ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর

শহীদ টিপু সুলতান

মুহাম্মদ ইলয়াস নদভী

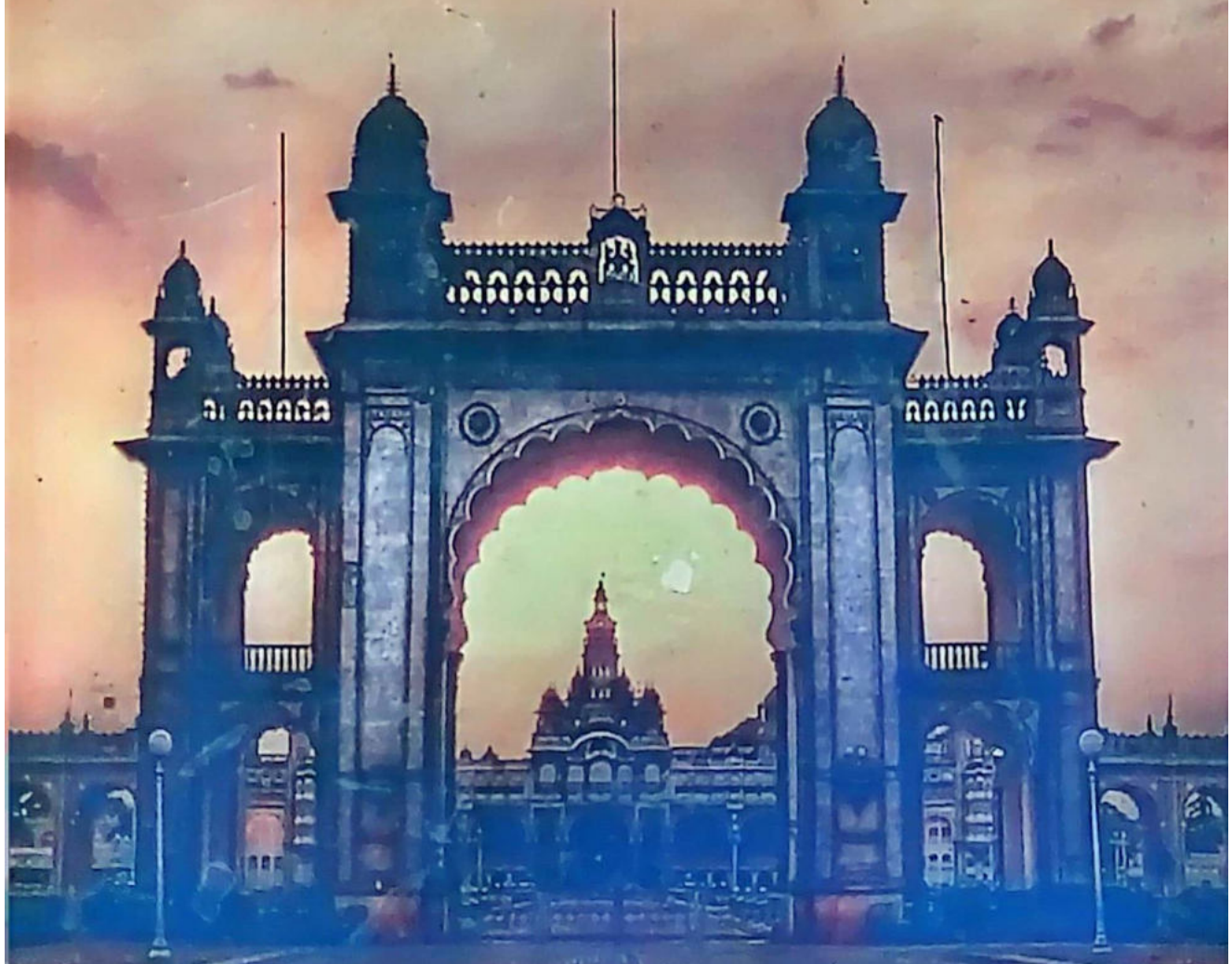

আবদুল্লাহ আল ফারুক

[অনূদিত]

www.boimate.com

ভারতবর্ষের ইতিহাসে টিপু সুলতানই ছিলেন সবচেয়ে উঁচু মনোবলসমৃদ্ধ শাসক, স্বদেশপ্রেমী সমরবিদ এবং স্বধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ সুলতান। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিনি যে পরিমাণ সচেতন ছিলেন– তাঁর মতো ওমন যুগচাহিদা সচেতন ও জাত্যাভিমানী ব্যক্তিত্ব এদেশে খুব একটা দেখা যায়নি।

গোটা জীবন তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত ৪ মে ১৭৯৯ ঈসাব্দে শ্রীরঙ্গাপত্তনামে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তিনি ইংরেজদের দাসত্ব ও তাদের দয়া-করুণা নিয়ে বেঁচে থাকার ওপর মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর সেই বীরত্বব্যঞ্জক মন্তব্য ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল রয়েছে– **শৃগালের মতো একশো বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা উত্তম।** টিপু সুলতানের শাহাদাতের মাধ্যমে অস্তমিত হয় স্বাধীনতার সূর্য।

আফসোসের বিষয় হলো, রচনাবলি ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির প্রচুর উপস্থিতি সত্ত্বেও ইংরেজি বা উরদু ভাষায় এমন কোনো গ্রন্থ অদ্যাবধি আমাদের চোখে পড়েনি– যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে তাঁর দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুন্নত প্রতিষ্ঠার নানামাত্রিক প্রয়াস এবং জিহাদের ময়দানে তাঁর অসামান্য অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

যে কারণে এই ঈমানদীপ্ত সম্রাট, দ্বীনঅন্তপ্রাণ মুজাহিদের ওপর একটি সত্যনিষ্ঠ জীবনীগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘ দিন যাবত অনুভব করছিলাম। এটি স্রেফ প্রয়োজনই নয়, এটি আমাদের ওপর তাঁর একপ্রকার অধিকারও বটে।

আল্লাহ তা'আলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার গুণী সন্তান মৌলভী মুহাম্মদ ইলয়াস ভাটকালী নদভীকে। আমি শুরু থেকেই তাঁকে এ বিষয়ে কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছি, উৎসাহ যুগিয়েছি। লেখক নিজেই টিপু সুলতানের দেশের মানুষ। লেখকের জন্মস্থান হলো ঐতিহাসিক নগরী ভাটকাল– যা দাক্ষিণাত্যের জাত্যাভিমানী চেতনার বাহক নগরী।

আশা করি, বইটির মাধ্যমে শহীদ টিপু সুলতানের ব্যক্তিত্ব ও অবদান সম্পর্কে ইতিহাসের পাতায় অনেক নতুন তথ্য ও জ্ঞানকথা সংযোজিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বইটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর তরুণ ও নবীন প্রজন্মকে দ্বীনি স্বাতন্ত্র্য, ইসলামি স্বকীয়তা এবং দেশ ও দেশের যথোপযুক্ত সেবার তাওফীক দিন।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
২ যিলহজ ১৪১৬ হি.
২১ এপ্রিল ১৯৯৬ ঈ.

কভার। হাশেম আলী

www.boimate.com

ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর

শহীদ টিপু সুলতান

www.boimate.com

প্রথম সংস্করণ : জুমাদাল উলা ১৪৩৮ / ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এর
কিতাবমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে
প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও দোকান নং-১
আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত
এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে
মুদ্রিত।
ই-মেইল : maktabatulazhar@yahoo.com

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
✆ : 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা ✆ 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট,
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা ✆ : 019 24 07 63 65

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী
বর্ণবিন্যাস ও অলঙ্করণ: মদীনা বর্ণশীলন, বাসাবো, ঢাকা
alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

www.boimate.com

অর্পণ

মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.

বাংলার মাটিতে আমি তাঁর মাঝেই সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ও
ইসলামবৈরী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের
ইস্পাতকঠিন চেতনা খুঁজেছি।

www.boimate.com

অনুবাদকের বিনীত আরয

শহীদ টিপু সুলতান রহ.। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আদর্শের কেন্দ্রবিন্দুতে যাঁর অবস্থান। মনে পড়ে— ছোটবেলায় বিড়ালের ওপর বসে, হাতে পাটখড়ি নিয়ে একঘর থেকে অন্য ঘরে দাবড়ে বেড়াতাম আর থুতনি বাড়িয়ে বলতাম, 'আই এম এ টিপু সুলতান'। এতোটাই ভালোবাসতাম তাঁকে। হৃদয়ের চোখে যাঁকে বারবার কল্পনা করেছি আবেগের সবটুকু আবির মেখে।

শৈশবের সেই বীরপুরুষের জীবনীগ্রন্থ অনুবাদ করার সময় অন্যরকম শিহরণ অনুভব করতাম, সবসময়। তাঁর প্রতি ঢেঁকিছাঁটা ভালোলাগা অনুভব করতাম বলেই রাতের পর রাত জেগে বইটি অনুবাদ করতে এতোটুকুন ক্লান্তিও বোধ করিনি। দু' পায়ে মশার মুহুর্মুহু হুল ফোটানোর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ম্যাপের দিকে অপলক চেয়ে থেকেছি।

বইটির প্রতি ভালোলাগার আরেকটি কারণ হলো, টিপু সুলতান রহ.-এর প্রতি সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. গভীর অনুরাগ। ইতিহাসের জগদ্দল গবেষণার নিচে চাপা পড়া অনুদ্ঘাটিত সত্য প্রকাশের তাড়না থেকেই তিনি বারবার শহীদ টিপু সুলতান রহ.-এর ওপর কোনো জীবনীগ্রন্থ রচনার আকুলতা ব্যক্ত করেছেন। সেটাই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখককে এ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণা, গভীর অধ্যয়ন ও তার সারনির্যাস কলমের আঁচড়ে তুলে ধরতে উদ্দীপ্ত করেছে। ভালোলাগার সেই স্বর্ণদ্বীপে আমার হৃদয়তরীও নোঙর ফেলেছিলো।

২.

লেখক মুহাম্মদ ইলয়াস নদভী ভাটকালি উরদুভাষী আলেম। জন্মসূত্রে টিপু সুলতানের স্মৃতিবিজড়িত মহিসুর রাজ্যের নাগরিক। তিনি জীবনীগ্রন্থটি উরদু ভাষায় রচনা করেছিলেন। সংশ্লিষ্টরা জানেন, উরদু ভাষায় হরকতের ব্যবহার নেই। অর্থাৎ আ-কার, ই-কার, উ-কারের বালাই নেই। যার কারণে যে কোনো বিদেশি শব্দের সঠিক উচ্চারণ উরদুর বুক থেকে উদ্ধার করা অত্যন্ত কষ্টকর। কষ্টের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, যখন সে-সব শব্দ হয় প্রাচীন আমলের কোনো অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির বা অচেনা স্থানের। বইটির অনুবাদকর্মে আমাকে এ বিষয়টি যথেষ্ট ভুগিয়েছে।

www.boimate.com

এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রচুর মানচিত্র জোগাড় করেছি। সময়-অপ্রয়োজনে গুগুলের দ্বারস্থ হয়েছি। বিভিন্ন প্রয়োজনে ইউকিপিডিয়ার সহায়তা নিয়েছি। কয়েকজন বন্ধু দীর্ঘদিন কর্নাটক-কেরালায় অবস্থান করেছিলেন। তাদের কাছ থেকেও প্রচুর সহায়তা পেয়েছি।

কোনো অচেনা ব্যক্তি বা স্থানের নামের পাশে মূল বইয়ে বন্ধনীর ভেতর ইংরেজি উচ্চারণ ছিলো না। নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ইংরেজি উচ্চারণ সংগ্রহ করে তা অনূদিত বইয়ে যুক্ত করেছি। হয়তো এ কারণে সাবলীলতা ক্ষুণ্ন হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে আশা করি সমঝদার পাঠক তা মেনে নেবেন।

৩.

মূল বইয়ে গুটিকয়েক সাদাকালো মানচিত্র ও ছবি ছিলো। সব মিলিয়ে দশটিও হবে না। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের খোরাক যোগাতে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আমি প্রচুর ছবি সংগ্রহ করে বইয়ের শেষাংশে যুক্ত করেছি। পঞ্চাশোর্ধ্ব ছবির এই এলবাম বইটিকে সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি এনে দেবে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪.

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বাসাবো আবু যর গিফারি কমপ্লেক্সের সম্মানিত পরিচালক মাওলানা আবদুর রাযযাক কাসেমী নদভী সাহেবের। তিনি আমাকে মূল বইটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। শুকরিয়া আদায় করছি প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহর। যার গভীর বন্ধুত্বকে ব্যক্ত করার মতো কোনো শব্দ আমার অভিধানে নেই।

সবশেষে সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি প্রিয় সহধর্মিনীর। যাকে বঞ্চিত করেই আমি সবসময় লেখালেখির জন্যে সময় বের করি; অথচ বিস্ময়কর সহযোগিতা নিয়ে অষ্টপ্রহর মাথার পাশে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

আল্লাহ তাঁদের ও অন্যসব শুভাকাঙ্ক্ষীর মঙ্গল করুন।

আবদুল্লাহ আল ফারুক
১১-০২-২০১৭

www.boimate.com

■■ সূচিপত্র ■■

অনুবাদকের কথা ০৭
প্রারম্ভিকা ২৫
অবতরণিকা [সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর কলমে] ৩১
লেখকের কথা ৩৬

প্রথম অধ্যায়
হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহান
ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চালচিত্র

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহান ও ভারতবর্ষ ৪৮
হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক চিত্র ৪৯
মুসলিম জাহানের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা ৫১
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চালচিত্র ৫৪
ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা ৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহিসুর রাজ্যের পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ

সালতানাতে খোদাদাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ ৬০
ইংরেজ ৬১
ভারতবর্ষে ইংরেজদের অনুপ্রবেশ ৬১
ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম যুদ্ধ ৬৪
দ্বিতীয় যুদ্ধ ৬৫
মারাঠা ৬৬
দাকানের নিযাম ৬৭
আরকাটের নবাব ৭০

www.boimate.com

তৃতীয় অধ্যায়
মহিসুর ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক অবস্থান

মহিসুরের নামকরণ ৭৪
মহিসুরের বর্তমান অবস্থান ৭৪
ইতিহাসের পাতায় মহিসুরের অবস্থান ৭৫
মহিসুরে ইসলামের আগমন ৭৭
দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৭৭
হিন্দু রাজ্যের পতন ৮১
বিজয়নগরের পতনের পর মহিসুরের অবস্থা ৮২
সালতানাতে খোদাদাদের প্রতিষ্ঠাকালে মহিসুরের অবস্থা ৮৩

চতুর্থ অধ্যায়
টিপু সুলতান শহীদের পরিবার

টিপু পরিবারের পেছনের ইতিহাস ৮৬
টিপু পরিবারের ভারতবর্ষে আগমন ৮৭
টিপুর পিতৃপুরুষ ৮৮
দাদা মুহাম্মদ ফত্হ ৮৯

পঞ্চম অধ্যায়
হায়দার আলী : জন্মগ্রহণ থেকে সেনাপ্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত

জন্মগ্রহণ ৯৪
শৈশব ৯৫
চাকুরিতে যোগদান ৯৫
বৈবাহিক সম্পর্ক ৯৬
সামরিক বাহিনীতে পদোন্নতি ৯৮
মহিসুর রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ও মারাঠাদের আক্রমণ ১০০
হায়দার আলীর বিশ্বস্ততা ও সেনাপ্রধানের পদে পদোন্নতি লাভ ১০১

www.boimate.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সালতানাতে খোদাদাদের প্রতিষ্ঠা থেকে হায়দার আলীর মৃত্যু পর্যন্ত

হায়দার আলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১০৪
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো ১০৬
শ্রীরঙ্গাপত্তনামের ওপর হায়দার আলীর আক্রমণ ও দখল ১০৭
হায়দার আলী কর্তৃক মহিসুরের অভিভাবকত্ব গ্রহণের কারণ ১০৯
শাসনক্ষমতা স্থানান্তরিত হওয়ার সময় মহিসুরের আয়তন ১১৩
প্রাথমিক বিজয় ১১৩
বেদনুর (Bednore) দখল ১১৪
গোয়া নগরীর ওপর আক্রমণ ১১৬
কেরালার মুসলমানদের সহায়তা ও মালাবার আক্রমণ ১১৬
কন্যানুর ও কালিকাট জয় ১১৯
পুনানী অভিযান ১১৯
মারাঠাদের আক্রমণ ১২০
মারাঠাদের অগ্রযাত্রা ১২০
ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের প্রথম যুদ্ধ ১২২
ইংরেজদের পশ্চাদসরণ ও সন্ধির আবেদন ১২৬
মারাঠাদের দ্বিতীয় আক্রমণ ১২৭
বিজয়ী বেশে অগ্রযাত্রা ও মামলাকাতে খোদাদাদের সম্প্রসারণ ... ১৩০
ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৩১
শত্রুপক্ষের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা ১৩২
যুদ্ধের সূচনা ১৩৪
হায়দার আলীর অসুস্থতা ১৩৬
পৃথিবী থেকে প্রস্থান ১৩৭
মালাবার থেকে সুলতান টিপুর আগমন ১৩৮

সপ্তম অধ্যায়

হায়দার আলীর বৈশিষ্ট্যাবলি

আকার-আকৃতি ১৪২

www.boimate.com

প্রাত্যহিক অভ্যাস ১৪২
সাহস ও বীরত্ব ১৪৪
প্রশাসন পরিচালনার যোগ্যতা ১৪৫
রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান ১৪৬
মানবিক সহমর্মিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা ১৪৯
ধর্মীয় উদারতা ১৫০
ইসলামি চেতনা ১৫১
রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক কর্মকৌশল ১৫২
হায়দার আলীর শাসনামলে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি ১৫৫

অষ্টম অধ্যায়

টিপু সুলতান শহীদ রহ.

জন্ম থেকে সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত

জন্মগ্রহণ ১৫৮
বংশলতিকা ১৫৮
টিপুর জন্ম হায়দার আলীর জীবনে কল্যাণের শুভবার্তা ১৬০
শিক্ষা ও প্রতিপালন ১৬০
টিপুর শৈশব ১৬০
টিপুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে হায়দার আলীর সবিশেষ ১৬১
মনোযোগ ১৬৩
স্বীকারোক্তিনামা ১৬৪
ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে উজ্জ্বল অবদান ১৬৫
মারাঠাবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১৬৫
বিয়ে ১৬৬
হায়দার আলীর শেষ যুদ্ধে টিপুর কৃতিত্ব ১৬৯
হায়দার আলীর মৃত্যু ও টিপুর স্থলাভিষিক্তি ১৭০
জনগণের নামে প্রথম রাষ্ট্রীয় বার্তা ১৭২
সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে টিপুর ভূমিকা ১৭৩

www.boimate.com

নবম অধ্যায়
রাজসিংহাসনে আরোহণ থেকে মঙ্গলোর চুক্তি পর্যন্ত

রণদামামা বেজেই চলছে ১৭৬
ইংরেজদের বেদনুর (Bednore) দখল ১৭৬
মঙ্গলোর অবরোধ ১৭৮
কাডাপ্পা (Kadapa)-এরর বিদ্রোহ ১৭৯
শ্রীরঙ্গপত্তনমে নানা চক্রান্ত ১৭৯
বিশ্বস্ত সেনাপতির নির্বুদ্ধিতা ও পরিণতি ১৮০
পাইনঘাটে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ ও পরাজয় ১৮১
কিডলোরের যুদ্ধ ও মহিসুরের সেনাবাহিনীর বিজয় ১৮২
ইংরেজ শিবিরে নৈরাশ্য ও সন্ধির আবেদন ১৮২
মঙ্গলোর চুক্তি ও তার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা ১৮৩
টিপু কেন সন্ধির পথে হাঁটলেন? ১৮৪
বিজয়ের উৎসব ১৮৬
টিপু সুলতানের মসনদে আরোহণের আনুষ্ঠানিক আয়োজন ১৮৭
'ফাতহুল মুজাহিদীন' গ্রন্থ সংকলন ১৮৭

দশম অধ্যায়
অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও মারাঠা যুদ্ধ

বিভিন্ন করদ রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন ১৯০
রাজা পঙ্কনোজের অবাধ্যতা ১৯০
নরগণ্ডা বিজয় ১৯১
কোর্গ অধিবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ১৯২
কনানূরের রানীর আনুগত্য স্বীকার ১৯৪
যুদ্ধবন্দীদের ইসলাম গ্রহণ ১৯৫
মারাঠা ও নিযামের উন্মত্ত আক্রমণ ও পশ্চাদসরণ ১৯৬
যুদ্ধের জন্যে অজুহাত সন্ধান ১৯৭
যুদ্ধ এড়াতে টিপুর প্রচেষ্টা ১৯৮
বাদামি (Baddami) নগরীর পতন ১৯৯

www.boimate.com

ধারওয়াড় কেল্লারক্ষীর বিশ্বাসঘাতকতা ২০০
টিপু কর্তৃক আদোনী (Adoni) নগরীর ওপর আক্রমণ ২০১
কুঞ্জনগড় দখল ও রাজকুমারের ইসলাম গ্রহণ ২০২
অনৈতিক আচরণের দায়ে কিছু সৈন্যের দণ্ডপ্রয়োগ ২০৩
প্রকাশ পেলো টিপুর বুযুর্গি ২০৪
নদী পেরিয়ে মারাঠাদের ওপর গেরিলা আক্রমণ ২০৫
মারাঠাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সংঘাত ও টিপুর সফল যুদ্ধকৌশল ২০৫
শত্রুপক্ষের একের পর এক পরাজয়
ও মহিসুরের সেনাবাহিনীর বুদ্ধিমত্তা ২০৭
যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সদাচরণ ২০৮
আবার রণাঙ্গনে ২০৮
শাহনুর (Savanur) জয় ২০৯
মহিসুরের সৈন্যরা যখন বিভিন্ন রণাঙ্গনে ২১০
সন্ধিচুক্তি ২১১
চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ২১১

একাদশ অধ্যায়

অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলির ওপর মনোযোগ প্রদান ও উসমানি খলীফার কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ

রাজধানী প্রত্যাবর্তন ও বিজয়-উৎসব ২১৪
রাজ্যের প্রাশাসনিক কাঠামোর সুব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগ ২১৪
রাজ-সিংহাসনের নবরূপ দান ২১৫
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ২১৬
মসজিদে আ'লা নির্মাণ ২১৬
টিপুর কারামত ও জনতার বিস্ময় ২১৭
কারখানা স্থাপন ২১৭
খিলাফতে উসমানিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ২১৮
উসমানিয়া সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ২১৯
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আসল উদ্দেশ্য ২২০
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক কারণ ২২২

www.boimate.com

উসমানিয়া খেলাফত কর্তৃক সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি ২২৪
খলীফা বরাবর টিপুর পত্র প্রেরণ ২২৫
চুক্তির খসড়া ২২৫
খলীফার উত্তর ২২৬
ব্যর্থ মনোরথে প্রতিনিধিদলের ব্যর্থতা, খলীফার দুর্ভাগ্য ২২৭
কোর্গ নগরীতে পুনরায় বিদ্রোহ ২২৮
মালাবারে করদ রাজাদের অবাধ্যতা ২২৯
কোচি ও ট্রাভাংকুর (Travancore)-এর রাজাদের শায়েস্তা ২২৯

দ্বাদশ অধ্যায়

তৃতীয় যুদ্ধ থেকে শ্রীরঙ্গপত্তনাম চুক্তি পর্যন্ত

ইংরেজদের গোপন রণপ্রস্তুতি ২৩২
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অজুহাত সন্ধান ২৩৩
প্রথম সংঘাত ২৩৩
শায়খ বুরহানুদ্দীনের শাহাদাতলাভ ২৩৪
জেনারেল মেডোজের পলায়ন ২৩৪
রণপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে সম্মিলিত বাহিনী গঠনের তোড়জোড় ... ২৩৫
নিযামের সঙ্গে সমাঝোতা গড়ে তুলতে টিপুর প্রচেষ্টা ২৩৬
তিন বাহিনীর জোট ২৩৭
বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে ধূর্ত ইংরেজ ২৩৮
ফরাসিদের কাছে সহযোগিতার আহ্বান ২৪০
রণক্ষেত্র অভিমুখে সম্মিলিত বাহিনী ২৪০
ব্যাঙ্গালুরু অভিমুখে টিপুর অভিযাত্রা এবং হোস্কোটা ও কোলার
নগরীদ্বয়ের ওপর ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার ২৪১
প্রথম সংঘাত ও ইংরেজদের পশ্চাদসরণ ২৪২
ব্যাঙ্গালুরু নগরীর পতন ২৪৩
কৃষ্ণা রাওয়ের বিশ্বাসঘাতকতা ২৪৫
গাদ্দারির পরিণতি ২৪৬
টিপুর চিকবালাপুর পুনর্দখল ২৪৭
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন ২৪৭

www.boimate.com

মীর কমরুদ্দীনের কৃতিত্ব ২৪৭
মারাঠা ও নিযামের যৌথবাহিনীর আক্রমণ ২৪৮
মারাঠাদের তাণ্ডব ও নিজেদের মন্দিরের অবমাননা ২৪৮
ধারওয়াড় নগরীতে মহিসুর বাহিনীর পশ্চাদসরণ ২৪৯
রাজধানীর নিষ্ফল অবরোধ ২৫১
গরমকুণ্ডা নগরীতে টিপুর রাজপুত্রের বীরত্ব ২৫২
শ্রীরঙ্গপত্তনম পুনঃঅবরোধ ২৫২
জনগণকে টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে ইংরেজদের চক্রান্ত ২৫৩
যুদ্ধ হলো শুরু ২৫৫
তুমুল সংঘর্ষ ২৫৫
টিপুর ভুল সিদ্ধান্ত ও তার প্রায়শ্চিত্ত ২৫৬
অবরোধ দীর্ঘতর হওয়ায় সন্ধির জল্পনা ২৫৭
চুক্তির খসড়া ২৫৮
আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন টিপু কীকরে এই লাঞ্ছনা মেনে নিলেন? ... ২৫৯
চুক্তি বাস্তবায়ন ২৬১
সম্মিলিত বাহিনী কী পেল? ২৬১
সাম্রাজ্যের ওপর চুক্তির নেতিবাচক প্রভাব ২৬২
পরাজয়ের মাঝেও বিজয়ের সূর ২৬৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ও বিদেশী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ

যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন..... ২৬৬
দু' শাহযাদার প্রত্যাবর্তন ২৬৬
প্রজাতন্ত্র প্রবর্তন ও সংসদ গঠন ২৬৭
সামরিক বাহিনীর পুনর্বিন্যাস ও নৌশক্তির ওপর মনোযোগ ২৬৯
আনুগত্যের অঙ্গীকার নবায়ণ ২৭০
আনুগত্যের অঙ্গীকারের আড়ালে মীর সাদিকের গাদ্দারি ২৭১
অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ২৭৩
মারাঠা যাযাবরের ইসলামগ্রহণ ২৭৩

www.boimate.com

নিযাম ও মারাঠিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গঠনের পুনচেষ্টা ২৭৫
ইংরেজ প্রশাসনের রদ-বদল ২৭৬
ইউরোপে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নেপোলিয়নের উত্থান ২৭৭
বিদেশের মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ ২৭৮
উসমানি সুলতানের কাছ থেকে পুনরায় নৈরাশ্য ২৭৮
কাবুল-শাসকের প্রেরণাদায়ী উত্তর ২৮১
যামান শাহকে ফেরাতে ইংরেজদের সফল কূটচাল ২৮২
ইরান-সম্রাটের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ২৮৩
রাষ্ট্রের হিন্দু রাজাদের উদ্দেশে ঐক্যের আহ্বান ২৮৪
মীর সাদিকের প্রতারণার জাল বিস্তার ২৮৫

চতুর্দশ অধ্যায়

চতুর্থ যুদ্ধের সূচনা থেকে টিপুর শাহাদাৎ পর্যন্ত

চতুর্থ যুদ্ধ বাঁধাতে ইংরেজদের পরিকল্পনা ২৮৮
সাব সিডিয়ারি সিস্টেম ২৮৮
নিযামের নির্বুদ্ধিতা ও স্কিমে সম্মতি প্রদান ২৯০
স্কিমের ওপর স্বাক্ষর করতে মারাঠিদের ওপর চাপ প্রয়োগ ২৯১
টিপুকে অসতর্ক রাখার অপচেষ্টা ২৯২
যুদ্ধের জন্যে অজুহাত সন্ধান ২৯৩
পদচ্যুত রাজার রানীর চক্রান্ত ২৯৫
মাদরাজ প্রশাসনের সেক্রেটারির নীতি-নৈতিকতা ২৯৬
দেশ বিক্রির কুমতলববাজদের সীমাহীন দৌড়-ঝাঁপ ২৯৭
ঈমান ও কুফরির রণাঙ্গনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন ২৯৭
দায়মুক্তির কৌশল হিসেবে সর্বশেষ পদক্ষেপ ২৯৮
যথারীতি যুদ্ধের সূচনা ২৯৯
মীর মুঈনুদ্দীন ও পুর্নিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ৩০০
আরেক স্থানে সংঘাত ৩০০
রাজধানী অবরোধ ৩০১
চরম বিপদের মুহূর্তে ফরাসিদের কৃতজ্ঞতা ৩০২
দেশ বিক্রির কুমতলববাজদের আরেকটি প্রতারণা ৩০৩

www.boimate.com

বদরুজ্জামান খানের রহস্যজনক পরামর্শ ৩০৩
যে দিনটি যুদ্ধের গতিপথ নিশ্চিত করেছে ৩০৪
জনৈক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ৩০৬
কেল্লার ওপর আক্রমণ ৩০৭
সাইয়্যেদ আবদুল গাফফারের সৌভাগ্য ৩০৭
টিপু সুলতানের শাহাদাত-স্পৃহা ও চরম অস্থিরতা ৩০৯
নরাধম মীর সাদেক অপমৃত্যুর গহ্বরে ৩১০
সুলতানের শাহাদাতের অন্তিম মুহূর্তের কিছু চিত্র ৩১০
বাঘের মতো এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা শিয়ালের মতো
হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম ৩১১
আরেকটি কারবালা, আরেকটি শাহাদাত, আরেক হুসাইন ৩১২
স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলো ৩১৩
প্রাণ নিস্তেজ; দেহ উষ্ণ ৩১৫
শ্রীরঙ্গাপত্তনম পতন ৩১৮
মানবতাও সেদিন ডুকরে কেঁদেছিলো ৩১৮
জানাযা ও দাফন ৩১৯
সেদিন আকাশের চোখেও অশ্রু ছিলো ৩২০

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীরঙ্গপত্তনাম পতনের পর সংঘটিত কিছু ঘটনা

সুলতানের ঐশ্বর্য এখন লুটেরাদের হাতে ৩২৪
রাজসিংহাসন ৩২৬
সুলতানের পরিবার-পরিজন নজরবন্দি ৩২৬
রাজপরিবারের নির্বাসন ৩২৮
জাত্যাভিমানী সুলতানের সন্তানদের অসহায় জীবন ৩২৯
নতুন সরকার গঠন ও শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ৩৩০
হিন্দু রাজপরিবারের পুনর্বহাল ৩৩১
গাদ্দারির প্রতিদান ৩৩২
সাম্রাজ্য বণ্টনের সময় ইংরেজদের বানরসুলভ বটোয়ারা ৩৩২
ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়োল্লাস ৩৩৩

www.boimate.com

ষোড়শ অধ্যায়

সুলতানের শারীরিক গড়-গঠন ও সন্তান-সন্ততি

শারীরিক গঠন ৩৩৬
প্রাত্যহিক কর্মসূচি ৩৩৮
সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য ৩৪১

সপ্তদশ অধ্যায়

গাদ্দারদের অপকীর্তি ও প্রকৃতির প্রতিশোধ

ঘরের শত্রু বিভীষণ ৩৪৬
১. খন্ডে রাও ৩৪৯
২. হায়দার বখশ ৩৫০
৩. কৃষ্ণা রাও ৩৫০
৪. মীর সাদিক ৩৫১
৫. ত্রিমুল রাও ৩৫৬
৬. পুর্নিয়া ৩৫৬
৭. লক্ষ্মী উমানী ৩৫৮
৮. মীর আলম ৩৫৯
৯. মীর গোলাম আলী লেংড়া ৩৬১
১০. মীর মুঈনুদ্দীন ৩৬৪
১১. মীর কমরুদ্দীন ৩৬৫
১২. মীর কাসেম আলী ৩৬৭
১৩. আয়ায খান ৩৬৮
১৪. মুহাম্মদ কাসেম খান ৩৬৮
১৫. উসমান খান কাশ্মিরী ৩৬৯
১৬. মাহদী আলী খান ৩৬৯
১৭. রাজা খান ৩৭০
১৮. শায়খ শিহাবুদ্দীন ৩৭১

www.boimate.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

টিপুর জন্যে প্রাণোৎসর্গী ক'জন সঙ্গী
ইতিহাসের পাতায় যারা চিরকাল অম্লান

টিপুর জন্যে প্রাণোৎসর্গী ক'জন সঙ্গী
ইতিহাসের পাতায় যারা চিরকাল অম্লান ৩৭৪
১. বুরহানুদ্দীন ৩৭৪
২. সাইয়্যেদ আবদুল গাফফার ৩৭৬
৩. মুহাম্মদ রেযা খান ৩৭৭
৪. গোলাম খোদাদাদ ৩৭৮
৫. মালিক জাহাঁ খান ৩৭৮
৬. শায়খ ইসমাঈল ৩৮০
৭. মুহাম্মদ আলী ৩৮০
৮. সাইয়্যেদ হামেদ ৩৮২
৯. লালা মাহতাব রায় সাবকাত ৩৮২
১০. নবাব হুসাইন আলী খান ৩৮২
১১. শায়খ মেরান ৩৮৪
১২. মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন ৩৮৪
১৩. খাজা আফতাব খান ৩৮৪
১৪. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান ৩৮৪
বদরুজ্জামান খান নায়েতা : ইতিহাসের রহস্য পুরুষ ৩৮৫

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীরঙ্গপত্তনম পতনের নেপথ্য কারণ
এবং মুসলিমবিশ্ব ও ভারতবর্ষের ওপর তার প্রভাব

সালতানাতে খোদাদাদের পতনের নেপথ্য কারণ ৩৯০
১. ঘরের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা ৩৯১
২. কোমল মনোবৃত্তি ও অধীনস্থদের ওপর সীমাতিরিক্ত আস্থা ৩৯১
৩. মানুষ চিনতে ভুল করা ৩৯১
৪. সামরিক কর্মকৌশলের ব্যর্থতা ৩৯৩
৫. শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীর মুখে নিঃসঙ্গ টিপু ৩৯৩

www.boimate.com

৬. ইংরেজদের সামরিক সুশৃংখলা ৩৯৫
৭. ধর্মীয় রুসম রেওয়াজ নিষিদ্ধ করার কারণে জনগণের ক্ষোভ ৩৯৭
৮. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফরাসিদের সঙ্গে নিষ্প্রোয়জনীয় সম্পর্ক ৩৯৭
হিন্দুস্তানের রাজনীতির ওপর টিপু পতনের প্রভাব ৩৯৮
মুসলিম জাহানের ওপর সালতানাতে খোদাদাদের
পতনের প্রভাব ৩৯৯

বিংশ অধ্যায়

টিপু সুলতানের মানবিকতা ও ধর্মীয় সৌহার্দ্য

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ৪০৪
প্রশাসনের উচ্চপদে হিন্দু অফিসার ৪০৬
মন্দির ও সেখানকার পুরোহিতদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন ৪০৭
মন্দিরে উপহার ৪০৯
রাজপ্রাসাদের কাছেই মন্দির ৪১১
মন্দিরের জন্যে স্থাবর সম্পত্তি..... ৪১১
হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সামাজিক শুদ্ধি..... ৪১২
সুলতানের প্রতি হিন্দু প্রজাদের অপরিসীম ভালোবাসা ৪১৪
খ্রিস্টান প্রজাদের সঙ্গে সুলতানের আচরণ ৪১৫
মাহদী মতাবলম্বীদের ওপর কঠোরতা ও তার কারণ ৪১৭

একবিংশ অধ্যায়

একজন মুসলমান ও ধর্মপ্রচারক হিসেবে টিপু সুলতানের অবদান

ইসলামি ঐক্য গড়ে তোলার স্পৃহা ৪২০
ধর্মের ওপর কঠোর অবস্থান ৪২০
কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালন ৪২৫
ইসলামি সমাজ কায়েমের প্রয়াস ৪২৯
তাকওয়া ও খোদাভীরুতা ৪৩৫
লজ্জা ও শালীনতা ৪৩৭

www.boimate.com

বুযুর্গি ৪৩৮
অধরা স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেলো ৪৪০
রায়বেরেলী সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের ফলেই টিপু
পরিবারের দ্বীনের ওপর অবিচলতা..... ৪৪১

দ্বাবিংশ অধ্যায়
একজন আলেম ও বিদ্যানুরাগী হিসেবে টিপু সুলতানের অবদান

জ্ঞান-গভীরতা ৪৪৬
সুলতানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ৪৪৮
টিপুর স্বহস্তে বা নির্দেশনায় সংকলিত বইয়ের তালিকা ৪৫০
সালতানাতে খোদাদাদে উরদূ ভাষার ব্যবহার ৪৫৯
উরদূ ভাষার প্রথম সংবাদপত্র ৪৬০
চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ ৪৬১
টিপু সুলতানের সময়কার উলামা ও কবিগণ ৪৬৩
টিপু সুলতানের কয়েকটি অমীয় বাণী ৪৭২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
জন্মগত গুণাবলি ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলি

বীরত্ব ও সাহসিকতা ৪৭৫
বাঘের সঙ্গে টিপুর সখ্যতা ৪৭৬
বাঘসদৃশ্য খেলনা ৪৭৭
প্রভাব ও দাপট ৪৭৮
তিনি নেপোলিয়নের চেয়েও বড় বীর ছিলেন ৪৭৯
হৃদয়ের কোমলতা ৪৮০
ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্য ৪৮৩
ক্ষুরধার মেধা ৪৮৫
উদ্ভাবনী ক্ষমতা ৪৮৫
নগরীর নাম পরিবর্তন ৪৮৭

www.boimate.com

মুদ্রার নাম ৪৮৯
পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রশাসন ৪৯০
ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আদম শুমারি ৪৯১
স্বপ্নের সঙ্গে টিপুর মিতালী ৪৯১
দেশপ্রেম ৪৯২
নির্মাণশিল্পের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ ৪৯৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শাসক ও দেশপরিচালক হিসেবে টিপুর মূল্যায়ন

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা ৪৯৮
প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ৪৯৯
কেন্দ্রীয় প্রশাসন ৪৯৯
১. অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫০০
২. স্থলবাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫০১
৩. নৌবাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫০১
৪. প্রতিরক্ষা বিভাগ ৫০১
৫. সমরাস্ত্র সংরক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫০২
৬. রাজকোষ সংরক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫০২
৭. আইন, বিচার ও সালিশ মন্ত্রণালয় ৫০৩
৮. সেনাবাহিনী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫০৩
৯. প্রচার ও প্রজ্ঞাপন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫০৩
প্রাদেশিক প্রশাসন ৫০৪
জেলা ও তালুক ব্যবস্থা ৫০৫
নাগরিক ব্যবস্থাপনা ৫০৫
পররাষ্ট্র নীতি ৫০৬
ফরাসিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ৫০৭
মহিসুরের সেনাবাহিনী ৫০৯
সেনাবাহিনীর বিন্যাস ৫১১
নৌশক্তি ৫১৩

www.boimate.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

টিপু সুলতানের শাসনামলে মহিসুরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

মহিসুর রাজ্যের আর্থিক সচ্ছলতা ৫১৬
বাণিজ্য-সম্প্রসারণ ৫১৭
প্রকৌশল ও কারিগরি শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি ৫১৯
যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ৫২০
কৃষি খাত ৫২১
শত্রুদের মুখে সুলতানের ভূয়ষী প্রশংসা ৫২৬
গ্রন্থে আলোচিত কিছু অপরিচিত স্থানের
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৫৩০
গ্রন্থপঞ্জি ৫৪১

www.boimate.com

প্রা র ম্ভি কা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، أَمَّا بَعْدُ :

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা প্রাকৃতিকভাবে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র। তারা স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতা ও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। এর কারণ হলো, ইংরেজরা যখন ভারত গ্রাস করা শুরু করে এবং ধীরে ধীরে একেকটি প্রদেশ ও ভূ-খণ্ড করায়ত্ব করতে থাকে ওই সময় মুসলমানরাই ছিল ভারতের শাসক।

সর্বপ্রথম যিনি এই আশঙ্কা উপলব্ধি করেছেন তিনি হলেন মহিসুরের দুঃসাহসী, দূরদর্শী ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন শাসক সুলতান ফতেহ আলী খান টিপু (মৃত ১২১৩ হি./১৭৯৯ ঈ.)। যিনি তাঁর গভীর দৃষ্টি ও অসাধারণ মেধার মাধ্যমে এ কথা অনুভব করেছেন যে, ইংরেজ এভাবে একেকটি প্রদেশ ও একেকটি জমিদারি গ্রাস করতে থাকবে। যদি কোনো শৃঙ্খলিত শক্তি তাদের প্রতিরোধ না করে তাহলে শেষ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ তাদের গ্রাসে পরিণত হবে। এ কারণেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নিজের পূর্ণ সামরিক উপায়-উপকরণ, শক্তি-ক্ষমতা ও সামরিক প্রস্তুতি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হন।

টিপু সুলতান ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজা, মহারাজা ও নবাবদেরকে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার ওপর উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তুর্কিস্তানের সম্রাট সলীম উসমানি-সহ অন্যান্য মুসলিম সম্রাট, ভারতবর্ষের বিভিন্ন নৃপতি ও নবাবদের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান করেছেন। নিজের রাষ্ট্রদূতদেরকে ফ্রান্স, তুর্কিস্তান, ইরান প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রেরণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। নেপোলিয়ানও তাঁকে সহায়তা করেছেন। ক্রমবর্ধনশীল বিপদজনক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি তাকে সহায়তা করেছেন। গোটা

www.boimate.com

জীবন তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সফলতার দোরগোড়ায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। ইংরেজদের সকল ষড়যন্ত্র ধুলিস্যাৎ করে ভারতবর্ষের মাটি থেকে তাদের শেষ শেকড়টুকু উপড়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিলেন। কিন্তু চতুর ইংরেজ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সম্রাটের সঙ্গে জোট বাঁধে। শেষ পর্যন্ত এই মুজাহিদ সম্রাট ৪ মে ১৭৯৯ ঈসাব্দে শ্রীরঙ্গাপত্তনমের রণাঙ্গণে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তিনি ইংরেজদের দাসত্ব ও বশ্যতা এবং তাদের দয়া-করুণা নিয়ে বেঁচে থাকার ওপর মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর সেই বীরত্বব্যঞ্জক মন্তব্য ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে যে, **'শৃগালের মতো একশো বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা উত্তম।'**

যখন জেনারেল হ্যারিস সুলতান টিপুর শহিদ হওয়ার সংবাদ শোনে তখন সে তাঁর লাশের ওপর দাঁড়িয়ে এ কথা বলেছিলো এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসে তার সেই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো যে, **'আজ থেকে ভারতবর্ষ আমাদের।'**

ভারতবর্ষের ইতিহাসে টিপু সুলতানের চেয়ে অধিক উঁচু মনোবল সমৃদ্ধ, দূরদর্শী, স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের জানি দুশমন ব্যক্তি একজনও নেই। ইংরেজ শিবিরে তাঁরচেয়ে অধিক ভয় ও বিরাগ অন্য কারো ওপর ছিলো না। অনেক দিন পর্যন্ত (এবং সেই যুগ আমরাও দেখেছি) তারা তাদের অন্তর্জ্বালার আগুন নেভাতে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন ও জিহাদের এই মহাবীরকে অপমান-অপদস্থ করতে তাদের পালিত কুকুরগুলোকে 'সুলতান টিপু' নামে ডাকতো।

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে, এই বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ প্রসারে ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর বৃটিশদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এবং তার যুগের প্রবাহ বদলে দেওয়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন উপলব্ধি করা এবং এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে (যা শুধু ভারতবর্ষই নয়; বরং মুসলিম উম্মাহ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং আগামীর পৃথিবীর ওপরও প্রভাব ফেলেছিলো) ইত্যাদি সম্পর্কে টিপু সুলতান যে পরিমাণ অবহিত ও সন্ত্রস্থ ছিলেন, তাঁর মতো এমন দূরদর্শী, যুগচাহিদা সচেতন ও জাত্যাভিমানী ব্যক্তিত্ব এদেশের ইতিহাসে বিরল। যদি এক্ষেত্রে টিপু সুলতানের বাইরে

www.boimate.com

দ্বিতীয় কেউ থেকে থাকেন তিনি হলে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. (১২০১ হি.-১২৪৬ হি.)। তাঁর মূল্যবান চিঠিপত্রে সে ভাষ্যই ফুটে ওঠেছে। তিনি গোয়ালিয়রের মহারাজার প্রধান উযির রাজা হিন্দুরাও ও তার সামরিক সেনাপতি গোলাম হায়দার খানের নামে চিঠিগুলো লেখেছিলেন। সেখানে ইংরেজদের সম্পর্কে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এ মন্তব্য করেছেন।

রাজা হিন্দুরাওয়ের উদ্দেশে প্রেরিত পত্রে তিনি লেখেন—

> 'জনাব ভালোভাবেই অবহিত আছেন যে, সমুদ্রের ওপার থেকে আসা এই বিদেশীরা এখন গোটা বিশ্বের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ব্যবসার ছদ্মবেশে তারা সাম্রাজ্যের কর্তা বনে গেছে। অনেক বড় বড় সম্রাটদের সাম্রাজ্য ও তাদের মান-সম্মান ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। যারা এতোদিন রাজত্ব ও রাজনীতির বীরপুরুষ ছিলো, এখন তাদেরকে ওরা নাস্তানাবুদ করে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই বাধ্য হয়ে কয়েকজন গরিব ও সহায়-সম্বলহীন মানুষ সাহস করে দাঁড়িয়ে গেছে। তারা একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। ধন-সম্পদের প্রতি তাদের সামান্য পরিমাণ লোভও নেই।'

গোয়ালিয়রের প্রধান সেনাপতি গোলাম হায়দারের নামে লেখা পত্রে সাইয়্যেদ আহমদ শহিদ রহ. লেখেন—

> 'ভারত রাজ্যের বৃহদাংশ বিদেশীদের করতলগত হয়ে গেছে। তারা সবখানে অত্যাচার-নিপীড়নের স্টিমরোলার চালাচ্ছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজা-মহারাজার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহস কারোরই হচ্ছে না। এখন প্রত্যেকেই তাদেরকে নিজেদের প্রভু মনে করছে। যেহেতু বড় বড় শাসকরা তাদের বিরোধিতা করার সাহস খুইয়ে বসে গেছে; এজন্যে আমরা কয়েকজন দুর্বল ও অসহায় মানুষ এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি।'

সম্ভবত এই ঈমানি দূরদর্শিতা, দ্বীনি আত্মসম্মানবোধ, গভীর প্রজ্ঞা ও কর্মস্পৃহার ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের সমান সম্পৃক্ততার কারণ হলো,

www.boimate.com

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.-এর বংশের সঙ্গে শহীদ টিপু সুলতান রহ.-এর বংশের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিলো। শহীদ সুলতান রহ. সম্পর্কে যেই বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হয়েছে, সেগুলোতে এ বিষয়টির ওপর খুব কমই আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়টি উদ্ঘাটিত হয়েছে وقائع محمدي [ওয়াক্বাইয়ে' মুহাম্মাদী] নামক বইয়ে আলোচিত সেই বয়ান থেকে, যা সাইয়্যেদ সাহেব তাঁর হজের সফরের সূত্রে কলকাতায় অবস্থানকালে পেশ করেছিলেন। সাইয়্যেদ সাহেবকে যখন টিপুর পরিবারের নির্বাসিত ছেলে-মেয়েরা দাওয়াত করে এবং তাঁর হাতে বাই'আত হয়ে ইসলাহি সম্পর্ক কায়েম করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তারই সূত্র ধরে আলোচনাটি ওই গ্রন্থে ওঠে আসে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ 'সীরাতে টিপু সুলতান শহীদ'-এর মাঝে সম্মানিত লেখক মৌলভী মুহাম্মদ ইলয়াস নদভী বিস্তারিতভাবে সেই পারিবারিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতার ওপর আলোকপাত করেছেন।

ঐতিহাসিকভাবে এটাই বাস্তব যে, টিপু সুলতানের শাহাদাতের ঘটনাটি ভারতবর্ষের ইতিহাসের বাঁক বদল করেছে। তাঁর শাহাদাত এ ভূ-খণ্ডকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের হাতে তুলে দেয়। যার প্রভাব ভারতবর্ষের ওপর ব্যাপকাকারে বিস্তৃত। যার প্রভাব ভারতীয় মুসলমানদের ওপর (যারা তখন মুসলিম জাহানে জ্ঞানবৃত্তিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন) অত্যন্ত গভীর, অন্তস্পর্শী ও বিস্তৃত। এই বাস্তবতাকে যুগের বিরল কবি মাওলানা জাফর আলী খান যেভাবে শিল্প-সুষমা ও বাস্তববাদী শৈলীতে উপস্থাপন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত এবং তাঁর মতো বাস্তবতার যথাযথ চিত্রায়ণ একটি বিশাল প্রবন্ধে তুলে ধরাও কঠিন। তিনি লেখেন—

اس کے اٹھتے ہی مسلمان کا گھر بیٹھ گیا

تھا قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود

তাঁর প্রস্থানমাত্রই ধ্বসে পড়েছে মুসলমানদের বসত।
একেই বলে প্রলয়ের উত্থান ও প্রলয়ের প্রস্থান।

প্রয়োজন ছিলো, এমন ঈমানদীপ্ত, প্রত্যয়ী, জাত্যাভিমানী, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সম্রাট, মুজাহিদ ও দেশনেতার ওপর একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সত্যঘনিষ্ট জীবনীগ্রন্থ সংকলিত হবে। এটি শুধু প্রয়োজনই নয়; এটি আমাদের ওপর তাঁর এক প্রকার অধিকারও বটে। কিন্তু আফসোসের

www.boimate.com

বিষয় হলো, রচনাবলি ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির প্রচুর উপস্থিতি সত্ত্বেও ইংরেজি বা উরদূ ভাষায় এমন কোনো গ্রন্থ অদ্যাবধি আমাদের চোখে পড়েনি— যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে তাঁর দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক বিবরণ, মেলবন্ধন এবং জিহাদের ময়দানে তাঁর অসামান্য অবদান, তাঁর শাসনব্যবস্থা, সুন্নত ও শরীয়তের ওপর তাঁর অত্যধিক গুরুত্বারোপ, সুন্নত পুনরুজ্জীবনে তাঁর নানামাত্রিক প্রয়াস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে। যেহেতু তাঁর আধ্যাত্মিক ও ইসলাহি সম্পর্ক আমাদের বংশের বড়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো, যার কারণে আমাদের সেই আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। আমরা সর্বান্তকরণে কামনা করেছি, আলোচিত বিষয়গুলোর ওপর ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বিষয়টির ওপর কেউ আলোকপাত করুক।

আল্লাহ তা'আলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটির তাওফিক দিয়েছেন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার গুণী সন্তান মৌলভী মুহাম্মদ ইলয়াস ভাটকালী নদভীকে। যিনি এ প্রসঙ্গে একটি বিস্তারিত গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। আমি শুরু থেকেই তাঁকে এ বিষয়ে কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছি, উৎসাহ যুগিয়েছি। লেখক নিজেই টিপু সুলতান শহীদ রহ.-এর দেশের মানুষ। লেখকের জন্মস্থান হলো সেই ঐতিহাসিক নগরী ভাটকাল— যা দাক্ষিণাত্যের জাত্যাভিমানের চেতনা বাহক নগরী। যুগে যুগে যার অধিবাসী বিভিন্ন ন্যায়নিষ্ঠ কাজে অকুণ্ঠ সঙ্গ দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে এ বিষয়ে কলম ধরার অধিকার অন্য যে কারোর চেয়ে তাঁরই বেশি। শরীয়তের স্বীকৃতি পরিভাষা অনুসারে এটি একধরনের 'হক্কে শুফ'আহ'— 'প্রতিবেশীসুলভ অধিকার'।

আল্লাহ তা'আলার শোকর যে, সম্মানিত লেখক তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়ন, দীর্ঘ জ্ঞানচর্চা, আত্মিক সম্পর্ক ও দ্বীনি আত্মসম্মানবোধের বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে গভীর যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজটি পূর্ণ করেছেন। গ্রন্থটির বিধিবদ্ধ সূচিপত্র যার স্বাক প্রমাণ বহন করে। আমি মনে করি, এ প্রসঙ্গে অভিমত পেশ করার অধিকার ও কাজের স্বীকৃতি দেয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন দেশের কৃতিপুরুষ প্রফেসর খলিক আহমদ নিযামি আলীগড়ি। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা নিঃসন্দেহে বইটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

www.boimate.com

বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। যার ফলে বইটির নির্ভরযোগ্যতা বেড়ে গেছে।

আল্লাহ চাহেন তো আশা করি, বইটির মাধ্যমে টিপু সুলতান শহীদ রহ.-এর ব্যক্তিত্ব ও অবদান সম্পর্কে ইতিহাসের পাতায় অনেক নতুন তথ্য ও জ্ঞানকথা সংযোজিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা প্রিয় লেখকের এই মহান উদ্দেশ্যপূর্ণ, ফলপ্রদ ও অভিবাদনযোগ্য শ্রম-সাধনা কবুল করুন। নিদেনপক্ষে বইটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর তরুণ-নবীন প্রজন্মকে, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে দ্বীনি স্বাতন্ত্র্য, ইসলামি স্বকীয়তা, দেশ ও দেশের যথোপযুক্ত সেবা ও দিকনির্দেশনার তাওফীক দান করুন।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
২ যিলহজ ১৪১৬ হি.
২১ এপ্রিল ১৯৯৬ ঈ.

www.boimate.com

অবতরণিকা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে টিপু সুলতান শহীদ রহ.-এর নাম সবসময় সোনালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। ইকবালের ভাষায়—

آں شہیدان محبت را امام

آبروے ہند و چین و روم و شام

ওই সকল আত্মোৎসর্গীরা ছিলেন ভালোবাসার পথিকৃৎ
তাদের কারণেই হিন্দ-চীন, রোম ও শামদেশ মান পেয়েছে।

স্বাধীনতার দীপশিখার প্রেমে মাতোয়ারা সেই মহান সুলতান যেই ভাবাবেগ বিভোরতার সঙ্গে জীবনের সর্বোচ্চ কামনা প্রাপ্তির অভিলাষে জীবন উৎসর্গ করার যেই নজির স্থাপন করেছেন, যেভাবে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

در جہاں نتواں اگر مردانہ زیست

ہمچو مرداں جاں سپردن زندگیست

পৃথিবীতে যদি বীরের মতো বাঁচতেই না পারি
তাহলে আমাদের মতো বীরপুরুষদের জন্যে প্রাণদানই জীবন।

তা এদেশবাসীর অন্তরে চিরদিনের জন্যে সংগ্রাম ও দুর্লঙ্ঘ জয়ের প্রেরণার মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছে।

শ্রীরঙ্গাপত্তনম ও বালাকোট হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই বাতিঘর– যেখানে মুজাহিদগণ মাথায় কাফন বেঁধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সেই বীরপুরুষ গাজীদের অবদান জাতি এখনও কল্পনার চোখে স্মরণ করে। আহ! যুদ্ধের ময়দানে মুণ্ডুবিহীন লাশের তড়পানোর দৃশ্য! একদিকে রক্তের স্রোত বইছে, অন্যদিকে বুকের পিঞ্জির থেকে আত্মা বেরিয়ে আসার পূর্বমুহূর্তে আত্মা তীব্র ছটফট করছে। কর্তিত

www.boimate.com

মুণ্ডুতে তখন শোভা পাচ্ছিলো অপার্থিব সুখের অনাবিল উচ্ছ্বাস! কবির ভাষায়—

بنا کردند خوش رسمے بخاک وخون غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

যারা মাটি ও খুনের তুলী দিয়ে এঁকেছেন জীবনের গল্প
পবিত্র মৃত্তিকার তৈরি এই প্রেমীদের ওপর আল্লাহর রহমত ঝরুক।

টিপু সুলতান শহীদ রহ. যেভাবে শ্রীরঙ্গাপত্তনমের রণাঙ্গনে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তা যুগে যুগে নিষ্প্রাণ দেহে রক্তের স্রোত জাগিয়ে তুলেছে। তাঁর সেই চেতনাকে পরবর্তীকালে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. দ্বীনি আত্মসম্মানবোধের প্রেরণাশক্তি দিয়ে অধিকতর দৃঢ় করেছেন। তিনি জনতার অন্তরে জিহাদের স্পৃহা এমনভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন যে, তখন সর্বত্র এই শ্লোগান-ই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো—

الٰہی مجھے بھی شہادت نصیب

یہ افضل سے افضل عبادت نصیب

হে আল্লাহ! আমাকেও শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য দিন।
এই উৎকৃষ্টতর ইবাদত পালনের সৌভাগ্য আমার ললাটে দিন।

যখন ভিলোরের যুদ্ধের পর টিপু সুলতানের গোটা পরিবার দেশত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসে তখন তারা সেখানে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.-এর হাতে বাই'আত হন এবং ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের পতাকা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার জিহাদে শামিল হয়। এভাবে শ্রীরঙ্গাপত্তনম ও বালাকোটের দুটি পথ এক হয়ে যায়।

টিপু সুলতানের জীবনবৃত্তান্তের ওপর সর্বপ্রথম ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদরাই মনোযোগ নিবদ্ধ করে। যদিও তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, সুলতান শহীদ রহ.-কে জাতির সামনে এমন বৈরীভাবে উপস্থাপন করবে যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব ঘিরে অন্য কোনো আন্দোলন দানা না বাঁধে। কিন্তু যখন ভারতীয় লেখকগণ তাঁর জীবনবৃত্তান্তের ওপর বিশদ বই লেখতে শুরু করেন তখন চালচিত্র আদ্যোপ্রান্ত বদলে যায়। মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরি, প্রফেসর মুহিব্বুল হাসান, প্রফেসর বী আলী শাইখ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

www.boimate.com

শুনে অত্যন্ত প্রীত হলাম যে, এখন এমন একজন যুবক ও রুচিশীল লেখক এ বিষয়ে কলম ধরেছেন যিনি সেই টিপু সুলতান রহ.-এর স্বদেশের সন্তান। যার মনোজাগতিক দীক্ষা সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.এর পরিবারের মহান উত্তরসূরী হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভীর তত্ত্বাবধানে নদওয়াতুল উলামায় বিকশিত হয়েছে। তিনি কাজটি দীর্ঘ শ্রম, অনুসন্ধান ও গবেষণা সহকারে সম্পন্ন করেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাঁর এই প্রয়াস সর্বোতভাবে সমাদৃত হবে। সুলতান টিপুর জীবনবৃত্তান্ত যথাযথ প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আশা করি গ্রন্থটি সহায়ক হবে। আমি দেখেছি, লেখক সুলতান টিপুর জীবনচিত্র গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনের সবক'টি শাখার ওপর যথোচিত আলোকপাত করতে পেরেছেন।

টিপু সুলতান ছিলেন সবধরনের যোগ্যতার অধিকারী নিপুণ পুরুষ। তাঁর সংগ্রামী চেতনার গভীরে ছিলো একটি ব্যথাতুর হৃদয় ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব– নৈতিকতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর সেই গুণাবলিকে আরো আবেদনময় করে তুলেছিলো। তিনি ইংরেজবিরোধী আন্দোলনকে পূর্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সামরিক প্রত্যয়দীপ্ত সামর্থ্য ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ফ্রান্সিসদের সঙ্গে ইংরেজ বিরোধিতার চুক্তি করেছেন। নিজের রাষ্ট্রদূতদেরকে ফ্রান্স, তুরস্ক, ইরান-সহ অপরাপর রাষ্ট্রসমূহে প্রেরণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ান টিপু সুলতানকে সহায়তা করেছেন। প্রচুর সংখ্যক ফ্রান্সিস সেনা কর্মকর্তা টিপু সুলতানের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছেন। যখন ১৭৯৭ ঈসাব্দে ফ্রান্স বিপ্লবের স্মারকে গণতন্ত্রপ্রেমীদের সংগঠন গঠিত হয় তখন স্বাধীনচেতা নাগরিকদের তালিকায় টিপু সুলতানের নামও যুক্ত করা হয়। এই কূটনৈতিক পদক্ষেপের নেপথ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কারিগরি স্বার্থও নিয়ামক ছিল। তিনি সেই প্রথম ভারতীয় মুসলমান— যিনি পশ্চিমাদের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত ব্যাপক সম্ভাবনার

www.boimate.com

আগাম অনুমান করতে পেরেছিলেন। তখন তিনি তাঁর পূর্ণ মনোযোগ এদিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি উপকূলীয় অঞ্চল ও নগরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাক্টরি ও বাণিজ্যিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। সিল্ক, চিনি ও কাগজের অনেকগুলো কারখানা প্রতিষ্ঠা করে গ্রামীণ শিল্পগুলো সমৃদ্ধ করার পথ খুলে দিয়েছিলেন। ১৭৯৪ ঈসাব্দে তিনি টাইপের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে উরদূ ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।

টিপু সুলতান এ কথা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রণক্ষেত্রে এখন প্রান্তর-তেপান্তর ছাড়িয়ে সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যার কারণে তিনি তাঁর সামরিক ব্যবস্থাপনার মাঝে নৌ সমর বিদ্যার প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি চল্লিশটি নৌ যুদ্ধজাহাজ ও বিশটি ফ্রিগেট সংগ্রহ করেন। তাঁরই নির্দেশনায় সামরিক পরিভাষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে 'ফাতহুল মুজাহিদীন' নামে মহামূল্যবান গ্রন্থ সংকলিত হয়। তাঁর সেই নৌব্যবস্থাপনাকে কিরপ্যাট্রিক (Kirpatrick) মারাত্মক বিপদজনক অভিহিত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, ফোরাত নদী থেকে নাজিফ আশরাফ পর্যন্ত একটি খাল খনন করবেন।

নৌবাহিনীর প্রতি টিপু সুলতানের এই সবিশেষ গুরুত্বের কথা সবাই জানেন। এর বাইরে তাঁর সাহিত্যানুরাগের কথাও সর্ববিদিত। চার্লস স্টুয়ার্ট ১৮০৯ ঈসাব্দে তাঁর প্রকাশনীর বইগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে আওরাঙ্গজেবের স্বহস্তে লেখা কুরআন কারীম, তাসাওউফ সম্পর্কিত রচনাবলি, বিশেষত খাজা গেসুদারের বিভিন্ন বই-পুস্তক ছাড়াও আরবি, ফারসি, তুর্কি ও উরদূ ভাষার অনেকগুলো বই-পুস্তক তালিকাভুক্ত রয়েছে।

টিপু সুলতান রহ. ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানসিক উদারতার অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। ডক্টর সলিট্যুর তাঁর ধর্মীয় উদারতা ও হিন্দুধর্মের প্রতি পূর্ণ সহমর্মিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

টিপু সুলতান ১৭৯৯ ঈসাব্দে শহিদ হন। সে বছরই ব্যাটল অফ নেভারিনো (Bettle of Navarino)–এ তুর্কিরা পরাজিত হয়। যার ফলে বছরটি ঐতিহাসিকদের কাছে মুসলমানদের রাজনৈতিক পতনের মাইলফলক বিবেচিত হয়। কিন্তু আল্লামা ইকবালের ভাষায় এরপরই

www.boimate.com

জাতীয় জাগরণের বিভিন্ন আন্দোলনের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.-এর আন্দোলনের মাঝে জিহাদের পাশাপাশি জাতীয় জাগরণের দিকটিও অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল।

আমি বিশ্বাস করি, ধর্মীয় বিভিন্ন মহলে মাওলানা ইলয়াস নদভী সাহেবের এই শ্রম আল্লাহ চাহেন তো সমাদৃত হবে। তাঁর এই রচনা টিপু সুলতান শহীদ রহ.-এর ব্যক্তিত্ব ও অবদানের যথোচিত প্রেক্ষাপট অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন—

رفت سلطان از سرائے ہفت روز

نوبت او در دکن باقی ہنوز

দীর্ঘ দিন পূর্বে যদিও সুলতান বিদায় নিয়েছেন;
কিন্তু এখনও দাকান নগরীতে তাঁর স্মৃতি সতেজ।

খলিক আহমদ নিযামি
আলীগড়, ভারত
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ঈ.

www.boimate.com

লেখকের কথা

الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ :

কুরআন কারীমের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত— এগুলো এমন বিষয় যে, এ সম্পর্কে কোনো লেখক বা সংকলক আজ পর্যন্ত এ দাবী তুলতে পারেনি যে, সে এগুলোর হক আদায় করতে পেরেছে। এই বিষয়বস্তুগুলো এতোটাই নিসীম বিস্তৃত যে, এ ধরনের দাবী কেউ তুললে তা ধোপে টিকবে না!

শুধু সূরা ফাতেহার তাফসীরের ওপর মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তরজমানুল কুরআনে পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার একটি খণ্ড সংকলন করেছেন। হাদীস শরীফের ওপর অজস্র গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্য হতে স্রেফ সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে আল্লামা ইবনে হজর রহ. পুরো ১৪ খণ্ড লেখতে বাধ্য হয়েছেন। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. নবীজির সীরাতের ওপর ৭ খণ্ড লেখার পরও এ দাবী তুলতে পারেননি যে, আমি এর হক আদায় করতে সমর্থ হয়েছি। ইসলামের ইতিহাসের এই চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস সংকলন ও বিন্যাসের কাজটিও অনেকটা এরকমই। ইসলামি সভ্যতা ও ঐতিহ্য, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও শাস্ত্র, বিভিন্ন জাতি, নৃগোষ্ঠী, রাজত্ব ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে যদি স্রেফ শেষোক্ত বিষয়টিকেই নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে এ কথা পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যাবে যে, পূর্ণ বিশদভাবে লেখার পরও জাতির অনেক বিখ্যাত ও কৃতিসন্তানের জীবনবৃত্তান্ত সেই ইতিহাসগ্রন্থে তোলার সুযোগই পাওয়া যাবে না।

www.boimate.com

এমন কিছু মুসলিম মনীষী রয়েছেন যাদের ওপর অল্প-বিস্তর কাজ হয়েছে। কিন্তু ইসলামের জন্যে তাদের অবিস্মরণীয় ত্যাগ, আল্লাহর পতাকা সমুন্নত করার ক্ষেত্রে তাদের আত্মোৎসর্গী ভূমিকার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, ইসলামের ইতিহাসের বইগুলোতে তাদেরকে তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান দেয়া হয়নি। ঐতিহাসিকভাবে তাদের সঙ্গে অবিচার হয়েছে। যতোটুকু আলোচনা হয়েছে, তা আদতে না হওয়ারই নামান্তর। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে, তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ইতিহাসের এমনই একজন নিপীড়িত বঞ্চিত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মুজাহিদ সম্রাট হযরত টিপু শহীদ রহ.। যাঁর ইতিহাস ও জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহাসিকদের তুলনায় অমুসলিম, বিশেষত পশ্চিমা ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। যার ফল দাঁড়িয়েছে যে, একদিকে যদিও তাঁদের প্রাসঙ্গিক ও গৌণ বৈশিষ্ট্যগুলো মুসলমানদের সামনে চলে এসেছে; কিন্তু তাঁর প্রাকৃত ইসলামি মিশন, মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি, নৈতিক গুণাবলি, আল্লাহপ্রদত্ত মেধা-প্রতিভা ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য আড়ালে রয়ে গেছে। যেই গুণগুলোর কারণে একদিকে তিনি মুহাম্মদ ইবনে কাসিম, তারেক ইবনে যিয়াদ, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ও সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.-এর কাতারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতর ছিলেন; অথচ পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ সেই ইতিহাস বিকৃত করে বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর ব্যক্তিত্বকে অত্যাচারী, একনায়ক ও সাম্প্রদায়িক শাসকের চরিত্রে উপস্থাপন করেছে।

সেমতেই 'ভিলিক্স' তার লেখা 'মহিসুরের ইতিহাস' গ্রন্থে তাকে কট্টোরপন্থী সাম্প্রদায়িক প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছে। কিরপ্যাট্রিক (Kirpatrick) তাকে অনুদার প্রমাণিত করার সর্বাত্তকরণে চেষ্টা করেছে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক 'লিউন বী বোরঙ্গ' সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে তাকে মাহমুদ গজনবীর সমকক্ষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছে। আরেকদল ঐতিহাসিক তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তার সাহসিকতা ও বীরত্বকে ফ্রান্সের নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করে বিশ্বকে ভুল তথ্য দেয়ার চেষ্টা করেছে। অথচ বীরত্বের ক্ষেত্রে টিপু ছিলেন নেপোলিয়ানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ফ্রান্সের সামরিক কর্মকর্তা নেপোলিয়ান তার অসাধারণ সুখ্যাতি ও বীরত্ব সত্ত্বেও শেষ জীবনে আশাহত হয়ে নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অথচ তার চেয়ে

www.boimate.com

মারাত্মক বিপর্যয়ের শিকার হয়েও টিপু মনে করেছেন, এ মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করলে সেটা হবে জীবনের প্রতি চরম অবমাননা। যার কারণে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সিংহের মতো মরণপণ যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এরপরও কেউ যদি টিপু সুলতানকে নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা করে তাহলে সেটা হবে তাঁর ব্যক্তিত্বকে ছোট করার নামান্তর।

মোটকথা, অমুসলিম ঐতিহাসিকরা তাদের রচনাবলির মাঝে পাঠকবর্গকে এ কথা বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যে, তিনি তাঁর শাসনামলে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর অস্বাভাবিক অত্যাচার করেছেন। তাঁর নির্দেশে অজস্র মন্দির ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সহস্র অমুসলিমকে জোরপূর্বক ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে। তাদের এই অভিযোগগুলো কতোটা বাস্তবতাশ্রিত– তা বোঝার জন্যে আমি স্রেফ একটি উদাহরণ পেশ করছি। তা হলো, টিপু সুলতান সম্পর্কে অধিকাংশ বই-পুস্তকে এই অসত্য বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে যে, তিনি শুধু 'কর্গ' নগরীতে ৭০ হাজার হিন্দুকে বলপ্রয়োগ করে মুসলমান বানিয়েছিলেন। অথচ যে শিক্ষার্থী সবেমাত্র মহিসুরের ইতিহাস পড়তে শুরু করেছে সেও ভালোভাবে জানে যে, টিপু সুলতানের আমলে কোর্গ (Coorg) নগরী তো পরের কথা, পুরো কোর্গ (Coorg) অঞ্চলের পূর্ণ জনসংখ্যা ২৫/৩০ হাজারের অধিক ছিলো না। উপরন্তু সেখানে কয়েক হাজার মুসলমান ও খ্রিস্টান আগ থেকেই বসবাস করতেন। এধরনের আরও যতো অপবাদ রয়েছে, সেগুলোর বাস্তবতা ও সঠিক তথ্য জাতির সামনে মেলে ধরার দাবী পশ্চিমা গবেষকদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা অবান্তর। কারণ হলো, পশ্চিমাদের চোখে বিভিন্ন কারণে মুসলিম শাসকবর্গের মধ্য হতে টিপুর চেয়ে অধিক ঘৃণ্য আর কেউ নেই।

যদিও ফারসী ভাষায় 'নিশানে হায়দারী' নামে এ প্রসঙ্গে টিপুর সমবয়সী লেখক 'মীর হুসাইন আলী কিরমানী' অনেক আগেই গ্রন্থ সংকলন করেছেন। কিন্তু যেহেতু ওই সময় কিরমানী ইংরেজদের হাতে নজরবন্দি ছিলো, তাদের নির্দেশেই সে গ্রন্থটি লেখেছে; এজন্যে তাদের খায়েশ পূরণ করতে গিয়ে তাকে তার গ্রন্থে অনেক অসত্য বর্ণনা স্থান দিতে হয়েছে। পরবর্তীকালে মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরী 'সুলতানাতে খোদা মহিসুর' নামে একটি বিশদ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। যদিও তার এ গ্রন্থ অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; কিন্তু অনেকগুলো কারণে গ্রন্থটি ঐতিহাসিক

www.boimate.com

মানদণ্ডে উন্নীত হতে পারেনি। জেনে-না জেনে এ বইটিতেও বেশ কিছু অস্বীকৃত ও অসত্য ঘটনা চলে এসেছে। এরপর প্রফেসর মুহিব্বুল হাসান সাহেব ও প্রফেসর বী শেখ আলী সাহেব ইংরেজিতে এ প্রসঙ্গে গবেষণামূলক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

সত্য হলো, টিপু সুলতান শহীদের ওপর তাঁদের দু'জনের বইদুটি দীর্ঘ গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের ফসল। এ পর্যন্ত যতোগুলো কাজ হয়েছে সেগুলোর মধ্য হতে এ দু'টিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রচনা। কিন্তু এমন দীর্ঘ গবেষণা ও সংকলন সত্ত্বেও বাস্তবতা হলো, জাতির এই মহান শহীদের সংগ্রামী জীবনের এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ রয়েছে যার ওপর অদ্যাবধি কোনো গ্রন্থেই বিশদাকারে আলোকপাত করা হয়নি। যেমন, তিনি ছিলেন ইসলামের প্রচারক। ছিলেন সত্যপথের দাঈ। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর ওপর যতোগুলো বই হয়েছে, সেগুলোতে তাকে স্রেফ একজন সফল শাসক, প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও বাহাদুর সেনাপতির চরিত্রেই উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর সকল কীর্তি ও অবদান পৃথক পৃথক শৈলীতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলে দেখা গেছে, তিনি মুসলিম জাহানের বৃহত্তর স্বার্থে যেসকল পদক্ষেপ নিয়েছেন, মুসলমানদের পরস্পরে ঐক্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যেই অসাধারণ প্রয়াস ব্যয় করেছেন সেগুলোকেও রাজনৈতিক স্বার্থ ও সামরিক ফায়দার প্রেক্ষাপটেই প্রদর্শন করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি কনস্ট্যান্টিনেপলের অটোমান খেলাফত বরাবর নিজ কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন সেখান থেকে ঐতিহাসিকগণ এ পরিণতি বের করেছেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো নেহায়তই নিজের রাজক্ষমতা সুদৃঢ় করা এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক ও সামরিক প্লাটফর্ম গড়ে তোলা। অথচ অটোমান খলীফা বরাবর তিনি যেই অসংখ্য পত্র প্রেরণ করেছেন সেগুলো পড়লে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ওগুলো ছিলো তাঁর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য। আসলে তিনি এই প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে খলীফা সলীমকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উসমানিয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া কূটিল চক্রান্ত এবং পশ্চিমা, বিশেষত বৃটিশদের অপবিত্র পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন।

www.boimate.com

বৃহত্তম ইসলামি ঐক্য গঠনে তাঁর বিভিন্ন প্রয়াস, একটি খাঁটি ইসলামি সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা, আকাঈদের ক্ষেত্রে তাঁর আদ্যোন্ত পরিপক্কতা, বিদ'আত-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর আজন্ম ঘৃণা, তাঁর তাকওয়া ও স্বচ্ছ মনোবৃত্তি ইত্যকার বৈশিষ্ট্যাবলি এতোটাই উজ্জ্বল ছিলো যে, সেগুলোকে আমলে নেয়া হলে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, একজন যোগ্য শাসক ও দক্ষ রাজনীতিবিদের চেয়ে একজন সাচ্চা ইসলাম-প্রচারক ও সত্যের নকিব সম্রাটের চরিত্রে ইসলামের ইতিহাসের স্বনামধন্য সন্তানের তালিকায় তিনি অনায়াসে স্থান পাবেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়— অদ্যাবধি এই শহীদ সম্রাটের ওপর ওই দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণামূলক কাজ হয়নি, যতোটা হয়েছে তা না হওয়ার নামান্তর।

এ সকল কারণ ও অনুপ্রেরণার প্রেক্ষাপটে আমাদের মহান অভিভাবক, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামি চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী বারবার তাঁর জ্ঞান-আসরে এ কথা বলতেন যে, ইসলামের ইতিহাসে সুলতান টিপুকে সেই মর্যাদা দেয়া হয়নি, তিনি যার যোগ্য ছিলেন। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর মতো উঁচু মনোবল সমৃদ্ধ, দূরদর্শী, দেশ ও দশের প্রয়োজনে উৎসর্গপ্রাণ সুলতান দ্বিতীয়জন নেই। যদিও তাকে নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি; কিন্তু তাঁর সব্যসাচী ব্যক্তিত্বের ওপর, তাঁর জীবনের সবগুলো দিগন্তের ওপর ব্যাপক আলোচনা সমৃদ্ধ, বিশেষত তাঁর ধর্মীয় ও ইসলামিক ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার মতো একটি বিশদ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এখনও সুতীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। আল্লাহর কোনো বান্দা যদি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং এই খেদমতটুকু আঞ্জাম দিতেন তাহলে মুসলিম উম্মাহর সোনালি ইতিহাসের একটি বিরাট শূন্যতার পূরণ হতো।

১৯৮৮ ঈসাব্দে আমি যখন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মাতৃভূমি ভাটকলে ফিরে আসি তখন আমার কল্পনার কোনো নিভৃত প্রান্তেও এ পরিকল্পনা ছিলো না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক নেক ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় বান্দার আন্তরিক চাওয়া ও দীর্ঘ দিলের লালিত স্বপ্ন আমার মতো এক নিষ্কপর্দককে দিয়ে পূরণ করবেন। ১৯৯২ ঈসাব্দের শুরুর দিকে একদিন শ্রদ্ধেয় উসতায ও অভিভাবক মাওলানা ফারুক নদভী সাহেব (জামিয়া ইসলামিয়া ভাটকালের ভূতপূর্ব

www.boimate.com

পরিচালক) আমাকে অবহিত করলেন যে, ব্যাঙ্গালুরুর একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাকে আরবিতে শহীদ টিপু সুলতান রহ.-এর জীবনালেখ্য সংকলনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে তারা আমাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার উসতায আবুল হাসান আলী নদভীর সেই কথাগুলো মনে পড়লো, যা আমি নদওয়ার শিক্ষাজীবনে বিভিন্ন মজলিসে বারবার শুনেছি। আমি জানালাম, আরবীতে অনুবাদ করার জন্যে এ মুহূর্তে আমার দৃষ্টিতে এমন কোনো অনুবাদযোগ্য গ্রন্থ নেই, যা আরবদের প্রয়োজন এবং তাঁদের ধর্মীয় মানসিকতার প্রেক্ষিতে ইসলামের জন্যে টিপুর অসামান্য অবদান ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। যদি হযরত অনুমতি প্রদান করেন এবং এক্ষেত্রে আমার পূর্ণ পথনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন তাহলে আমি সর্বপ্রথম উরদূ ভাষাতেই এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রত্যাশামাফিক গবেষণামূলক কাজ করবো। এরপরই বইটির আরবী অনুবাদের পালা আসবে।

সেমতে আমি তৎক্ষণাৎ বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে শ্রদ্ধেয় নদভী রহ.-এর কাছে পত্র প্রেরণ করি। জবাবি পত্রে মাওলানা কাজটির ওপর শুধু তাঁর গভীর উচ্ছ্বাসের কথাই জানাননি; বরং তাৎক্ষণিক কাজ শুরু করার নির্দেশ করে তাঁর পথনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এবং আমাকে অনতিবিলম্বে লাখনৌ ডেকে পাঠিয়ে পূর্ণ কাজের নকশা বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি কাজটি সম্পন্ন হওয়ার তীব্র অপেক্ষায় থাকবো। আমি দেখবো— তুমি কতো দ্রুত সম্পন্ন করতে পারো।'

ওই সময় আমার বয়স ছিলো কম। উপরন্তু জ্ঞানের স্বল্পতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে আমি অনুমান করতে পারিনি যে, কাজটি কতোটা নাজুক ও কঠিন! তারপরও মাওলানার প্রগাঢ় আগ্রহের দিকে তাকিয়ে ২-৩ বছরের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ফেলি। কিন্তু কাজটি যতো এগিয়েছি, ততোই আমি সেটির জটিলতা ও কাঠিন্যের উপলব্ধি শুরু করি। কারণ হলো, হযরত আমাকে সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের শৈলীতে কাজ করার পথনির্দেশ করেছিলেন। ঠিক এভাবে টিপু সুলতান শহীদের ওপর কাজ হয়নি। যার কারণে আমাকে সর্বপ্রথম ইসলামি ইতিহাসের একটি বিশাল অংশ নতুন করে অধ্যয়ন করে টিপু সুলতানের পূর্বে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ঐতিহাসিক,

www.boimate.com

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চালচিত্রের পূর্ণ নিরীক্ষণ করতে হয়েছে। এরপর তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মিশনের যাবতীয় প্রতিবন্ধক ও মিশনটির প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করতে হয়েছে। এরপর তাঁর সমকালে আশপাশে যেসকল রাষ্ট্র ছিলো —যেগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ার কাজে তাঁকে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে— সেগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করতে হয়েছে। এরপর সুলতান টিপুর শাহাদাত ও মহিসুর রাজ্যের পতনের ফলে মুসলিম জাহান ও ভারতবর্ষের রাজনীতির ওপর যেসকল ঐতিহাসিক প্রভাব পড়েছে, তার বিস্তারিত খতিয়ানও ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকলে আমার এই জ্ঞানবৃত্তিক পরিশ্রমের কোনো মূল্য-মান হতো না।

বাস্তব হলো, এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়োজন পূর্ণ একাগ্রতা ও অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে পূর্ণ অবসর। টিপু সুলতান শহীদ রহ.-এর ইসলামের খেদমতে নিবেদিত অবদানের ওপর আলোকপাত করতে আমাকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলির বাইরে ওই সকল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও রাজ-ফরমান পাখির চোখে পড়তে হয়েছে— যা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সাইয়্যেদ আলী মিয়া নদভীর সহায়তায় আমি সেগুলো সহজেই হস্তগত করতে পেরেছি। তবে এর জন্যে আমার নিয়মিত সফর চালিয়ে যেতে হয়েছে। যার ফলে কাজটির গতি এতোটাই শ্লথ হয়ে পড়েছিলো যে, এক পর্যায়ে আশঙ্কা হলো— এ কাজ সম্পন্ন করতে ৭-৮ বছর বা তারও অধিক সময় লেগে যাবে। ফলশ্রুতিতে নিরূপায় হয়ে ১৯৯৫ সালে আমি আমার শিক্ষকতা থেকে এক বছরের জন্যে ছুটি নিয়ে নিই। সকাল-সন্ধ্যা এ কাজেই নিমগ্ন হয়ে পড়ি। আলহামদুলিল্লাহ ১৯৯৬ ঈসাব্দে কাজটি সম্পন্ন করে বইটির খসড়া পাণ্ডুলিপি হযরতের খেদমতে উপস্থাপন করি। পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে হযরত কী পরিমাণ আনন্দিত-উল্লসিত হয়েছিলেন, তা আমি ব্যক্ত করতে সমর্থ হবো না। সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত। আনন্দের আতিশয্যে হযরত আমার মাথার ওপর হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দুআর বারিধারা বইয়ে দিয়ে বলেছিলেন— 'তুমি আমার প্রত্যাশা ও স্বপ্ন ছাড়িয়ে গেছো। অতি উৎকৃষ্ট মানের কাজ করেছো।'

হযরত নিজেও পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পড়েছেন এবং অতিরিক্ত নিরীক্ষণের প্রয়োজনে ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ও সুপ্রশিদ্ধ

www.boimate.com

ঐতিহাসিক, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর খলীক আহমদ নিযামী সাহেবের খেদমতে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে এ পত্রও জুড়ে দেন যে, 'আমার উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই তরুণ কাজটি সম্পন্ন করেছে। আপনি যদি আপনার মূল্যবান সময় বের করে এটির ওপর পুনর্দৃষ্টি বুলিয়ে দেন তাহলে তা ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যে সীমাহীন আনন্দ ও সৌভাগ্যের কারণ হবে।'

দীর্ঘ দু' মাস ব্যয় করে তিনি পাণ্ডুলিপি দেখে দেন। তিনি বইটির ওপর উৎসাহমূলক যেই অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তা পড়ে হযরত মাওলানা আমাকে বলেন, নিযামী সাহেবের সত্যায়নের মাধ্যমে তোমার বইটি এখন আধুনিক শিক্ষিত মহলেও ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে আস্থা পেয়ে গেলো। যার ফলে বইটির মূল্য-মান পূর্বাপেক্ষা বেড়ে গেছে।' এরপর হযরত মাওলানা বইটির ওপর শুধু তাঁর মূল্যবান ভূমিকাই জুড়ে দেননি; বরং ভালোবাসার উষ্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রকাশনা ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান 'মজলিসে তাহকীকাত ও নশরিয়্যাতে ইসলাম লাখনৌ' থেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপরন্তু বলেন, আমরা আল্লাহ চাহেন তো, নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বইটি আরবি ও ইংরেজিতেও ভাষান্তর করবো।' সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা এককভাবে আল্লাহ তা'আলার।

আমি অধিকতর সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে বইটির পাণ্ডুলিপিটি গোয়া ও মঙ্গলোর ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাচার্য প্রফেসর বি শেখ আলী সাহেবের সকাশে উপস্থাপন করি। প্রফেসর সাহেব বর্তমান সময়ে পুরো ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় নির্ভরযোগ্য টিপু-গবেষক। তিনি তাঁর সীমাহীন ব্যস্ততার ভেতর দিয়েও পাণ্ডুলিপিটির প্রতিটি অক্ষর ধরে ধরে অধ্যয়ন করেছেন এবং এ সংক্রান্ত অতীব মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। কিছু কিছু জায়গায় তাঁর পরামর্শ অনুসারে সংশোধন করেছি। তারপরও আমার মতো নিষ্কপর্দকের পক্ষে এ দাবী করা শোভা পায় না যে, বইটি আলোচিত প্রসঙ্গের চাহিদা শতভাগ পূরণ করতে পেরেছে। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, বইটিতে অধিকতর সংযোজন-বিয়োজনের অনেক সুযোগ রয়েছে। আমি অবশ্যই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সেই

www.boimate.com

একনিষ্ঠ ভাইদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো— যারা এক্ষেত্রে আমাকে তাদের মূল্যবান পরামর্শ জানিয়ে বাধিত করবেন। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে তার প্রতি লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করবো।

আল্লাহ তা'আলা বইটির সংকলনে যেভাবে আমাকে পদে পদে সহায়তা করেছেন, পথ দেখিয়েছেন, তা আমি বলে-কয়ে ব্যক্ত করতে পারবো না। রচনার বাঁকে বাঁকে আমি তাঁর সহায়তা প্রত্যক্ষ করেছি। স্রেফ আল্লাহর করুণা ছিলো, বলেই আমি তাঁর তাওফীকে কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। যদি পাঠকবর্গ বইটির মাঝে কোনো উৎকৃষ্টতা দেখতে পান সেটির পূর্ণ কৃতিত্ব এককভাবে আমি আল্লাহর দিকেই সম্বন্ধিত করবো। এর বিপরীতে কোনো ভুল বা প্রমাদ দেখতে পেলে তার দায়ভার সম্পূর্ণরূপে আমার।

পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ও অভিভাবক সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী বইটির সংকলন কাজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ, প্রেরণা, মনোবল ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। সীমাহীন সস্নেহে সর্বোতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বইটির সংকলন থেকে শুরু করে মুদ্রণ পর্যন্ত যে পরিমাণ তীব্র অপেক্ষা ও আন্তরিকতা নিয়ে পাশে থেকেছেন, তার যথাযথ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে আমি অক্ষম। তাঁর এই সুবিশাল মাহাত্ম্য ও করুণা আমি জীবনভর ভুলতে পারবো না। নিরেট আল্লাহর তাওফীকে সম্পন্ন হওয়া আমার এই ছোট্ট প্রচেষ্টার পূর্ণ কৃতিত্ব আমি সেই বরকতঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের দিকে সম্বন্ধিত করে এ দুআই প্রার্থনা করবো যে, হে আল্লাহ! আপনি মুসলিম উম্মাহর এই মহান কৃতি সন্তানকে দীর্ঘ দিন সুস্থ ও নীরোগ রাখুন। তাঁর অবিস্মরণীয় বিপূল কর্মযজ্ঞের বিনিময়ে তাঁকে আখেরাতে আপনি যথোপযুক্ত পু..স্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

আমি আলিগড়ের প্রফেসর খলীক আহমদ নিযামি সাহেব ও মহিসুরের প্রফেসর শেখ আলী সাহেবেরও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যে, এই দু'বরেণ্য ব্যক্তি তাদের সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার পাণ্ডুলিপি আদ্যোন্ত অধ্যয়ন করে তাদের মূল্যবান অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে ধন্য করেছেন ও মনোবল যুগিয়েছেন।

www.boimate.com

অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা হবে, যদি আমি আমার শ্রদ্ধেয় উসতায মাওলানা কাযী ফারুক হাসান নদভী সাহেবের কৃতজ্ঞতা আদায় না করি। যিনি হযরত আলী মিয়া নদভীর পরই সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি— যার উৎসাহ, আগ্রহ ও সবিশেষ দুআ গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করেছে।

নদওয়াতুল উলামার উপ-ব্যবস্থাপক হযরত মাওলানা মুঈনুদ্দীন নদভী সাহেব ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মহামান্য পরিচালক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ রাবে' হাসানী নদভী সাহেবেরও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাঁদের সস্নেহ ভালোবাসা সবসময় গ্রন্থটির কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে 'মজলিস' থেকে গ্রন্থটির দ্রুত মুদ্রণের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আমি আমার কর্মস্থলের সকল দায়িত্বশীলদের শুকরিয়াও আদায় করছি। তারা যদি সময়ে-অসময়ে এ কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমাকে অবসর করে না দিতেন তাহলে সম্ভবত কাজটি এতো দ্রুত সম্পন্ন হতো না। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

এর বাইরে মহিসুরের জনাব সলীম তামান্নায়ী সাহেব, ওয়াতান প্রেস, ব্যাঙ্গালুরুর আবদুল্লাহ সাহেব, মাওলানা আবদুল আযীয নদভী ভাটকালী সাহেব, মাওলানা গুফরান নদভী সাহেব, মাওলানা আনীস নদভী সাহেব, ডক্টর শফী আহমদ, মহিসুরের আহমদ শরীফ সাহেব, ইসমাঈল ইরশাদ সাহেব ও মৌলভী শুয়াইব আহমদ নদভী প্রমুখের শুকরিয়া আদায় করছি। যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন।

আজ আমার একটু পরপর মনে পড়ছে জামিয়া ইসলামিয়া ভাটকালের সাবেক ব্যবস্থাপক আলহাজ্জ মুহিউদ্দীন মুনীরী সাহেবের কথা— আমার ওপর যার অবদান সীমাহীন। যিনি অধীর আগ্রহে গ্রন্থটির কাজ সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা করেছেন। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন আর আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মুদ্রিত কপি হাতে পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর আনন্দের সীমা থাকতো না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উচ্ছ্বসিত রহমতে আচ্ছাদিত করুন। পরকালে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করুন।

যেই মহান দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও বদান্যতায় এই দুরুহ কাজটি সম্পন্ন করে দিয়েছেন, সেই পবিত্র ও

www.boimate.com

সম্মানিত সত্তার কাছে আমি শুধু প্রবল আশাবাদীই নই; একান্ত বিশ্বাসী যে, তিনিই গ্রন্থটিকে কবুল ও মঞ্জুর করে এর উপকারিতা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবেন। গ্রন্থটিকে তিনি টিপু সুলতান শহীদ রহ.-এর পাশাপাশি আমাদের সবার নাজাত ও মাগফিরাতের মাধ্যমে পরিণত করবেন। গ্রন্থটির সংকলন ও বিন্যাসের কাজে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে উপকৃত করবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، إِلَيْهِ أُنِيْبُ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

ওয়াস-সালাম

মুহাম্মাদ ইলয়াস মুহিউদ্দীন নদভী
১৩ জুমাদাল উলা ১৪১৭ হি.
২৪ অক্টোবর ১৯৯৬ ঈ.

জামিয়া ইসলামিয়া
ভাটকাল

www.boimate.com

প্রথম অধ্যায়

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহান ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চালচিত্র

www.boimate.com

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহান ও ভারতবর্ষ

যে কোনো শাসক বা মুজাদ্দিদের শুদ্ধি আন্দোলন ও সংস্কার মিশন জানার জন্যে তার যুগের সেই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি জানা আবশ্যক– যেখানে সেই শাসক বা সমকালীন মুজাদ্দিদ চোখ খুলেছেন। বিশেষ করে তিনি যখন নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন ওই সময় যদি তার মাতৃভূমি ও তৎসংলগ্ন জিওগ্রাফিক ভূখণ্ড ও রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা যদি অবর্ণনীয় হয়ে থাকে, তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক মানসিকতার মাঝে যদি অবিশ্বাস্য ধরনের বিপর্যয় দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে ওই সময় তার গৃহিত প্রয়াস ও সাধনার কল্যাণে ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে, বৈশ্বিক মানচিত্রে ঘটিত রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোর গুরুত্ব অত্যাধিক বেড়ে যায়। টিপু সুলতান শহীদের কৃতিত্ব, রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা এবং অন্যান্য শাসকের সঙ্গে তাকে তুলনা করার জন্যেও মহিসুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিম জাহান ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করতে হবে। কারণ, মুসলিম জাহানের সঙ্গে ওই সময় আমাদের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত নানা সম্পর্ক অবশ্যই ছিল। সম্পর্কের এই মেলবন্ধনকে অপেক্ষাকৃত আরও বৃহৎ ঐক্যের প্লাটফর্মে নিয়ে আসাই ছিলো সুলতান টিপুর সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। কারণ হলো, ইসলামি ইতিহাসের প্রাজ্ঞ লেখক হযরত সাইয়্যেদ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর ভাষায়—

> মানবসমাজ একটি প্রবহমান নদীর মতো, যার প্রতিটি ঢেউ ও প্রতিটি তরঙ্গ আরেকটি ঢেউ ও তরঙ্গের সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এজন্য দুনিয়ার কোনো দেশ— তা সেই দেশ ও সেই রাষ্ট্র অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে যত বিচ্ছিন্নই থাকুক, এবং যত পরস্পরসম্পর্কহীন জীবনযাপনই করুক, পার্শ্ববর্তী দুনিয়ার সঙ্ঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি, বিপ্লব, পরস্পর বিদ্যমান শক্তিসমূহ এবং শক্তিশালী আন্দোলন থেকে

www.boimate.com

একেবারে সম্পর্কহীন ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়াশূন্য থাকতে পারে না। [তারীখে দাওয়াত ও আযীমত/সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস : ৪/৩২]

যার কারণে সর্বাগ্রে আমরা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্রাবলি থেকে দ্বাদশ হিজরী শতাব্দী/অষ্টাদশ ঈসায়ি শতাব্দীতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চালচিত্র কেমন ছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি এর মাধ্যমে পাঠকবর্গ সামনে মহান এই শহীদের সেসকল কৃতিত্ব সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন— যা তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনামলে আঞ্জাম দিয়েছেন।

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক চিত্র

এটাই সেই যুগ— যে যুগে মুসলমানরা ইউরোপে ঈসায়ি সপ্তদশ শতকের পর রাজনৈতিক সাফল্য পেতে শুরু করেছিল। ১৭৩৫ ঈসাব্দে রাশিয়া ইরানে তার অধিকৃত এলাকাগুলো থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। ১৬৯৮ ঈসাব্দে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পর্তুগিজদের রাজত্ব আরবদের সহায়তায় নিঃশেষ হয়ে পড়ে। ১৭০৭ ঈসাব্দে সুলতান আওরাঙ্গজেব রহ.-এর ইনতিকালের সময় মুসলিম জাহানের একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ তার গোটা ইতিহাসের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলো। মুসলিম জাহানে ইসলামি খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব হিজরী দশম শতাব্দীর অগ্রভাগ থেকেই উসমানি সাম্রাজ্য অর্থাৎ তুর্কি হুকুমতই করছিলো। বাগদাদ থেকে শুরু করে আলজেরিয়া পর্যন্ত এবং হাঙ্গেরি থেকে ইয়ামান পর্যন্ত গোটা ভূখণ্ড তাদের অধিকৃত ছিলো। পশ্চিমে প্রাচ্যে ইন্দোনেশিয়ার দীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত, উত্তরে হাঙ্গেরি থেকে দক্ষিণে ঘানা রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামি রাষ্ট্রের পতাকা পতপত করে উড়তো। [মিল্লাতে ইসলামিয়া কি মুখতাসার তারীখ। দ্বিতীয় খণ্ড]

মরক্কো থেকে সুদান পর্যন্ত ছিলো আরবদের রাজত্ব। পুণ্যভূমি হিজাযও উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল। সেখানে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতো মককার শরিফ। যিনি বংশীয়ভাবে সাইয়্যেদ ছিলেন। ওই সময় সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি-স্থিতি বিরাজ করতো। অর্থনৈতিকভাবে সর্বত্র স্বচ্ছলতা ছিলো। বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছিলো। মুসলিম জাহানে কারিগরি ও প্রকৌশলবিদ্যা এবং কৃষিকাজের

www.boimate.com

সার্বিক উন্নতির কারণে উৎপাদিত শষ্যের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। সামষ্টিকভাবে মুসলমানরা তখন গোটা পৃথিবীর ১ কোটি ৫৭ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে রাজত্ব করতো।[১] ওই সময় মুসলমানরা ছিল পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২১ ভাগ। ১২৫ মিলিয়ন তথা প্রায় ১৫ কোটি মুসলমান ছিল।[২]

কিন্তু খুব দ্রুতই কয়েক বছরের মাথায় শুরু হয়ে যায় মুসলিম জাহানের বেদনাবিধুর অধ্যায়। আকস্মিক বিশ্বের মুসলমানগণ রাজনৈতিক ময়দানে উন্নতির শিখর থেকে অধঃপতনের দিকে ছুটতে শুরু করে। দেখতে না দেখতেই উসমানি সাম্রাজ্যের গতিমুখ পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ১৭২৭ ঈসাব্দে মরক্কোর সম্রাট সুলতান ইসমাঈলের ইনতিকালের পর মরক্কো রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৭৩৭ ঈসাব্দে ইরান থেকে সাফাভী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। যা সুন্নি পরিবারেরই এক সন্তান 'নাদির শাহ' দখল করে নেয়। সেখান থেকে সে অগ্রসর হয়ে কান্দাহার ও কাবুল হয়ে ১৭৩৯ ঈসাব্দে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ১৭৪৭ ঈসাব্দে সেই পরিবারেরই জনৈক সদস্যের হাতে সে নিহত হলে ইরানেও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে আহমদ শাহ দুররানী আফগানদেরকে সংঘবদ্ধ করে আফগান সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ স্থাপন করে। পরবর্তীকালে যা পূবদিকে কাশ্মির ও পাঞ্জাব পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।

ওদিকে ইউরোপে বলকানের মুসলিম ভূখণ্ডও ইউরোপের হাতে চলে যায়। মধ্য এশিয়ার অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্র– কিরঘিযিয়া ও আর্মেনিয়ার ওপর রুশ অধিকৃত করে। ১৭০৭ ঈসাব্দে আওরঙ্গজেবের ইনতিকালের পূর্বেই মোঘল সাম্রাজ্যে শুরু হয়ে যায় ভাঙ্গনের খেলা। ১৭৫৭ ঈসাব্দে ইংরেজরা দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ অংশ ছাড়াও তৎকালীন বঙ্গদেশ দখল করে নেয়। এমন এক পতনোন্মুখ যুগেই দক্ষিণ ভারতে *সালতানাতে খোদাদাদ মহিসুর* প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম মিল্লাহর দুই ইস্পাতকঠিন প্রত্যয়ী বীর নবাব হায়দার আলী ও সুলতান টিপুর রাজত্ব সূচিত হয়।

---

1 قسمات العالم الإسلامي المعاصر ، ل مصطفى مؤمن ۔

2 مسلم دنیا : ماضی اور حال

www.boimate.com

মুসলিম জাহানের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা

হাদীস শরীফের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, যুগ যতো সামনের দিকে অগ্রসর হবে, বিশ্বমুসলিমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ময়দানে যতো উন্নতিই করুক না কেন, নববী যুগ থেকে তাদের দূরত্ব যতো বেশি বৃদ্ধি পাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার ততো বেশি অধঃপতন ঘটবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

'(নৈতিকতা ও ধর্মচর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে) সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। এরপরের স্তরে পরবর্তী প্রজন্মের যুগ। এরপরের স্তরে তৎপরবর্তী প্রজন্মের যুগ।'

এ কথা স্পষ্ট যে, নবাব হায়দার আলী ও টিপু সুলতান যেই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন সেটি হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী। নববী যুগের সঙ্গে যে যুগের ব্যবধান কম করে হলেও এগারো শ বছর। ফলশ্রুতিতে হাদীস শরীফের আলোকে ওই যুগে নৈতিক অধঃপতন, ধর্মচর্চার স্বল্পতা ও ঈমানি দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ কথা স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয় যে, বিশ্বের মুসলমানদের এ ধরনের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন ১২৫৮ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়ে যায়।[৩] যার ফলে আল্লাহর আযাব তাতারীদের আকৃতিতে মুসলমানদের ওপর নেমে আসে। তারা যখন মুসলিমবিশ্বের ওই সময়কার রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র বাগদাদের ওপর আক্রমণ করে, তখন তারা সেখানে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছিলো। পুরো এক মাস নগরী জুড়ে গণহত্যা চালায়। ওই সময় প্রায় ১৮ লক্ষ মুসলমানকে তারা শহীদ করে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর রহ.-এর বর্ণনামতে ২০ লক্ষাধিক মুসলমানকে নৃশংসভাবে তারা হত্যা করে। এমন প্রলয়ঙ্কারী ধ্বংসযজ্ঞের পর মনে হচ্ছিলো, এখন আর পৃথিবীতে রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সম্ভাবনাও নেই। এমনকি আল্লামা ইবনে আসীর রহ. তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'আল কামেল'-এর মাঝে এমন মন্তব্যও করেন যে,

---

৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। খণ্ড : ১৩

www.boimate.com

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ أَنَّ الْعَالَمَ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آدَمَ إِلَى الْآنَ لَمْ تَبْتَلُوْا بِمِثْلِهَا لَكَانَ صَادِقًا.

'যদি কোনো ব্যক্তি এ কথা বলে যে, মানবেতিহাসের শুরু থেকে অদ্যাবধি এমন গণহত্যার ঘটনা আর ঘটেনি, তার দাবী অবশ্যই সত্য।'

কিন্তু ইসলামের সেই শত্রুদেরকে দিয়েই আল্লাহ তা'আলা আরেকবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ আদায় করে নিয়েছেন। তাতারীদের একটি জাতিই ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে।

এভাবে যখন হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক পতন শুরু হয় এবং মুসলিম জাহানের পুরো ভূখণ্ড– প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্য আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যগুলোর ওপর ইউরোপ তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয় উপমহাদেশে মোঘল সাম্রাজ্য পতনের শিকার হয়ে পূর্বের ১ কোটি ৫৭ লক্ষ বর্গমাইল হ্রাস পেয়ে মাত্র ৪৫ লক্ষ বর্গমাইলের আয়তনের ভেতর সংকুচিত হয়ে পড়ে। এমন এক দুঃসময়ে আল্লাহ তা'আলা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহত করার জন্যে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র থেকে অনেক দূরে আরব সাগরের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল থেকে যৎসামান্য দূরে মহিসুর প্রদেশে টিপুর আকৃতিতে এমন একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেন, যার নাম শুনলে ইংরেজ শিবিরে কম্পন শুরু হয়ে যেতো। বৃটিশ মায়েরা তাদের সন্তানকে ভয় দেখিয়ে ঘুম পড়ানোর জন্যে তার নাম নিতো। তিনি যতো দিন জীবিত ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিজয়ের কল্পনা করার দুঃসাহসও করতো না।

আসলে এটি ইসলামের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মাঝে সৃষ্টিগতভাবেই এই বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন যে, যখনই তার সামনে বড় কোনো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ফেতনা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছে তখন সম্পূর্ণ গায়বিভাবে ময়দানে এমন ব্যক্তিত্ব অবশ্যই আবির্ভূত হন— যিনি তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে সেই ফেতনা প্রতিহত করেন।

এটাও আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি যে, দুনিয়ার যে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বিপ্লব বা ধর্মীয় অরাজকতার উপায়-উপকরণ খোদ তাদের মধ্য হতেই উৎসারিত হয়ে থাকে। উহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে

www.boimate.com

মুসলমানের পরাজয়ের কারণ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। বাগদাদের ওপর তাতারীদের আক্রমণের সময় মুসলমানদের মাঝে কী পরিমাণ শিয়া-সুন্নী বিবাদ ছিলো, তা সবাই জানেন। অদ্রূপ আপনি যদি হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী তথা ঈসায়ি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধোগতির প্রেক্ষাপট নিরীক্ষণ করেন তাহলে আপনার সামনে এই কারণগুলো পরিষ্কার ভেসে ওঠবে যে, ওই সময় ইরানে মদ ও কাবাবের আসর তুঙ্গে ছিলো। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৭০৭ ঈসাব্দে আওরঙ্গজেব পরবর্তী মোঘল শাসকদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত করার মহামারী দেখা দিয়েছিলো। উসমানি সালতানাতের মাঝে রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে শাহী বেগমরা সবসময় নাক গলাতো। রাজারা প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতো। তুরকিস্তানে বংশীয় ও ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণ মানসিকতা দেখা দেয়। সামষ্টিকভাবে ওই সময় গোটা মুসলিম জাহানে তখন শিক্ষা-গবেষণার প্রতি চরম উদাসীনতা, খাঁটি তাওহীদ ও আক্বীদার দৃঢ়তার স্বল্পতা, শিরক-বিদ'আতের ব্যাপক প্রচলন, দ্বীনের নামে বিভিন্ন কুসংস্কার, প্রথা ও রুসম-রেওয়াজের প্রচার-প্রসার, দ্বীন প্রচারের প্রতি অনীহা, পীর-শায়খদের মানসিক স্থবিরতা, চৈন্তিক ও আদর্শিক উদারতার তীব্র শূন্যতা-সহ ইত্যকার অসংখ্য অনিষ্টতা ও জটিলতা বিদ্যমান ছিল। এগুলোই মুসলমানদের পতনের প্রকৃত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা ধীরে ধীরে মুসলমানদেরকে পতনের গহ্বরের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এটাই সেই যুগ, যখন ইউরোপে রাজনৈতিক উন্নতি সূচিত হয়। ওই সময় গোটা মুসলিম জাহানের সামষ্টিক ধর্মীয় ও নৈতিক অধোগতির কী চিত্র ছিলো, তা 'সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ' গ্রন্থের মাঝে সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক ডক্টর লুথরোপ স্টুডার্ড (Dr. Lothrop Stoddard)-এর প্রসিদ্ধ বই New World of Islam [নিউ ওয়াল্ড অব ইসলাম]-এর উদ্ধৃতিতে লেখেন—

> 'অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিমবিশ্ব তার দুর্বলতার শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল। তাদের প্রকৃত শক্তির চিহ্ন কোথাও পাওয়া যেত না। সর্বত্রই স্থবিরতা ও অধঃপতন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আদব-আখলাক, সভ্যতা-শিষ্টাচার ও নীতি-নৈতিকতা যেন ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আরবীয় সভ্যতার শেষ

www.boimate.com

চিহ্নটুকুও লোপ পেতে বসেছিল। শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলছিল। মুসলিমজাতির গোটা সালতানাত ছিল বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতার শিকার। বিশৃংখলা ও খুন-খারাবির রাজত্ব চলছিল সর্বত্র। প্রজাসাধারণ লুটতরাজ, যুলুম-নিপীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। গ্রামীণ ও শহুরে লোকদের অন্তর থেকে শ্রমের উৎসাহ উঠে গিয়েছিল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষি এতোটা হ্রাস পেয়েছিল যে, জীবনধারণের জন্য যতটুকু না হলেই নয়, ঠিক ততটুকুই তখন করা হত।

অপরাপর বিষয়ের মতো ধর্মের অবস্থাও ছিল অবনতির শেষপর্যায়ে। তাসাওউফের শিশুসুলভ ধ্যান-ধারণা মাত্রাতিরিক্ত চর্চা ইসলামের তাওহিদ তথা একত্ববাদকে ঢেকে ফেলেছিল। মসজিদসমূহ জনমানবহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। মূর্খ ও নিরক্ষর জনসাধারণ এ থেকে দূরে থাকত। তারা তাবিয-তুমার বেশরা দরবেশদের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়েছিল। তারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণ পীর-বুযুর্গদের মাযার যিয়ারতে নিমগ্ন থাকত এবং ওই মৃত ব্যক্তিদেরই আল্লাহর বন্ধু, অভিভাবক ও সুপারিশকারী ধরে নিয়ে তাদেরই পূজা করত। ওইসব মূর্খ-জাহিল মনে করত যে, আল্লাহ এমন এক উর্ধ্বতন সত্তা, যাকে কোনোরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তখন কুরআন মজীদের নৈতিক শিক্ষাকে কেবল পেছনেই ফেলে রাখা হয়নি; বরং তা অমান্যও করা হত। আফিম ও মদের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বত্রই ছিল ব্যভিচারের প্রাবল্য। ঘৃণ্যতম কর্মও খোলাখুলি করা হত। [সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (উরদূ)। সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (বাংলা) : ৬/৮৫]

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চালচিত্র

১৭৬১ ঈসাব্দে দক্ষিণ ভারতে আরব সাগরের পূব উপকূল থেকে সামান্য দূরে মহিসুর ভূখণ্ডে যখন সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ওই সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিলো শোচনীয়। ১৭০৭ ঈসাব্দে

www.boimate.com

আওরঙ্গজেবের ইনতিকাল পর্যন্ত হিন্দুস্তান ছিলো চীনের পর ওই সময়কার পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম সাম্রাজ্য। যার শাসনভার ছিলো মুসলমানদের হাতে। পুরো ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'অশোক' পরবর্তী কোনো যুগেই এমন বৃহৎ সাম্রাজ্য আর দেখা যায়নি। তার আয়তন ছিল কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয়ে কাবুল পর্যন্ত পনেরো লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক। মোট জনসংখ্যা প্রায় ২০ কোটি। মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আওরঙ্গজেবই সর্বপ্রথম আসামকে মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। ইতোপূর্বে এটি ছিলো পৃথক রাজ্য। কিন্তু তার ইনতিকালের পরপরই মোঘল সাম্রাজ্যে শুরু হয়ে যায় পতনের খেলা। পরবর্তী কোনো শাসকের মাঝেই আলমগীরের মতো মেধা ও রাজত্ব পরিচালনার সামর্থ্য ছিলো না। তিনি রাজ্যপরিচালনার সুবিধার্থে গোটা দেশকে তিন অংশে বণ্টন করে তিন সন্তানের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মাঝে দেখা দেয় ভ্রাতৃঘাতী কলহ। তাদের পারস্পরিক সেই কলহের কারণে দেশটির অখণ্ডতা ধ্বংস হয়।

১৭১২ ঈসাব্দ পর্যন্ত তাঁর বড় ছেলে 'মুয়ায্যম বাহাদুর শাহ' দেশ শাসন করে। এরপর ১৭১৯ ঈ. পর্যন্ত রাজক্ষমতা এ বংশেরই এক সদস্য 'ফারখ সের'-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু ততোক্ষণে জনগণের মন থেকে রাজার প্রতি ভয়-সমীহ লোপ পেয়ে যায়। জনগণ ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠে। রাজমহলগুলো অশ্লীল বিনোদনের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। অন্যদিকে রাজকীয় বিভিন্ন বিষয়ে শাহী বেগমরা নাক গলাতে শুরু করে। মোটকথা, অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা ও সম্পদ উপার্জনের উদগ্র নেশা প্রশাসনের প্রত্যেককে বেহুঁশ করে ফেলে। ১৭৪৮ ঈসাব্দে যখন মুহাম্মদ শাহ ক্ষমতার বাগডোর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় ওই সময় প্রশাসনের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে গিয়েছিলো। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, পরবর্তীকালে আরও যতো শাসক এসেছে তারা অযোগ্যতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতায় একজন পূর্ববর্তীজনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। মোঘল শাসকদের এমন দূরাবস্থা ও পারস্পরিক অনৈক্যের সুযোগে যত্রতত্র বিশৃঙ্খলা গজিয়ে ওঠতে থাকে। মারাঠারা সুযোগ কাজে লাগিয়ে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দখল করে নেয়। অন্যদিকে গৌদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দেয় নাদির শাহ। সে ১৭৩৯ ঈসাব্দে মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী কাবুল, পেশোয়ার, লাহোর প্রভৃতি নগরী দখল করে দিল্লীর ওপর চড়ে

www.boimate.com

বসে। থানেশ্বরের কাছাকাছি এক স্থানে প্রলয়ঙ্কারী যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ মানুষ হত্যা করে, পঞ্চাশ কোটি অর্থমূল্যের সম্পদ লুণ্ঠন করে ইরান ফিরে যায়। ওই সময় তার উদ্দেশ্য ছিলো, যেসকল আফগান তৎকালীন হিন্দুস্তানের কাবুল নগরীতে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে কেন মোঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ তার হাতে তুলে দিলো না, তার উচিত শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এর পরিণতিতে দেখা গেলো, এখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও নবাবের মনে দিল্লীর সম্রাটের প্রতি বিন্দু পরিমাণ সমীহ নেই। তারা লালকেল্লার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকম দুঃসাহসী হয়ে ওঠেছে। বিহার, উড়িষ্যা, সিন্ধু, দাকান, কাশ্মীর সহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে স্বাধীন সার্বভৌম স্থানীয় সরকার দাঁড়িয়ে গেছে। সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা ১৭৫৭ ঈসাব্দে বাঙ্গাল ও ১৭৬৪ ঈসাব্দে এলাহাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলো দখল করে ফেলে। বাকসারের রণাঙ্গনে পরাজিত হয়ে শাহ আলমও নিজেকে ইংরেজদের দয়া-করুণার ওপর ছেড়ে দেয়। ১৭৫৬ সালে একটি চুক্তিনামা অনুসারে সে বাঙ্গাল, উড়িষ্যা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেয়। নাদের শাহের পর আহমদ শাহ আবদালী ১৭৬৫ ঈসাব্দে অকস্মাৎ দিল্লি দখল করে ফেলেছিলো। তখন তার হাত থেকে দিল্লী উদ্ধার করার জন্যে মারাঠাদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। দিল্লী হস্তগত হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে মারাঠাদের নাকগলানি শুরু হয়ে যায়। ক্রমশ তা বাড়তে বাড়তে পরিস্থিতির এতোটাই অবনতি ঘটে যে, আশঙ্কা হচ্ছিলো– এভাবে চলতে থাকলে মারাঠাদের সামরিক প্রভাব ও রাজনৈতিক শক্তিমত্তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ঠিক এহেন ক্রান্তিকালে মুসলমানদের দুর্বিসহ পরিস্থিতির ওপর আল্লাহর রহমত নেমে আসে। দিল্লীর কাছাকাছি পানিপথের ময়দানে আফগান থেকে আহমদ শাহ আবদালীর পুনঃআগমন ঘটে। তিনি মাত্র ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মারাঠাদের দু' লক্ষ সেপাইকে মৃত্যুর ঘুম পাড়িয়ে একটি মারাত্মক বিপদ থেকে মুসলমানদেরকে কিছু দিনের জন্যে উদ্ধার করেন। কাশ্মির, সিন্ধ, পাঞ্জাব নগরীর ওপর তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশিষ্ট ভূখণ্ডগুলোকে মোঘল সম্রাট শাহ আলমের হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিজে আফগান চলে যান। যদি তিনি কয়েক বছর দিল্লী শাসন করতেন তাহলে সম্ভবত মোঘল সাম্রাজ্যের ক্রমপতন রুখতে সমর্থ

www.boimate.com

হতেন। কিন্তু আফসোস, তেমনটি ঘটেনি। মারাঠাদের প্রভাব চিরদিনের জন্যে থেমে গেলেও তার স্থানে দৃশ্যপটে চলে আসে ইংরেজরা। ক্রমশ তাদের প্রভাব গোটা দেশে ছড়াতে শুরু করে। তারা বাণিজ্যের পরিবর্তে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর ছড়ি ঘোড়াতে থাকে। এমনকি যখন ১৭৬১ ঈসাব্দে দাক্ষিণাত্যে সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারা গোটা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাদের সামরিক শক্তি গুছিয়ে এনে এই সালতানাত ধ্বংসের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে। তাদের সেই রাজনৈতিক সংঘাতের ধারাবাহিকতা ১৭৯৯ ঈসাব্দে সুলতান টিপুর শাহাদাত পর্যন্ত চলমান থাকে। যার সঙ্গে জুড়ে ছিলো ভারতবর্ষের মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাগ্য। সেই ভাগ্যের ওপরও সিলমোহর লেগে যায়। যার প্রমাণ খুব দ্রুতই ১৭৫৭ ঈসাব্দে গোটা দেশের ওপর ইংরেজদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দুঃখজনক চিত্র ইতিহাসের দর্পণে ভেসে ওঠে।

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা

ওই শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা নিরীক্ষণ করার জন্যে আপনি যখন ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করবেন তখন একটি কথা পরিষ্কারভাবে, সর্বস্বীকৃত কণ্ঠে আপনার সামনে চলে আসবে যে, ওই সময় ভারতীয় মুসলমানরা খাঁটি তাওহীদি শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিলো। তারা এমন জঘন্য বিদআত ও কুসংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো যে, যা ধর্মের মানদণ্ডে ছিলো পরিষ্কার শিরক। শরীয়তপরিপন্থী কর্মকাণ্ড ও রুসম-রেওয়াজকে তারা ধর্মের অনুষঙ্গে পরিণত করেছিলো। কবরপূজা, গায়রুল্লাহর কাছে মান্নত প্রার্থনা করা, জীবনের বিভিন্ন আয়োজনে হিন্দু সংস্কৃতির অনুগমন করা, নিজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্যে বিভিন্ন বুযুর্গ ও নেককারদের কাছে প্রার্থনা করা, তাদের নামে জীব-জন্তু উৎসর্গ করা-সহ এমন অজস্র জাহেলী কর্মকাণ্ড ও অনৈসলামিক রেওয়াজ মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছিলো। তাদের চালচিত্র দেখলে বাইরের কারোও মনে হবে না যে, সে ইসলামি সমাজ দেখছে। এটি হলো সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা।

অন্যদিকে উলামা-মাশায়েখের অবস্থা হলো, তাদের চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগত ছিলো স্থবির। তারা এতোটাই তাকলীদপ্রবণ ছিলো যে, কোনো

www.boimate.com

মাসআলায় ইজতিহাদ করাটাকে তারা গর্হিত অপরাধ মনে করতো। কুরআন-হাদীসের ওপর তারা ফিকাহর ভাষ্যকে প্রাধান্য দিতো। মাওলানা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.-এর ভাষায় 'ওই সময়কার জনসাধারণ তো দূরের কথা, আলেমরা পর্যন্ত কুরআন-হাদীসের নিগুঢ় তত্ত্ব ও তার প্রাণ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো।'[৪] সকল মুফতী মনে করতো— ফিকাহ ও ফতোয়ার শব্দপূজাই আমাদের আসল লক্ষ্য।

এর বাইরে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটেছে। কুদরতিভাবে ওই সময় এই হিন্দুস্তানের মাটিতেই এমন ক'জন চিন্তাবিদ ও প্রাজ্ঞ আলেম জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যারা ওই যুগের অধঃপতনমুখী গড্ডালিকা প্রবাহের প্রতিকূলে স্থির-নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই তালিকার শ্রেষ্ঠাংশে থাকবেন হাকিমুল ইসলাম, মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১১১৪ হি.-১১৭২ হি.) হযরত মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (১১১১ হি.-১১৯৫ হি.) ও মোল্লা নিযামুদ্দীন লাখনাভী (মৃত ১১৬১ ঈ.) প্রমুখ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বুযুর্গের খানকাহ ও ছোট ছোট দ্বীনি মাদরাসা ছাড়াও সর্বত্র এমন কিছু দ্বীনদার, মুত্তাকী মানুষ বিদ্যমান ছিলেন যারা এসকল সমস্যা ও জটিলতা সত্ত্বেও দ্বীনের বুনিয়াদের ওপর দৃঢ়তার সঙ্গে অবিচল ছিলেন।

ওই যুগেই মোল্লা নিযামুদ্দীনের সুযোগ্য সন্তান প্রখ্যাত জ্ঞানতাপসী আবদুল আলী —যিনি নিজেও অনেক উঁচু স্তরের আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন— মাদ্রাজের কাছাকাছি 'আরকাট' (Arcot) নামক স্থানে একটি বৃহৎ দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] যেখানে ইলম অর্জনের জন্যে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানপিপাসু উলামায়ে কেরাম ছুটে আসতেন। যার ফলে 'আরকাট' নগরীটি দাক্ষিণাত্যের সর্ববৃহৎ জ্ঞান-নগরীর রূপ লাভ করে। কিন্তু যেহেতু আরকাটের নবাব মুহাম্মদ আলী মাদরাসাটির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এজন্যে তার পতনের সঙ্গে সঙ্গে মাদরাসাটিও তার জৌলুস হারিয়ে ফেলে।

---

৪. মাকালাতে সুলাইমান। দ্বিতীয় খণ্ড

৫. মোঘলোঁ কে যাওয়াল সে কিয়ামে পাকিস্তান তক

www.boimate.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহিসুর রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ

www.boimate.com

সালতানাতে খোদাদাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ

১৭৬১ ঈসাব্দে যখন দাক্ষিণাত্যের ভূখণ্ড মহিসুরে *সালতানাতে খোদাদাদ* প্রতিষ্ঠিত হয় এর পূর্বে এটি ছিলো রাজ কৃষ্ণরাজের অধীনস্থ। সূচনাকালে মাত্র ৩৩ টি ছোট গ্রাম নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উত্তরাঞ্চলের লোকজন এই রাষ্ট্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতো না। কিন্তু দেখতে না দেখতেই রাষ্ট্রটির পরিধি মাত্র কয়েক বছরের মাথায় ৮০ হাজার বর্গমাইল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরে কৃষ্ণা নদী (Krishna River) থেকে এর সীমানা শুরু হয়ে দক্ষিণে কেরালার প্রসিদ্ধ নগরী কোচি (Cochin) পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। খোদ দেশের লোকেরাই গতকালও যে রাষ্ট্রটির কথা জানতো না, মাত্র অল্প ক'দিনেই তার সুখ্যাতি দেশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে ইউরোপ পৌঁছে যায়।

একটি নতুন রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাহ্যতই আশপাশের কিছু রাষ্ট্র ও তার সরকার তাকে নিয়ে আশঙ্কিত হবে, আবার কিছু রাষ্ট্র তাকে বন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। মহিসুরের আশপাশে যেমন ইংরেজ ছিলো, তেমনই ছিলো আরকাটের নবাব, ছিলো মারাঠা। আরও ছিলো দাকানের নিযাম। সালতানাতের খোদাদাদের জন্মলগ্ন থেকে পতন পর্যন্ত নবাব হায়দার আলী ও টিপু সুলতানকে এ সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বোঝাপড়া করতে হয়েছে। যার কারণে এখন আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, মহিসুরের সেই সালতানাতে খোদাদাদের আশপাশে যেসকল রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা ছিলো, যেসকল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় বসবাস করতো, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কারণ একটি উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্র ঠিক কী কারণে পরিসমাপ্তির মুখোমুখি হয়েছে— তা জানতে বিষয়টি অনেকখানি সহায়ক হবে। যেহেতু সুলতান টিপুকে জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে, অন্যান্য রাষ্ট্র যথা নিযাম ও মারাঠারা টিপু শহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে, এজন্যে আমরা ইংরেজ সম্পর্কিত আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিশদাকারে উপস্থাপন করবো।

www.boimate.com

ইংরেজ

টিপু সুলতান শহীদ ও তাঁর আব্বাজান হায়দার আলীর আসল লড়াই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধেই ছিলো। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে তাঁদেরকে আজীবন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডারদের নবরূপ ইংরেজদের বিরুদ্ধেই লড়ে যেতে হয়েছে। ১৭৬১ ঈসাব্দ থেকে ১৭৯৯ ঈসাব্দ পর্যন্ত সালতানাতে খোদাদাদকে মহিসুরের মাটিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চারটি বৃহৎ ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ লড়তে হয়েছে। শহীদ টিপু সুলতান ইংরেজদেরকে যেভাবে আপন ধর্ম ইসলামের জন্যে মারাত্মক আশঙ্কা মনে করতেন, তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি তিনি তাদেরকে নিজ মাতৃভূমির প্রবল শত্রু মনে করতেন। কাজেই একসঙ্গে তিনি দু'টি লড়াই করেছেন। একটি হলো, স্বদেশী জনগণকে ইংরেজদের অপবিত্র দূরভিসন্ধি থেকে মুক্ত রাখা। দ্বিতীয় হলো, নিজ মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। ইংরেজরা যদিও মারাঠা ও দাকানের নিযামের শত্রু ছিলো। কারণ তারা ছিলো ভিনদেশী। কিন্তু ইউরোপ থেকে এতো দূরের রাষ্ট্র ভারতবর্ষে এসে তারা এ পরিমাণ রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্য কীভাবে পেলো, তা বুঝতে হলে সর্বাগ্রে তাদের ভারতবর্ষে আগমনের প্রেক্ষাপট ও পরবর্তীকালে ব্যবসার ছদ্মাবরণে এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের অনুপ্রবেশের বিষয়গুলো জানতে হবে। এখন আমি এ সম্পর্কেই আলোচনার চেষ্টা করবো।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের অনুপ্রবেশ

ঈসায়ি ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট পরিবারের রাজা জেমস প্রথম (১৬২৫ ঈ.) সর্বপ্রথম ক্যাপ্টেন ইউলিয়াম হকিন্স ও টমাস রু মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে ইংল্যান্ডের রাজার প্রথম কূটনৈতিক পত্র নিয়ে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে পৌঁছে। তখন থেকেই ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের কূটনৈতিক সম্পর্ক সূচিত হয়। এদেশে ইংরেজদের নিয়মিত আগমন শুরু হয় ১৬১২ ঈ.। ওই ইংরেজরাই গুজরাটের প্রশিদ্ধ শহর, ওই সময়কার অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র ও নৌবন্দর 'সুরাট'-এ সর্বপ্রথম তাদের বাণিজ্যিক কুঠি নির্মাণ করে। তারা এর নাম রেখেছিলো ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি। খুব দ্রুত তারা বাণিজ্যিক সফলতা কুড়াতে থাকে। একপর্যায়ে তারা দেশটির পূব উপকূলে 'চিনাপাটনাম'-এর রাজার কাছ

www.boimate.com

থেকে কিছু ভূখণ্ড ভাড়ার বিনিময়ে গ্রহণ করে। ওই সময় পূব উপকূলীয় নগরী 'মুম্বাই' ছিল পর্তুগিজদের দখলে। মাছির ভীষণ উপদ্রব, দুর্গন্ধ ও পঁচা পরিবেশের কারণে ওই সময় পর্যন্ত শহরটির ওপর ভারতীয় শাসকবর্গ বিশেষ কোনো মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস যখন পর্তুগিজ রাজকন্যাকে বিয়ে করেন তখন যৌতুক হিসেবে মুম্বাই নগরীটি ইংল্যান্ডের রাজার হাতে তুলে দেয়া হয়। তিনি পরবর্তীকালে ১৬৬১ সালে দশ পাউন্ড বার্ষিক ভাড়ায় ওই এলাকা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে দেন। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুম্বাই নগরীর ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে। ১৬৮৭ সালে তারা তাদের বাণিজ্যিক কুঠি সূরাট থেকে মুম্বাইয়ে স্থানান্তর করে। এর পাশাপাশি তারা মাদ্রাজ ও কলকাতায় আরও অনেকগুলো কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। তারা এখান থেকে গরম মশলা, সুতি ও রেশমি কাপড় ইউরোপ রপ্তানি করতো। কিন্তু যখন তৎকালীন মোঘল সম্রাটরা এ তথ্য পেলেন যে, ইংরেজরা বাণিজ্যিক কুঠির ছদ্মাবরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক কেল্লা নির্মাণ করছে তখন তারা প্রত্যেক প্রদেশে স্থানীয় গভর্নর বরাবর এই নির্দেশনামা পাঠিয়ে দেন যে, তারা যেন তাৎক্ষণিকভাবে ইংরেজদের দেশজুড়ে বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। তাদের সম্পদ ক্রোক করে এবং তাদের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে। যখন ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস এই সংবাদ শোনে তখন সে পূর্ববাংলার নৌবন্দর চট্টগ্রামের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে জঙ্গী রণতরী পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যিতে হয়। তারা বঙ্গোপসাগরে কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় আরব সাগরে গুজরাট থেকে যেসকল মুসলমান হজের উদ্দেশ্যে হিজায গমন করতো সেই হাজীদের নৌজাহাজ লুণ্ঠন শুরু করে দেয়। কয়েক বছরের মধ্যেই বৃটিশ বাণিজ্যিক কোম্পানি হিন্দুস্তানে দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কোম্পানির উকিলরা তখন রাজন্যবর্গের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬৯০ ঈসাব্দে বাঙ্গালুরুর গভর্নর তাদেরকে দ্বিতীয়বারের মতো ব্যবসা-বাণিজ্যের শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করে। উপরন্তু কারখানা নির্মাণ করার জন্যে কলকাতায় এক টুকরো ভূমি ইজারার ভিত্তিতে প্রদান করে।[৬]

---

[৬]. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম। প্রথম খণ্ড।

www.boimate.com

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী কয়েক বছর ইংরেজরা দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত রেখে পূর্ণ মনোযোগ বাণিজ্যিক সীমারেখার ভেতর নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। ১৭০৭ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ইনতিকালের ফলে মোঘল সাম্রাজ্যে অনেক বড় ফাটল দেখা দেয়। রাজপরিবারের চরম অনৈক্যের সুযোগে বিভিন্ন স্থানে দেশের ভেতর বেশ কিছু স্বাধীন সরকার আত্মপ্রকাশ করে। ওদিকে ইংরেজদের মতো ফরাসিরাও অনেক দিন আগ থেকে স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে ব্যবসার অনুমতি নিয়ে তার আড়ালে বিভিন্ন স্থানে নিজেদের সামরিক কেল্লা নির্মাণ করে যাচ্ছিলো। পাণ্ডেচেরি ছিলো ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে। মাদ্রাজের আরকাট প্রদেশের শাসক নবাব আনওয়ারুদ্দীনকে ফরাসিরা 'আমবুর' নামক স্থানে হত্যা করে নিজেদের পুতুল গভর্নর হিসেবে চান্দা সাহেবকে তার স্থানে বসিয়ে দেয়। পুরো কার্যক্রমটিতে ওই সময়কার পাণ্ডেচেরির ফরাসি গভর্নর ধূর্ত ক্রীড়ানকের ভূমিকা পালন করেছিলো।'[৭]

হায়দারাবাদের নবাব মুযাফফর জঙ্গও কার্যত ফরাসিদেরই অধীনস্থ ছিলো। যাথেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, দাক্ষিণাত্যের বিশাল অংশের ওপর পর্দার আড়াল থেকে ফরাসিরাই রাজত্ব করছিলো। যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফরাসিরা ছিলো ইংরেজদের প্রবল প্রতিপক্ষ; সে কারণে দাক্ষিণাত্যে ফরাসিদের এই আধিপত্য বিস্তার ও ক্রমোন্নতি ইংরেজদের চোখে অসহনীয় ঠেকতে শুরু করলো। যার কারণে তারা পুনরায় ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতির ওপর দখলদারিত্ব শুরু করে দিলো। ১৭৫১ সালে ইংরেজ জেনারেল রবার্ট ক্লাইভ আরকাটের ওপর আক্রমণ করে সেখানকার গভর্নর চান্দা সাহেবকে হত্যা করে এই ভূখণ্ডের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইতোপূর্বে এই আরকাট প্রদেশ ছিলো প্রকৃতপক্ষে ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে। লর্ড ক্লাইভ আরকাট (Arcot) নগরী জয়ের পরপরই দ্রুততার সঙ্গে ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli)-ও দখল করে। তারা তখন আরকাট প্রদেশের গদিতে নামকাওয়াস্তে নিজেদের বিশ্বস্ত বন্ধু মুহাম্মদ আলীকে স্থলাভিষিক্ত করে। ওদিকে

[৭]. তারীখে মুসলমানে পাক ও হিন্দ = সাইয়্যেদ হাশেমী ফরিদাবাদী

www.boimate.com

হায়দারাবাদের নিযামও কার্যত ইংরেজদের অধীনস্থ ছিলো। যার ফলে একমাত্র মহিসুর ব্যতিরেকে হায়দারাবাদ, মাদ্রাজ সহ আশপাশের সকল রাজ্যের ওপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দু' হাজার বর্গমাইলেরও অধিক এলাকা তখন পুরোপুরি ইংরেজদের হাতের মুঠোর ভেতর চলে গিয়েছিলো।[৮]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম যুদ্ধ

কর্নাটক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পর ইংরেজদের মনে রাজত্ব দখলের খায়েশ বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের চলার পথে তারা যাদেরকে প্রতিবন্ধক মনে করতো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা দ্বিধা করতো না। যেহেতু তাদের বাণিজ্যিক ব্যস্ততা কলকাতায়ও ছিলো; এজন্যে এখন তারা মুম্বাই, সুরাট, মাদ্রাজ ও হায়দারাবাদের পর বাঙ্গালের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ওই সময় সেখানকার শাসক ছিলেন নবাব সিরাজুদ্দৌলা। যাঁকে তাঁর নানাজান আলীবর্দী খান স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং উপদেশ দিয়েছিলেন, সবসময় পশ্চিমা আগ্রাসী শক্তিগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। নয়তো এই বাঙ্গাল তোমার থাকবে না।

একবার সুযোগ পেয়ে ইংরেজরা সামুদ্রিক পথে তার রাজ্যের ওপর অকারণে আক্রমণ করে। সিরাজুদ্দৌলা তাদের এই অপমান নীরবে হজম করার মানুষ ছিলেন না। তিনি ২০ জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর ময়দানে ৭০ হাজার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন। ওই সময় তার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সৈন্য ছিলো মাত্র ৩ হাজার। কিন্তু তার উযির ও আত্মীয় মীর জাফর, শেঠ উমিচাঁদ, ইয়ার লুতফ খান ও রাজা দুর্লভ প্রমুখের বিশ্বাসঘাতকার কারণে সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত হন। ইংরেজরা যুদ্ধশেষে তাকে গ্রেফতার করে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতিহাস সাক্ষী, ওই সকল বিশ্বাসঘাতকদেরকে কুদরত ক্ষমা করেনি। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রত্যেকের শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে। মীর জাফর গোদ রোগে আক্রান্ত হয়ে ছটফট করে মরেছে। রাজা দুর্লভ মরেছে পানিতে ডুবে।

---

[৮]. ইনকিলাব কি খুনী তারীখ = শাওকাত আলী ফাহমী

www.boimate.com

উমিচাঁদ শেষ জীবনে পাগল হয়ে গিয়েছিলো। আর ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করে জীবন সাঙ্গ করে।[৯]

দ্বিতীয় যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভ করে ইংরেজরা মীর জাফরকে কলকাতার শাসক বানিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মাথায় তাকে পদচ্যুত করে তার জামাতা মীর কাসেমকে বাঙ্গলার নবাবের পদে বসিয়ে দেয়। কিন্তু সে যখন তার শ্বশুরের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ইঙ্গিতে পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করে এবং নিজ রাজ্যে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মতো ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ওপর থেকেও বাণিজ্যিক শুল্ক উঠিয়ে দেয় আর তার ফলে দেশী-বিদেশী সকল ব্যবসায়ী ব্যবসার ময়দানে একই কাতারে চলে আসে তখন ইংরেজরা পুনরায় তার শ্বশুর মীর জাফরকে ১৭৬৩ সালে বঙ্গদেশের গভর্নর বানিয়ে দেয়। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে মীর কাসেম তার এই অপমান সয়ে নিতে পারেননি। এজন্যে সে অযোধ্যার তৎকালীন শাসক নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর তৈমুর বংশের শাসক শাহ আলমের সহায়তায় –যিনি ওই সময় নিজেই অযোধ্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ইংরেজদেরকে দেশ থেকে বের করার পরিকল্পনা আঁটছিলেন–[১০] ইংরেজদের সঙ্গে ২২ অক্টোবর ১৭৬৪ সালে বক্সারের ময়দানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। দুঃখের বিষয় হলো, ওই যুদ্ধে মীর কাসেমের কমান্ডার নাজিফ খান মীর জাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যার পরিণতিতে মুসলমানদের ৫০ হাজার সৈন্য প্রতিপক্ষের মাত্র ৭ হাজার সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়। ফলশ্রুতিতে মোঘল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ইংরেজদের কাছে ভাতা প্রাপ্তির চুক্তি করে বিহার, বাঙ্গাল, উড়িষ্যা কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেন। অযোধ্যার নবাবও ইংরেজদের সামনে নতজানু হতে বাধ্য হয়।

এভাবে দাক্ষিণাত্যের পর উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশাল ভূখণ্ডও ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মুম্বাই, সুরাট তো পূর্ব থেকেই তাদের দখলে। যার অর্থ হলো, তখন থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয় ভারতীয়দের দাসত্বের

---

৯. জঙ্গে আযাদিয়ে আঠারো সো সাত্তাওয়ান্ন = খুরশিদ মুসতফা

১০. তারীখে মারহাট্টা (মারাঠা) = মুহাম্মদ ইদরীস খান নাজিবাবাদী

www.boimate.com

জীবন। ইংরেজদের হাতে স্বাধীনতা খুইয়ে তারা তখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়েছে। ইতিহাসের এমন এক ক্লান্তিলগ্নে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ভারতবর্ষের বুকে নবাব হায়দার আলী ও টিপু সুলতান শহীদ রহ. দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে।

মারাঠা

মারাঠা হচ্ছে ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র প্রদেশের পশ্চিম উপকূলের পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী একটি কৃষিজীবি গোষ্ঠী। এরা হলো সেই অনার্য অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয় বিভিন্ন গোত্রের সংমিশ্রণে সৃষ্ট– যারা উত্তর ভারত থেকে পালিয়ে দাকানে আশ্রয় নিয়েছিলো।[১১] হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সামাজিক ভাগের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্ক শূদ্র জাতের সঙ্গে। 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' গ্রন্থের লেখকের বক্তব্য অনুসারে তৎকালীন ভারতবর্ষে মারাঠারা একটি গুপ্তচোরা গেরিলাশক্তি ও বিদ্রোহী সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু মোঘল সম্প্রদায়ের ক্রমাগত দুর্বলতা, নেতৃবর্গের পারস্পরিক শক্তিপরীক্ষার সুযোগে তারা গোটা ভারতবর্ষে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে।[১২]

তারা দাক্ষিণাত্যে আহমদনগরের নিযামে শাহী ও বেজাপুরের আদেল শাহী রাষ্ট্রের রাজা-মহারাজাদের অধীনে সামরিক পদে চাকুরি করতো। তাদেরকে সামরিক সেনাবাহিনী হিসেবে সর্বপ্রথম তাদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শক শিবাজী ভোঁসলে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে ঈসায়ি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে সংঘবদ্ধ করে।[১৩] ১৬৬৪ সালে সে সর্বপ্রথম নিজের জন্যে 'রাজা' উপাধী এক্তিয়ার করে। অথচ কিছু দিন পূর্বেও তাদেরকে গোটা দেশে একটি বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৭৬১ সাল নাগাদ তারা গুজরাট, পাঞ্জাব, মালওয়াহ ও উড়িষ্যা নগরী দখল করে ফেলে। দক্ষিণ ভারতে তাদের রাজত্ব তিনজাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। ১৬৮০ সালে শিবাজী ভোঁসলের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের হাল ধরে

---

[১১]. তারীখে মারাঠা

[১২]. তারীখে দাওয়াত ও আযীমত। পঞ্চম খণ্ড।

[১৩]. তারীখে মারাঠা

www.boimate.com

তারই সন্তান সম্ভাজী ভোঁসলে। ১৭০৭ ঈ. থেকে ১৭২০ ঈ. পর্যন্ত মারাঠিদের নিয়ন্ত্রণ করে বালাজী বাজী রাও। এ সময়টিই ছিলো মারাঠিদের গোটা ইতিহাসে তাদের রাজনৈতিক উত্থানের সুবর্ণ সময়। তখন তারা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোর প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি ছড়াতে শুরু করে। তারা আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর ওপর সামরিক আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ভারতীয় মুসলিমদের জন্যে এমন এক দুর্যোগময় মুহূর্তে ১৭৬১ সালে আফগানিস্তান থেকে আহমদ শাহ আবদালী আগমন করে। তিনি পানিপথের ময়দানে নিজের মাত্র ৯০ হাজার সৈন্য দিয়ে মারাঠাদের তিন লক্ষ রক্তপিপাসু সৈন্যের মোকাবেলা করেন। তার হাতে দু' লাখ মারাঠা সৈন্য নিহত হয় এবং চিরদিনের জন্যে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

যখন মহিসুরে সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একটি হিন্দু গোষ্ঠী হিসেবে তারা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্যে মারাত্মক আশঙ্কাজনক মনে করেছিলো। এজন্যে তাদের অবশিষ্ট শক্তি গোয়ালিয়রের জেনারেল সিন্ধিয়া, নাগপুরের জেনারেল ভোঁসলে ও ইন্দোরের জেনারেল হালকার এবং গুজরাটের গাইকোয়াজের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থান থেকে পুনা নগরীতে এসে পেশওয়া মাধোয়া রাও-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। তারা যেমন এককভাবে সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো, অদ্রূপ মহিসুরের বিরুদ্ধে ইংরেজদের পরিচালিত চারটি বৃহৎ যুদ্ধের প্রথম ও তৃতীয়টিতেও তারা সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলো।

দাকানের নিযাম

এই প্রশাসনের অপর নাম 'সালতানাতে হায়দারাবাদ' বা 'মামলাকাতে আসিফিয়াহ'। ঈসায়ি সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র তথা 'গোয়ালকাভাহ'-এর কুতুব শাহী, বেজাপুরের আদেল শাহী, আহমদনগরের নিযাম শাহী ও বেডারের বারীদ শাহী সালতানাত জয় করে মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব সবগুলো আঞ্চলিক রাষ্ট্র একীভূত করে 'দাকান' নামে একটি বিশাল প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭০৭ ঈসাব্দে

www.boimate.com

আওরঙ্গজেবের ইনতিকালের পর যখন মোঘল সাম্রাজ্যের ভেতর আভ্যন্তরীণ তুমুল অরাজকতা সৃষ্টি হয়, তখন সেই বিশৃঙ্খলার প্রভাব 'দাকান প্রদেশ'-এর ওপরও পড়ে। দিল্লীর রাজদরবারের পক্ষ থেকে প্রদেশটির অরাজকতা দূর করে সেখানে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা পুনপ্রতিষ্ঠিত করা এবং তার ওপর মোঘল পরিবারের প্রভাব সুদৃঢ় করার জন্যে ১৭২০ সালে কমরুদ্দীন চীঁ কুলিচ —যিনি নিযামুল মুলক নামে সমধিক পরিচিত— প্রদেশটির গভর্নরের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়। বংশপরম্পরায় তিনি ছিলেন হযরত শাইখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহ.-এর বংশীয় লোক। অনেক দিন আগেই তার পরিবার মধ্য এশিয়ার প্রশিদ্ধ রাষ্ট্র তুর্কেমিনিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তানে এসে থিতু হয়েছিল। কিন্তু সে মোঘল বাদশাদের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতার সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ১৭২৪ সালে নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাট ঘোষণা করে হায়দারাবাদকে নিজের সালতানাতের রীতিমত রাজধানীর পদমর্যাদা প্রদান করে।

তৎকালীন মোঘল সম্রাট নিজের সামরিক দুর্বলতা ও নিযামুল মুলকের ক্ষমতার পরিধি আঁচ করতে পেরে তার সঙ্গে যুদ্ধে জড়ালেন না। বরং তদস্থলে তাকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে মেনে নিলেন। শুধু তাই নয়; রীতিমত তাকে 'আসিফ জাহ'-এর পদবীতেও ভূষিত করলেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রটি 'মামলাকাতে আসিফিয়্যাহ' নাম পেয়ে যায়।[১৪] সে নিজের পরিচয় দিতো, আসিফ জাহে আওয়াল। অবশ্য মুদ্রা ও জুমু'আর খুতবা দিল্লীর মোঘল সম্রাটের নামেই প্রচলিত ছিল। এর মাধ্যমে একদিকে নিযামুল মুলক নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে, অন্যদিকে সে মোঘলদের পৃষ্ঠপোষকতাও বাগাতে সক্ষম হয়। ১৭২৭ সালে নিযামুল মুলক তার প্রতিবেশী রাজ্য মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সেই যুদ্ধের খেসারত হিসেবে তাকে তার বেশ কিছু সীমান্ত এলাকা খোয়াতে হয়। ১৭৪৮ সালে নিযামুল মুলক আসিফ জাহে আওয়াল যখন ইনতিকাল করেন তখন তার স্থলাভিষিক্ত কে হবে— তা

[১৪] মোঘলোঁ কে যাওয়াল সে কিয়ামে পাকিস্তান তক। লেখক, সাইয়্যেদ হাশেমী ফরিদাবাদী।

www.boimate.com

নিয়ে তার ছেলে নাসির জঙ্গ ও পোপুত্র মুযাফফর জঙ্গের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। মুযাফফর জঙ্গ ওই সময়ে ব্যবসার ছদ্মাবরণে এ দেশে অবস্থিত ফরাসীদের সহায়তা নিয়ে ১৭৫০ সালে হায়দারাবাদ দখল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু খুব দ্রুতই সে নিহত হয়।

১৭৫৩ সালে নিযামুল মুলকের তৃতীয় ছেলে সালাবত জঙ্গ (Salabat Jung) রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ১৭৫৬ সালে তার অপর চতুর্থ ভাই নিযাম আলী সফলতার সঙ্গে নিজের মুঠোর ভেতর নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। ওই সময় সলাবত জঙ্গ (Salabat Jung) নামকাওয়াস্তে সিংহাসনের গদীনশীল হয়ে থাকে। এটাই সেই সময়, যখন ইংরেজরা চাতুর্যের সঙ্গে হায়দারাবাদ প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার শুরু করে। যার ফলে হায়দারাবাদের সেনাবাহিনীর ওপর ফরাসীদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। সেনাবাহিনীর বড় বড় পদ থেকে ফরাসী সেনাকর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। যার আবশ্যিক পরিণতিতে হায়দারাবাদ সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পায়। সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ১৭৬১ সালে মারাঠারা দাকানের বিশাল এলাকা দখল করে বসে। কিন্তু ওই বছরই যখন পানিপথের যুদ্ধে আহমাদ শাহ আবদালীর হাতে মারাঠারা ঐতিহাসিক শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হয়, তখন নিযাম আলী খান মারাঠাদের হাত থেকে তার হারানো এলাকাগুলো পুনঃদখল করতে সক্ষম হয়।

এ সময় সে তার বড় ভাই সলাবত জঙ্গ (Salabat Jung)— যিনি এতো দিন নামকাওয়াস্তে সিংহাসনের বসে ছিলেন, তাকে বন্দী করে স্বাধীন রাজা হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেয়। ঠিক এমনই এক মুহূর্তে দাকানের প্রতিবেশী এলাকা মহিসুরে সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। হায়দার আলীর সামরিক শক্তিমত্তার ক্রমশ উন্নতি নিযামের কপালে ভাঁজ ফেলতে শুরু করে। সে আশঙ্কা করে, হায়দার আলী দাকানের অধিকৃত এলাকাগুলো না-জানি দখল করে বসে। কল্পিত ও সম্ভাব্য সেই আশঙ্কা থেকেই নিযামুল মুলক কার্যত হায়দার আলীর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী গড়ে তোলে। ১৭৬৮ সালে ইংরেজদের সঙ্গে কৃত একটি চুক্তি অনুসারে সে তার অধিকৃত কর্নাটকের বিশাল এলাকা সাত লাখ রুপি বার্ষিক প্রদেয়'র বিপরীতে তাদের হাতে

www.boimate.com

তুলে দেয়। যার বিনিময় হিসেবে ইংরেজরা যেকোনো প্রয়োজনে সবসময় নিযামকে সামরিক সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

যার অর্থ হলো, উত্তর ভারতে অযোধ্যার নবাব যেই অবস্থান পেয়েছেন দক্ষিণ ভারতে দাকানের নিযামও ঠিক সেই অবস্থানটাই পেলেন। ইতোপূর্বে যার রাজত্ব নর্বদা নদী থেকে রাসকুমারী[১৫] ও মহারাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো, যার পরিধি প্রায় তিন লক্ষ বর্গমাইল— এখন তা সংকুচিত হয়ে হায়দারাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে সীমিত হয়ে পড়ে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের যেই চারটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো তার তিনটিতে নিযামুল মুলক সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সঙ্গ দেয়। একজন মুসলমান শাসক হওয়া সত্ত্বেও সে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের পতন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টিপুর শাহাদাতের পর ১৮০০ সালে ইংরেজরা তার সেই টুকটাক নবাবিটুকুও কেড়ে নেয়। ১৮০৩ সালে নিযামুল মুলক নিজেও ইনতিকাল করে।

আরকাটের নবাব

সালতানাতে মহিসুরের আশপাশে যে ক'টি রাজ্য ছিলো তন্মধ্য হতে মারাঠা ও নিযাম সম্পর্কে আমরা অবহিত হলাম। বাকি রইলো নবাব মুহাম্মদ আলীর রাজ্য। তাকে সবাই কর্নাটকের নবাব হিসেবে অভিহিত করতো। ঈসায়ি সপ্তদশ শতাব্দীতে মোঘলরা দাক্ষিণাত্যের এই ভূখণ্ড জয় করার পর এর নাম রাখে কর্নাটক। এখানকার স্থানীয় জনগণ তামিল ভাষায় কথা বলে থাকে। এ অঞ্চলটি বর্তমানে তামিলনাড়ু এলাকায় অবস্থিত। ওই যুগে এলাকাটির আরেক নাম ছিলো 'আরকাট' (Arcot)।[১৬] এই প্রদেশের পাশেই আরেকটি মোঘল শাসিত প্রদেশ ছিলো। নাম ছিলো, সিরা (Sira)। এই দুই প্রদেশের জন্যে ১৭১১ ঈসাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর দরবার থেকে একজন গভর্নরই নিযুক্ত ছিলেন।

---

[১৫] কেরালা প্রদেশের ঐতিহাসিক উপকূলীয় এলাকা। –আ. আ. ফারুক

[১৬]. আরকাট মূলত মাদ্রাজের নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। কিন্তু ওই যুগে পার্শ্ববর্তী সিরা (Sira) প্রদেশের বিপরীতে পুরো এলাকাটিকে এই নামেই পরিচয় দেয়া হয়।

www.boimate.com

সা'আদাতুল্লাহ খান। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এই দুই প্রদেশের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। সিরা (Sira) প্রদেশের জন্যে 'আমীন খান' নামের এক ব্যক্তিকে গভর্নর হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। আমীন খানের ইনতিকালের পর সা'আদাতুল্লাহ খান দাকানের নিযামুল মুলকের সহায়তায় দ্বিতীয়বার সিরা (Sira) প্রদেশের গভর্নরের পদ বগলদাবা করে নিতে সমর্থ হয়। সে নিজের পক্ষ থেকে তাহির খানকে এ এলাকার গভর্নর নির্ধারণ করে।

১৭৪৩ সালে এই শাসক পরিবারকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে অন্য বংশের সন্তান নবাব আনওয়ারুদ্দীন আরকাটের গদি দখল করে বসে। ১৭৪৯ সালে আনওয়ারুদ্দীনের ইনতিকাল ঘটে। তার ছেলে মুহাম্মদ আলী তখন পালিয়ে ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli) চলে যায়। ১৭৫১ সালে আরকাটের পুরাতন শাসকের পরিবারের এক লোক চান্দা সাহেব ও বর্তমান পরিবারের দাবীদার মুহাম্মদ আলীর মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যায়। চান্দা সাহেবের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তখনকার ভারতবর্ষে বিদ্যমান ফরাসীরা এগিয়ে আসে। অন্যদিকে মাদ্রাজ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুহাম্মদ আলীর সহায়তায় এগিয়ে আসে। মুহাম্মদ আলী ইংরেজদের সহায়তার লোভে তার অধিকৃত রাজ্যের একটি বিশাল এলাকা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। মুহাম্মদ আলীর এহেন দুর্বলতার সুযোগে এভাবেই এ অঞ্চলে প্রথমবারের মতো ইংরেজরা রীতিমতো রাজকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। তার বিনিময়ে ইংরেজরা দিল্লীর রাজদরবার থেকে মুহাম্মদ আলীর নামে কর্নাটকের নবাবীর ফরমান এনে দেয়। ততোদিনে চান্দা সাহেব ইনতিকাল করেন। যার ফলে আরকাটের ওপর মুহাম্মদ আলীর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেহেতু আরকাটের ওপর মুহাম্মদ আলীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ইংরেজরা সামরিক সহায়তা করেছিলো, এজন্যে এ নবাবও চিরদিনের জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী গড়ে তোলে। সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যতোগুলো যুদ্ধ হয়েছে, তার প্রতিটিতেও সে ভায়া হয়ে সম্পৃক্ত ছিলো। ১৭৯৫ সালে নবাব মুহাম্মদ আলী টিপুর শাহাদাতের মাত্র চার বছর পূর্বে ইনতিকাল করে। আসলে তাকে ইংরেজরা মহিসুরের রাজত্বের লোভ দেখিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে নিজেদের সঙ্গী

www.boimate.com

করে নিতে সমর্থ হয়। ইংরেজদের চিরদিনের অভ্যাস হলো, তারা স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে পুরনো মিত্রদের বেমালুম ভুলে যায়। তারক্ষেত্রেও ইংরেজদের সেই পলিসির ব্যত্যয় ঘটেনি। যেই রাজনৈতিক দূরাভিলাষের জন্যে, ক্ষমতার যেই আকাশ কুসুম ফানুসের জন্যে এই মুহাম্মদ আলী তার স্বধর্মের মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে শরিক হয়ে ইসলামবৈরী শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলো, তার সেই স্বপ্ন চিরদিনের জন্যে অধরাই থেকে যায়।

www.boimate.com

তৃতীয় অধ্যায়

মহিসুর ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক অবস্থান

www.boimate.com

মহিসুরের নামকরণ

ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের গবেষণামতে মহিসুরের পুরাতন নাম 'মহেশ কনুরু'। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। মহেশ শব্দের অর্থ, মহিষ। আর কনুরু শব্দের অর্থ নগরী।[১৭] তাহলে সংস্কৃত ভাষা অনুসারে শব্দটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে মহিষের নগরী। এ নামটি কীভাবে পড়লো? নামকরণের কারণ কী? এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত কথা বলার সুযোগ নেই। কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত হল, এখানে প্রচুর পরিমাণে মহিষ পাওয়া যেতো। যার কারণে শহরটির নাম হয়ে যায় মহেশ কনুরু তথা মহিষের শহর। সে শব্দটিই কালক্রমে বিকৃত হয়ে মহিসুরে পরিণত হয়। স্মর্তব্য যে, মহিসুরের আশপাশে যেই নাওয়ায়েত সম্প্রদায় বসবাস করতো তাদের ভাষাতেও মহেশ শব্দের অর্থ মহিষ। কিন্তু এগুলো সম্ভাবনা মাত্র। দলীল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে এগুলোকে গবেষণাপ্রসূত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলা মুশকিল; তবে এতোটুকু যথার্থ যে, মহিসুরের পুরাতন নাম 'মহেশ কনুরু'-ই ছিল।

মহিসুরের বর্তমান অবস্থান

বর্তমান সময়ে ভারতের বুকে কোনো প্রদেশের নাম মহিসুর নয়। বরং এটি একটি নগরী বা জেলাশহরের নাম মাত্র। ১৯৭৩ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বর্তমান প্রদেশ 'কর্নাটক' রাজ্যের নাম 'মহিসুর'-ই ছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৫৩ সালে যখন ভাষার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের নতুন নামকরণের কার্যক্রম সূচিত হয় তখন যারা কানড়ি ভাষায় কথা বলেন তাদের এলাকাগুলোকে একত্র করে পুরো অঞ্চলটিকে 'মহিসুর' নাম দিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হয়। সেই প্রদেশের মাঝে বর্তমান সময়ের প্রদেশ মুম্বাই (মহারাষ্ট্র) এবং হায়দারাবাদ (আন্ধ্রাপ্রদেশ)-এর কিছু কানড়ি ভাষাভাষী লোকদের এলাকাও চলে এসেছিলো। এভাবে আজ যখন ভৌগলিক বুনিয়াদের ভিত্তিতে 'মহিসুর প্রদেশ' বলা হয় তখন তদ্বারা বর্তমানের এই কর্নাটক প্রদেশই উদ্দেশ্য হয়। যার আয়তন ১,৯১,৭৯১ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। প্রদেশটির

---

[১৭]. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম। খণ্ড : ২১।

www.boimate.com

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের একটি কোণ অবস্থিত। প্রদেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১১%। সংখ্যায় ৫০ লক্ষাধিক।

প্রদেশটির সীমারেখা হলো, উত্তরে মহারাষ্ট্র প্রদেশ ও গোয়া। দক্ষিণে কেরালা ও তামিলনাড়ু প্রদেশ। পূবে আন্ধ্রাপ্রদেশ। প্রদেশটির পশ্চিম প্রান্ত মিলেছে আরব সাগরের পূব উপকূলের সঙ্গে। ২০ টি জেলা নিয়ে গঠিত এই প্রদেশটিকে বর্তমান ভারতের অন্যতম উন্নয়নশীল ও সচ্ছল প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। জনসংখ্যার ৫৫% জনগণ শিক্ষিত। যাদের অধিকাংশই কানড়ি ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মুসলমানদের মাতৃভাষা শহুরে এলাকাগুলোতে উরদূ এবং গ্রামাঞ্চলে কানড়ি ভাষা। এখানকার মুসলমানগণ দেশের অন্য প্রদেশগুলোর মুসলমানদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও শিক্ষিত।

কর্নাটকের রাজধানী ব্যাঙ্গালুরুকে দেশের অন্যতম সুন্দর শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। এটিকে ফুলের শহরও বলা হয়। জনসংখ্যা ও আয়তনের হিসেবে প্রদেশটিকে ভারতের মোট ২৫ টি প্রদেশের মধ্যে ১৮ নম্বর স্থানে গণ্য করা হয়। অবশ্য বর্তমান ভৌগলিক পরিভাষায় মহিসুর স্রেফ একটি জেলাশহরের নাম মাত্র। যা আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সরল রেখার উপরে ও বিষুব রেখার নিচে ১২ ডিগ্রি প্রস্থ ও ৭৬ ডিগ্রি দৈর্ঘ্যে অবস্থিত।

মহিসুর জেলার আয়তন ১১৯৫৪ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। যার সীমানা কর্নাটকেরই অন্য দু'টি জেলা মিণ্ডিয়া ও ব্যাঙ্গালুরুর সঙ্গে মিলেছে।

মহিসুর নগরীকে দেশের অন্যতম ঐতিহাসিক ও সুন্দর জেলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে মুসলমানদের জনসংখ্যা ২৫%। যার কারণে এই শহরটি দেশের ওই ৩৯ টি শহরের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে যেই শহরগুলোর মোট জনসংখ্যার ২৫% মুসলমান।[১৮] সুন্দর পরিবেশ, ভারসাম্যপূর্ণ আবহাওয়া ও ঐতিহাসিক স্থান হওয়ার কারণে শহরটি এ অঞ্চলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসের পাতায় মহিসুরের অবস্থান

ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিগ্রন্থের বরাতে যদ্দূর জানা যায় তা হলো, মহিসুর ভূখণ্ডটি প্রাচীনকাল থেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো। হিন্দুদের

---

[১৮]. Monorma Year Book 1993

www.boimate.com

ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ইত্যাদিতে ভূখণ্ডটির আলোচনা পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভুল প্রথা সংশোধন করার জন্যে যখন খোদ এক হিন্দু ধর্ম প্রচারক গৌতম বুদ্ধ শ্লোগান তোলেন তখন হিন্দুদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে গৌতম বুদ্ধের তাবৎ সংস্কার ও শুদ্ধিচারিতা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক হয়ে একটি পৃথক ধর্মের আকার ধারণ করে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। তার ধর্মীয় সকল কর্মকাণ্ড উত্তর ভারতেই সীমিত থেকেছে। কিছু দিন পর সেই ধর্মের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অশোকা ও চন্দ্রগুপ্তের যুগে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ দিকে মহিসুরে আগমন করে। ইতিহাসের সেই সময়টিতে মহিসুরের নাম ছিলো মহেশ কনুরু। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে অঞ্চলটিকে অনেকগুলো বংশ শাসন করেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে সর্বপ্রথম যেই বংশের শাসনের কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় তারা হলো হিন্দুদের মুরিয়া বংশ।

মুফতী শওকত আলী ফাহমীর বক্তব্যানুসারে এ অঞ্চলের ওপর মুসলমানদের সর্বপ্রথম আক্রমণ হয় সুলতান আলাউদ্দীন খালজীর যুগে। ১৩১০ ঈসাব্দে।[১৯] দাক্ষিণাত্যের ঐতিহাসিক নগরী মাধুরার সিংহাসন নিয়ে যখন বীরপান্ডে ও সুন্দরপান্ডের মাঝে যুদ্ধ হয় তখন সুন্দরপান্ডে সামরিক সহায়তা চেয়ে সুলতান খালজীর দ্বারস্থ হয়। তার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি নিজের নওমুসলিম গোলাম মালিক কাফুরকে সৈন্য সহকারে প্রেরণ করেন। ওই যুদ্ধে বীরপান্ডে ও তার মিত্র রাজা মায়সুর বালালাসুম পরাজিত হয়। প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার ভাষ্যমতে ওই সময় বীরপাণ্ডের অধীনে এক লক্ষ সৈন্য ছিলো।[২০] ওই সময় পর্যন্ত মহিসুরের শাসক ছিলো রাজা বালালাসুম। ইতিহাসের পাতায় তাদের শাসনকাল 'সালা শাসন' নামে অভিহিত। কৃষ্ণা নদী (Krishna River) থেকে মালাবার পর্যন্ত এবং আ ব সাগরের উপকূল থেকে কারুমন্ডল পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল।[২১]

এভাবে এলাকাটি আলাউদ্দীন খালজীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এরপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে অল্প কয়েক বছর পরেই দ্বিতীয় আক্রমণটি আসে

---

১৯. মুকাম্মাল তারিখে ইসলাম। লেখক, মুফতী শওকত আলী ফাহমী

২০. ইবনে বতুতার সফরনামা

২১. আরব ও দিয়ারে হিন্দ

www.boimate.com

মুহাম্মদ ইবনে তুঘলকের শাসনামলে। তিনি তখন তার প্রাশাসনিক রাজধানী দিল্লী থেকে দাকানের এলাকা 'দেওগিড়ি' (দৌলতাবাদ)-এ স্থানান্তর করেন।

মহিসুরে ইসলামের আগমন

এ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম আরব বণিকদের মাধ্যমে পৌঁছে। আরব বণিকরা হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হিজায ও ইয়ামান থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় কেরালা, মঙ্গলোর, ভাটকাল ও হোনাওয়ার-এ যাতায়াত করতেন। সেখান থেকে দেশের অভ্যন্তরে মহিসুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল সহ গোটা দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়েন। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইসলামের আলো ফোটার আগ থেকেই ছিলো। কিন্তু হিজাযের পুণ্যভূমিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর তারা পূর্বের মতো স্রেফ বণিক হয়ে থাকেননি। বণিকের পাশাপাশি তারা ইসলাম প্রচারকের দায়িত্বও সুচারুরূপে পালন করেছেন।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ ইবনে তুঘলক যখন দাকানে অবস্থান করতেন ওই সময়টিতে যখন উত্তরাঞ্চলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি দিল্লী ফিরে যান। সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে মহিসুরের পরাজিত শাসক রাজা বালালাসুম তৎকালীন হিন্দুদের প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতা জগতগুরু শঙ্কর আচার্য মহাদেবের সহায়তায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত হিন্দুদেরকে সংঘবদ্ধ করে তোলে। দাক্ষিণাত্যের 'তুঙ্গবদ্রা' নদীর দক্ষিণে বিজয়নগর-এ একটি সংঘবদ্ধ হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। রাজা হরিহর নামে একব্যক্তি ছিলো মুহাম্মদ ইবনে তুঘলকের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। যাকে তিনি বালারী এলাকার গভর্নরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাকে এই নতুন হিন্দুরাষ্ট্রের প্রথম শাসক নিযুক্ত করা হয়। এই ঘটনাগুলো ১৩৩৬ ঈসাব্দের আগে-পরে ঘটে।

এরপর কয়েক বছর পর্যন্ত হিন্দুরা নিজেদেরকে সবধরনের যুদ্ধ ও কলহ থেকে বাঁচিয়ে ধর্মীয় বুনিয়াদ পোক্ত করার ওপর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে। তাদের সকল প্রয়াস বিজয়নগরের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত এই হিন্দুরাষ্ট্রের বুনিয়াদ মজবুত ও সুশৃঙ্খল করার ওপর নিবদ্ধ ছিলো। আশপাশের

www.boimate.com

সবগুলা ছোট-বড় হিন্দু রাষ্ট্র বিজয়নগরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তবে বালারী ও কাডাপ্পা (Kadapa)-এর দু'জন সর্দার ছিলো এদের ব্যতিক্রম। তারা রাজা হরিহরের বশ্যতা অস্বীকার করে।[২২]

১৩৪৬ ঈসাব্দে যখন রাজা হরিহর মারা যায় ততোদিনে বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্যের আয়তন তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) নদী থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। ঠিক সে যুগেই আরব সাগরের পূব উপকূলে হোনাওয়ার ও ভাটকালের মধ্যবর্তী এক এলাকায় খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত 'নাওয়ায়েত' মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সিন্ধুর পর এ ধরনের দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র। প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তার সফরনামায় লেখেছেন যে, তিনি যখন এ এলাকায় পৌঁছেন তখন এখানকার সম্রাট জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ছিল নামকাওয়াস্তে সম্রাট। সে তখন বিজয়নগরের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলো। এখানকার লোকেরা অভ্যাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, নৈতিকতা, দ্বীনচর্চা ও অতিথিপরায়ণতার ক্ষেত্রে নিজ পিতৃপুরুষ আরবদের অনুরূপ ছিল।[২৩]

মাওলানা আবু যাফর নদভী সাহেব তার লেখা 'মুখতাসার তারীখে হিন্দ' গ্রন্থে সেই আরবরাষ্ট্রের কথা বিশদাকারে উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেছেন, 'ওই সময় সুলতান জামালুদ্দীনের অধীনে একটি মজবুত নৌ যুদ্ধ জাহাজ ছাড়াও ছয় হাজার সৈন্যের সেনাবাহিনী ছিলো'।

যে যুগে ভারতের দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর এলাকায় হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে উঠছিলো ওই সময় দিল্লী ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো বাহমানী পরিবার শাসন করতো।

রাজা হরিহরের মৃত্যুর পর তার ভাই 'বুকারিয়া' রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের বাহমানী সালতানাত ও হিন্দুদের বিজয়নগরের হিন্দুরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী এলাকা ওয়ারাঙ্গালে রাজা নায়েকদেবের একটি ছোট্ট স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিলো। কিন্তু মুহাম্মদ শাহ তার ওপর আক্রমণ করে ওয়ারাঙ্গাল নগরীকে গোয়ালকান্ডা কেল্লা সহকারে নিজের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যার ফলে বিজয় নগর ও বাহমানী সালতানাতের দু' সীমান্ত পরস্পরে মিলে যায়। শক্তি-সামর্থের বিবেচনায় এ দু'টি রাষ্ট্র একে অপরের সমকক্ষ ছিলো।

---

২২. দাকান কে বাহমী সালাতীন = হারুন খান শেরওয়ানী

২৩. ইবনে বতুতার সফরনামা

www.boimate.com

১৩৬৫ সালে রাজা বুকারিয়া বাহমানী মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় ওয়ারাঙ্গালের ওপর আক্রমণ করে সেখানকার হাজার হাজার মুসলমানকে নির্বিচারে গণহত্যা করে এবং বাহমানী সালতানাতের অন্যান্য সীমান্ত এলাকা দখল করার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। তখন মুহাম্মদ শাহ তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে নদী পার হয়ে বিজয়নগর অবরোধ করে। ওই সময় সে হাজার হাজার হিন্দু—যাদের মাঝে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণই ছিলো দশ হাজারেরও অধিক— তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে রাজা বুকারিয়াকে তার সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য করে। কিন্তু রাজা বুকারিয়া কয়েক বছরের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্র যথা মদুরা ও মালাবারের সালতানাতের ওপর আক্রমণ করে সেগুলোকেও বিজয়নগরের হিন্দুরাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসে। যার ফলে হিন্দু রাষ্ট্রের সীমানা দক্ষিণে রাশকুমারী নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।

১৩৭৯ সালে রাজা বুকারিয়া মারা যায়। তখন রাজা হরিহর দ্বিতীয় রাজসিংহাসনে আরোহণ করে। সে ১৪০৪ ঈ. পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করে। তার শাসনামলে বাহমানী সম্রাট ফিরোজশাহের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যার ফলে মুসলমানরা রাইচপুর দখল করতে সমর্থ হয়। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, বিজয়নগর সম্রাট ও বাহমানী সম্রাটরা আগামীতে পারস্পরিক সংঘাত ও রক্তক্ষয় থেকে বাঁচার জন্যে একটি পথ বের করে। ফিরোজ শাহ বিজয়নগরের তৎকালীন সম্রাট প্রথম দেবরায়ের কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু দেখা যায়, তাদের সেই বিয়ে এদু'টি রাজ্যের জন্যে রক্তক্ষয় এড়ানোর ক্ষেত্রে সফলতার মুখ দেখেনি। ১৪২৫ ঈ. থেকে ১৪৪৬ ঈ. পর্যন্ত রাজা দেবরায় দ্বিতীয়, ১৪৪৬ ঈ. থেকে ১৪৬৭ ঈ. পর্যন্ত রাজা অর্জুন বিজয় রায় এবং ১৪৬৭ ঈ. থেকে ১৪৭৯ পর্যন্ত তার চাচা বীর অক্ষয় পালাক্রমে বিজয়নগর শাসন করেন।

শেষোক্ত রাজার শাসনামলে এই বিশাল হিন্দুরাজ্যের ঐক্যের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। বিজয়নগরের অধীনস্থ কুঞ্জীওয়ারাম, মদুরায় ও মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকরা অভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা ও শাসনতান্ত্রিক অরাজকতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষণা করে। 'তারীখে জুনুবিয়ে হিন্দ' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে 'আরব ও দিয়ারে হিন্দ' গ্রন্থের সংকলক লেখেন যে, 'বীর অক্ষয়ের শাসনামলেই সহস্র মুসলিম আরব ব্যবসায়ীকে ভাটকাল নগরীতে গণহত্যা করা হয়। যারা এখান থেকে কোনোমতে পালিয়ে বেরিয়ে আসেন তারা আশ্রয় নেন

www.boimate.com

গোয়াতে। কিন্তু হানাদার হিন্দুরা সেখানেও তাদের অবরোধ করে। ওই সময় বাহমানী সাম্রাজ্যের উযির মাহমুদ গুলবার্গা (Gulbarga) নগরীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে গোয়ার ওপর আক্রমণ করে সেখানকার নিরীহ মুসলমানদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেন।

বীর অক্ষয়ের অযোগ্যতার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে সাম্রাজ্যের শাসকবর্গ পরস্পরে পরামর্শ করে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তদস্থলে অন্য পরিবারের সন্তান, কুনুয জেলার গভর্নর 'নরসিমা'-কে সিংহাসনে সমাসীন করে। এভাবে ১৪৮৬ সালে হিন্দু রাষ্ট্রটির দেড়শো বছরের শাসক পরিবার 'সিঙ্গমা' পরিবার থেকে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা হিন্দুদের 'তেলেঙ্গা' পরিবারের হাতে চলে যায়। কিন্তু খুব দ্রুতই ১৪৯৯ সালে তৃতীয় আরেকটি হিন্দু পরিবার 'তিলোদা' রাজক্ষমতা পুনরায় দখল করে নিয়ে 'নিরসা নায়েক'-কে ক্ষমতাসীন করে। ভূতপূর্ব শাসক 'নরসিমা'-কে খাদ্যে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছিলো।

ইতিহাসের ঠিক এ সময়টাতেই বাহমানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। দুর্বল শাসনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেজাপুরে 'আদেল শাহী', বেদারে 'বারীদ শাহী' ও আহমদনগরে 'নিযাম শাহী' নামে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। ১৫২৫ সালে গোয়ালকান্ডা নগরীতেও একটি স্বাধীন রাজ্য 'কুতুবশাহী' প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বিজয়নগরের আশপাশে যতোগুলো স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটেছে, তন্মধ্যে বেজাপুরের 'আদেলশাহী'-ই ছিলো সবচেয়ে মজবুত রাজ্য। যার নিয়ন্ত্রণে ছিলো রাইচপুর কেল্লা এবং কৃষ্ণানদী (KrishnaRiver) ও তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) নদীর মধ্যবর্তী দু'জলা ভূমি। যার কারণে এই রাজ্যটিকেই স্বাভাবিকভাবে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাষ্ট্র নিজেদের জন্যে সবচেয়ে বড় বিপদজনক মনে করতো।

দুর্ভাগ্যক্রমে ওই সময় মুসলিম রাজ্যগুলোর পরস্পরেও সুসম্পর্ক ছিলো না। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বৈরীতাকে কাজে লাগিয়ে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণা দেওরিয়া ১৫২০ সালে গোয়া নগরীতে অবস্থিত পর্তুগিজ সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ৭ লক্ষ ফৌজ সহকারে বেজাপুর সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এভাবেই সর্বপ্রথম পর্তুগিজরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রাইচপুর কেল্লাটি যদিও এতোদিন বিজাপুর (Bijapur) রাজ্যের করদ রাজ্য ছিলো; কিন্তু

www.boimate.com

সেই যুদ্ধে বিজয়নগর তা দখল করে ব্যাপকাকারে মুসলমানদের হত্যা করে। শুধু তাই নয়; কেল্লা দখল করার পর ইতোপূর্বে মালাবার, মাদুরা সহ যতোগুলো ছোট ছোট মুসলিম রাষ্ট্র ছিলো, কৃষ্ণা দেওরিয়া সেগুলোর ওপরও বলপ্রয়োগ করে বিজয়নগরের রাষ্ট্রের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করে।[২৪]

রাজা কৃষ্ণ দেওরিয়ার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত কে হবে— তা নিয়ে তুমুল বিবাদ দেখা দেয়। যার ফলে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ১৫৩০ সালে দ্বিতীয়বারের মতো রাইচপুর কেল্লা দখল করে নেয়। ১৫৫১ সালে বিজয়নগরের তৎকালীন রাজা 'রামরাজ' দাকান (Decan)-এর তিনটি মুসলিম রাজ্য— আহমদনগর, বেজাপুর ও গোয়ালকান্ডার পরস্পরে বিবাদ বাঁধিয়ে নিজেই বেজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বেজাপুরের সম্রাট ইবরাহীম আদেল শাহ বাধ্য হয়ে নিজের পরাজয় স্বীকার করে সন্ধি করে নেয়। ১৫৫৮ সালে বিজয়নগর হিন্দুরাষ্ট্রটি আহমদনগরের মুসলিম রাষ্ট্রটিকেও দখল করে নেয়। এটাই হিন্দুরাষ্ট্রটির ইতিহাসে সর্বোন্নতির সোনালি যুগ। 'আরব ও দিয়ারে হিন্দ' বইয়ের সংকলক লেখেন, ওই সময় রামরাজই ছিলো দাক্ষিণাত্যের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক সম্রাট। যার ভয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর রাজারা পর্যন্ত সন্ত্রস্থ থাকতো।

বিজয়নগর হিন্দুরাষ্ট্রের পতন

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাসে রাজা রামরাজই ছিলো সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক ও অত্যাচারী শাসক। ইসলামের প্রতি তার স্বভাবজাত বৈরীতা প্রকাশের কোনো সুযোগই সে হাতছাড়া করতো না। একটুখানি সুযোগ পেলেই সে তার শক্তিমত্তার ঔদ্ধত্বে উন্মাদ হয়ে মুসলমানদের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ করে কিছু না কিছু অংশ নিজের শাসনাধীন রাজ্যে যুক্ত করে ফেলতো। মুসলমানদের প্রতি তার অত্যাচারের মাত্রা প্রতিদিন বেড়েই চলতো।

যখন তার এই অমানুষিক অত্যাচার মুসলমানদের ধৈর্যের বাইরে চলে যায় এবং এর ওপর তাদের সংযম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দাকানের মুসলমানদের সামনে আত্মরক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি হয়। তৎকালীন মুসলিম শাসকবর্গ এ কথা বুঝতে সক্ষম হন যে, যদি এ

---

[২৪]. আরব ও দিয়ারে হিন্দ।

www.boimate.com

ধরনের চিত্র আর কিছু দিন অব্যাহত থাকে তাহলে বিষয়টি স্রেফ তাদের রাজ্যগুলোর জয়-পরাজয়ের মাঝে সীমিত থাকবে না; বরং সেটি মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণেই আশপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শাসকবর্গ ঐক্যের প্লাটফর্ম গড়ে তোলেন। তারা রামরাজকে প্রতিহত করার শপথে বলিয়ান হয়ে ওঠেন।

কৃষ্ণা নদী (Krishna River) থেকে ২৫ মাইল উত্তরে 'তালিকোট' ময়দানে ১৫৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে একটি তুমুল সংঘর্ষপূর্ণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওই যুদ্ধেই দাক্ষিণাত্যের সবচেয়ে বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরের পতন নিশ্চিত হয়। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেজ থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, ওই যুদ্ধে মুসলমানদের আড়াই লক্ষ সৈন্যের বিপরীতে হিন্দুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো প্রায় পাঁচ লক্ষ।[২৫] উপরন্তু তাদের সৈন্যদলের মাঝে দুই হাজার হাতি ও এক হাজার তোপও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। যুদ্ধে রাজা রামরাজকে হত্যা করে তার কর্তিত মুণ্ডু বর্শার মাথায় গেথে গোটা মুসলিম শিবিরে প্রদক্ষিণ করা হয়। ওই যুদ্ধে নিদেনপক্ষে এক লক্ষ হিন্দু সিপাহি মারা পড়ে। প্রচুর ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। বিজয়নগরে হিন্দু সৈন্যদলের পরাজয়ের সংবাদ শুনে আশপাশের স্থানীয় গোত্রগুলোও শহরে প্রবেশ করে ব্যাপক লুটতরাজ করে। যুদ্ধের কয়েক দিন পর বিজয়ী মুসলিম বাহিনী বিজয়নগরে প্রবেশ করে। এভাবে দাক্ষিণাত্যের একটি সুন্দর-স্বচ্ছল নগরী চোখের পলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের শক্তি চিরকালের জন্যে ভেঙ্গে পড়ে। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলের মুসলিম শাসকবর্গের সামনে দক্ষিণ ভারতে আক্রমণ ও দখলের ফটক খুলে যায়।

বিজয়নগরের পতনের পর মহিসুরের অবস্থা

স্রেফ হিন্দুরাজ্য দখল করাই মুসলমানদের লক্ষ্য ছিলো না; বরং রামরাজ্যের অহঙ্কার ধুলোধুসরিত করে তার শক্তি চিরদিনের জন্যে নিঃশেষ করারও উদ্দেশ্য ছিলো। তাদের সেই উদ্দেশ্য শতভাগ পূর্ণ হয়। যুদ্ধের পর মুসলিম রাজন্যবর্গ ছয় মাস বিজয়নগরে অবস্থান করেন। এসময় তারা মুসলমানদের ছিনিয়ে নেওয়া এলাকাগুলো ফেরত দিয়ে সেগুলোকে পূর্বের রাজ্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেন। যার ফলে বিজয়নগর

[২৫]. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম

www.boimate.com

রাজ্যের অবশিষ্ট পুরো ভূখণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে পূর্বের মতো বিভিন্ন ছোট ছোট হিন্দু রাজা ও সামন্তদের অধীনে চলে যায়।

মহিসুর ভূখণ্ড দ্বিতীয়বারের মতো কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার (Krishnaraja Wodeyar) পরিবারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মহিসুর রাজ্যের ওপর এ পরিবারের শাসন সর্বপ্রথম ১৩৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বিজয়নগরের পতনের ফলে ১৬৭৭ সালে দ্বিতীয়বারের মতো পরিবারের সপ্তম প্রজন্ম রাজা রাজ ভিড়ইয়ারের হাতে মহিসুরের শাসনক্ষমতা ফিরে আসে। এ পরিবারটি ১৬১৬ সাল পর্যন্ত শাসনক্ষমতা ধরে রাখতে সমর্থ হয়। পরিবারটির শাসন শুধু মহিসুর ও তৎসংলগ্ন মফস্বল পর্যন্ত সীমিত ছিলো। হিন্দুরাষ্ট্র বিজয়নগর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যগুলোর মতো এটিও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গ্রাসে পরিণত হয়েছিলো। বিজয়নগর পতনের পর তারা যখন পরিবারটির হাতে দ্বিতীয়বারের মতো শাসনক্ষমতা চলে আসে তখন ১৬০৯ সালে রাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার (Krishnaraja Wodeyar) ঈসায়ি নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত নগরী শ্রীরঙ্গাপত্তনামকে তার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন।[২৬] ওই যুগে এই রাজ্য বিজাপুর রাষ্ট্রকে কর প্রদান করতো। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন ১৬৮৬ সালে বিজাপুরের ওপর এবং ১৬৮৭ সালে গোয়ালকান্ডার দখল করেন তখন তিনি দাক্ষিণাত্যের তার অন্যান্য বিজিত এলাকাগুলোকে একীভূত করে একটি প্রদেশ বানিয়ে ব্যাঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত সিরা (Sira) নগরীকে প্রধান প্রাশাসনিক নগরীর মর্যাদা দান করেন। যেহেতু মহিসুর নগরী ছিলো বিজাপুরের অধীনে, যার ফলে বিজাপুরের ওপর আওরঙ্গজেবের নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে মহিসুরও তার অধীনে চলে আসে। অন্যভাবে বললে, মহিসুরের হিন্দু শাসক কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার (Krishnaraja Wodeyar) পরিবারও একান্ত সীমিত শাসনক্ষমতা বজায় রেখেই কার্যত মোঘল সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

সালতানাতে খোদাদাদের প্রতিষ্ঠাকালে মহিসুরের অবস্থা

মহিসুরের সেই কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার (Krishnaraja Wodeyar) পরিবারে নবাব হায়দার আলী সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে

---

[২৬]. সাওয়ানেহে হায়দার আলী। লেখক, আমজাদ আলী আশহুরী

www.boimate.com

কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তার হাতেই দাক্ষিণাত্যে সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬১ সালে যখন নবাব হায়দার আলী শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন ওই সময় মহিসুরের রাজা ছিলেন কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার।[২৭] যিনি চর্মরাজের পর ১৭৩৬ সাল থেকে রাজত্ব পরিচালনা করে আসছিলেন।

ওই সময় মহিসুরের রাজ্যের অধীনে ছিলো আশপাশের ৩৩ টি গ্রাম। যা কার্যত মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে একটি করদ রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। রাজনৈতিকভাবে পরিবারটির শাসন ছিলে স্রেফ নামকাওয়াস্তে। প্রতিটি গ্রামের ওপর স্থানীয় জমিদারদের পৃথক পৃথক রাজত্ব ছিলো। তারা অর্থনৈতিকভাবে জনগণকে পুরোপুরি শোষণ করতো। গোটা সাম্রাজ্যের মাঝে স্রেফ শাসক পরিবারই সুখে-শান্তিতে থাকতো। তখন ছিলো দাসত্বের যুগ। হিন্দু নারীদের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে পৃথক বাজার বসতো। মন্দিরে মন্দিরে প্রকাশ্যে মানুষের বলিদানের নৃশংস কাজ চলতো। মহিলারা অর্ধনগ্ন হয়ে হাট-বাজারে ঘুরে বেড়াতো। অনৈতিকতা ও অশ্লীলতার ব্যপক সয়লাবের কারণে পরিবেশের চরম অবনতি ঘটেছিলো। একজন হিন্দু নারীকে একই সময়ে চারজন স্বামীর ঘর-দোর সামলাতে হতো। তাদের সঙ্গে সে পালাবদল করে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হতো। যার কারণে, প্রসূত সন্তানদের বংশলতিকা পিতার স্থলে মায়ের দিকেই সম্বন্ধিত হতো। নেশাজাতীয় দ্রব্যের রমরমা ব্যবসা চলতো।

ওই সময় যদিও বৃহৎ সংখ্যক মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে একই দেশে, একই রাষ্ট্রে বসবাস করতো; কিন্তু তারা তখন ছিলেন খাঁটি তাওহীদের শিক্ষা থেকে শত ক্রোশ দূরে। কুসংস্কার, বিদ'আত ও শিরকি কর্মকাণ্ডে তারা এতোটাই ডুবে ছিলেন যে, বাহ্যত তাদেরকে হিন্দুদের মতোই মনে হতো। একজন নবাগত বিদেশীর পক্ষে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানের মাঝে ফারাক করা দুস্কর হতো। মোটকথা, সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় মহিসুর রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত শোচনীয় ও অবর্ণনীয় বিপর্যস্ত ছিলো।

---

[২৭]. সাওয়ানেহে হায়দার আলী। লেখক, লিউন বী বুরঙ্গ

www.boimate.com

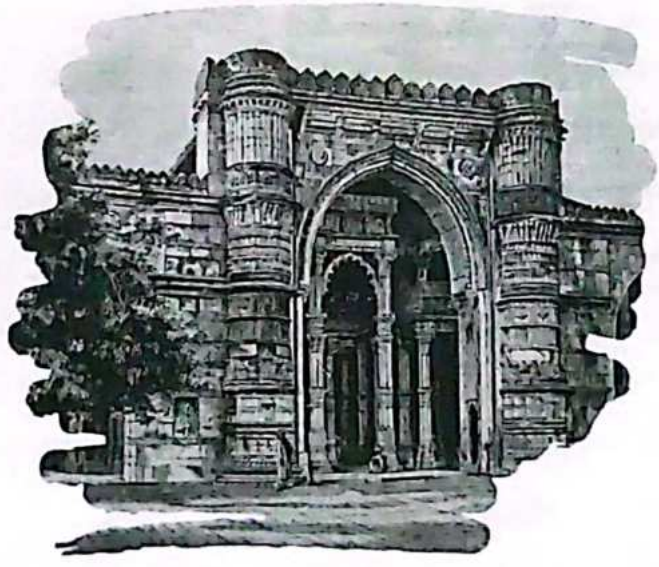

চতুর্থ অধ্যায়

সুলতান টিপু শহীদের পরিবার

www.boimate.com

টিপু পরিবারের পেছনের ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ কথা কেউ আগাম অনুমান করতে পারেনি যে, যেই হায়দার আলীর কর্মজীবন সূচিত হয়েছে মহিসুর রাজ্যের একজন সাধারণ সিপাহি হিসেবে, কালক্রমে তারই ছেলে টিপুর হাতে রাজ্যটির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আঞ্জাম পাবে। যেহেতু তার হাতে ইতিহাসের এমন অভূতপূর্ব কৃতিত্ব সম্পন্ন হওয়ার কথা ঘূর্ণাক্ষরেও কারো মনে আসেনি, এ কারণে ইতিহাসের পাতায় তাঁর পরিবারের পেছনের ইতিহাস ও বিশদ বিবরণ যথাযথভাবে সংরক্ষিত নেই।

খোদ ঐতিহাসিকগণের মাঝেই এ ব্যাপারে প্রবল বিতর্ক রয়েছে যে, টিপু আসলে কোন পরিবার বা গোত্রের সদস্য ছিলেন। অবশ্য এতোটুকু তথ্যের ওপর তারা সবাই প্রায় একমত যে, তার পরিবার আসলে মহিসুর বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আদি অধিবাসী ছিলেন না। সিকি শতাব্দী বা অর্ধশতাব্দী ধরে তারা এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছিলেন। ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের গবেষণা অনুসারে টিপু মূলত আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। কুরাইশ গোত্রের সন্তান ছিলেন। অন্যভাবে বলতে, তিনি ছিলেন নববী পরিবারের উত্তরসূরি। তবে ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিলিক্স-এর উদ্ধৃতিতে মাহমুদ ব্যাঙ্গলোরি লেখেছেন, তাঁর পিতা-মাতা পাঞ্জাবী ছিলেন। যার সূত্রে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তাকে পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত অভিহিত করেছেন।

বিষয়টি সম্পর্কে যতোগুলো ঐতিহাসিক বই-পুস্তক পড়েছি তার আলোকে আমার এ কথা বুঝে এসেছে যে, ঐতিহাসিকদের এই মতভেদ বাহ্যত কোনো বুনিয়াদি মতভেদ নয়। এতদসংশ্লিষ্ট সবগুলো বর্ণনা একত্র করার পর আমার চোখে সেগুলোর মাঝে কোনো মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়েনি। বিষয়টি সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আরও স্পষ্টাকারে পরিদৃষ্ট হবে।

www.boimate.com

টিপু পরিবারের ভারতবর্ষে আগমন

অধিকাংশ বিশুদ্ধ বর্ণনামতে, তার পরিবার মূলত আরব বদ্বীপের অধিবাসী ছিলো। মক্কা মুকাররমায় বসবাস করতো। ঈসায়ি ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে এ পরিবারটি মক্কা মুকাররমা থেকে জীবিকান্বেষণের তাগাদায় বেরিয়ে আসে। সর্বপ্রথম তারা বাগদাদ নগরীতে এসে থিতু হয়। সেখান থেকে ইরান হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছে কিছু কাল সেখানে অবস্থান করে। এরপর সেখান থেকে পাঞ্জাব চলে আসে। বেশ কিছু দিন সেখানে অবস্থানের পর দিল্লী ও আজমির শরীফ হয়ে তারা সর্বশেষ গুলবার্গা (Gulbarga) নগরীতে নিবাস পাতে। যেহেতু এ পরিবারটি বেশ কিছুকাল পাঞ্জাবে ছিলো, যার ফলে পরিবারটির জীবনাচারে পাঞ্জাবী সভ্যতা-সংস্কৃতির নানা প্রভাব পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে। পাঞ্জাবী সংস্কৃতির সেই বাহ্যিক প্রভাবের কারণেই কেউ কেউ তাদেরকে 'পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত' মনে করতো।

এ পরিবারটি যেহেতু স্থলপথে আফগানিস্তান থেকে পাঞ্জাব এসেছিলো, এ জন্যে স্থানীয় পাঞ্জাবী লোকেরা তাদেরকে 'আফগান বংশোদ্ভূত' হিসেবে পরিচয় দিতো। অথচ আসলে পরিবারটি এসেছে আরব বদ্বীপ থেকে।

মোটকথা, এ পরিবারটি ঈসায়ি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাষ্ট্র বিজয়নগরের পতনের পর মহিসুরের কাছাকাছি এলাকায় নিবাস পেতেছিলো। 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থের লেখক মীর হুসাইন আলী কিরমানী ও 'তারীখে টিপু সুলতান' গ্রন্থের লেখক মুহিব্বুল হাসান 'কারনামায়ে হায়দারী' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে এ প্রসঙ্গে যতোগুলো বর্ণনা নকল করেছেন সেগুলো থেকেও আমাদের এ কথার সমর্থন মেলে। যার বিশদ বিবরণ হলো, টিপুর পিতৃপুরুষদের একজনের নাম হাসান ইবনে ইয়াহইয়া (ইনতিকাল ১৪৬৯ হি.)। তিনি ছিলেন মক্কা নিবাসী কুরাইশ বংশোদ্ভূত। তাকে উসমানি খেলাফতের পক্ষ থেকে মক্কার 'শরীফ' মনোনীত করা হয়েছিলো। তাঁর ছেলে হলেন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান। তাঁর ছেলে আহমদ বিয়ে করেন সান'আ নগরীতে বসবাসরত তৎকালীন ইয়ামানের জনৈক রাজার কন্যাকে। যেহেতু ওই রাজার কোনো ছেলে সন্তান ছিলো না; এজন্যে তার মৃত্যুর পর জামাই হিসেবে তিনি ইয়ামানের শাসক মনোনীত হন। কিন্তু একপর্যায়ে তাঁর মন্ত্রী পরিষদ তাঁর সঙ্গে

www.boimate.com

প্রতারণা করে। তাকে খুব দ্রুত হত্যা করা হয়। তখন তার ছেলে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ পালিয়ে বাগদাদ চলে আসেন। সেখানে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। কিছু দিন পর তিনি সেখানকার 'তাহের আফেন্দী' নামের একব্যক্তির মেয়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাদের সংসার আলো করে তিন ছেলে সন্তান জন্ম নিয়েছিলো। যাদের একজনের নাম আবদুল গনী। তার ছেলে হাসান একসময় কিছু নিরূপায় কারণের চাপে বাধ্য হয়ে বাগদাদ থেকে দেশত্যাগ করে আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি হিন্দুস্তানের আজমীর শরীফে চলে আসেন। এখানে তিনি হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.-এর মাজারের তত্ত্বাবধায়কের মেয়েকে বিয়ে করেন। তারও ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন 'মুহাম্মদ বাহলুল' নামের এক সন্তান।

টিপুর পিতৃপুরুষ

বাহলুলের এক সন্তানের নাম 'ওলী মুহাম্মদ'। ১৬২৬ সালে তিনি বেজাপুরের আদেল শাহী পরিবারের শাসক মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের সন্তান সুলতান মুহাম্মদের শাসনামলে সেখান থেকে দেশত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন। সেখান থেকে ছেলে মুহাম্মদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে গুলবার্গা (Gulbarga) নগরীতে চলে এসে এখানেই নিবাস পাতেন।[২৮] এটি সেই সময়ের কথা, যখন বেজাপুর রাজ্যের উত্থানের যুগ চলছিলো। গোটা রাজ্যের জ্ঞানী-গুণীরা তখন বেজাপুরে চলে আসছিলেন। গুলবার্গের প্রসিদ্ধ দরগাহ হলো হযরত বান্দানাওয়াজের মাযার। যিনি *গেসুয়ে দরাজ* নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। সেই মাযারের একজন তত্ত্বাবধায়ক অথবা ঐতিহাসিক মুহিব্বুল হাসানের তথ্যমতে মাযারের একজন খাদেমের মেয়ের সঙ্গে ওলী মুহাম্মদ তাঁর ছেলে মুহাম্মদ আলীর বিয়ে দেন। এর কিছু দিন পর ওলী মুহাম্মদ ইনতিকাল করেন। তখন মুহাম্মদ আলী বেজাপুর চলে আসেন। ওই সময় সেখানে আদেল শাহীর শাসন চলছিলো। মুহাম্মদ আলী সহদোর সাত ভাইকে নিয়ে আদেল শাহীর সেনাবাহিনীতে সিপাহি হিসেবে যোগদান করেন। বেজাপুরের ওপর যখন মোঘলরা আক্রমণ করে তখন তার সাত ভাইয়ের প্রত্যেকেই শহীদ হন।

---

[২৮]. হায়দার আলী। লেখক, নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা

www.boimate.com

মনের দুঃখে মুহাম্মদ আলী চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে কোলার (Kolar) নগরীতে চলে আসেন। সেখানকার স্থানীয় গভর্নর শাহ মুহাম্মদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকেই সম্পর্ক ছিলো। যার ফলে তিনি তাকে তার সম্পত্তির নেগরানের পদে নিযুক্ত করেন। এর বাইরে চাষাবাদের জন্যে শাহ মুহাম্মদ তাকে কিছু জমি-জেরাতও দান করেন। অবসর সময়ে তিনি সেখানে কিছু চাষাবাদ করতেন। মাঝে-মধ্যে তিনি সেই জমিন অন্যদেরকে ভাড়া দিতেন। এক বর্ণনামতে ওই সময় মুহাম্মদ আলী কোলার (Kolar) নগরীর কোনো এক পরিবারের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান ফতেহ মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন সুলতান টিপুর আপন দাদা। এ বর্ণনার আলোকে প্রমাণিত হয়, টিপু সুলতানের দাদী কোলার (Kolar) নগরীর আদি অধিবাসী ছিলেন।

দাদা মুহাম্মদ ফত্হ

১৬৬৭ সালে মুহাম্মদ আলী চার সন্তান রেখে ইনতিকাল করেন। চার সন্তানের নাম যথাক্রমে ১. মুহাম্মদ ইমাম ২. মুহাম্মদ ইলয়াস ৩. আলী মুহাম্মদ ৪. ফাতহ মুহাম্মদ। পিতার ইনতিকালের পর এই চার ভাই জীবিকার অন্বেষণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চলে যান।

ফাতহ মুহাম্মদ কোলার (Kolar) নগরীতে কিছু কাল অবস্থান করার পর আরকাটের গভর্নর নবাব সা'আদাত উল্লাহর কাছে চলে আসেন। কিছু দিন সেখানকার কেল্লার যিম্মাদার ইবরাহীম খানের সুপারিশে তার অধীনে চাকুরি করেন। পরবর্তীকালে নবাব সাহেব তাকে তার হাতে সেনাবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্বভার অর্পণ করেন। ওই সৈন্যদলে ছিলো পাঁচ শ অশ্বারোহী, চার শ পদাতিক সৈন্য ও পঁচিশটি তোপ।

ওদিকে ফাতহ মুহাম্মদের বড় ভাই শায়খ মুহাম্মদ ইলয়াসের ছেলে হায়দার আলী সাহেব পূর্ব থেকে মহিসুরের রাজার অধীনে চাকুরি করতেন। তাকে যখন ভাতিজা হায়দার আলী উপর্যপুরী অনুরোধ করতে থাকে তখন তিনি আরকাটের নবাবের চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে মহিসুর রাজার সেনাবাহিনীর 'নায়েক' পদে যোগদান করেন। নায়েক হচ্ছে তৎকালীন মহিসুর সেনাবাহিনীর একটি সামরিক পদের নাম। ওই সময় মহিসুরের রাজার মন্ত্রীদের মাঝে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ততোদিনে

www.boimate.com

হায়দার আলী সাহেবও ইনতিকাল করেন। ইত্যকার নানা কারণে ফাতহ মুহাম্মদের মনে ভেঙ্গে গেলে তিনি পুনরায় কোলার (Kolar) নগরীতে ফিরে আসেন।[২৯]

কোলার (Kolar) নগরীতে দ্বিতীয়বারের মতো নিবাসকালে তার ঔরসে দু'জন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথমজনের নাম শাহবাজ। আর দ্বিতীয়জনের নাম ওলী মুহাম্মদ। দ্বিতীয়জন শৈশবেই ইনতিকাল করেন। যেহেতু কোলার (Kolar) নগরীতে ফাতহ মুহাম্মদের জীবিকার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা ছিলো না; এজন্যে জীবিকা উপার্জনের তাগিদে তাকে সিরা (Sira) প্রদেশে চলে আসতে হয়। ওই সময় এটি ছিলো 'দাকান' অঞ্চলে মোঘল সুলতান অধিভূক্ত এলাকাগুলোর প্রাদেশিক রাজধানী। তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন নবাব দরগাহ কুল্লি আলী। তিনি মুহাম্মদ ফাতহ-কে সাদরে বরণ করে নেন এবং ডোডা বালাপুরের মতো অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কেল্লার যিম্মাদারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ওই কেল্লায় তখন একশ অশ্বারোহী ও এক শ পদাতিক সৈন্য অবস্থান করতো। সিরা (Sira) প্রদেশে চাকুরিকালেই ১৭২২ সালে 'বুদীকোটাহ' স্থানে তাঁর একটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সন্তানের নাম রাখেন হায়দার আলী।

নবাব দরগাহ কুল্লী আলীর ইনতিকালের পর সিরা (Sira)-এর গভর্নর নির্বাচন নিয়ে প্রচণ্ড কলহ সৃষ্টি হয়। যদিও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রকৃত হকদার ছিলো তার ছেলে আবদুর রাসূল; কিন্তু 'যাহের খান' বলপ্রয়োগ করে তা জবরদখল করে। ফলে তাদের দু'জনের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যায়। ওই যুদ্ধে আবদুর রাসূল খানের সঙ্গে ফাতহ মুহাম্মদও মারা যান। ১৭২৮ সালে যাহের খান সিরা (Sira)-এর গভর্নরের সিংহাসনে আরোহণ করে।

ইতিহাসের এই মোড়টিতে এসে ঐতিহাসিকদের মাঝে দ্বিমত দেখা দিয়েছে যে, হায়দার আলী মুহাম্মদ ফাতহের কোন স্ত্রীর সন্তান? 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থের লেখক 'মীর হুসাইন আলী কিরমানী'-এর অভিমত হলো, মুহাম্মদ ফাতহ-এর একজন স্ত্রীই ছিলো। তাঁর তিন সন্তানই এক স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। যিনি তিনজাওয়ার নগরীর পীরযাদা সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীনের মেয়ে ছিলেন।[৩০]

---

[২৯]. তারীখে টিপু সুলতান। লেখক, মুহিব্বুল হাসান।

[৩০]. নিশানে হায়দারী। লেখক, মীর হুসাইন আলী কিরমানী।

www.boimate.com

কিন্তু ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের গবেষণা থেকে বুঝে আসে যে, মুহাম্মদ ফাতহের দু'জন স্ত্রী ছিলেন। একজন ছিলেন কোলার (Kolar) নগরীর আদি বাসী। যার গর্ভে প্রথম দু' ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী হলেন সিরা (Sira) প্রদেশের জমিদার আকবর আলী খানের কন্যা মাজেদা বেগম। যার গর্ভে হায়দার আলী নামের এক সন্তানই জন্মগ্রহণ করেছে।[৩১]

কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিক কর্নেল ভিলিক্স-এর উদ্ধৃতিতে মাহমুদ খান ব্যাঙ্গালুরী লেখেন, ফাতহ মুহাম্মদের তিন স্ত্রী ছিলো। একজন হলেন কুলারের বাসিন্দা। তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন। তার গর্ভে কোনো সন্তান হয়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রী হলেন 'নাওয়ায়েত' বংশোদ্ভূত। তাদের সঙ্গে ফাতহ মুহাম্মদের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস হলো, 'আহলে নাওয়ায়েত'-এর একটি পরিবার কুকন থেকে আরকাট যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে তাদের ওপর ডাকাতদল আক্রমণ করে সবাইকে হত্যা করে ফেলে। স্রেফ একজন মহিলা বেঁচে যান। যার সঙ্গে এক ছেলে ও দু মেয়ে ছিলো। তারা পরবর্তীকালে কোলার (Kolar) নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওই সময় ফাতহ মুহাম্মদ কুলারে বসবাস করতেন। তিনি ওই মহিলার বড় মেয়েকে বিয়ে করেন; কিন্তু বিয়ের অল্প কদিন পরেই সেই মেয়ে মারা যায়। তখন তিনি তার ছোট বোনকে বিয়ে করেন। এই সংসারেই শাহবায ও হায়দার আলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যেসকল ঐতিহাসিকদের মতে ফাতহ মুহাম্মদ সিরা (Sira)-এর জমিদার আকবর আলী খানের কন্যা মাজিদা বেগমকে বিয়ে করেছিলেন, তারা উপরিউক্ত বিয়ের বিবরণ এভাবে বলে থাকেন যে, আকবর আলী খান সিরা (Sira)-এর গভর্নর নবাব দরগাহ কুল্লী আলী খানের কাছে প্রচুর অর্থ ঋণ করেছিলেন। যা তিনি তার জীবদ্দশায় শোধ করতে পারেননি। তখন সিরা (Sira)-এর নবাব ফাতহ মুহাম্মদকে আকবর আলী খানের স্ত্রীর কাছে ঋণ উসুলের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করে। তার পক্ষে ওই ঋণ শোধ করার সামর্থ ছিলো না। এহেন প্রেক্ষাপটে ফাতহ মুহাম্মদ প্রস্তাব করেন যে, যদি তিনি তাকে তাকে মেয়ে জামাতা হিসেবে মেনে নেন তাহলে তিনি নিজের পক্ষ থেকে সেই ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করবেন। তার

---

৩১. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম

www.boimate.com

এই প্রস্তাবে আকবর আলী খানের স্ত্রী রাজি হন। এভাবে তিনি তার মেয়েকে বিয়ে করেন।[৩২]

ফাতহ মুহাম্মদ যখন ইনতিকাল করেন তখন তিনিও সিরা (Sira)-এর গভর্নরের কাছে ঋণী ছিলেন। মুহাম্মদ ফাতহের ইনতিকালের পর সিরা (Sira)-এর গভর্নরের ওয়ারিসরা তার বিধবা স্ত্রী ও ছেলে শাহবায ও হায়দার আলীকে পিতার ঋণ পরিশোধের জন্যে চাপ প্রয়োগ শুরু করে। ঋণের পরিমাণ তৎকালীন মুদ্রায় আঠারো হাজার রুপি। ঋণের বাহানায় তারা ওই বিধবা ও ইয়াতিমদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন ও শক্তিপ্রয়োগ করতো। ভাগ্যক্রমে ওই সময় হায়দার আলীর মামা ইবরাহীম সাহেব অথবা লেখক নরেন্দ্র কিষাণ সিনহার তথ্যমতে খোদ চাচাতো ভাই হায়দার সাহেব মহিসুর রাজার অধীনে চাকুরি করতেন।[৩৩] তার মাধ্যমে যখন এই পরিবারের ওপর সিরা (Sira)-এর গভর্নরের ওয়ারিসদের নির্যাতন-নিপীড়নের সংবাদ মহিসুরের রাজার কানে পৌঁছে তখন তিনি ওই পরিবারকে তাৎক্ষণিক ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ জানিয়ে সিরা (Sira)-এর গভর্নর বরাবর আদেশনামা পাঠিয়ে দেন। আদেশ অমান্য হলে কঠিন আচরণ করা হবে, মর্মে সতর্ক করে দেন।

রাজার আদেশ পেয়ে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ পরিবারটিকে ছেড়ে দেয়। সেখান থেকে তারা ব্যাঙ্গালুরু হয়ে মহিসুরের রাজধানী শ্রীরঙ্গাপত্তনামে পৌঁছেন। যেহেতু ততো দিনে শাহবায ও হায়দারী আলী যথেষ্ট তাগড়া হয়ে ওঠেছিলেন; এজন্যে মহিসুর রাজার অধীনে কর্মরত আত্মীয়-স্বজনের সুপারিশে তারা নিজেরাও মহিসুরের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

---

৩২. হামালাতে হায়দারী। সাওয়ানেহে হায়দারী আলী গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে।
৩৩. হায়দার আলী। লেখক, নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা

www.boimate.com

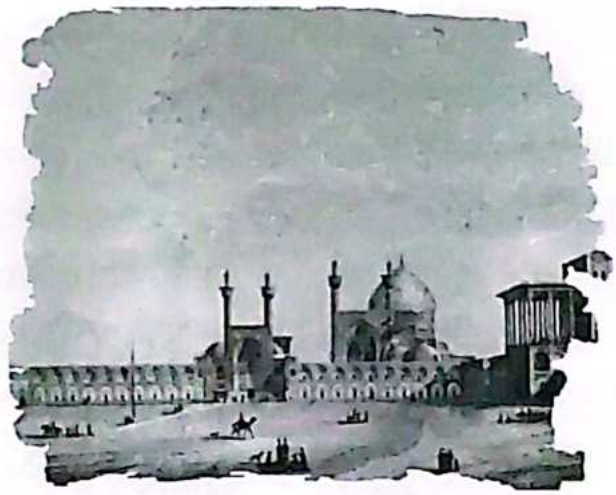

পঞ্চম অধ্যায়

হায়দার আলী

জন্মগ্রহণ থেকে সেনাপ্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত

www.boimate.com

জন্মগ্রহণ

যেমনটি পেছনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হায়দার আলী ১১৩৪ হিজরী মুতাবেক ১৭২২ ঈসাব্দে পিতা ফাতহ মুহাম্মদ যখন সিরা (Sira) প্রদেশে ডোডা বালাপুর কেল্লার তোপখানার দায়িত্ব পালন করতেন, সেই যুগে কোলার (Kolar) নগরীর নিকটবর্তী বোদীকোটাহ নামক গ্রামে অধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে সিরা (Sira)-এর জমিদার আকবার আলী খানের কন্যা মাজেদা বেগমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারীখে টিপু সুলতান গ্রন্থের লেখক মুহিব্বুল হাসান সাহেবের গবেষণা অনুসারে হায়দার আলীর জন্মসন ১১৩৩ হিজরি / ১৭২১ ঈসাব্দ। যদিও অপরাপর ঐতিহাসিকগণ ১১২৯ হিজরি / ১৭১৭ ঈসাব্দের কথা বলে থাকেন। কিন্তু সাধারণত অধিকাংশ কিতাবেই প্রথমোক্ত সনের তথ্য পাওয়া যায়।

আমজাদ আলী আশহুরী 'সাওয়ানেহে হায়দার আলী' গ্রন্থে 'হামালাতে হায়দারী' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে হায়দার আলী নামকরণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে লেখেন, 'ফাতহ মুহাম্মদ ছেলেদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তার ইচ্ছে ছিলো, তার আরও কিছু ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করুক। মাজেদা বেগম যখন গর্ভবতী ছিলেন তখন তিনি তাকে ওই যুগের বিখ্যাত বুযুর্গ হায়দার আলী শাহ দরবেশের খেদমতে প্রেরণ করেন এবং তার মাধ্যমে দুআ করান– যেন তার নেককার ও যোগ্য ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি বলেছিলেন, ইনশা-আল্লাহ, ছেলে সন্তানই হবে। জন্মগ্রহণের পর তার নাম আমার নামানুসারে হায়দার আলী-ই রাখবে'।[৩৪]

জন্মের পর ফাতহ মুহাম্মদ তার সেই নির্দেশনা প্রতিপালন করেন। সদ্যপ্রসূত সন্তানের নাম 'হায়দার আলী' রাখেন। পরবর্তীকালে এ সন্তান নবাব হায়দার আলী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

---

৩৪. সাওয়ানেহে হায়দার আলী

www.boimate.com

শৈশব

হায়দার আলীর জন্মের চার-পাঁচ বছর পর পর্যন্ত তার পরিবার অত্যন্ত সচ্ছল ছিলো। কারণ, ওই সময় ফাতহ মুহাম্মদ খান সিরা (Sira) প্রদেশে ডোডা বালাপুর কেল্লার তোপখানার দায়িত্ব পালন করতেন। ফাতহ মুহাম্মদ খানের ইনতিকালের পর পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে শুরু করে। তাদের পূর্বের শান্তিময় সচ্ছলতার স্থলে আকস্মিক দারিদ্রের কষাঘাত শুরু হয়ে যায়। জীবনে সংকীর্ণতা নেমে আসে। অন্যদিকে পিতা ফাতহ মুহাম্মদের ঋণ পরিশোধের জন্যে সিরা (Sira)-এর গভর্নরের ওয়ারিসরা ক্রমাগত চাপপ্রয়োগ করতে থাকে। এক পর্যায়ে নিরূপায় হয়ে পরিবারটি মহিসুরে চলে আসে। ওই সময় হায়দার আলীর বয়স ছিলো মাত্র ৬ বছর। বড় ভাই শাহবায তখন ১১ বছরের কিশোর। যার ফলে শৈশব থেকে এই দু' ভাই পিতার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিপালন থেকে বঞ্চিত হন। অন্যদিকে জন্মদাত্রী মা ছিলেন বিপর্যস্ত পরিস্থিতির শিকার। আর্থিক উপকরণ যতোটুকু ছিলো, তা না থাকারই নামান্তর। যার কারণে তিনি তার ছোট্ট এ দু'টি শিশুর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করতে পারেননি। অথচ ওই যুগে মুসলিম পরিবারে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিলো।

কোনো ব্যস্ততা না থাকার কারণে হায়দার আলী সিংহভাগ সময় বন-বাদাড়ে শিকার করে কাটাতেন। ঘোড়ায় চড়া ও সিপাহিগিরি করা ছিলো হায়দার আলীর প্রধান শখ। যার ফলে তিনি যদিও শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হায়দার আলী রণকৌশল ও সামরিক দক্ষতায় অত্যন্ত প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এভাবেই তাঁর জীবনের ১২ থেকে ১৩ টি বছর কেটে যায়। যদিও ততোক্ষণ পর্যন্ত পরিবারটির অর্থনৈতিক দৈন্যদশা কাটেনি।

চাকুরিতে যোগদান

নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা তাঁর 'হায়দার আলী' গ্রন্থে লেখেন, 'হায়দার আলীর ভাই শাহবায প্রথম জীবনে কর্নাটক অর্থাৎ আরকাটের নবাব মুহাম্মদ আলীর ছোট ভাই আবদুল ওয়াহাবের অধীনে সামরিক বাহিনীতে চাকুরি করেন। তিনি ছিলেন চিতোরের জাগীরদার। শাহবায আলীকে প্রথম

www.boimate.com

দিকে দু' শ অশ্বারোহীর একটি চৌকস সেনাদলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়। হায়দার আলী ওই সময় তার ভাইয়ের কাছে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[৩৫]

মহিসুরের তৎকালীন রাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার (Krishnaraja Wodeyar) নিজের মন্ত্রীবর্গের হাতে কাঠের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। রাজ্যের সকল কাজ নিষ্পন্ন হতো মন্ত্রীদের ইচ্ছেমাফিক। এক্ষেত্রে দু' জন মন্ত্রী ছিলেন মূলক্ষমতার অধিকারী। একজন রাজার জামাতা নন্দরাজ। অপরজন তার ভাই দেবরাজ। সে ছিলো সেনাপ্রধান। নন্দরাজ ছিলো শুল্ক ও অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান। নন্দরাজ শাহবাযকে মহিসুর সেনাবাহিনীর একটি চৌকস সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করেন। ওই দলে ৫০০ অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতিক সৈন্য ছিলো। হায়দার আলী যখন শ্রীরঙ্গাপত্তনামে চলে আসেন তখন তাকেও ফৌজের ছোট্ট একটি দলের কমান্ডারের পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৭৪৯ ঈসাব্দে যখন মহিসুর সেনাবাহিনী দেভানহাল্লী (Devanahalli) অবরোধ করে তখন সেই যুদ্ধে হায়দার আলী অসামান্য বীরত্ব ও সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলো। যা দেখে মুগ্ধ হয়ে নন্দরাজ তাকে পদোন্নতি দিয়ে 'খান' পদবিতে ভূষিত করে এবং দু'শ পদাতিক ও একশ অশ্বারোহী নিয়ে গঠিত একটি সেনাদলের কমান্ডারের পদে মনোনীত করে। এভাবে খুব দ্রুত হায়দার আলী তার প্রাকৃতিক মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে মহিসুর সেনাবাহিনীর মাঝে একটি নিজস্ব অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। রাজ্যের বিভিন্ন উযিরের মনেও সে তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়।

বৈবাহিক সম্পর্ক

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির মাঝে হায়দার আলীর বিয়ে-শাদী প্রসঙ্গে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। সাধারণত ঐতিহাসিকগণ তার দু'টি বিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম বিয়ে সম্পন্ন হয় সিরা (Sira) প্রদেশের শ্রদ্ধেয় পীরযাদা সাইয়্যেদ শাহবায শাহ মিয়ার এক কন্যার সঙ্গে। ওই সময়

---

৩৫. নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা রচিত 'হায়দার আলী'।

www.boimate.com

হায়দার আলীর বয়স ছিলো ১৯ বছর বা এর কাছাকাছি। ওই বিয়ের সকল ব্যয় মহিসুরের প্রতাপশালী উযির নন্দরাজ বহন করেন। ওই সংসার আলোকিত করে একটি মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু এই প্রথমা স্ত্রী পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে সাংসারিক কাজকর্ম সম্পন্ন করতে পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়েন। ১৭৯৯ সালে সালতানাতে খোদাদাদের পতনের সময় তিনি জীবিত ছিলেন। শাহী পরিবারকে যখন ইংরেজরা ভিল্লোরে দেশান্তর করে তখন তিনি সেখানে ১৮০৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ভিল্লোরেই তার মাযার অবস্থিত।

এই পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্ত্রীর উপর্যপুরি অনুরোধের প্রেক্ষিতে হায়দার আলী কাডাপ্পা (Kadapa)-এর গভর্নর মুঈনুদ্দীনের কন্যা ফাতেমা বেগমকে বিয়ে করেন। অন্দরমহলে তিনি 'ফখরুন্নিসা' উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হায়দার আলীর এই দ্বিতীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ২০ যিলহজ্ব ১১৬৩ হিজরী, মুতাবেক ২০ নভেম্বর ১৭৫০ ঈসাব্দ। ব্যাঙ্গালুরু থেকে উত্তর-পূব প্রান্তে দেউনহিলি নামে একটি থানাশহর রয়েছে। সেখানেই এই সংসারের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হায়দার আলী নিজ পিতা ফাতহ মুহাম্মদের নাম অনুসারে এ সন্তানেরও নাম রাখেন ফাতহ মুহাম্মদ। অন্যদিকে আরকাট নগরীতে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ টিপু মাস্তান ওলীর মাযার রয়েছে। যেহেতু ফাতেমা বেগম ওই বুযুর্গের মাযারে এসে এক সৌভাগ্যবান ছেলে সন্তান লাভের দুআ করেছিলেন, এজন্যে তিনি সন্তানের নাম রাখেন টিপু সুলতান। এই দ্বিতীয় নামটিই সর্বাধিক ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে তিনি এ নামেই সুখ্যাতি লাভ করেন। টিপু ছাড়াও এ সংসারে আরো ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিছু বর্ণনানুসারে হায়দার আলী তৃতীয় বিয়ে করেছেন। তিনি জমাদার মাহদী বেগের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এ সংসারেও আরেকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। যার নাম ছিলো করীম শাহ ওরফে সফদার শিকওয়াহ। এ সন্তানটি জন্মগতভাবেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছিলো।

'কারনামায়ে হায়দারী' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে দায়েরায়ে মা'আরিফে ইলমিয়্যাহ গ্রন্থের মাঝে এসেছে যে, হায়দার আলীর তৃতীয় আরেকটি সন্তান ছিলো। তার নাম ছিলো সফদার আলী খান। কিন্তু 'গাজিয়ে আযম' গ্রন্থের লেখক

www.boimate.com

শাহ আবুল হাসান আদীব গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সফদার আলী খান নামটি করীম শাহ-এরই দ্বিতীয় নাম।

কিছু কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, হায়দার আলী পরবর্তীকালে কাডাপ্পা (Kadapa)-এর নবাব আবদুল হাকীম খানের বোনকে বিয়ে করেছিলেন।

সামরিক বাহিনীতে পদোন্নতি

টিপু সুলতানের জন্মের পরপরই হায়দার আলীর ভাগ্যের তারকা জ্বলতে শুরু করে। পৃথিবী আলোকিত করে একটি ভাগ্যবান সন্তানের আগমন তার রাজনৈতিক ও সামরিক পদোন্নতির পথ খুলে দেয়। ১৭৫২ সালে আরকাটের নবাবের সিংহাসনে আরোহণ নিয়ে যখন নবাব মুহাম্মদ আলী ও চান্দা সাহেবের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায় তখন মুহাম্মদ আলীর পৃষ্ঠপোষক ছিলো ইংরেজ সৈন্যদল। চান্দা সাহেবের সমর্থনে এগিয়ে আসে ফরাসি বাহিনী। মুহাম্মদ আলী তখন তার গদি রক্ষার জন্যে মহিসুরের রাজার শরণাপন্ন হয় এবং তার কাছে সামরিক সহযোগিতার আবেদন পেশ করে। সে তখন অঙ্গীকার করেছিলো যে, বিজয় লাভ করলে ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli) মহিসুরের রাজার হাতে তুলে দেবে। ওই সময় যদিও মারাঠা ও নিযামের পক্ষ থেকে তার ওপর যুদ্ধের প্রবল আশঙ্কা ছিলো; কিন্তু ত্রিচ্চন্নাপল্লি প্রাপ্তির লোভে নন্দরাজ তখন হায়দার আলীর নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্যের সেনাদল তার সাহায্যার্থে প্রেরণ করে। ওই যুদ্ধে চান্দা সাহেব নিহত হয়। মুহাম্মদ আলী আরকাটের গদি দখল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু বিজয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে সে ত্রিচ্চন্নাপল্লি মহিসুরের রাজার হাতে তুলে দিতে গড়িমসি শুরু করে দেয়। বাধ্য হয়ে নন্দরাজ ফরাসি সৈন্যদের সহায়তায় ত্রিচ্চন্নাপল্লি দখল করার চেষ্টা করে; কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি। ব্যর্থ মনোরথে নন্দরাজ তখন মহিসুরে ফিরে আসেন। হায়দার আলী ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই যুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে হায়দার আলীর সামরিক দক্ষতা পূর্বাপেক্ষা প্রচুর বেড়ে যায়। 'সাওয়ানেহে হায়দার আলী' গ্রন্থের লেখক এ প্রসঙ্গে লেখেন—

www.boimate.com

'ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli) হায়দার আলীর জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রমাণিত হয়। সেখানকার ক্রমাগত সামরিক অভিযান, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া তার ব্যক্তিত্বকে আরও পরিপক্ক করে তোলে। যার ফলে তার নিরীক্ষণ শক্তি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বোধ-উপলব্ধি ক্ষমতা ক্ষুরধার হয়। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি এখানেই যুদ্ধ পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরিপক্ক অনুভূতি, স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি ও স্বাতন্ত্রিক মন-মানসিকতার বদৌলতে তিনি পশ্চিমাদের প্রতিহত করার কৌশল ও কর্মপদ্ধতি খুব সহজেই বুঝে ফেলতে সক্ষম হন।'[৩৬]

হায়দার আলীর বীরত্ব, দৃঢ়তা ও সামরিক দক্ষতার গুণে মুগ্ধ হয়ে মহিসুরের উযির নন্দরাজ তাকে ১৭৫২ সালে মহিসুরের নিকটবর্তী ডিন্ডিগাল (Dindigal) জেলার পালিগারোঁ অর্থাৎ জমিদারদের বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে তাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার অধীনে তখন চার হাজার পদাতিক সৈন্য ও দেড় হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একটি যুদ্ধবাজ দল প্রদান করা হয়।

'তারীখে টিপু সুলতান' গ্রন্থের লেখক জনাব মুহিব্বুল হাসান লেখেন, 'হায়দার আলী যখন ডান্ডিগালের গভর্নর ছিলেন তখন তিনি নন্দরাজের অনুমতিক্রমে অধীনস্থ সৈন্যদের জনবল ও কাঠামোর মাঝে নানাভাবে সংযোজন করেন। তোপখানাকে নতুন আকারে বিন্যস্ত করেন। ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তায় সেখানে একটি অস্ত্রশালা গড়ে তোলেন। ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli) থেকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসাটা নন্দরাজের জন্যে যদিও প্রচুর মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো; কিন্তু এই অভিযান হায়দার আলীর জীবনে উন্নতির সোপান পরিণত হয়। সেখান থেকে তার জন্যে সেনাবাহিনীর মাঝে পদোন্নতির ফটক খুলে যায়।'[৩৭]

---

৩৬. হায়দার আলী। লেখক, নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা।

৩৭. মুহিব্বুল হাসান রচিত তারীখে টিপু সুলতান।

www.boimate.com

মহিসুর রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ও মারাঠাদের আক্রমণ

হায়দার আলী যখন ডিন্ডিগাল (Dindigal) নগরীর গভর্নরের দায়িত্ব পালন করছিলেন তখন নানাবিধ কারণে মহিসুর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দিনদিন নষ্ট হতে থাকে। আমরা আগেই বলেছিলাম যে, মহিসুরের রাজা ওয়াদিয়ার (Krishnaraja Wodeyar) আদতে তার মন্ত্রীদের হাতে কাঠের পুতুলে পরিণত হয়েছিলো। সে তখন চেষ্টা করছিলো— কীভাবে উযিরদের প্রাশাসনিক ক্ষমতা কমিয়ে এনে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল বিষয়-আশয়ে তার নিজের কথাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের রূপ দেওয়া যায়।

অন্যদিকে শক্তিমান উযিরদ্বয় নন্দরাজ ও দেবরাজের অযোগ্যতার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা উর্ধ্বতন অফিসার গঙ্গারামের নেতৃত্বে উযিরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। ওই সময় ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli)-এর ব্যর্থ অভিযানের কারণে মহিসুর সরকার ছিলো অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার। ঠিকমতো সেনাসদস্যদের বেতনের জোগান দেয়া যাচ্ছিলো না। যার ফলশ্রুতিতে অল্প ক'দিনের মাথায় নন্দরাজের বিরুদ্ধে গোটা রাষ্ট্রজুড়ে তীব্র অসন্তোষ ও পরিষ্কার বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

অবস্থা বেগতিক দেখে নন্দরাজের ভাই দেবরাজ রাজপ্রাসাদের ওপর গোলা বর্ষণ শুরু করে দেয় এবং রাজাকে তার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্যে নন্দরাজ ডিন্ডিগাল (Dindigal) থেকে হায়দার আলীকে মহিসুরে ডেকে আনে। মাত্র দু' মাসের চেষ্টায় হায়দার আলী বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন। বিদ্রোহী সৈন্যদের নেতা গঙ্গারামকে কারারুদ্ধ করেন। সেনাসদস্যদের বেতন-ভাতার বন্দোবস্ত করেন। রাজা ও তার উযিরদের মাঝে তিনি মধ্যস্ততা করে দু' পক্ষকে সন্ধির ওপর একমত করেন।

১৭৫২ সালে মারাঠারা আকস্মিক মহিসুর রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে বসে। ওই সময় তাদের উদ্দেশ্য রাজ্যদখল ছিলো না; তারা চেয়েছিলো, এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে চলে যাবে। মহিসুরের রাজা যখন তাদেরকে

www.boimate.com

এক কোটি রুপি প্রদানের অঙ্গীকার করেন তখন তারা দ্রুত রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। অবশ্য জামানত হিসেবে তারা মহিসুর রাজ্যের প্রচুর এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিয়েছিলো। মহিসুরের রাজা যখন অঙ্গীকার অনুসারে তাদেরকে পূর্বোক্ত অঙ্ক প্রদান করতে অস্বীকার করেন তখন মারাঠারা যথারীতি নিজেদের হাতে রক্ষিত অঞ্চলগুলোর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করে।

হায়দার আলীর বিশ্বস্ততা ও সেনাপ্রধানের পদে পদোন্নতি লাভ

একজন জাত্যাভিমানী পুরুষ হিসেবে হায়দার আলী তার উপকারী রাজার এই লাঞ্ছনা মেনে নিতে পারেননি। রাজার প্রশাসন পূর্ব থেকেই অনেক সীমিত ছিলো; এখন তা আরও সংকুচিত হয়ে মহিসুর ও তৎসংলগ্ন উপশহরের মাঝে সীমিত হয়ে পড়ে।

হায়দার আলী সর্বপ্রথম মারাঠা সৈন্যদের সেই দলটির ওপর আক্রমণ করেন যা গোপাল রাও-য়ের নেতৃত্বে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অবরোধ করে রেখেছিলো। তিনি উপর্যপুরী আক্রমণ করে পেছনে সরে আসতে বাধ্য করেন। এরপর প্রথম সুযোগেই তিনি আশপাশের এলাকাগুলো থেকে প্রার্থিত অর্থ সংগ্রহ করেন এবং অঙ্গীকার অনুসারে মারাঠাদের হাতে তুলে দিয়ে তাদেরকে রাজার অধিকৃত অঞ্চলগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য করেন।

হায়দার আলীর এই বিশ্বস্ততা দেখে রাজা এ পরিমাণ উৎফুল্ল হন যে, তৎক্ষণাৎ এর বিনিময় হিসেবে 'ফাতেহে হায়দারাবাদ বাহাদুর' নাম দিয়ে তাকে তার পুরো সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানের পদে সমাসীন করেন। এ ছাড়াও শত্রুদলের সঙ্গে যাবতীয় সামরিক বিষয়-আশয় সম্পন্ন করার পূর্ণ এক্তিয়ারও তার হাতে অর্পণ করেন। অন্যদিকে প্রধান উযির নন্দরাজ মহিসুরের রাজনৈতিক চালচিত্র দেখে আশাহত হয়ে পড়েন।

হায়দার আলীর পরামর্শেই তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। যার বিনিময় হিসেবে রাজা তাকে অবশিষ্ট জীবন নিরূপদ্রব

www.boimate.com

সুখের সঙ্গে কাটাতে একটি বড় অঞ্চলের জমিদারি দান করেন।

হায়দার আলীর পরামর্শেই মহিসুরের রাজা নন্দরাজের স্থলে খন্ডেরাও-কে তার প্রধানমন্ত্রীর পদে মনোনীত করেন। যদিও পরবর্তীকালে এই খণ্ডেরাও হায়দার আলীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কূটজাল সৃষ্টি করেছিলো।

www.boimate.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সালতানাতে খোদাদাদের প্রতিষ্ঠা থেকে হায়দার আলীর মৃত্যু পর্যন্ত

www.boimate.com

হায়দার আলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

মহিসুরের মতো হায়দারাবাদেও ইতিহাসের ঠিক অভিন্ন সময়েই শাসক নির্বাচন নিয়ে তীব্র কলহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। নিযাম সালাবাত (Salabat Jung)-কে তার ভাই নিযাম আলী ১৭৬১ সালে বন্দী করে নিজেই হায়দারাবাদের গদি দখল করে বসে। কৃষ্ণা নদীর আশপাশের দক্ষিণাঞ্চলে তার আরেক ভাই বাসালত যঙ্গ রাজত্ব করতো। ১৭৬১ সালে পানিপথের ময়দানে আহমদ শাহ আবদালীর সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধ চলছিলো। যার কারণে তার পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলো উত্তর ভারতের ওপর। যেন তার রাজধানীর দিকে আফগানরা এগিয়ে আসতে চাইলে তাদের প্রতিহত করতে পারে। ওই সময় সিরা (Sira) প্রদেশ ছিলো মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণে। নিযামের ভাই বাসালত যঙ্গ সেই সিরা (Sira) প্রদেশ দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। এ উদ্দেশ্যে সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তার সেনাবাহিনী ব্যাঙ্গালুরু থেকে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত হোসকোটাহ কেল্লা অবরোধ করে। কেল্লার ভেতরে ছিলো ৭০০ মারাঠা সৈন্য । দু' মাস অবরোধ করেও সে যখন কেল্লা জয় করতে ব্যর্থ হয় তখন নিরূপায় হয়ে মহিসুর সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান হায়দার আলীর কাছে সে সামরিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করে। হায়দার আলী তার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এ শর্তে তাকে সহযোগিতার অঙ্গীকার করে যে, কেল্লা বিজিত হলে সে তাকে সিরা (Sira) প্রদেশের নবাব মনোনীত করবে। অবশ্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পুরোটা বাসালত যঙ্গকে দিয়ে দেয়া হবে। নিরূপায় হয়ে বাসালত যঙ্গ তার সেই শর্ত মেনে নেয়।

হায়দার আলী মাত্র কয়েক দিনের চেষ্টায় কেল্লা দখল করতে সমর্থ হয়। অঙ্গীকার অনুসারে বাসালত যঙ্গের সুপারিশে দিল্লির তৎকালীন মোঘল বাদশাহ হায়দার আলীকে সিরা (Sira) প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। যার ফলে হোসকোটা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল হায়দার আলীর মাধ্যমে মহিসুর

www.boimate.com

সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। হায়দার আলীও এখন সবার মুখে 'নবাব হায়দার আলী' নামে সম্বোধিত হতে থাকেন। কার্যত সরাসরি হায়দার আলীর মাধ্যমেই একটি বিশাল ভূখণ্ড মহিসুর সাম্রাজ্যের মানচিত্রে যোগীভূত হয়।

রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী খণ্ডে রাও– যিনি পূর্বে হায়দার আলীর একজন ব্যক্তিগত হিসাবরক্ষক হিসেবে রাজ্যের অর্থনৈতিক বিভাগের একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং এখন হায়দার আলীর সুপারিশেই রাজ্যসভার প্রধানমন্ত্রী হয়ে আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা রাজ্যে মহিসুর সম্রাটের পর সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, তিনি যখন দেখতে লাগলেন যে, মহিসুর রাজ্যে হায়দার আলীর প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশ বেড়ে চলেছে, একজন দাপুটে ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে তিনি সবার শ্রদ্ধা ও সমীহ কুড়িয়ে নিচ্ছেন, তখন তিনি বিষয়টিকে ইতিবাচক নিতে পারেননি। অন্যদিকে রাজা ও তার রানীদের মনেও এ অনুভূতি দিনদিন তীব্র হচ্ছিলো যে, তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামোর মাঝে পূর্বের মতো খেলার পুতুলে পরিণত হচ্ছেন। নন্দরাজ থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই কার্যত তারা খণ্ডে রাও ও হায়দার আলীর অনুগত পরিণত হয়েছেন। লাগাম একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে স্থানান্তরিত হলেও তাদের নিজস্ব অবস্থানে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এখন হায়দার আলীর হাতে চলে গেছে।

ঘটনাচক্রে ওই সময় ইংরেজদের ইঙ্গিতে আরকাটের নবাব মুহাম্মদ আলী ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণাধীন পাণ্ডেচেরি নগরীর ওপর আক্রমণ করে বসে। ফরাসিরা তখন কয়েকটি এলাকা হায়দার আলীর হাতে তুলে দেওয়ার অঙ্গীকার করে তার কাছে সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করে। হায়দার আলীর ফৌজ তাদের সহায়তা করতে পাণ্ডেচেরি পৌঁছে গিয়েছিলো; কিন্তু তাদের মাধ্যমে ফরাসিদের খুব বেশি উপকার হয়নি। ফেরার পথে হায়দার আলীর ফৌজ যখন আরকাট নগরীতে অবস্থান করছিলো তখন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খোদ তার কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক খাণ্ডেরাও তলে তলে এ চক্রান্ত করে বসে যে, রাজপ্রাসাদের রানীবর্গ, রাজা দেওয়ান ভেঙ্কট পাটিয়া, অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্য হতে ভীর নাচটি, অন্যায় শাস্ত্রী প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে হায়দার আলীর কর্তৃত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে

www.boimate.com

একটি উচিত শিক্ষা দেয়ার কুমতলব তৈরি করে।[৩৮] খণ্ডে রাও রাজাকে এ কথা বলে ক্রুদ্ধ করার চেষ্টা করে যে, 'আজ আপনার এক কর্মচারী আপনার সমকক্ষ হতে চাচ্ছে।'

ওদিকে সে পুনা নগরীতে অবস্থানরত মারাঠা সর্দার মাধুরাওয়ের কাছে এ বার্তা প্রেরণ করে সাহায্য প্রার্থনা করে যে, 'একজন মুসলমান মহিসুর সাম্রাজ্য দখল করতে চাচ্ছে। আপনি যদি আমাদেরকে সহায়তা করেন তাহলে আপনাকে মহিসুরের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু' লক্ষ রুপি ও নগদ পাঁচ লক্ষ রুপি অর্থ প্রদান করা হবে।' তার প্রস্তাবে মাধুরাও রাজি হয়ে যায়। তিনি হায়দার আলীর বিরুদ্ধে মহিসুরের রাজাকে সহায়তা করার জন্যে তোপখানা সমেত একদল সৈন্যও প্রেরণ করে।

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো

মহিসুরের রাজপ্রাসাদে যখন এই ষড়যন্ত্র জট পাকাচ্ছিলো ওই সময় হায়দার আলীর অধিকাংশ সৈন্য ছিলো আরকাট নগরীতে মাখদুম আলীর নেতৃত্বে। মহিসুরে ওই সময় তার হাতে ছিলো মাত্র এক হাজার নিরস্ত্র সৈন্য, ৪০০ অশ্বারোহী ও ১৩০০ পদাতিক সৈন্য। তিনি তখন শ্রীরঙ্গাপত্তনামের দরিয়া দৌলতবাগ মহলে অবস্থান করছিলেন। ওই মহলে অবস্থানরত তার কতিপয় হিন্দু হীতাকাঙ্ক্ষীর মারফতে তিনি তার ওপর ঘটিতব্য প্রাণঘাতী আক্রমণের অগ্রিম তথ্য পেয়ে যান। সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি কালবিলম্ব না করে, রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন। সামনে ছিলো তীব্র তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদী। জীবনটাকে হাতের মুঠোর ভেতর ভরে তিনি সেই খরস্রোতা নদীতে ঝাপিয়ে পড়েন। একাধারে বিশ ঘণ্টার দূরত্ব বিরতিহীন অতিক্রম করে তিনি ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছে যান। অবশ্য টিপু সুলতান সমেত তার পুরো পরিবার ওই সময় শ্রীরঙ্গাপত্তনামে রয়ে গিয়েছিলেন। রাঙ্গারাও তাদেরকে একটি সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তর করেন। তাদের সঙ্গে সদাচরণ করেন এবং তাদের যাবতীয় ভালো-মন্দের খোঁজখবর নেন।

---

৩৮. হায়দার আলী। লেখক, নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা

www.boimate.com

নরেন্দ্র কিষাণ সিনহার বক্তব্য হলো, শ্রীরঙ্গাপত্তনাম থেকে ব্যাঙ্গালুরু পালিয়ে যাওয়ার সময় হায়দার আলীর সঙ্গে ৩০০ অশ্বারোহী ও স্বর্ণ-রূপা সমৃদ্ধ থলে ছিলো।[৩৯]

ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছে তিনি সর্বপ্রথম আরকাটে অবস্থানরত নিজ ফৌজকে ব্যাঙ্গালুরু ডেকে পাঠান। সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে তিনি স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ রুপি ঋণ গ্রহণ করেন। ওদিকে মহিসুরে যখন খণ্ডে রাও ও মারাঠা ফৌজ তার পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ শোনে তখন তারা ব্যাঙ্গালুরু পর্যন্ত তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলো। কিন্তু হায়দার আলী 'মীর মাখদুম আলী'-কে সঙ্গে নিয়ে তাদের সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। মারাঠাদের সামরিক সহযোগিতা পেয়েও তার বাহিনী হায়দার আলীর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। উপরন্তু তাদেরকে পরাজিত হয়ে মহিসুরে ফিরে আসতে হয়েছিলো। ওই সময় তাদের হাজার হাজার সৈন্য মারা পড়ে।

এ প্রসঙ্গে অমুসলিম ঐতিহাসিকরা খণ্ডে রাওয়ের পরাজিত হওয়ার অন্য একটি কারণ দর্শিয়েছেন। তারা বলেন, তার সেনাবাহিনীতে প্রচুর মুসলিম ফৌজ ছিলো। হায়দার আলী তাদেরকে ইসলামের দোহাই দিয়ে ও ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে খণ্ডে রাওয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রলুব্ধ করেছিলো। যার কারণে তারা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যায় এবং খণ্ডে রাও পরাজিত হয়। অথচ প্রখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা তার পরাজয়ের কারণ দর্শিয়ে বলেন, খণ্ডে রাওয়ের সেনাবাহিনীর বৃহদাংশ ছিলো বাউণ্ডুলে। যার কারণে তাদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে খণ্ডে রাও নিজেও আশ্বস্ত ছিলো না। এর বিপরীতে হায়দার আলীর সৈন্যদল ছিলো শতভাগ বিশ্বস্ত।

শ্রীরঙ্গাপত্তনামের ওপর হায়দার আলীর আক্রমণ ও দখল

যখন মহিসুরে এ সংবাদ পৌঁছে যায় যে, খণ্ডেরাও-কে পরাজিত করে হায়দার আলী বিজয়ী হয়েছেন তখন সেখানে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ওদিকে হায়দার আলী ব্যাঙ্গালুরু থেকে বেরিয়ে তার সৈন্যদলকে নিয়ে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। চতুর্দিক থেকে

---

৩৯. নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা রচিত 'হায়দার আলী'।

www.boimate.com

তিনি নগরী অবরোধ করেন। ওই সময় কিছু ইংরেজ কর্মকর্তা এ তদবির শুরু করে দেয় যে, রাজা ও হায়দার আলীর মাঝে যেকোনো মূল্যে সন্ধি হয়ে যাক। তাহলে আর খণ্ডে রাওকে কোনো ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কারণ হায়দার আলী ভালো করেই জানেন যে, রাজা নেহায়েতই কাঠের পুতুল। খণ্ডে রাওয়ের স্থানে যে কোনো ব্যক্তিকে বসিয়ে এ ধরনের অবস্থা আবারও সৃষ্টি করা যাবে।

স্মর্তব্য যে, শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অবরোধের পূর্বেই সাবেক উযির নন্দেরাওয়ের প্রস্তাব অনুসারে মারাঠা ফৌজ খণ্ডে রাও থেকে পৃথক হয়ে হায়দার আলীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলো। যার বিনিময়ে হায়দার আলী তাদেরকে 'বারো মহল' অঞ্চল দান করেন। যার ফলে এখন হায়দার আলীর মুকাবেলায় স্রেফ খণ্ডেরাওয়ের অবশিষ্ট সৈন্যদল রয়েছে। ওদিকে রাজপ্রাসাদের রানীগণও খণ্ডেরাওয়ের নির্বুদ্ধিতার কারণে তার ওপর ক্ষুব্ধ। এজন্যে তারা নিজেরাই স্বপ্রণোদিত হয়ে হায়দার আলীর কাছে অনুরোধ পেশ করে যে, আপনি আগের মতো প্রাশাসনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং খণ্ডে রাওকে তার পদ থেকে অপসারিত করুন। কিন্তু হায়দার আলী তাদেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, তিনি রাজধানীর ওপর আক্রমণ করে তা দখল করার যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, তার ওপর কিছুতেই পুনর্বিবেচনা করবেন না।

মহলের সৈন্যদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে তিনি সর্বপ্রথম রাজপ্রাসাদ লক্ষ্য করে তোপ নিক্ষেপ শুরু করেন এবং বিদ্রোহের মূল ষড়যন্ত্রবাজ খণ্ডেরাওকে তার হাতে তুলে দেওয়ার দাবী পেশ করেন। রাজা যদিও প্রথমদিকে যথেষ্ট টালবাহান করেছেন এ ভয়ে যে, হায়দার আলী তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে পারে। অবশেষে রাজা তাকে হায়দার আলীর হাতে এ শর্তে তুলে দিলেন যে, তাকে তিনি গ্রেফতার করে কোনো ধরনের ক্ষতি করবেন না। অঙ্গীকার অনুসারে হায়দার আলী তাকে কোনো ধরনের শারীরিক কষ্ট দিলেন না। শুধু এতোটুকু করলেন যে, লোহার প্রকাণ্ড খাঁচা বানিয়ে তাকে সেখানে নিক্ষেপ করলেন। সেই খাঁচার ভেতরেই তাকে খাদ্য-পানীয় পৌঁছে দেয়া হতো। হায়দার আলী খণ্ডে রাওকে দেখিয়ে বলতেন, এ হলো আমার তোতা পাখি। আমি এই পাখিটির প্রতিপালন করছি। এক বছরের মাথায় সেই খাঁচার ভেতর বন্দী থাকাবস্থায় খণ্ডে রাওয়ের মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনাগুলো ঘটেছে ১৭৬১ সালের

www.boimate.com

শেষাংশে। রাজপ্রাসাদের ওপর আক্রমণের দ্বিতীয় দিন হায়দার আলী মহামূল্যবান উপঢৌকন ও নজরানা নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হন। মহিসুরের রাজনৈতিক ও সামরিক চিত্র তার সামনে উপস্থাপন করে বলেন, তিনি যেন রাজ্যের গোটা কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা তার হাতে সঁপে দেন। এভাবে মহিসুরের রাজা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সম্মানের সঙ্গে সিংহাসন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। হায়দার আলী রাজাকে তাঁর প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে তিন লক্ষ বার্ষিক আয় সমৃদ্ধ একটি বিশাল জমিদারি অর্পণ করেন। তার সাবেক উযির নন্দরাজকেও তিনি এক লক্ষ রুপি বার্ষিক আয় সমৃদ্ধ একটি এলাকার জমিদারি প্রদান করেন। এরপর তিনি তার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্গালুরু চলে যান।

হায়দার আলী কর্তৃক মহিসুরের কর্তৃত্ব গ্রহণের কারণ

পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ; এমনকি খোদ আমাদের দেশের কিছু সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঐতিহাসিক এ প্রেক্ষিতে এ কথা চাউর করে দিয়েছে যে, যেই রাজা হায়দার আলীকে উন্নতি দিতে দিতে একসময় প্রধান সেনাপতি পর্যন্ত বানিয়েছেন, সেই রাজার সঙ্গে অকৃতজ্ঞ হায়দার আলী গাদ্দারি করেছেন। নিজের ওপর উপকারকারীর বিরুদ্ধে তিনি নিজেই চক্রান্ত করে গদিচ্যুত করেছেন এবং নিজেই সে গদির ওপর থিতু হয়েছেন। এককথায় হায়দার আলী অন্যায়ভাবে রাজার রাজত্ব দখল করেছেন।

আফসোসের বিষয় হলো, তাদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কিছু মুসলিম লেখক ও নিরপেক্ষ হিসেবে বিবেচিত হিন্দু ঐতিহাসিকরাও হায়দার আলীর বিরুদ্ধে এই অন্যায় অপবাদ আরোপের মিছিলে শরীক হয়েছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা— যার লেখা বইটি হায়দার আলী ও সালতানাতে খোদাদাদের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজেও অত্যন্ত সমাদৃত— তিনিও তার বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে মহিসুর রাজার সঙ্গে গাদ্দারি করার ক্ষেত্রে হায়দার আলীকে খণ্ডে রাওয়ের সামান্তরালে উপস্থাপন করেছেন। অথচ হায়দার আলী যেই পরিস্থিতির কারণে নিরূপায় হয়ে মহিসুরের কর্তৃত্ব নিজ নিয়ন্ত্রণে তুলে নেন, সেই পরিস্থিতির পূর্বাপর নিরীক্ষণ করলে একজন সাধারণ পাঠকও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, হায়দার আলী ওই সময় যেই পদক্ষেপগুলো

www.boimate.com

নিয়েছেন তা তার নৈতিকতা ও উত্তম সদাচারের প্রমাণ বহন করে। রাজাকে তিল পরিমাণ কষ্ট না দিয়ে তাকে সম্মানজনকভাবে তার নিজের মতো করে বাকি জীবন অতিবাহিত করার অনুমতি দিয়েছেন, এরচেয়ে উত্তম আচরণ ওই যুগের অন্য কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এর বাইরে আরো কিছু রাজনৈতিক কারণ ও প্রেক্ষিত রয়েছে, যেগুলোর কারণে হায়দার আলী নিরূপায় হয়ে শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন। নিম্নে সেগুলো পেশ করছি। যা আমাদের সামনে তৎকালীন বাস্তবতার চিত্র পরিষ্কার দর্পণে ফুটিয়ে তুলবে।

১. পৃথিবীতে যখন থেকে মানুষের বসবাস তখন থেকে এটাই পৃথিবীর চিরন্তন নিয়ম যে, কুদরত কখনই কোনো পরিবার বা ব্যক্তিকে রাজত্ব ও সিংহাসনের চিরস্থায়ী হকদার বানায়নি। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে অদ্যাবধি কোনো ভূখণ্ড বা অঞ্চলের কর্তৃত্ব কোনো বিশেষ পরিবার বা বংশের হাতে ধারাবাহিক থাকেনি। যারাই রাজত্ব করেছেন, তারা নিজেরা অথবা তাদের পিতৃপুরুষদের কেউ অন্যের হাত থেকে সেই বাগডোর ছিনিয়ে নিয়েই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছেন। রাজত্বের পালাবদল ও শাসনযন্ত্র এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরের এই ধারাবাহিকতা প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের এটাই অনিবার্য ধারা। খোদ মহিসুরের রাজার পরিবারও ১৩৯৯ সালে মহিসুরের শাসনকর্তৃত্ব অন্য একটি পরিবারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনে নিই যে, হায়দার আলী অন্যায়ভাবে রাজত্ব দখল করেছেন, তাহলে স্রেফ এতোটুকুই প্রমাণিত হবে যে, একটি পরিবার যেই রাজত্ব অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছিলো, অন্য একটি পরিবার সেই রাজত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বড় কোনো অপরাধ নয়।

২. মহিসুরের তৎকালীন রাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার প্রাশাসনিকভাবে কার্যত অথর্ব ও নিষ্ক্রিয় জীবন কাটাচ্ছিলেন। রাজ্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিলো তার মন্ত্রীদের হাতে। অনেক দিন ধরে সেই মন্ত্রীরাই বাদশাহকে বেদখল বানিয়ে রাজত্ব দখল করে রেখেছিলো। ওই সময় তারা রাজার সঙ্গে ঠিক কী ধরনের আচরণ করতো, তা এখন নিশ্চয়তার সঙ্গে বলার সুযোগ নেই। তবে অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত ও আলামত থেকে

www.boimate.com

এটাই বুঝে আসে যে, শাসনক্ষমতা দখল করে তারা রাজার সঙ্গে খুবই অমানবিক আচরণ করতো। যখন প্রশাসনের কোনো উযির রাজত্ব দখল করার কথা ভাবতে পারে তখন রাজার সঙ্গে সদাচার ও যথোপযুক্ত সম্মান দানের উদ্দেশ্যে, শাসনক্ষমতা অন্যের হাতে চলে যাওয়ার পথ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে, সেই রাষ্ট্রের অন্য কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কেনইবা তা দখল করার চিন্তা-ভাবনা করবেন না? পদ-পদবির দৃষ্টিকোণ থেকে হায়দার আলী তৎকালীন কোনো মন্ত্রীর চেয়ে কোনো অংশেই ছোট ছিলেন না। তিনি একজন সিপাহসালার হিসেবেই রাষ্ট্রক্ষমতা কোনো ভুল বা অনুপযুক্ত হাতে চলে যাওয়ার পথ বন্ধ করতেই তিনি উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

৩. হায়দার আলী মূলত রাজার উযির খন্ডে রাও-কে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। এই খণ্ডেরাও-কে তিনি নিজেই সুপারিশ করে নন্দরাজের স্থলে রাজার প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। সেই বদান্যতার প্রতিদানে সে দিয়েছে কৃতঘ্নতা ও বিদ্রোহ। আর বিদ্রোহ দমন করা ও তা সমূলে উপড়ে ফেলার জন্যে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করা মানবপ্রকৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। খণ্ডে রাও-কে শিক্ষা দেয়ার জন্যে রাজকর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হায়দার আলীর জন্যে আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। আর হায়দার আলী সে কাজটিই করেছেন।

৪. মহিসুরের রাজা নিজেও তার রানী ও খণ্ডেরাওয়ের প্রলোভনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মারাঠা সৈন্যদের সহায়তায় রাজধানীর দরিয়া দৌলতবাগের ওপর আক্রমণ করার জন্যে নিজের রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। হায়দার আলী সেই দৌলতবাগে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু ভাগ্য যেহেতু হায়দার আলীকে সঙ্গ দিয়েছিলো, এজন্যে তিনি রাতের অন্ধকারে কাভেরিনদী পাড়ি দিয়ে ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছতে পেরেছিলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয়, হায়দার আলীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে রাজা কার্যত নিজেও সম্পৃক্ত ছিলেন। অন্য শব্দে বললে, রাজা নিজেই হায়দার আলীকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিলেন।

৫. হায়দার আলী সিরা (Sira) প্রদেশের নবাবি পেয়েছিলেন সরাসরি মোঘল দরবার থেকে। কাজেই কার্যত তিনি মহিসুরের রাজার অধীনস্থ নন। এরপরও তিনি যে নিজেকে মহিসুরের রাজার অধীনস্থ হিসেবে পেশ

www.boimate.com

করতেন এটা অবশ্যই তার চারিত্রিক উদারতা। রাজার অধীনে স্রেফ মহিসুর ও তৎসংলগ্ন ৩৩টি গ্রাম ছিল। অথচ সিরা (Sira) প্রদেশের নবাবি লাভের পর হায়দার আলীর নিয়ন্ত্রণে কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড চলে এসেছিলো।

৬. যদি হায়দার আলীর মনে বাস্তবেই রাজত্ব দখলের লোভ থাকতো তাহলে তিনি যখন ডিন্ডিগাল (Dindigal)-এর গভর্নর ছিলেন আর লড়াই করে মারাঠা সৈন্যদেরকে মহিসুরের অধিকৃত ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন তখনই রাজা ও তার মন্ত্রীবর্গ তার সামরিক ক্ষমতা ও প্রশাসন পরিচালনার যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ইচ্ছে করলে ওই সময়ই রাজ্যক্ষমতা দখল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

৭. যখন মহিসুরের উযির নন্দরাজের ক্রমবর্ধমান প্রতাপ-প্রতিপত্তিকে মহিসুরের রাজা নিজের জন্যে বিপদজনক অনুভব করছিলেন তখন সুন্দর পদ্ধতিতে নন্দরাজকে মন্ত্রীত্ব থেকে অব্যাহতির ওপর সম্মত করে তদস্থলে খণ্ডে রাও-কে নিযুক্ত করা এককভাবে হায়দার আলীর কৃতিত্ব। তিনি ইচ্ছে করলে তখন খণ্ডে রাও-এর স্থানে নিজেকে সমাসীন করতে পারতেন। এবং এরপর খুব সহজেই রাজাকে অধিকতর পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু এমন বিবেকহীন কাজ হায়দার আলী করেননি।

৮. রাজক্ষমতা নিজ নিয়ন্ত্রণে তুলে নেয়ার পরও হায়দার আলী মহিসুরের রাজাকে 'নামকাওয়াস্তে' হলেও রাজার পদে রেখে দিয়েছিলেন। এমনকি ১৭৬৬ সালে যখন কৃষ্ণরাজা মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি তার পালকপুত্রকেও রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেন। যা শাসকবর্গের প্রতি হায়দার আলীর নিখাদ কৃতজ্ঞতাবোধের অনন্য প্রমাণ।

৯. হায়দার আলী সর্বোতভাবে রাজার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। শুধু তার অনুরোধের ঢেকি গিলে তিনি খণ্ডে রাও-কে মৃত্যুদণ্ড দেননি। স্রেফ একটি খাঁচার মাঝে তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন।

১০. রাজধানী দখল করার পর হায়দার আলী নিজেই অনেক মহামূল্যবান উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে রাজার খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। এরপর বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা আয় সমৃদ্ধ ভূখণ্ডের জমিদারী তার হাতে তুলে

www.boimate.com

দিয়েছিলেন। হায়দার আলী যতোদিন জীবিত ছিলেন, রাজার সন্তুষ্টির জন্যে তিনি সবসময় দশমীর উৎসবে শুধু উপস্থিতই হতেন না; বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সবধরনের সুযোগ-সুবিধা-সহযোগিতা নিশ্চিত করার নির্দেশ জারী করেছিলেন।

শাসনক্ষমতা স্থানান্তরিত হওয়ার সময় মহিসুরের আয়তন

হায়দার আলী যখন ১৭৬১ সালে মহিসুরে রাজ্যক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেন তখন এই ভূখণ্ডটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিলো অত্যন্ত অপরিচিত ভূখণ্ড। রাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ারের রাজত্ব সংকুচিত হয়ে স্রেফ মহিসুর ও শ্রীরঙ্গাপত্তনামের আশপাশের ৩৩ টি গ্রামে সীমিত হয়ে পড়েছিলো। রাজ্যটিকে শুধু দাক্ষিণাত্যের লোকজন চিনতো। উত্তর ভারত বা ভারতবর্ষের বাইরের খুব কম লোকই মহিসুরের অস্তিত্বের কথা জানতো। কিন্তু ১৭৮২ সালে যখন হায়দার আলী ইনতিকাল করেন তখন তার রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়ে ৮০ হাজার বর্গমাইলে পৌঁছে গিয়েছিলো। যেই রাজ্যটির নাম খোদ দেশের লোকজনই জানতো, আজ তার সুখ্যাতির কথা দেশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার লোকদের কানে পৌঁছে গেছে।

প্রাথমিক বিজয়

রাজ্যক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর হায়দার আলী সর্বপ্রথম সিরা (Sira)-প্রদেশের প্রাশাসনিক শৃঙ্খলা বিধানের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। রায়দুর্গ ও চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog) মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বিদ্রোহ নির্মূল করে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ১৭৬৩ সালে চক বালাপুরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিদ্রোহ দমন করেন। ওই সময় তিনি 'নন্দী' জয় করে সেখানকার রাজা মিরা রাও-কে বন্দী করে ব্যাঙ্গালুরু পাঠিয়ে দেন। তার দু' ছেলে তখন ইসলাম গ্রহণ করে। মোটকথা, প্রথম দিকে ২/৩ বছর হায়দার আলী তার রাজ্যের সম্প্রসারণ না করে পুরনো এলাকাগুলোর ওপর নতুন করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ওপর সবিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। যে কাজে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন।

www.boimate.com

বেদনুর (Bednore) দখল

আরব সাগরের পূব উপকূলে মহিসুরের উত্তরে, পশ্চিম সীমান্তে ওই যুগে 'বুদনুর' নামে একটি ছোট্ট স্বায়ত্ত্বশাসিত হিন্দুরাজ্য ছিলো। যা বর্তমানে শিমালী কিনারা জেলায় অবস্থিত। ওই রাজ্যটিকে তখনকার যুগে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে সচ্ছল রাজ্য মনে করা হতো। পাহাড়ের ওপর ঘন জঙ্গলে বেষ্টিত হওয়ার কারণে ছোট্ট সেই রাজ্যের ভৌগলিক গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। উপরন্তু সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিলো অতুলনীয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব-উপাত্ত থেকে বুঝে আসে যে, দাক্ষিণাত্যের সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ রাজ্য বিজয়নগর পতনের পর সেখানকার হিন্দুরা প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য সেখানে স্থানান্তর করেছিলো। চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog) থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত এই রাজ্যটির রাজা বসুয়া নায়েক যখন ১৭৫৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন তখন সেখানকার রানী ও ব্রাহ্মণ প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে চক্রান্ত করে রাজক্ষমতা দখল করে রাজার পালক পুত্র মহাব্দীকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে।

মহাব্দী তখন পালিয়ে ১৭৬৩ সালে হায়দার আলীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সে তখন অভিযোগ দায়ের করে যে, 'সংবিধান অনুসারে রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসনের আমি-ই একক হকদার। রানী ব্রাহ্মণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে তা অবৈধভাবে দখল করে আমাকে আমার প্রাপ্য ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এখন তারা ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে আছে। অন্যদিকে দেশের আইন-কানুন-শান্তি-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। রানী নিজেই আমার প্রাণঘাতী হয়ে ওঠেছে। সে আমাকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে মরিয়া হয়ে ওঠেছে। আমি কোনোমতে জীবন মুঠোয় নিয়ে পালিয়ে চিত্রাদুর্গে আসতে পেরেছি। এখন আপনার কাছে আমার অনুরোধ— আপনি আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দিন। রাজক্ষমতা ফিরে পেতে আমাকে সহায়তা করুন।'

নরেন্দ্র কিষাণ সিনহার বক্তব্য অনুসারে ওই রাজপুত্র এর বিনিময় হিসেবে নগদ চল্লিশ লক্ষ রুপি প্রদানের অঙ্গীকার করে। অপরাপর ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, ওই সময় সে বিনিময় হিসেবে হায়দার আলীর করদভুক্ত জমিদার হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

www.boimate.com

মহাব্দীর অনুরোধে সম্মতি জানিয়ে হায়দার আলী বেদনুর (Bednore) রাজ্যের ওপর তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করেন। রাজ্য দখল করে মহাব্দীর হাতে তুলে দেন। এর বিনিময়ে হায়দার আলী হোনাওয়ার ও মঙ্গলোরের আশপাশের অঞ্চল লাভ করেন।

অবশ্য এক্ষেত্রে 'হায়দার আলী' গ্রন্থের লেখক নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা খানিকটা ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেন, হায়দার আলী মহাব্দীর হাতে রাজ্যের শাসনক্ষমতা তুলে দেননি। তিনি বরং তার স্ত্রীর প্রেমে পড়ে যান। তাকে পাওয়ার জন্যে তিনি মহাব্দীর প্রাণঘাতী শত্রুতে পরিণত হন। তখন তিনি মহাব্দীকে বন্দী করে মুডগিরি (Mudgiri) পাঠিয়ে দেন।

এ কথা সত্য যে, মহাব্দীর সঙ্গে হায়দার আলীর সম্পর্কের শেষ পর্যন্ত অবনতি ঘটেছিলো; কিন্তু তাদের পারস্পরিক শত্রুতার যেই প্রেক্ষাপট নরেন্দ্র কিষাণ বর্ণনা করেছেন, তা সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য ঐতিহাসিক উৎসগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে তাদের শত্রুতার যেই কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তাহলো, মহাব্দী বেদনুর (Bednore) জয় করার পর যখন হায়দার আলীর হাতে মঙ্গলোর এলাকা তুলে দেন তখন তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে হায়দার আলী মঙ্গলোরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। ওই সময় বদনূরের প্রয়াত রাজার বিধবা স্ত্রী মহাব্দীকে সঙ্গে নিয়ে হায়দার আলীকে হত্যা করার চক্রান্ত তৈরি করে। তাকে এ কথা বলে ফুঁসলায় যে, মঙ্গলোর থেকে ফেরার পথে হায়দার আলী বেদনুর নগরীও দখল করে নেবে। কাজেই তাকে এখানে আসার আগে হত্যা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

মহাব্দী তখন রানীর প্রস্তাবে সম্মত হয়। সে হায়দার আলীর ফেরার পর বারুদভরা সুরঙ্গ খনন করে। একজন ব্রাহ্মণ শুভাকাঙ্ক্ষীর মাধ্যমে হায়দার আলী মঙ্গলোর থাকাবস্থাতেই ষড়যন্ত্রের আগাম আভাষ পেয়ে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ রানী ও তার প্রেমিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। মহাব্দীকে গ্রেফতার করে বেদনুর (Bednore) অঞ্চলকে আইনীভাবে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ রাজ্য জয় করার পর হায়দার আলীর হাতে অগুণতি দৌলত চলে আসে। যার আনুমানিক মূল্য তৎকালীন বারো কোটি রুপি। হায়দার আলীর সামনে যখন স্বর্ণ-রৌপ্য স্তূপাকারে ফেলা হয় তখন সেটি আয়তনে একজন অশ্বারোহীর উচ্চতারও অধিক ছিলো।

www.boimate.com

বিজয়ের আনন্দে সৈন্যদের প্রত্যেককে দেড় মাসের অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হয়। বদনূরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় হায়দারনগর। যেহেতু ভৌগলিক গুরুত্ব বিবেচনায় এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো; এজন্যে হায়দার আলী এ এলাকাকে তার রাজধানী ঘোষণা করেন। ভেঙ্কট অপিয়া নামের একজন হিন্দু কর্মকর্তাকে এ এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এখানে মুদ্রা তৈরি করার জন্যে একটি টাকশাল নির্মাণ করা হয়। সেই মুদ্রার নাম ছিলো বাহাদুরি প্যাগোডা। যেহেতু এ এলাকায় সংখ্যাগুরু ছিলো হিন্দুধর্মাবলম্বী; এজন্যে তাদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই মুদ্রার ওপর বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা হতো।

গোয়া নগরীর ওপর আক্রমণ

হায়দার আলী যখন মহিসুরের রাজক্ষমতায় অভিষিক্ত হন তখন পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা গোয়া নগরী ছিলো পর্তুগিজদের দখলে। হায়দার আলী বেদনুর (Bednore) দখল করার পর সেখানকার কিছু এলাকা পর্তুগিজরা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিলো। হায়দার আলী যখন তাদের এই অযাচিত কর্মকাণ্ডের সংবাদ পান তখন তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রেখে বদনূরে বসে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার পরিবর্তে সরাসরি গোয়া আক্রমণ করে বসেন। যার ফলে তারা বেদনুর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিজ এলাকা রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে পর্তুগিজরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। তারা কারোওয়ার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল হায়দার আলীর হাতে তুলে দিয়ে কোনোমতে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। যার ফলে হায়দার আলী কোনো ধরনের রক্তপাত ব্যতিরেকেই নিজের এলাকা সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি নতুন আরো কিছু ভূখণ্ড নিজ রাজ্যের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন।

কেরালার মুসলমানদের সহায়তা ও মালাবার আক্রমণ

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কবে ইসলামের আলো উদিত হয়— এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু অভিযানের মধ্য দিয়ে এ দেশে ইসলামের আলো ছড়াতে শুরু করে। এর বিপরীতে অন্য ঐতিহাসকিদের অভিমত হলো, ইসলাম সর্বপ্রথম হিজরী প্রথম শতাব্দীর প্রথমদিকে পশ্চিম

www.boimate.com

উপকূলে আগমনকারী আরব বণিকদের মাধ্যমে আগমন করে। এটাই অত্যধিক বিশুদ্ধ যে, সিন্ধু অভিযানের অনেক আগেই আরব সাগরের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে অবস্থিত মালাবার, মঙ্গলোর, ভাটকাল ও হোনাওয়ার প্রভৃতি এলাকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো। আরবদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইসলামের আগমনের অনেক আগ থেকেই ছিলো। সেই আরব বণিকদের মাধ্যমেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইসলামের বার্তা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোয় পৌঁছে গিয়েছিলো। এমনকি কিছু কিছু ঐতিহাসিক এ কথাও লেখেছেন যে, মালাবারের রাজা ঝিমূর্ণ সামরী নবীজির চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে। ঘটনাটি তার মনে এতোটাই রেখাপাত করে যে, তিনি তখনই তার সকল প্রজাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই উপকূলীয় অঞ্চলে এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের স্বায়ত্ত্বশাসিত ছোট ছোট অনেকগুলো রাজ্য গড়ে ওঠেছিলো। প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা যখন ভারতবর্ষে পৌঁছেন তখন তিনি সেই মুসলিম রাজ্যগুলোও প্রদক্ষিণ করেছিলেন। তিনি তার 'ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনী' গ্রন্থের মাঝে সেই রাজ্যগুলো ও সেখানকার অধিবাসীদের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করেছেন।

গোটা ভারতবর্ষের মাঝে মালাবার অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সবুজ-শ্যামলিমা ও বাণিজ্যের কারণে অত্যন্ত সচ্ছল জনপদ হিসেবে বিবেচিত হতো। এখানকার মুসলমানদেরকে মাপলা ও হিন্দুদেরকে 'নায়র' বলা হতো। ওই সময় হিন্দু নারীদেরকে একসঙ্গে চারজন স্বামীর ঘর করতে হতো। পিতার মৃত্যুর পর সন্তান উত্তরাধিকারী হতো না; সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো তার ভ্রাতুষ্পুত্র। যেহেতু হিন্দু নায়ররা সংখ্যাগুরু ছিলো; এজন্যে তারা সংখ্যালঘু মুসলমান মাপলাদের ওপর বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন-নিপীড়ন করতো। যার ফলে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিলো।

তারা যখন এ তথ্য পান যে, হায়দার আলী মহিসুরের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তখন একজন মুসলমান রাজাকে রাজসিংহাসনে আরোহণ করতে দেখে তাদের মনে আশার পিদিম জ্বলে ওঠেছিলো। ঘটনাক্রমে ওই যুগে কাননুর (Cannanore)-এর নায়র রাজার মেয়ের সঙ্গে 'আলী' নামের এক মুসলমান যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নায়র রাজা তাদের সেই

www.boimate.com

প্রেম মেনে নেন এবং তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে সম্পন্ন করেন। যেহেতু রাজার কোনো ছেলে সন্তান ছিলো না; এজন্যে আইনীভাবে তিনি তাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিয়ে নায়র ও মাপলা (Mappla) সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে পূর্বের দূরত্ব ও বৈরীতা আরো বেড়ে যায়।

ফলশ্রুতিতে নিরূপায় হয়ে মুসলমানরা ১৭৬৫ সালে হায়দার আলীর কাছে অনুরোধ করে যে, আপনি নায়রদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সামরিক সহায়তা করুন। একজন সফল সেনাপ্রধান হিসেবে হায়দার আলী পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সিংহভাগ নায়ররা সমুদ্রের উপকূলে বসবাস করে। তাদের ওপর আক্রমণ করতে হলে স্থলসৈন্যের পাশাপাশি নৌযুদ্ধ জাহাজও অত্যাবশ্যক। এজন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ নৌযুদ্ধ জাহাজ তৈরি করার নির্দেশ প্রদান করেন। এজন্যে তিনি মঙ্গলোরে জাহাজ তৈরি করার একটি কারখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। নৌসেনা তৈরি করে নায়র রাজার মুসলিম জামাতা আলীকেই সেই সৈন্যদলের সেনাপতি মনোনীত করেন।

হায়দার আলীর নৌযুদ্ধ জাহাজ তৈরি করার এই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গোটা দেশের সম্রাটদের মনে তার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সম্মান সৃষ্টি করে। কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনিই সেই প্রথম শাসক— যিনি সামরিক ও বাণিজ্যিক— উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নৌসেনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের পর নায়ররা ভয় পেয়ে যায়। তারা কিছু দিন মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন-উৎপীড়ন বন্ধ রাখে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই নির্যাতনের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়।

অবশেষে হায়দার আলীর নির্দেশে নৌসেনাধ্যক্ষ আলী নায়রদের এলাকাগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। ভারতসাগরে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ দখল করে, সেখানকার রাজাকে গ্রেফতার করে। তার দু'চোখ কোটর থেকে উপড়ে ফেলা হয়। নৌসেনাধ্যক্ষের এই কর্মকাণ্ড হায়দার আলীর মনোঃপূত হয়নি। তিনি মানবিকতা ও ইসলামি শিষ্টাচার পরিপন্থী এমন অন্যায় আচরণের প্রেক্ষিতে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে নৌসেনাধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করেন। নিজেই রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে রাজার হাতে একটি বিশাল এলাকার জমিদারি তুলে দেন। মালদ্বীপের এই অভিযানে হায়দার আলীর

www.boimate.com

সঙ্গে তৎপুত্র টিপু সুলতানও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র পনেরো বছর।

কাননুর (Cannanore) ও কালিকাট (Calicut) জয়

নৌসেনাধ্যক্ষের পদ থেকে আলীর অপসারণের সিদ্ধান্তকে নায়ররা ভুল বোঝে। তারা আগের মতো মাপলা মুসলমানদের ওপর উৎপীড়ন-নিপীড়ন শুরু করে দেয়। অবশেষে হায়দার আলী নিজে ২০ হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে কাননুর (Cannanore) পৌঁছে নায়রদের ওপর আক্রমণ করেন। এলাকাটি জয় করে তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে কালিকাটের ওপরও মহিসুরের বিজয়ের পতাকা উড্ডয়ণ করেন। স্থানীয় রাজা ঝিমূর্ণ কোনো ধরনের রক্তপাত ব্যতিরেকেই হায়দার আলীর বশ্যতা স্বীকার করেন। এক বর্ণনা অনুসারে তারা প্রজারা এভাবে তার পরাজয় স্বীকারকে ইতিবাচকভাবে নেয়নি। তারা রাজার আত্মসম্মানবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অপমানের অনুভূতি থেকে রাজা আত্মহত্যা করেন। এভাবে নায়রদের দ্বিতীয়বারের মতো মাথা তোলার দুঃসাহসকে হায়দার আলী শক্ত হাতে দমন করেন। তাদের বিদ্রোহের অহমিকা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কোচি (Cochin)-এর রাজাকেও বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। এ সময় কিছু দিন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি কোয়েম্বাতুর (Coimbatore) অবস্থান করেন।

পুনানী অভিযান

হায়দার আলীর কোয়েম্বতুর অবস্থানের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নায়ররা পুনানী ও কালিকাট —যার ওপর হায়দার আলী সদ্য বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করে এসেছেন— সেখানকার আশপাশের হিন্দু রাজাদের সহায়তায় অবরোধ করে বসে। এমনিতেই পূর্বের যুদ্ধে কয়েক হাজার মহিসুরী সৈন্য নিহত হয়েছিলো। হায়দার আলী যখন কোয়েম্বাতুর (Coimbatore)-এ বসে তাদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পান তখন কালবিলম্ব না করে সঙ্গের ১৫ হাজার সৈন্য নিয়ে খুব দ্রুত পুনানী চলে আসেন। ওই সময় তার সঙ্গে বেশ কিছু ইউরোপিয়ান সৈন্যও ছিলো। সেখানে দু' পক্ষের মাঝে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। ফরাসি সৈন্যদের বুদ্ধিমত্তার ফলে হায়দার আলীর সেনাবাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করে। হাজার হাজার

www.boimate.com

নায়র নিহত হয় । গোটা নগরী আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হয় । যেসকল নায়র কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করে পালাতে পেরেছিলো তারা আশপাশের এলাকাগুলোতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে । হিন্দুসমাজে নায়রদের অবস্থান ছিলো ব্রাহ্মণদের পরেই । হায়দার আলী ঘোষণা করেন, এখন থেকে সামাজিকভাবে নায়রদের অবস্থান হবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে । ব্রাহ্মণ ও নায়রদের পক্ষ থেকে হরিজনদেরকে সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করার যেই নিষেধাজ্ঞা ছিলো, হায়দার আলী তা তুলে দেন । রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে তাদের পূর্বের যাবতীয় অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে । ফলশ্রুতিতে তখন হাজার হাজার নায়র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে । এরফলে মাপলা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের ওপর এতোদিনের চলে আসা উৎপীড়ন-নিপীড়ন অনেকখানি কমে আসে ।

মারাঠাদের আক্রমণ

যদিও বেদনুর (Bednore) অঞ্চলের ওপর হায়দার আলী অনেক আগেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়ার কারণে নতুন করে বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করে । ওই সময় যেহেতু হায়দার আলী মালাবারের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন; এ সুযোগে বদনূরের হিন্দুরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মারাঠাদের কাছে সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করে । এই অজুহাতে মারাঠারা বদনূরের ওপর আক্রমণ করে বসে । হায়দার আলী সেই সংবাদ পেয়ে মালাবাসেরর প্রাশাসনিক দায়িত্ব 'মীর রেযা আলী' নামের একজন সামরিক কর্মকর্তার হাতে অর্পণ করে তিনি নিজেই বেদনুর পৌঁছে যান । ওদিকে তার আগমনের সংবাদ শুনে মারাঠারা সেখান থেকে পালিয়ে যায় । শাহনূরের নবাবের সঙ্গে হায়দার আলীর ব্যক্তিগত রেষারেষি ছিলো । যার কারণে সে তখন মারাঠাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ময়দানে নেমে ছিলো । এজন্যে হায়দার আলী তার কাছ থেকেও এক কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ আদায় করেন এবং তার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কয়েকটি কেল্লা গ্রহণ করে তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন ।

মারাঠাদের অগ্রযাত্রা

হায়দার আলীর ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রযাত্রা মারাঠাদের কপালে ভাজ ফেলতে শুরু করে । তারা হায়দার আলীর অস্তিত্ব নিজেদের জন্যে চরম

www.boimate.com

হুমকি মনে করতো। তারা আশঙ্কা করছিলো যে, এভাবে যদি হায়দার আলীর অগ্রযাত্রা চলতে থাকে তাহলে খুব শীঘ্রই তিনি পুনা নগরীর ওপর আক্রমণ করে বসবেন। ওই সময় মারাঠাদের সর্দার ছিলো মাধুরাও। সে ছিলো নির্ভয় বাহাদুর ও অভিজ্ঞ সমরনায়ক। ১৭৬৫ সালে সে নিজের সঙ্গে দু' লক্ষ সৈন্য ও শাহনূরের পরাজিত নবাবকে নিয়ে শাহনূর (Savanur), মুডগীরি, বালাপুর (Ballapur), কাডাপ্পা (Kadapa), কোলার (Kolar) ও মালবাগুল প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের দোরগোড়ায় চলে আসে। দু'দলের মাঝে চরম মোকাবেলা হয়। প্রথমদিকে মহিসুরের সেনাবাহিনীর চরম ক্ষতি হয়েছিলো। প্রচুর জীবন ও সম্পদ খোয়াতে হয়েছিলো। বিজয়ের পাল্লা মারাঠাদের দিকে হেলতে শুরু করে। কিন্তু যখন শেষ দিকে মহিসুরের সৈন্যরা জঙ্গলে লুকিয়ে মারাঠাদের ওপর গেরিলা আক্রমণ শুরু করে দেয় তখন যুদ্ধের এই নতুন কৌশল সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে যুদ্ধের চিত্র আমূল বদলে যায়। চোখের পলকে তাদের হাজার হাজার সৈন্য মারা পড়ে। বিজয়ের আনন্দে বিহ্বল মারাঠিদের চোখে-মুখে নেমে আসে পরাজয়ের ঘোরতর অন্ধকার।

যেহেতু হায়দার আলীর স্বপ্ন ছিলো, তিনি একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। তার চোখে সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন ও পরিকল্পনা ছিলো, এজন্যে তিনি তখন মারাঠিদের সঙ্গে অধিকতর শক্তিপরীক্ষা করাকে নিজের শক্তির চরম অপচয় মনে করতেন। এজন্যে তিনি তখন মনে করলেন যে, এমন পরাজিত জাতিকে প্রতিশোধের নেশায় বুঁদ হয়ে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া সমীচিন হবে না। তার পরিবর্তে ফিলহাল তাদেরকে কিছু অর্থ দিয়ে পুনায় রেখে দেওয়াই সঙ্গত হবে। ওদিকে মাধুরাও নিজেও পরাজিত হয়ে পুনা প্রত্যাবর্তন করার চেয়ে সন্ধি করতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। হায়দার আলী তখন 'মারাঠারা পুনর্বার মহিসুর অভিমুখী হবে না' এ শর্তে নগদ আট লক্ষ রুপি ও পরবর্তীকালে পঞ্চাশ লক্ষ রুপি প্রদানের অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন।

অবশ্য কিছু কিছু ঐতিহাসিক হায়দার আলীর এই সন্ধিকে তার পরাজয় হিসেবে ব্যক্ত করেছে। নরেন্দ্র কিষাণ সিনহাও এ ধরনের অভিমত পেশ করেছেন। এক্ষেত্রে আমার বিবেচনা হলো, হায়দার আলী তার সাম্রাজ্যকে চরম ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রজাদের অন্যায় রক্তপাত ও খুন-খারাবি এড়াতে, এবং

www.boimate.com

এরচেয়ে বড় কথা হলো, ভবিষ্যতের বিশাল রাজনৈতিক পরিকল্পনা সামনে রেখে সন্ধির প্রস্তাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি চাইলে যুদ্ধ অব্যাহত রেখে তার সম্প্রসারণশীল মানসিকতার বাস্তবায়ন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি মনে করেছেন, এ মুহূর্তে সামরিক দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অনুসারে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখাটা হবে ইঁচড়ে পাকামি বা তরাপ্রবণ সিদ্ধান্ত।

এ কথা ভিন্ন যে, যুদ্ধের প্রথমদিকে যেভাবে মারাঠারা এগুচ্ছিলো তখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছিলো যে, মহিসুরের সালতানাতে খোদাদাদের এই সূর্য বুঝি উদয়ের অল্প ক'দিনের মধ্যেই ডুবতে বসেছে। এমনকি হায়দারাবাদের অধীনস্থ অনেকগুলো ভূখণ্ডের স্থানীয় রাজা ও নবাবেরা বিদ্রোহ করে তার বিরুদ্ধে মারাঠাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলো। আশঙ্কা হচ্ছিলো, খুব শিগগিরি মহিসুরের ওপর মারাঠাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে চলেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যথাসময়ে হায়দার আলীকে সহায়তা করেছিলেন। যার ফলে একটি সদ্যপ্রসূত ও বাহ্যত ক্রমকম্পমান রাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা কয়েকগুণ দৃঢ় ও প্রত্যয়দীপ্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের প্রথম যুদ্ধ

যেমনটি আমরা পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন শিরোনামের অধীনে পড়েছি যে, ১৭৬১ সালে যখন হায়দার আলী মহিসুরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তখনকার পরিস্থিতি হলো, ইংরেজরা বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পলাশীর ময়দানে পরাজিত করে বাংলা দখল করে নিয়েছে। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের পর অযোধ্যাতেও তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজদের রাজনৈতিক যুগ সূচিত হয়ে তারা একটি স্বীকৃত বাস্তবতা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। আরকাটের সিংহাসনের ওপরও তারা ফরাসিদের মিত্র চান্দা সাহেবকে হত্যা করে নিজেদের রাজনৈতিক মিত্র নবাব মুহাম্মদ আলীকে বসাতে সমর্থ হয়েছে। ওদিকে হায়দারাবাদের নিযামও কার্যত ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। পুনা নগরীতে তখন মারাঠা সৈন্যদল অবস্থান করতো। প্রয়োজনের সময় তারা তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ইংরেজদেরকে সামরিক সহায়তা করতো। যেহেতু আরকাটের ক্ষমতায় আরোহণ নিয়ে চান্দা

www.boimate.com

সাহেব ও মুহাম্মদ আলীর মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিলো আর ওই সময় ফরাসি সৈন্যদের ভায়া হয়ে মহিসুরের সৈন্যরা চান্দা সাহেবকে সমর্থন করেছিলো; এজন্যে চান্দা সাহেবের মৃত্যু ও পরাজয় সত্ত্বেও আরকাটের নবাব মুহাম্মদ আলী মহিসুরের সেনাদের শত্রুতার কথা ভুলতে পারেনি। এহেন প্রেক্ষিতে এটাই স্বাভাবিক যে, সে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রে একটি সুদৃঢ় প্রশাসন গড়ে উঠতে দিতে চাইবে না। উপরন্তু সে কার্যত ইংরেজদের অধীনস্থ হয়ে পড়েছিলো। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও সামরিক প্রসঙ্গে নিজ প্রভু ইংরেজদের উপেক্ষা করে কোনো কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার তার ছিলো না। মুহাম্মদ আলীর সঙ্গে হায়দার আলীর সীমান্ত ঝগড়া নিয়মিত লেগে থাকতো।

অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গে হায়দারাবাদের নিযামের সামরিক চুক্তি ছিলো। চুক্তির শর্তানুসারে প্রয়োজনের সময় ইংরেজদেরকে সে সামরিক সহায়তা করতে বাধ্য ছিলো। হায়দার আলী যেভাবে তার রাজ্যকে সম্প্রসারণ করে যাচ্ছিলো, তা দেখে সে নিজেও আতঙ্কিত ছিলো। এই ভয় থেকেই সে ইংরেজদের সঙ্গে সামরিক সহায়তা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলো।

মারাঠাদের অবস্থা হলো, তারা ইতোপূর্বে একাধিকবার হায়দার আলীর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। পরাজয়ের দুঃসহ স্মৃতিগুলো তাদেরকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াতো। এ কারণে তারা সবসময় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে ওৎ পেতে থাকতো।

ইংরেজরা ছিলো মুসলমানদের চিরকালীন শত্রু। মাদ্রাজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবসময় এ ভয়ে সন্ত্রস্থ থাকতো যে, হায়দার আলীর দুর্ধর্ষ নৌসেনা যেকোনো সময় মাদ্রাজে ঢুকে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে পারে। অন্যদিকে তাদের আন্তর্জাতিক শত্রু ফরাসিদের সঙ্গে হায়দার আলীর সুসম্পর্ক রয়েছে। এজন্যে হায়দার আলী সম্পর্কে তাদের পূর্বের আশঙ্কাগুলো বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছিলো।

ইংরেজ, মারাঠা, নিযাম ও নওয়াব মুহাম্মদ আলী– এ চার শক্তির একটিরও একাকী হায়দার আলীর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সাহস ছিলো না। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই হায়দার আলীকে তাদের পথের কাঁটা মনে করতো। তারা প্রত্যেকেই মনে করতো, নিজেদের সাম্রাজ্যের

www.boimate.com

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই হায়দার আলীকে পথ থেকে সরাতে হবে। ধূর্ত ও চতুর ইংরেজরা কূটকৌশল প্রয়োগ করে মহিসুরের বিরুদ্ধে এই চারটি শক্তিকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো।[৪০] অথচ আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই চারটি শক্তির পরস্পরে কোনো মেলবন্ধন ছিলো না। শুধু অভিন্ন শত্রুকে নির্মূল করার ভাবনা থেকেই তারা সাময়িক ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত হয়। তারা পরস্পরে শলা পরামর্শ করে সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বের ঝাণ্ডা তুলে দিলো ইংরেজ কমান্ডার জেনারেল স্মিথের হাতে।

হায়দার আলী সম্মিলিত শত্রুর পূর্বপরিকল্পনা জানতে পেরে কালবিলম্ব না করে নিজের সামরিক বাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন। সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে তিনি গোটা বাহিনীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করলেন। তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার যথাক্রমে অর্পণ করলেন তার সদ্যযুবক উত্তরসূরী টিপু সুলতান, মীর রেযা আলী খান, হায়বাত জঙ্গ ও মুহাম্মদ আলীকে। ফৌজের পঞ্চম অংশের নেতৃত্বভার নিজের হাতে রেখে দিলেন। ওদিকে ইংরেজরা মুম্বাই থেকে তাদের সামরিক বাহিনী নিয়ে এলো পশ্চিম উপকূলীয় নগরী মঙ্গলোরে। ওই সময় এলাকাটির নাম ছিলো কোড়িয়াল বন্দর। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, মহিসুরের সেনাবাহিনীর মনোযোগ সেদিকে সরিয়ে দেওয়া। সংবাদ পেয়ে হায়দার আলী তাঁর যোগ্য ছেলের নেতৃত্বে— ওই সময় যার বয়স ছিলো মাত্র ১৭ বছর— সাত হাজার সৈন্যের একটি প্লাটুন দিয়ে ইংরেজদের প্রতিহত করার জন্যে মঙ্গলোর পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মঙ্গলোর পৌঁছে তাদের অবরোধ করলেন। কিছু দিন পর হায়দার আলী নিজেও মঙ্গলোরের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

ওদিকে হায়দার আলীর মঙ্গলোর গমনের সংবাদ শুনতেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনী প্রথমে বালাঘাট দখল করে নিলো। অল্প কদিনের ভেতর ওয়াম্বাড়ী, হোসকোটাহ, কোলার প্রভৃতি নগরীও মহিসুরের বাহিনীর হাতছাড়া হয়ে গেলো।

---

৪০. মহিসুরের প্রথম যুদ্ধের নেপথ্যের সবগুলো কারণ জানতে অধ্যয়ন করুন প্রফেসর বী শেখ আলীর রচনা British Relation with Hyder Ali

www.boimate.com

ওদিকে হায়দার আলীর মঙ্গলোর পৌঁছার সংবাদ পাওয়া মাত্রই কচ্ছত্র সৈন্যরা সামুদ্রিক পথে মুম্বাই পালিয়ে গেলো। তারা তখন এতোটাই ভয় পেয়েছিলো যে, পলায়নের সময় প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ছাড়া কয়েক হাজার সৈন্য ফেলে চলে গেলো। অথচ ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় হায়দার আলীর সৈন্য সংখ্যায় নেহায়েতই কম ছিলো। পলায়নের সময় ইংরেজ সৈন্যরা এতোটাই বেদিশা হয়ে পড়েছিলো যে, তারা খোদ নিজেদের সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিলো। মঙ্গলোর অভিযান সম্পন্ন করেই হায়দার আলী পূর্বাঞ্চলী রণাঙ্গনে সমবেত সম্মিলিত বাহিনীর ওপর গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে হোসকোটা নগরী পুনরায় দখল করে নিতে সমর্থ হলেন।

একদিকে পশ্চিমাঞ্চলীয় রণাঙ্গন থেকে ইংরেজরা পালিয়েছে। অন্যদিকে এবার পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনেও সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হলো। দু'দিকের পরাজয়ের সংবাদ শুনে মারাঠা ও হায়দারাবাদী ফৌজ প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলো। তারা তখন ভেবে দেখলো, এ মুহূর্তে জান বাঁচাতে হলে সন্ধির বিকল্প নেই। তারা সন্ধিচুক্তিতে রাজি হওয়ার জন্যে ইংরেজদের ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করে দিলা। ওদিকে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের কারণে মহিসুরের সৈন্যরাও ক্লান্তি বোধ করছিলো। তারা তাই এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলো। হায়দার আলী তখন নিযামকে ১০টি ঘোড়া, ৫টি হাতি ও কিছু হীরা-জওহারাত ছাড়াও নগদ পঞ্চাশ হাজার রুপি প্রদান করে ইংরেজদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সফল হন। নিযামের সেনাছাউনী ছিলো ব্যাঙ্গালুরু থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সিনাপাটনাম এলাকায়। সন্ধিচুক্তিতে সাক্ষর করার জন্যে টিপু সুলতান নিজেই মাহফুজ আলী খান ও মীর আলী রেযাকে সঙ্গে নিয়ে নিযামের সেনাছাউনীতে উপস্থিত হলেন। তখন নিযাম টিপু সুলতানের প্রতি এতোটাই সন্তুষ্ট হন যে, তাকে نصیب الله (নসীবুদ্দৌলা) তথা রাজ্যের ভাগ্য উপাধীতে ভূষিত করেন।[৪১]

পুনার মারাঠা বাহিনীও ফিরে চলে গেলো। যার ফলে যুদ্ধের ময়দানে স্রেফ ইংরেজ ও তার অনুগত পুতুল নবাব মুহাম্মদ আলী রয়ে যায়। হায়দার আলী তখন নবাবের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভিল্লোর, ত্রিচ্চিন্নাপল্লি

---

৪১. বিশদ বিবরণ জানতে অধ্যয়ন করুন প্রফেসর বী শেখ আলীর রচনা British Relation with Hyder Ali

www.boimate.com

(Tiruchchirappalli) ও ওয়াম্বাড়ি প্রভৃতি এলাকাগুলোর ওপর আক্রমণ করে পুনরায় দখল করে নিলেন। যার ফলে সে মাদ্রাজে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। যুদ্ধে পরাজয়ের আভাস পেতেই ইংরেজ জেনারেল স্মিথ যুদ্ধের নেতৃত্বভার জেনারেল উডের হাতে ছেড়ে দিলেন। যার ফলে আরেকবার দু'দলের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। সামষ্টিকভাবে এবার হায়দার আলীর দিকে বিজয়ের পাল্লা ঝুঁকে পড়েছিলো। মহিসুরের সৈন্যরা হাজার হাজার ইংরেজ সৈন্য বন্দী করতে সমর্থ হয়। এমনকি এ যুদ্ধের অল্প ক'দিন পর মহিসুরের সেনাবাহিনী মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ কেল্লার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

ইংরেজদের পশ্চাদসরণ ও সন্ধির আবেদন

জেনারেল উড যখন বুঝতে পারলো যে, তার পক্ষে মহিসুরের সৈন্যদের পরাজিত করা অসম্ভব তখন সে চাতুর্যের সঙ্গে দ্রুত হায়দার আলীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলো। হায়দার আলী যদিও ওই সময় এমন অবস্থানে ছিলেন যে, পুরো মাদ্রাজ দখল করে ইংরেজদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন; কিন্তু কিছু রাজনৈতিক কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে তাদের প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। ইংরেজদেরকে মাদ্রাজে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করতঃ নিম্নের ধারাগুলোর ওপর দু'পক্ষের মাঝে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়—

১. উভয় পক্ষ অন্যকে দখলকৃত ভূমি ফেরত দেবে।
২. পরস্পরে বন্দী বিনিময় হবে।
৩. প্রয়োজনের সময় এক পক্ষ অপর পক্ষকে সামরিক সহায়তা করতে বাধ্য থাকবে।
৪. নবাব মুহাম্মদ আলীর কিছু এলাকা হায়দার আলীর হাতে তুলে দেয়া হবে।

মোটকথা, হায়দার আলী শত্রুপক্ষের সঙ্গে উদার আচরণের যেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার নজির ইতিহাসের পাতায় বিরল। যদিও এ কথা আপন স্থানে সত্য যে, হায়দার আলীর সেই উদারতা ও শিথিলতা পরবর্তীকালে তার জন্যে প্রাণঘাতী বিষ প্রমাণিত হয়েছিলো এবং এটাই সালতানাতে খোদাদাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যদি তিনি সুযোগের

www.boimate.com

সদ্ব্যবহার করে তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজ দখল করে সেখানে তার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতেন এবং সেখান থেকে তখনই ইংরেজদের সমূলে বিতাড়িত করতেন তাহলে সম্ভবত ইংরেজরা এতো দ্রুত মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি পেতো না। কিন্তু হায়দার আলী স্রেফ এ নিয়তে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, অঙ্গীকার মুতাবেক তিনি মারাঠাদের বিপক্ষে ইংরেজদের কাছ থেকে সামরিক সহায়তা পাবেন। কারণ, পূর্বের যুদ্ধগুলোর আলোকে তিনি মনে করেছিলেন, মারাঠারাই এ মুহূর্তে তার আসল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। যদিও হায়দার আলী পরবর্তীকালে তার সিদ্ধান্তের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর ওপর সীমাহীন আফসোস ব্যক্ত করেছেন। একসময় ইংরেজরাই হায়দার আলীর জন্যে মারাঠাদের চেয়েও চরম শত্রু প্রমাণিত হয়েছে।

আলোচনার সারকথা হলো, ১৭৬৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের যেই প্রথম যুদ্ধ সংঘঠিত হয় ১৭৬৯ সালে সেই যুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়েছিলো হায়দার আলীর বিজয় ও ইংরেজদের পরাজয়ের মাধ্যমে।

বিজয়ীবেশে হায়দার আলী একটি বিশাল রাজকীয় জৌলুসের সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে নিজ নিবাস-নগরী শ্রীরঙ্গাপত্তনাম প্রত্যাবর্তন করেন। ওই বিজয় মিছিলে হায়দার আলীর সঙ্গে ছিলো ৫০ হাজার অশ্বারোহী ও ৮০ হাজার পদাতিক সৈন্য। রাজসিংহাসনে আরোহণের পর থেকে এ পর্যন্ত হায়দার আলীকে যতোগুলো যুদ্ধের মুখোমুখী হতে হয়েছে তার মধ্যে এটাই ছিলো সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে তিনি প্রশান্তির সঙ্গে নিঃশ্বাস গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন।

মারাঠাদের দ্বিতীয় আক্রমণ

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে, হায়দার আলী মারাঠি সৈন্যদেরকে নগদ ৮ লক্ষ টাকা ও বকেয়া ৫০ লক্ষ টাকা দেয়ার অঙ্গীকার করে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাদেরকে পুনায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৬৯ সালে মারাঠা সর্দার মাধুয়া রায় যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে হায়দার আলীর জয়লাভ ও মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সন্ধিচুক্তির সংবাদ শুনতে পায় তখন সে এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। সে অঙ্গীকারকৃত বকেয়া ৫০ লক্ষ রুপি

www.boimate.com

হায়দার আলীর কাছ থেকে উসূলের নিয়তে অভিযানে নেমে পড়ে। সে ভেবেছিলো, হায়দার আলী একাধারে দু' বছর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। যার ফলে এখন তার শক্তি নিঃশেষ হয়েছে। সে এখন ৫০ লক্ষ রুপি প্রদানে ব্যর্থ হলে তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে অধিকৃত এলাকাগুলো ফেরত নেয়া যাবে।

ওদিকে হায়দার আলী নিজেও পরাজিত মারাঠি সিপাহিদেরকে তাদের সর্দার মাধুয়া রায়ের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে যাচ্ছিলো। যার কারণে মারাঠি সৈন্যরা হায়দার আলীর কাছে প্রত্যাশা করছিলো যে, তিনি যেন মাধুয়া রায় থেকে প্রতিশোধের ষোলকলা বুঝে নেন। ১৭৭০ সালে মাধুয়া রায় এক লক্ষ মারাঠি অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে মহিসুরের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog)-এর রাজা ও শাহনুর (Savanur)-এর নবাবও তার সঙ্গে জোট বাঁধে। যাওয়ার পথে মাধুয়া রায় অসুস্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। যার কারণে সে সৈন্যদলের নেতৃত্বের ভার তার সেনাপ্রধান তুর্মুক রাওয়ের হাতে তুলে দেয়। তাকে সার্বিক সহায়তা করার জন্যে তার মন্ত্রী নানা ফর্নাবিশ (Nana Phadnavis) থেকে যায়।

হায়দার আলী যখন মারাঠিদের দ্বিতীয়বার আক্রমণের সংবাদ শুনতে পান তখন তিনি ২৫ হাজার সৈন্যকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ফৌজি কেল্লা সুরক্ষার কাছে রেখে দেন। সমানসংখ্যক সিপাহিকে তিনি তার অধীনস্থ একাধিক কমান্ডার যথাক্রমে মীর রেযা, মাখদুম আলী, ভেঙ্কট রাও ও সুযোগ্য সন্তান টিপু সুলতানের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেন। অবশিষ্ট ৩৫ হাজার সৈন্য নিজের অধীনে রেখে দেন। যেহেতু হায়দার আলী মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে অনেকগুলো যুদ্ধ করেছেন, যার কারণে তাদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে তিনি শতভাগ অবহিত ছিলেন। যার কারণে তিনি তার কমান্ডারদেরকে গেরিলা আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। কারণ সীমাহীন মারাঠি সিপাহীদের বিরুদ্ধে সীমিত সৈন্য ও জনবল নিয়ে খোলা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার অর্থ নিজেই নিজের পরাজয় নিমন্ত্রণ করা। মাদরাজ চুক্তি অনুসারে তিনি ইংরেজদের কাছে সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করেন; কিন্তু যেই জাতির রগে-রন্ধ্রে প্রতারণা ও চাতুর্য মিশে আছে, তারা কীভাবে অঙ্গীকার রক্ষা করবে! তাই হলো, তারা যথারীতি অঙ্গীকার থেকে সরে দাঁড়ালো।

www.boimate.com

মারাঠিদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রথমদিকে মহিসুরের সৈন্যরা পেছন দিকে সরে যেতে থাকে। যার ফলে দেশের পূব-দক্ষিণাঞ্চলের অনেকগুলো এলাকা মারাঠিরা দখল করে নেয়। কারণ হলো, এতোক্ষণ পর্যন্ত মহিসুরের সিপাহিরা স্রেফ নিজেদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই তীব্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে টিপু সুলতান যেই কীর্তি স্থাপন করেন, তা খোদ হায়দার আলীকেও বিস্মিত করেছিলো। টিপুর নেতৃত্বে যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে গেরিলা আক্রমণের কৌশল এতোটাই সফলতা এনে দেয় যে, তখন হাজার হাজার মারাঠি সৈন্যের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। আক্রমণের তীব্রতায় মহিসুরের সৈন্যরা যেখান থেকে সরে আসতো বাধ্য হতো সেখানে রয়ে যাওয়া রসদ, খাবার ও পানি যেনো মারাঠি সিপাহিরা ভোগ করতে না পারে; এজন্যে হায়দার আলীর নির্দেশে তার সৈন্যরা সেখানকার পানি নষ্ট করে ফেলতো বা তার সঙ্গে বিষ মিলিয়ে দিতো বা ক্ষেত-খামারে আগুন জ্বালিয়ে দিতো। হায়দার আলীর আরেকজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ আলীও এ সময় বিস্ময়কর নৈপূণ্য প্রদর্শণ করেছেন। কাভেরি নদীর তীরে বসে মারাঠি সিপাহিরা যখন ধর্মীয় স্নানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছিলো তখন তিনি টিপুর সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চোরাপথে হাজির হয়ে এমন তীব্র আক্রমণ করেন যে, ঘটনাস্থলেই শত্রুদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়।

ওদিকে ৩৫ হাজার মারাঠি সৈন্য একমাসেরও অধিক সময় শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অবরোধ করে রেখেও তার ভেতরে প্রবেশে ব্যর্থ হয়। মাধব রাও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েও অসুস্থতার কারণে ফিরে গিয়েছিলো। ১৭৭২ সালে সে মৃত্যুবরণ করে। তার স্থলাভিষিক্ত কে হবে, তা নিয়ে পুনায় নারায়ণ রাও ও রাঘুনাথ রাওয়ের মাঝে বিবাদ বেঁধে যায়। প্রথমে নারায়ণ রাও ক্ষমতার সিংহাসনে বসে; কিন্তু পরে তাকে হত্যা করা হয়। যার ফলে রাঘুবা ক্ষমতার ছড়ি পেয়ে যায়। পুনায় ঘটে যাওয়া এসব কলহ থেকে হায়দার আলী রাজনৈতিক সুবিধা সার্থকতার সঙ্গে আদায় করে নেন। এবার তিনি ২৪ লক্ষ রুপি নগদ পরিশোধ করে, অবশিষ্ট ২৬ লক্ষ রুপি পরবর্তীকালে পরিশোধের অঙ্গীকার করে মারাঠি সিপাহিদের পুনরায় ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন।

আলোচনার সারকথা হলো, মারাঠিদের বিরুদ্ধে মহিসুরের যেই যুদ্ধ ১৭৭০ সালে শুরু হয় তা ছোট ছোট বিরতি সহকারে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত

www.boimate.com

অব্যাহত থাকে। কোনো ধরনের পরিণতি ছাড়াই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। অবশ্যই এ যুদ্ধের কারণে দু' পক্ষকেই প্রচুর জীবন ও সম্পদের ক্ষতি পোহাতে হয়েছে। সামষ্টিকভাবে এতে হায়দার আলীর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আর মারাঠিদের প্রচুর জনবল খোয়াতে হয়েছে। তাদের অজস্র সৈন্য নিহত হয়েছে, এরচেয়েও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে হায়দার আলীকে ২৪ লক্ষ রুপি নগদ পরিশোধ করে মারাঠিদের ফেরত পাঠাতে হয়, এজন্যে তার রাজকোষের ওপর তা গভীর প্রভাব ফেলে। কিন্তু হায়দার আলী তার অনন্য যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে সেই প্রভাব কাটিয়ে ওঠতে সক্ষম হন।

বিজয়ী বেশে অগ্রযাত্রা ও মামলাকাতে খোদাদাদের সম্প্রসারণ

যেহেতু মারাঠিদের সঙ্গে সংঘঠিত যুদ্ধগুলোতে হায়দার আলীর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, এজন্যে সেই ক্ষতিপূরণ উঠাতে হায়দার আলী এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যে, এখন শুধু পূর্বের এলাকাগুলোর ওপর পুনঃনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেই যথেষ্ট হবে না; বরং আরো নতুন নতুন এলাকাও জয় করতে হবে। ওদিকে মারাঠি সিপাহীরাও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। এজন্যে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সিরা (Sira) প্রদেশ দ্বিতীয়বার দখল করার জন্যে— যে প্রদেশটিকে বর্তমানে মারাঠিরা দখল করে রেখেছে— সুযোগ্য পুত্র টিপুকে প্রেরণ করেন। মাত্র তিন মাসের অতি অল্প সময়েই টিপু সুলতান তা জয় করতে সমর্থ হন। এ বিজয়ের মাত্র চার দিনের মাথায় তিনি মারকারাহ ও গোরাক নগরীদ্বয়ও জয় করেন। কিছু দিন পর হোসকোটাহ জয় করে দ্বিতীয়বারের মতো তা সালতানাতে খোদাদাদের অধীনে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। ১৭৭৫ সালে বালারী ও ১৭৭৯ সালে চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog), কাডাপ্পা (Kadapa) সহ প্রভৃতি নগরী জয় করে সেখানে মহিসুরের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) ও কৃষ্ণা নদীর আশপাশের যেই অঞ্চলগুলো এতোদিন মারাঠিরা দখল করে রেখেছে, হায়দার আলী সেগুলো জয় করেন। মালাবার, কোচি (Cochin) ও নীলগিরির প্রভৃতি ভূখণ্ড জয় করে সেগুলোকে 'দক্ষিণ কিয়ানারা' নামে একটি পৃথক প্রদেশের মর্যাদা দান করেন। দীর্ঘাঙ্গিকতা এড়াতে আমরা হায়দার আলীর বিজয়প্রবাহের বিশদ বিবরণ এখানে পেশ করব না।

www.boimate.com

ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের দ্বিতীয় যুদ্ধ

যুদ্ধের মাঝে কেউ কারো চিরন্তন বন্ধু বা শত্রু থাকে না। অনেক সময় বিজয় বা পরাজয়ের পর দীর্ঘ দিনের শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়, আবার দীর্ঘ দিনের বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হয়। সালতানাতে খোদাদাদের আশপাশে যতোগুলো রাজ্য ছিলো, অর্থাৎ মারাঠা, নিযাম, নবাব ও ইংরেজ তারাও পরস্পরে কোনো অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা বুনিয়াদের কারণে সম্মিলিত জোটবদ্ধ হয়নি। হ্যাঁ, তাদের সবার অভীষ্ট লক্ষ্য ছিলা একটাই। তাহলো, তারা প্রত্যেকেই হায়দার আলীকে তাদের অস্তিত্ব ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভয়াবহ হুমকি মনে করতো। তারা মনে করতো, পথের এই কাঁটা সরিয়ে দিতে পারলে তাদের সাম্রাজ্য সুরক্ষিত থাকবে। যেহেতু তাদের এই জোট দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ঐক্যের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এ কারণে দেখা যেতো— নেহায়তই সামান্য ব্যক্তিস্বার্থ ও সাময়িক মুনাফার লোভে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে কুণ্ঠিত হতো না। যেমন মহিসুরের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ চলাকালে শুধু পঞ্চাশ হাজার রুপি ও দশটি হাতি দিয়ে হায়দার আলী হায়দারাবাদের নিযামকে ইংরেজদের থেকে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সম্মিলিত জোটের অন্যতম অংশিদার নবাব মুহাম্মদ আলী কার্যত ইংরেজদের অনুগত ছিলো।

এই সম্মিলিত জোটের চার অংশিদারের মধ্য হতে হায়দারাবাদাদের নিযামই ছিলো সবচেয়ে দুর্বল অংশিদার। কখনই সে শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। সবসময় প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধনীতি অবলম্বন করতো। তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) ও কৃষ্ণা নদীর আশপাশের অঞ্চল ছিলো মারাঠিদের নিয়ন্ত্রণে। মারাঠারা মূলত ছোট ছোট অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। তাদের পরস্পরে গড়ে ওঠা ঐক্য ছিলো অত্যন্ত ঢিলেঢালা ও দুর্বল। এই চার শক্তির মধ্য হতে একমাত্র ইংরেজরাই ছিলো সবচেয়ে শক্তিশালী। তাদের শাসনক্ষমতা মাদরাজ, বঙ্গদেশ ও মুম্বাইয়ে দিন-দিন সুদৃঢ় হচ্ছিলো।

যেহেতু প্রথম যুদ্ধে তাদেরকে হায়দার আলীর প্রস্তাবিত শর্তের ওপর একমত হয়ে সন্ধিচুক্তি করতে হয়েছিলো; এজন্যে সে সন্ধিচুক্তি ছিলো খোদ তাদের কাছেই পরাজয়ের নামান্তর। যার কারণে তারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার সমূহ প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলো। কারণ, হায়দার

www.boimate.com

আলীর কাছে তারা বিগত যুদ্ধে যেই লজ্জা পেয়েছিলো, তার কলঙ্ক তিলক মুছতে বদ্ধপরিকর ছিলো।

ওদিকে হায়দার আলীও ইংরেজদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ, তারা মারাঠাদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত যুদ্ধে মাদ্রাজ চুক্তি অনুসারে হায়দার আলীকে সঙ্গ দেয়নি। কিন্তু ইংরেজদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, হায়দার আলীর বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধের ময়দানে নামার সাহস ওদের কখনই ছিলো না। তারা সবসময় মহিসুরের আশপাশের রাজ্যগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে হায়দার আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কৌশল অবলম্বন করতো।

শত্রুপক্ষের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা

অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে হায়দার আলী ইংরেজদের সেই মানসিক দুর্বলতা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি ভালোভাবে জানতেন যে, ইংরেজরা কখনই তার বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধে নামার কল্পনাও করবে না। তিনি ইংরেজদের সেই কূটিল চক্রান্ত ধরতে পেরে সর্বপ্রথম শত্রু-শিবিরে ভাঙন সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। যেহেতু নবাব মুহাম্মদ আলী ছিলো ইংরেজদের পাচাটা গোলাম, তার সিংহাসন ইংরেজদের দয়ার ফসল; এজন্যে তার পেছনে চেষ্টা করাটা নিরর্থক হবে। এজন্যে হায়দার আলী তার ওপর বিন্দু পরিমাণ মনোযোগ দেননি।

বাকি রইলো হায়দারাবাদের নিযাম আর মারাঠা। এ দু'টি রাজ্যের মধ্যে সামরিক শক্তিমত্তা বিবেচনায় মারাঠারা ছিলো খানিকটা মজবুত। কিন্তু ক্ষমতার টানাপড়েনের কারণে তাদের সেনাবাহিনী পূর্ব থেকেই দু'টি শিবিরে বিভক্ত ছিলো। একদলের নেতৃত্বের ভার ছিলো নারায়ণ রাওয়ের সদ্য কৈশোরে অবতীর্ণ ছেলের হাতে। তার অন্যতম উযির হলেন নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)। সৈন্যদের অপরদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো রঘুনাথ রাও। পুনার এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময় ইংরেজদের একচেটিয়া সমর্থন ছিলো রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষে। ইংরেজদের ইচ্ছে ছিলো, এখানেও তারা কর্নাটকের নবাব মুহাম্মদ আলীর মতো একজন পুতুল রাষ্ট্রপ্রধানকে গদিতে বসাবে। তাহলে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে তাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে। রঘুনাথ রাওয়ের প্রতি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা দেখে নানা ফার্নাভেজ হায়দার আলীর কাছে

www.boimate.com

সাহায্য প্রার্থনা করেন। হায়দার আলী তো পূর্ব থেকেই এই মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে সামরিক সহায়তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ওদিকে হায়দারাবাদের নিযামের নিয়ন্ত্রণাধীন গোন্টুর এলাকা ইংরেজরা দখল করে নেয়। যার কারণে স্বভাবতই তিনি ইংরেজদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি তখন সামরিক সাহায্য-সহযোগিতার আবেদন নিয়ে হায়দার আলীর দ্বারস্থ হন। হায়দার আলী যদিও নিযামের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিলেন না; কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকৌশলের দিকে তাকিয়ে তিনি নিযামের আবেদন মঞ্জুর করেন। কারণ আশঙ্কা ছিলো, নিযামকে ফিরিয়ে দেয়া হলে সে পুনরায় তার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে। এ কারণে তিনি একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সহায়তা করতে রাজি হয়ে যান।

ওদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসিদের সম্পর্কের টানাপড়েন চলছিলো। যেকোনো সময় দু'পক্ষের মাঝে গোলযোগ বেঁধে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেই রাজনৈতিক টানাপড়েন থেকে সুযোগ বের করে ইংরেজরা ভারতে ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা পান্ডেচেরি (Pondicherry) আক্রমণ করে দখল করে নেয়। মালাবার ছিলো হায়দার আলীর শাসনাধীন এলাকা— ফরাসিরা হায়দার আলীর অনুগত হয়ে এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করতো। ইংরেজরা মালাবার সমুদ্র বন্দরের ওপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এগোতে শুরু করে। নিরূপায় হয়ে ফরাসিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে হায়দার আলীর কাছে সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করে। যেহেতু মাদ্রাজ সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করে মারাঠাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে ইংরেজরা হায়দার আলীকে কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা না করে তাদের রক্তজ বৈশিষ্ট্য গাদ্দারি ও বেঈমানির স্বাক্ষর রেখে ছিলো, এজন্যে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হায়দার আলী পূর্ব থেকেই অস্থির ছিলেন। ফরাসিদের সহায়তার আবেদন হায়দার আলীর সামনে প্রতিশোধের মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছিলো। তিনি তাদের সেই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়ে দিলেন।

ইংরেজরা যখন এ তথ্য শুনতে পায় যে, গন্টুর দখল করার কারণে হায়দারাবাদের নিযাম তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে হায়দার আলীর সঙ্গে জোট বেঁধেছে তখন তারা কালবিলম্ব না করে নিযামকে গন্টুর এলাকা ফিরিয়ে দিলেন। হায়দার আলীর সেই আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করে

www.boimate.com

নিযাম যুদ্ধের আগমুহূর্তে মহিসুর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা জানিয়ে দিলো। ওদিকে পুনায় নানা ফার্নাভেজের সঙ্গে সামরিক সহায়তার যেই সন্ধি হয়েছিলো, তার ওপর লিখিত আকারে কোনো চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। হায়দার আলীর সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে দেখে ইংরেজরা দ্রুততার সঙ্গে তাদের সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিলো। অবশেষে হায়দার আলীও বাধ্য হয়ে ২৮ মে ১৭৮০ সালে তার ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের মুকাবেলা করার জন্যে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম থেকে বের হলেন। সৈন্যদলের মাঝে ২৮ হাজার অশ্বারোহী ছাড়াও প্রচুর ফরাসি সৈন্য ছিলো। মারাঠা ও নিযামকে পাশে না পাওয়ার কারণে ইংরেজরা একাকী লড়াই করতে সাহস পাচ্ছিলো না। এজন্যে তারা তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধি গার্ল-কে শান্তির বার্তা সহকারে প্রেরণ করে। হায়দার আলী তাদের অতীতের অবিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার দুঃসহ স্মৃতির ওপর বিদ্রুপ করে শান্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

যুদ্ধের সূচনা

হায়দার আলী যখন শ্রীরঙ্গাপত্তনাম থেকে রওয়ানা হন তখন তিনি তার সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে গোটা বাহিনীকে বিভিন্ন সামরিক কর্মকর্তার অধীনে বিভক্ত করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেন। ওই সময় টিপু সুলতানের বয়স ছিলো ২৯ বছর। হায়দার আলী তার অধীনে ৭ হাজার সিপাহি দিয়ে তাকে পাইনঘাটের দিকে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে হায়দার আলীর বাহিনী কাভেরিপাটনাম, কুঞ্জিওয়ারাম, মাহমুদ বন্দর প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করে সামনে অগ্রসর হয়ে পোলিলুর নামক স্থানে পৌঁছে ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হয়। দু'পক্ষের মাঝে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। কর্নেল বেলীর নিয়ন্ত্রণাধীন ইংরেজ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। হাজার হাজার সিপাহি নিহত হয়। ৩৬ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ২ হাজার সাধারণ সিপাহি গ্রেফতার হলে তাদেরকে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পাঠিয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে জেনারেল মনোরো নিজেও একটি সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো। জেনারেল বেলীর পরাজয়ের সংবাদ শুনে কাঞ্জিওয়ারাম ঝিলে নিজেদের সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করে রাস্তা থেকেই মাদ্রাজের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। হায়দার আলী সেখান থেকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ভিল্লোর দখল করে নেন। নবাব মুহাম্মদ আলীর

www.boimate.com

সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধেও হায়দার আলী খুব সহজেই জয়লাভ করেন। মুহাম্মদ আলীর পরাজয়ের পর তার কয়েকজন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা মহিসুরের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন সাইয়্যেদ হামেদ, রাজা বীরবর ও মীর সাদেক। হায়দার আলী তাদের অতীত অবস্থান বিবেচনা করে তার সেনাবাহিনীর মাঝে তাদেরকে তাদের পূর্বের পদেই নিযুক্ত করেন। মীর সাদেক আলীকে শুল্ক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদে নিয়োগ দেয়া হয়। সাইয়্যেদ হামেদ সহ অন্যদেরকে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অতিগুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করা হয়।

পোলিলুর যুদ্ধে হায়দার আলী ইংরেজ জেনারেল বেলীর অধীনস্থ বাহিনীকে পরাজিত করার পর থেমে যাননি। তিনি বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকেন। ইংরেজরা এভাবে ধারাবাহিকভাবে নিজেদেরকে পরাজিত হতে দেখে হায়দার আলীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করার সকল চেষ্টা-তদবির ব্যয় করে। কিন্তু হায়দার আলীকে তার সামরিক কর্মকর্তাদের একাংশ এ পরামর্শ প্রদান করেন যে, পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সন্ধির ফাঁদে পা দেয়া সমীচিন হবে না। তাদের সেই পরামর্শ মেনে নিয়েই হায়দার আলী ইংরেজদের সকল সন্ধিমূলক প্রস্তাব নাকচ করে যাচ্ছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুলতান টিপুর নিয়ন্ত্রণাধীন মহিসুর সেনাবাহিনী 'সাতগড়' নগরী জয় করে নেয়। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি তিয়াঘগড় ও আম্বুর প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করে মহিসুর সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। মহিসুর সেনাবাহিনী পশ্চিম উপকূলীয় শহরগুলোর ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১০ আগস্ট ১৭৮১ সালে তারা মাদ্রাজ পৌঁছে আকস্মিক আক্রমণ করে। আক্রমণের তীব্রতায় দিশেহারা ইংরেজ সৈন্যরা পালিয়ে তাদের যুদ্ধ জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই যুদ্ধে ইংরেজদের দু' হাজার সৈন্য বন্দি হয়। এরচেয়েও অধিক সৈন্য মহিসুর বাহিনীর হাতে নিহত হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, পুরো মাদ্রাজের ওপর হায়দার আলীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ওদিকে ইংরেজদের ক্রমাগত পরাজয়ের সংবাদ যখন গোটা দেশ এবং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তখন ইংরেজদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। নিরূপায় হয়ে ভারতের ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ার্ন হিস্টিঙ্গার ইংরেজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার

www.boimate.com

জেনারেল আয়ার কোর্টের হাতে তুলে দেন। ক্ষমতার এই পটপরিবর্তন প্রথম দিকে ইংরেজ শিবিরে খানিকটা সুফল এনে দেয়। তারা মাহমুদ বন্দর ও উরনী নগরীর ওপর দ্বিতীয়বারের মতো নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। ফরাসিরা যেহেতু এ যুদ্ধে হায়দার আলীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলো, এজন্যে যুদ্ধে বিজয়ের পূর্বাভাষ দেখে প্রথম দিকে তারা নিঃশ্চিন্তিত থাকে; কিন্তু এরপর যখন ইংরেজদের পাল্লা ভারী হতে শুরু করে তখন তাদেরই অনুরোধে হায়দার আলীর সহায়তার জন্যে এডমিরাল স্যাফার্নের অধীনে সামুদ্রিক পথ দিয়ে নৌবাহিনীর সামরিক রসদ পৌঁছানো হয়। রসদের তালিকায় ছিলো অসংখ্য নৌসেনা সমৃদ্ধ ৫টি যুদ্ধ জাহাজ ও পরিবহনের নানা প্রয়োজনীয়তা সামাল দেওয়ার জন্যে অতিরিক্ত ৮ টি জাহাজ। এই নৌবহরে সাত হাজার ফরাসি সিপাহী ও এক হাজার কামান ছিলো। ফরাসিদের এই সামরিক সহায়তা হায়দার আলীর সামরিক ক্ষমতাকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তোলে। একসঙ্গে ফরাসি বাহিনী সামুদ্রিক পথ দিয়ে এবং মহিসুরের সেনাবাহিনী স্থলপথ দিয়ে ইংরেজদের ওপর যুগপৎ আক্রমণ শুরু করে দেয়। তীব্র আক্রমণের মধ্য দিয়ে উরনী নগরীর ওপর পুনরায় মহিসুরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওদিকে মালাবারের নায়ারা বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। একই কাণ্ড ঘটে কোর্গ (Coorg) নগরীতে। হায়দার আলী সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্যে টিপুর নেতৃত্বে মালাবারে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। ওদিকে মীর মাখদুম আলীকে প্রেরণ করেন কোর্গ (Coorg) নগরীতে। মীর মাখদুম আলী যুদ্ধের এক পর্যায়ে শাহাদাত লাভ করেন। ফলশ্রুতিতে এখানকার বিদ্রোহ দমন করা যায়নি; কিন্তু টিপু সুলতান পূর্ণ সফলতার সঙ্গে নায়ারদের বিদ্রোহ দমন করেন। পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি সেখানে কিছু দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

হায়দার আলীর অসুস্থতা

নভেম্বর ১৭৮২ সালে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের যুদ্ধ চলছিলো হঠাৎ হায়দার আলী অসুস্থ হয়ে পড়েন। যার কারণে তিনি আরকাটে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার শরীরে ফোঁড়া দেখা দিয়েছিলো। চিকিৎসকরা সাধারণ ফোঁড়া মনে করে চিকিৎসা চালিয়ে যান। ফরাসি অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও মহিসুরের সেনাবাহিনরীর হিন্দু-মুসলিম হেকিমগণ

www.boimate.com

তাকে যেকোনো মূল্যে সারিয়ে তোলার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু সবশেষে বুঝে আসে যে, এই ফোঁড়া আসলে ক্যান্সারের পূর্বাভাষ ছিলো। ক্যান্সারের কোনো চিকিৎসা ওই যুগে আবিষ্কৃত হয়নি। রোগের প্রকোপ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কারণে মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে হায়দার আলী টিপু সুলতানকে মালাবারের সফল অভিযান শেষে ফিরে আসার নির্দেশ জানিয়ে চিঠি লেখেন। ইনতিকালের মাত্র একদিন আগে তিনি প্রিয়পুত্রকে যেই চিঠি লিখেছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিলো এরকম–

> চোখের জ্যোতি ও অন্তরের প্রশান্তিদায়ক বাবা আমার!
>
> যদি ওই অঞ্চলের বিদ্রোহীদের ওপর যথাযোগ্য দণ্ডপ্রয়োগের পর তুমি বাস্তবেই স্থির হয়ে থাকো, আন্তরিকভাবে সুস্থির হও তাহলে পিতার আঁখিযুগলকে তোমার সাক্ষাত দিয়ে দ্রুত আলোকময় করো। যদি কোনো সামরিক রসদ বা সৈন্যের প্রয়োজন বোধ করো তাহলে তার বিবরণ অবশ্যই আমার কর্ণকুহরে পৌঁছাবে।
>
> ইতি– হায়দার আলী

পৃথিবী থেকে প্রস্থান

চিঠি পড়ামাত্রই টিপু ফেরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি যখন পাইনঘাটে পৌঁছেন, অর্থাৎ ১ লা মুহাররম ১১৯৬ হিজরী, মুতাবেক ৭ ডিসেম্বর ১৭৮২ ঈসাব্দে রাতের বেলা চিতুর আরকাট গ্রামের নিকটবর্তী 'নরসিঙ্গ নারায়ণ পেট'[৪২] এলাকায় হায়দার আলী পরকালের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।

ইনতিকালের সময় সৌরবর্ষ হিসেবে তার বয়স হয়েছিলো ৬০ বছর এবং চন্দ্রবর্ষ অনুসারে ৬২ বছর।[৪৩] মৃত্যুর একদিন পূর্বে অর্থাৎ যিলহজের শেষ তারিখে তিনি উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আজ কত তারিখ? উত্তরে জানানো হয়, আজ মুহাররমের চন্দ্ররাত। প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, আমাকে গোসল করিয়ে দাও। নির্দেশ অনুসারে তাকে গোসল

---

৪২. তামিলনাড়ুর একটি নগরী।

৪৩. স্মর্তব্য যে, সৌরবর্ষের মাঝে সূর্যের বার্ষিক প্রদক্ষিণের ভিত্তিতে প্রতি ৩৩ সৌরবর্ষের পর চন্দ্রবর্ষে ১ বছরের সংযোজন ঘটে।

www.boimate.com

দেয়া হয়। নতুন কাপড় পরানো হয়। হায়দার আলী কালিমা-দরুদ শরীফ পাঠ করতে লাগলেন। কখনও মুখে উচ্চারণ করে পড়ছেন। কখনও মনে মনে পড়ে মুখের ওপর হাত বুলিয়ে নিতেন। সরকারি কর্মচারীদেরকে একমাসের অতিরিক্ত বেতন এবং ফকির-মিসকিনদেরকে মুক্তহস্তে সদকা দানের নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুক্ষণ আগে তিনি উত্তর আরকাট জয় করার জন্যে তার সেনাবাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার যেই আদেশ করেছিলেন, তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

মোটকথা, উপস্থিত লোকদের বক্তব্য হলো, হায়দার আলী বুঝতে পেরেছিলেন, তার জীবনের খুব একটা বাকি নেই। তবে যেহেতু তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, এজন্যে রাজনৈতিক কর্মকৌশল হিসেবে তার ইনতিকালের সংবাদ লুকিয়ে রাখা হয়। এবং এ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে পূর্ণ সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। যেসকল আগন্তুক অন্য দেশ থেকে এসেছে তাদের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হয়। ডাক-চিঠিপত্রের ওপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। যেকোনো সাধারণ দিনের তুলনায় ওই সময় গোয়েন্দাবৃত্তি ও সতর্ক দৃষ্টির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের গতিবিধির ওপরও বিশেষ পর্যবেক্ষণ রাখা হয়।

মালাবার থেকে সুলতান টিপুর আগমন

ওই সময় টিপু সুলতান ছিলেন মালাবারের অভিযানে। তার কাছে পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রেরণের জন্যে মহা মির্যা খানকে প্রেরণ করা হয়। ওদিকে টিপু পিতার চিঠি পেয়ে ফেরার পথ ধরে ততোক্ষণে পাইনঘাটে চলে এসেছিলেন। সেখানেই তাকে এই দুঃসংবাদ জানানো হয়। পিতার মৃত্যুর সংবাদ শোনামাত্রই টিপুর দুচোখ বেয়ে গলগল করে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যদি আব্বাজানকে আরও কিছু দিন জীবিত রাখতেন তাহলে তিনি ইংরেজদেরকে এ দেশ থেকে অবশ্যই বের করে ছাড়তেন। আহ! আল্লাহ যদি তাকে সে পর্যন্ত জীবিত রাখতেন!'

টিপু তখন আরশাদ বেগকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দ্রুত নরসিংঘ নারায়ণ পেটের উদ্দেশে রওয়ানা হন। ওদিকে হায়দার আলীর মন্ত্রীবর্গ

www.boimate.com

তার মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখার জন্যে এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, তার লাশ একটি বড় সিন্দুকে রেখে স্বশস্ত্র সৈন্যদের প্রহরায় শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পাঠিয়ে দেন। যেন লোকেরা মনে করে যে, নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো বড় খাজানা অন্যত্র স্থানান্তর করা হচ্ছে। সেই সিন্দুকটি পথিমধ্যে কিছু সময় কুলার নগরীতে তার পিতা ফাতাহ মুহাম্মদের কবরের পাশে রাখা হয়। এরপর সেখান থেকে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের লালবাগে নিয়ে আসা হয়। সেখানে টিপুর একান্ত ইচ্ছায় বিশেষ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নির্মিত গম্বুজের নিচে সমাহিত করা হয়। টিপুর শ্রীরঙ্গাপত্তনামে পৌঁছার আগ পর্যন্ত রাজসিংহাসন শূন্য না রেখে তদস্থলে তার ছোট ভাই করীম শাহকে সেখানে সমাসীন করে রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম যথারীতি সচল রাখা হয়। এ সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে যেসকল মন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তন্মধ্যে তালিকার অগ্রভাগে থাকবেন গাজী খান, বদরুজ্জামান খান, আবু মুহাম্মদ, মুহাম্মদ আলী কামীদান, পুর্নিয়া, কৃষ্ণ রাও, শামিয়া ও মীর সাদেক প্রমুখ। যথাসম্ভব সতর্কতা বজায় রাখা সত্ত্বেও হায়দার আলীর মৃত্যুর সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যেমনটি আশঙ্কা করা হয়েছিলো— অনিষ্টকামীরা বিভিন্ন স্থানে মাথা তুলে দাঁড়াবার কসরতও চালিয়ে যায়। একটি ঐতিহাসিক সূত্রে এ তথ্য এসেছে যে, খোদ টিপুর চাচাতো ভাই মুহাম্মদ আমীন বখশী শামসুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে এ চক্রান্ত করেছিলো যে, টিপুর স্থলে যেনো তার মানসিক বিকলাঙ্গ ও অনভিজ্ঞ ভাই করীম শাহকে রাজসিংহাসনে বসানো হয়। তাহলে এর আড়ালে সে রাষ্ট্রের বাগডোর বগলদাবা করতে সমর্থ হবে। টিপু সুলতান যখন তাদের সেই দূরাভিসন্ধির তথ্য লাভ করেন তখন তিনি তাদের দুজনকে হাতকড়া পরিয়ে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মহিসুর সেনাবাহিনী টিপু সুলতানের প্রশাসন পরিচালনার দক্ষতার কথা ভালোভাবেই জানতেন। এজন্যে তারা কোনো ধরনের বিদ্রোহ করেনি। বরং এহেন নাজুক মুহূর্তে তারা পূর্ণ বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ওদিকে ইংরেজদের অবস্থা ছিলো অবর্ণনীয়। হায়দার আলীর মৃত্যুর সময় অনেকগুলো রণাঙ্গণে তাদের সৈন্যরা চরমভাবে মার খাচ্ছিলো। নানা ফার্নাভেজের মারাঠি বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে নেমে আসতে পূর্ণ প্রস্তুত ছিলো। বঙ্গদেশে তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলোর ওপর আক্রমণ করার জন্যে নাগপুরের রাজা ইতোমধ্যে তরবারি কোষমুক্ত করে

www.boimate.com

ফেলেছে। এসকল জটিলতা ও বহুবিধ সমস্যার কারণে ইংরেজদের একান্ত ইচ্ছে ছিলো– যেকোনো উপায়ে হোক, এ যুদ্ধ যেন বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয়। এজন্যে তারা এ গুজব রটিয়ে দেয় যে, হায়দার আলী ইনতিকালের কিছু দিন পূর্বে মালাবারে অবস্থানরত টিপু-কে পত্রযোগে এ কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'ইংরেজরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের সঙ্গে সংঘাত নিরর্থক। এজন্যে সন্ধি করাটাই সবচেয়ে মঙ্গলকর হবে। আর কখনই ফরাসিদের ওপর ভরসা করবে না'। অথচ বাস্তবতা হলো, হায়দার আলীর অবস্থান ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কোনো ফলাফলে উপনীত হওয়ার আগে যুদ্ধ বন্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার সেই নির্দেশ পরবর্তীকালে টিপু সুলতান অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছিলেন এবং এরপর সেই যুদ্ধ আরও ষোল মাস অব্যাহত ছিলো।

www.boimate.com

সপ্তম অধ্যায়

হায়দার আলীর বৈশিষ্ট্যাবলি

www.boimate.com

আকার-আকৃতি

হায়দার আলী ছিলেন ছয় ফুট দীর্ঘ শরীরের অধিকারী। গায়ের রং ছিলো গম বর্ণের। চেহারার ওপর প্রবল প্রতাপ পরিস্ফুটিত হতো। নাক যথেষ্ট উঁচু ছিলো। দু'চোখ অপেক্ষাকৃত ছোট ছিলো; কিন্তু তা সবসময় জ্বলজ্বল করতো। বক্ষ ছিলো প্রশস্ত। কাঁধ লম্বাটে ও প্রচুর প্রশস্ত ছিলো। হাত ছিলো বেশ লম্বা। বাহু ছিলো পেশীবহুল। মাথার ওপর পাগড়ি ও কোমরে রেশমী বন্ধনী থাকতো। যেখানে ইরানি তরবারি ঝুলে থাকতো। সাধারণত হাতের মুষ্ঠিতে ছুরি থাকতো। চেহারায় দাড়ি ছিলো, কি ছিলো না— এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিপরীত বক্তব্য ও ছবি পাওয়া যায়। হতে পারে, একসময় পর্যন্ত তার মুখ শ্মশ্রুবিহীন ছিলো। পরবর্তীতে দাড়ি রাখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। সাধারণত তিনি দখিনী তথা উরদূতে কথা বলতেন। কিন্তু যেহেতু ফারসী ছিলো রাষ্ট্রীয় ভাষা, এজন্যে সে ভাষাতেই পত্র লেখালেখি করাতেন। নিরক্ষর ছিলেন। এজন্যে যাবতীয় চিঠি একজন লেখককে দিয়ে লেখাতেন। দ্বিতীয়জনকে দিয়ে পড়াতেন এবং তৃতীয়জনের মাধ্যমে সত্যায়ণ করতেন। এর বাইরে কানাড়, তামিল, মারাঠা ও তেলেগু ভাষা জানতেন। ফরাসিদের সঙ্গে নৈমিত্তিক সম্পর্কের কারণে অল্প-বিস্তর ফরাসি ভাষাও বুঝতে পারতেন।

প্রাত্যহিক অভ্যাস

জীবনের বৃহদাংশ, বিশেষত মহিসুরের সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে কেটে যায় যুদ্ধ ও দূর-দূরান্তের সফরে। যার কারণে তার নৈমিত্তিক কার্যধারা চূড়ান্ত ছিলো না। পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় সেখানে পরিবর্তন হতো। অবশ্য তিনি যখন শ্রীরঙ্গাপত্তনামে অবস্থান করতেন তখন সাধারণত সুবহে সাদিকের প্রথম ওয়াক্তেই ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন। আট থেকে নয়টার ভেতর ব্যক্তিগত সকল প্রয়োজনাদি সম্পন্ন

www.boimate.com

করে মন্ত্রীবর্গ ও সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসতেন। তাদের কাছ থেকে বিগত রাত থেকে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার বিবরণ শুনতেন। যেসব চিঠি ও আবেদন হস্তগত হয়েছে, সেগুলো পড়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রেরণ করতেন। রাজপ্রাসাদে কিছু হাতি ও চিতাবাঘ প্রতিপালিত হতো। হায়দার আলী নাশতার পর সেগুলো দেখতে যেতেন। সস্নেহে সেগুলোর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন। খুব কাছ থেকে সেগুলোর চলাফেরা ও গতিবিধি দেখে আপ্লুত হতেন।

সাড়ে দশটায় একটি শামিয়ানার নিচে দরবারে আম বসতো। সেখানে তিনি একটি উঁচু সিংহাসনের আরোহণ করতেন। জনগণ সেই দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরতো। তিনি তা পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন এবং এরপর তা নিরসন করার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করতেন। ওই সময় তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কূটনৈতিকদের সঙ্গেও সাক্ষাত সেরে নিতেন। সাক্ষাতের এই ধারাবাহিকতা দুপুর ২/৩ পর্যন্ত চলমান থাকতো। হায়দার আলী ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন। বিকেলে তিনি সেনাপরিদর্শনে যেতেন। কোনো সামরিক নির্দেশনার প্রয়োজন বোধ করলে তখন জানিয়ে দিতেন। এরপর তিনি ঘোড়ায় চড়ে বৈকালিক পরিভ্রমণে বেরোতেন। ফিরে এসে বিগত অধিবেশনের অবশিষ্ট আবেদন-অনুরোধ শুনতেন। মাগরিবের পর খাবার পরিবেশন করা হতো। খাবারের পর সাধারণত কিছুক্ষণ পায়চারী করতেন। রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আসর অনুষ্ঠিত হতো। সেই আসরগুলোতে সাধারণত রঙ্গ-রসের পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি হতো। ওই আসরে নবাবের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন ও আমির-উযারা উপস্থিত হতেন। সপ্তাহে দু'-তিনবার সময়-সুযোগমতো শিকারে বেরোতেন।

হায়দার আলী সাধারণ খাবারগুলোকেই প্রাধান্য দিতেন। 'রাগী'-এর রুটি ছিলো তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয় খাবার। তবে সফরের সময় তিনি ভাত খেতেই পসন্দ করতেন। তিনি যখন কোথাও যেতেন বা কোনো অভিযান শেষে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম ফিরে আসতেন ওই সময় যেই রাজকীয় জুলুশ বেরোতো, জনগণের কাছে সেটাই ছিলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও চমকদার।

www.boimate.com

সাহস ও বীরত্ব

শুধু ভারতবর্ষই নয়; গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তিনি ইতিহাসের সেই অল্পক'জন সম্রাটদের একজন– যারা নিজেরাই যুদ্ধের ময়দানে আবির্ভূত হয়ে শত্রুপক্ষের মুকাবেলা করেছেন। টিপু সুলতান ছিলো হায়দার আলীর যোগ্য সন্তান। এ দু'জনের নাম অব্যশই সেই সম্রাটদের তালিকায় সর্বাগ্রে থাকবে, যারা যুদ্ধের ময়দানে সবসময় নিজ সৈন্যদলের অগ্রভাগে অবস্থান করতেন। মহিসুরের রাজসিংহাসনে আরোহণের আগেও যেমন মহিসুরের পতাকাতলে অনুষ্ঠিত প্রতিটি যুদ্ধে স্বশরীরে শুধু অংশগ্রহণই করেননি; বরং শত্রুপক্ষের কাতারে প্রবেশ করে তাদের কচুকাটা করেছেন, সিংহাসনে আরোহণের পরও পূর্বের সেই বীরত্ব ও সাহসিকতার ধারা অব্যাহত রেখে শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মাথা উঁচু করে তাদের প্রতিহত করেছেন। হায়দার আলীর অসামান্য বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়েই মহিসুরের রাজা ১৭৫২ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে তাকে মহিসুরের নিকটবর্তী ডিন্ডিগাল (Dindigal) এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

এরও পূর্বে ১৭৪৯ সালে দেভানহাল্লী (Devanahalli)-এর সফল অবরোধ অভিযানে তাঁর অসামান্য সামরিক দক্ষতা প্রত্যক্ষ করে মহিসুরের উযির নন্দরাজ তাকে 'খান' উপাধীতে ভূষিত করেন। এবং মাত্র ২৬ বছর বয়সে দু'শ পদাতিক ও পঞ্চাশ অশ্বারোহী দলের 'অফিসার' মনোনীত করেছিলেন। মহিসুরে রাজদরবারে হায়দার আলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পর যখন খান্ডেরাও-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সৈন্যরা মারাঠা সৈন্যদের সঙ্গে জোট বেঁধে তাঁর শ্রীরঙ্গাপত্তনামের দরিয়া দৌলত বাগ অবরোধ করে, ওই সময় তিনি যেভাবে বিন্দু পরিমাণ সন্ত্রস্থ না হয়ে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে রাতের অন্ধকারে কাভেরি নদীর উত্তাল তরঙ্গমালা পাড়ি দিয়ে এবং অনবরত বিশ ঘন্টার যাত্রা শেষ করে ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছান এবং কল্পনাতীত দ্রুততার সঙ্গে ফিরে এসে পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ করে যেই বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন, তার স্বীকারোক্তি তাঁর তৎকালীন শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারেনি।

www.boimate.com

প্রশাসন পরিচালনার যোগ্যতা

হায়দার আলী যদিও নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি একাধারে ফারসী, উরদূ, কানাড়, তামিল ও তেলেগু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর এই উক্তি খুবই বিখ্যাত ও বহুলচর্চিত যে, 'আমার মতো একজন মূর্খ লোকের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহে এমন অসংখ্য কীর্তি সম্পন্ন হয়েছে যে, হাজার শিক্ষিত মানুষ মিলেও সেই কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবে না। এটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের একটি ছোট্ট নিদর্শন'।

তিনি মানুষের চেহারা পড়তে পারতেন। স্রেফ চেহারা দেখেই তিনি মানুষের অন্তর্গত যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুমান করতে পারতেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট– যিনি নৌশক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করে নৌবাহিনী গঠন করেন। ইতোপূর্বে ভারতবর্ষে স্রেফ ফরাসি ও ইংরেজদের হাতেই নৌবাহিনী ছিলো। হায়দার আলীর পরিকল্পনা ছিলো, নৌবাহিনীর মাধ্যমে তিনি সামরিক শক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুবিধা গ্রহণ করবেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি ম্যাঙ্গলোরে রীতিমতো জাহাজ তৈরির বিশাল কারখানা গড়ে তুলেন।

জনগণের সত্যিকার সংবাদ অবহিত হওয়ার জন্যে তিনি রাতের বেলা পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করতেন। গোয়েন্দাগিরির জন্যে তিনি পুলিশ বিভাগে পৃথক গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের সদস্যরা সাধারণত অর্থ-পয়সার ক্ষেত্রে প্রতারণা উদ্ঘাটনের কাজ করতো। হায়দার আলীর সাম্রাজ্যে অত্যাচার ও ঘুষ ছিলো ক্ষমাহীন অপরাধ। এমন অপরাধে ধৃত হলে বেত্রাঘাত করা হতো। এই দণ্ড কার্যকরের জন্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রীতিমত দু'শ জল্লাদ নিযুক্ত ছিলো। যদি কখনও কোনো সরকারি কর্মকর্তার ব্যাপারে ঘুষ গ্রহণ বা প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া যেতো, তাহলে তার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। কর্মক্ষেত্রে অনন্য অবদানের ওপর সেনাসদস্য ও রাজকর্মচারীদেরকে বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ধারাবাহিকতা তিনিই শুরু করেন।

যখনই কোনো নতুন এলাকা হায়দার আলী বিজয় করে সালতানাতে খোদাদাদে অন্তর্ভুক্ত করতেন, তখন সেখানকার জনগণকে বিদ্রোহ থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে সেখানকার প্রচলিত সংবিধান ও ঐতিহ্যের মাঝে

www.boimate.com

কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতেন না। হিন্দুদেরকে তাদের নিজ ধর্ম অনুসারে জীবন যাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। এমনকি হায়দার আলী রাজসিংহাসনে আরোহণের পূর্বে মহিসুরের স্থানীয় মুদ্রায় হিন্দুদের বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি ব্যবহারের যেই পুরনো ঐতিহ্য ছিলো, হায়দার আলী ক্ষমতারোহণের পরও তা অব্যাহত রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য হলো, যেন হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোনো আঘাত না পড়ে। হায়দার আলী বিভিন্ন যুদ্ধে গেরিলা আক্রমণের অত্যন্ত ফলপ্রসূ কৌশলগুলো নিপূণ দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারতেন।

তিনি কখনই আজকের কাজ পরবর্তী দিনের জন্যে ফেলে রাখতেন না। প্রতিদিনের হস্তগত চিঠির উত্তর সেদিনেরই ফিরতি ডাকে পাঠিয়ে দিতেন। অনেক সময় এমন চিঠির সংখ্যা ৩৫-৪০ এর কোটা ছাড়িয়ে যেতো। চিঠির উত্তর লেখার জন্যে তাঁর কাছে প্রতিটি ভাষার সেক্রেটারি নিযুক্ত ছিলো। যাদেরকে তিনি উত্তরের ভাষ্য বলে দিতেন। তিনি এতোটাই সূক্ষানুভূতিপ্রবণ ছিলেন যে, একজন চিঠিলেখককে দিয়ে চিঠি লেখার পর অন্য লেখককে দিয়ে পুনরায় তা পড়াতেন। এরপর তৃতীয়জনকে দিয়ে সত্যায়ণ করিয়ে নিতেন। যেনো তাঁর নিরক্ষরতার সুযোগের অপব্যবহার করে কোনো সেক্রেটারি অবৈধ ফায়দা লুটিয়ে কোনো ধরনের জটিলতা সৃষ্টির সুযোগ না পায়। এরপর যখন তিনি চিঠির ভাষ্য সম্পর্কে আশ্বস্ত হতেন তখন তার ওপর সরকারি মহর সেঁটে স্বাক্ষর করতেন। স্বাক্ষরের মাঝে তিনি শুধু ح বর্ণই লেখতেন।

হায়দার আলী তাঁর অধীনস্থদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং তার থেকে সে অনুযায়ী কর্মই আদায় করে নিতেন। সে কারণেই তিনি তাঁর সুযোগ্য সন্তান টিপুকে তাঁর পরবর্তীকালে রাজ্যপরিচালনার দায়িত্বভার পালনের জন্যে এমনভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলেন যে, তাঁর ইনতিকালের পর টিপুকে সামান্যতমও বেগ পোহাতে হয়নি।

রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান

হায়দার আলী তার গোটা রাজ্যকে ত্রিশটি জেলায় বিভক্ত করেছিলেন। প্রতিটি জেলায় প্রায় চল্লিশটি করে তালুক হতো। এর বাইরে

www.boimate.com

রাজ্যপরিচালনার সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে তিনি বিভিন্ন শাখায় বণ্টন করেছিলেন। শাখাগুলো নিম্নরূপ–

১. পররাষ্ট্র অধিদপ্তর

বিদেশীদের দেখাশুনা ও বিদেশী সিপাহিদের জন্যে ছাউনি ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।

২. সেনাবাহিনী ও রাজকোষ বিষয়ক অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো– যুদ্ধাস্ত্র, গোলা-বারুদ ইত্যাদির তৈরি ও মেরামত এবং সেগুলোর সরকারি রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

৩. কৃষি বিষয়ক অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো, কৃষিশষ্যের উৎপাদন সম্পর্কিত সকল তথ্য সংরক্ষণ করা এবং কৃষকের যাবতীয় স্বার্থ পর্যবেক্ষণ করা।

৪. রাষ্ট্রপরিচালকের নিরাপত্তা বিষয়ক অধিদপ্তর

রাষ্ট্রপ্রধান দেশে-বিদেশে যেখানেই থাকুন, তার সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধান করা।

৫. বাণিজ্য অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো, কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানি, বিভিন্ন ভাণ্ডারের হিসাব-নিকাশ এবং জনগণের মাঝে কৃষি উপকরণ ও নানা জাতের বীজ বণ্টন করা।

৬. বিচার বিভাগ

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো– জনগণকে তাদের প্রাপ্য সুবিচার প্রদানের উদ্দেশ্যে তাদের সকল অভিযোগ-নালিশ শ্রবণ করতঃ সেগুলোর প্রতিবিধান করা এবং প্রয়োজনে দণ্ড কার্যকর করা।

৭. ধর্মীয় স্থাপনা সংরক্ষণ অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো, বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা তথা মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধান এবং সেগুলোর আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।

www.boimate.com

৮. সাধারণ তথ্যসংগ্রহ অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো, রাষ্ট্রের প্রতিটি অংশের যাবতীয় তথ্য কেন্দ্রকে অবহিত করা।

৯. আমদানি-রপ্তানি বিভাগ

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো, আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্য থেকে শুল্ক উসূল করা।

১০. সামরিক অর্থবিভাগ

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করা।

১১. অর্থ বিষয়ক অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো, সংগ্রহকৃত সকল শুল্ক একত্র করে উপযুক্ত খাতগুলোতে বণ্টন করা।

১২. নিরীক্ষণ বিভাগ

এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ছিলো, প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ড ও কর্মকর্তাদের পরিদর্শন করা এবং সম্রাটের কাছে এতদ সংক্রান্ত রিপোর্ট অবহিত করা।

প্রতিটি অধিদপ্তর তথা মন্ত্রণালয়ের জন্যে একজন উযির, তিনজন বখশী, বিশজন ফৌজদার, একশ ব্যবস্থাপক-সহ প্রমুখ দায়িত্বশীল থাকতো। এর বাইরে চিঠিপত্র ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্যে প্রায় সতেরো শ দ্রুত ধাবমান অশ্বারোহী নিযুক্ত ছিলো। উযিরের পদটিকেই প্রশাসনের সবচেয়ে উঁচু পদ মনে করা হতো। প্রতি পাঁচ বছরের মাথায় প্রতিটি অধিদপ্তরের উযিরকে অন্য অধিদপ্তরে বদলি করা হতো। উদ্দেশ্য হলো, এক অধিদপ্তরে একাধারে দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে কেউ যেন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারে, বা এথেকে কোনো ভুল ফায়দা লুটতে না পারে।

www.boimate.com

মানবিক সহমর্মিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা

সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজনে একদিকে তিনি যেমন কঠোর শাসক ছিলেন; অন্যদিকে জনগণের প্রতি দয়াপ্রবণ অভিভাবকও ছিলেন। ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই সম্প্রীতিসুলভ নীতি অবলম্বন করতেন। তাঁর দরবারে ধনী-গরিবের বৈষম্য ছিলো না। ধর্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কারো সঙ্গে ভিন্ন আচরণ করা হতো না। শুল্ক উসূলের সময় কারো প্রতি কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি করা হতো না। জনগণকে প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রদান করার জন্যে বিভিন্ন স্থানে পুলিশি চৌকি স্থাপন করা হয়। জনগণের জন্যে এ অনুমতি ছিল যে, তারা তাদের এলাকার গভর্নরের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে নালিশ ঠুকতে পারবে।

হায়দার আলী আইনের শাসনে এতোটাই বিশ্বাসী ছিলেন যে, একবার কোনো এক বিষয়ে দণ্ডিত হওয়ার কারণে তিনি তার আদরের ছেলে টিপুর ওপর বেত্রাঘাত কার্যকর করেছিলেন। আরেকবার মারাঠাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পর কোনো কারণবশত টিপু সুলতান যুদ্ধলব্ধ সম্পদের রিপোর্ট প্রদানে বিলম্ব করেন। তখন এই অনাহুত বিলম্বের দণ্ড স্বরূপ জরিমানা হিসেবে হায়দার আলী খোদ টিপুর কাছ থেকে ছয় হাজার রুপি অর্থ উসুল করেন। মালদ্বীপের ওপর আক্রমণের পর যখন নৌবাহিনীর প্রধান সেখানকার স্থানীয় রাজাকে গ্রেফতার করে তার দু'চোখ উপড়ে ফেলে তখন তার এই অমানবিক কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে তিনি তার এ পদ থেকে অব্যাহতি দেন। ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের ওপর দুঃখ প্রকাশ করে তিনি নিজেই তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তার হাতে একটি বিশাল এলাকার জমিদারি তুলে দেন।

মোটকথা, হায়দার আলী সবসময় এ বিষয়টির প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন যে, তাঁর শাসনাধীন এলাকাতে কোনো একজন ব্যক্তিও যেন অবিচার-অনাচারের শিকার না হয়। এর পাশাপাশি কোনো অপরাধী যেন অপরাধ করে পার না পায়। কোনো অপরাধী অপরাধ করে পালিয়ে গেলে গোয়েন্দা পুলিশ তাকে খুঁজে বের করে হায়দার আলীর কাছে উপস্থিত করতো। ধৃত অপরাধীর ওপর হায়দার আলী নিজেই দণ্ড কার্যকর করতেন।

www.boimate.com

ধর্মীয় উদারতা

ইসলামের মহান শিক্ষা হলো, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। কোনো ধর্মের অবজ্ঞা করা যাবে না। ইসলাম সবসময় মুসলিম শাসকদেরকে এ নির্দেশ করে যে, তারা যেন তাদের শাসনামলে ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য না করে। যদিও বিধর্মীদের উপাস্য মিথ্যা, তারপরও তাদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কটু কথা বলা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত। [সূরা আন'আম : ১০৮]

সামষ্টিকভাবে ইসলামের ইতিহাস সেই ইসলামি বিধান ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের স্বর্বাক সাক্ষী। একজন মুসলিম শাসক হিসেবে হায়দার আলীও সেই বিধান অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। তার শাসনামলে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক নিজ নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস প্রতিপালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। তার অধিকাংশ উযির ও প্রাশাসনিক কর্মকতা ছিলো অমুসলিম। পুর্নিয়া ও কৃষ্ণরাও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। হায়দার আলী বেদনুর (Bednore) জয় করার পর যখন সেখানে টাকশাল তৈরি করেন তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থানীয় মুদ্রার ওপর হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি বহাল রেখে দেন। মন্দিরের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে বড় বড় জমিদারী প্রদান করা হয়। হিসূরের মন্দিরের অধীনে বিশাল জমিদারী দেয়া হয়। ত্রিপতির মন্দিরের জন্যে ১৭৮১ সালে কয়েক হাজার অর্থ প্রদান করা হয়। শ্রীরাঙ্গাপাটনামের মন্দির যখন আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হয় তখন ১৭৭৩ সালে হায়দার আলীর নির্দেশেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অর্থে সেটির পুনর্নির্মাণ করা হয়।

নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা লেখেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে একবার মহিসুরের সেনাবাহিনী রাজধানী থেকে যাত্রা শুরু করে। ওই সময় সেনাবাহিনীর ব্রাহ্মণ কর্মকর্তাগণ এ অনুরোধ পেশ করে যে,

www.boimate.com

কয়েকদিন পর রওয়ানা হলে হিন্দু ধর্মমত অনুসারে শুভ লগ্ন পাওয়া যাবে। তাদের সেই আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তৎক্ষণাৎ যাত্রা মুলতবি করা হয়। সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কখনই ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হতো না। ১৭৬৯ সালে সুরঙ্গিরি মঠের স্বামীর নামে প্রেরিত এক পত্রে হায়দার আলী লেখেন— তাকে পুনা ভ্রমণের জন্যে সাড়ে দশ হাজার রুপি, পাঁচটি ঘোড়া, একটি হাতি, পাঁচটি উট ও একটি পালকি প্রদান করা হচ্ছে।[৪৪]

১৭৭৪ সালে রঙ্গনাথের বিধ্বস্ত মন্দির হায়দার আলী নিজ অর্থে পুনর্নির্মাণ করেন।[৪৫] প্রথমদিকে হায়দার আলীর ব্যক্তিগত সহকারীর পদে ছিলেন 'খন্ডে রাও' নামের একজন ব্রাহ্মণ। হায়দার আলীর জোরালো সুপারিশের প্রেক্ষিতে মহিসুরের তৎকালীন রাজা তাকে বিগত প্রধান উযির নন্দরাজের স্থানে প্রধান উযির নিযুক্ত করেন। ওই সময় হায়দার আলী ইচ্ছে করলে এ পদের জন্যে যেকোনো মুসলমান কর্মকর্তার নাম প্রস্তাব করতে পারতেন ও রাজাও তা সানন্দে মঞ্জুর করতেন। অথচ এই নিমকহারাম খণ্ডেরাও-ই পরবর্তীকালে তার মহান ত্রাতা হায়দার আলীর বিরুদ্ধে প্রাণবিনাশী ষড়যন্ত্র করেছিলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে হায়দার আলী তাকে যেই দণ্ডে দণ্ডিত করেন, তা কখনই ধর্মের বুনিয়াদে ছিলো না; বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেই তাকে সেই দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ইসলামি চেতনা

হায়দার আলীর বিখ্যাত বাণী হলো, 'যুগে যুগে মুসলমানরা পারস্পরিক অনৈক্যের কারণেই পরাজিত হয়েছে। এটাই তাদের চরম দুর্বলতা'। এজন্যে তিনি আমৃত্যু এ চেষ্টা করেছেন যে, যেন কোনো মুসলিম রাজ্যের বিরুদ্ধে তার সেনাবাহিনীর কাতারবন্দী হতে না হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরে জোট তৈরি করার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। আরকাটের নবাব মুহাম্মদ আলী ও হায়দারাবাদের নিযামের সঙ্গে সবসময় সন্ধি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে তারা সবসময় হায়দার আলীর বিরুদ্ধে

---

৪৪. টিপু সুলতান আওর সুরঙ্গিরী মঠ। লেখক, মুহাম্মদ গাউস মুজাওর

৪৫. মাহমুদ ব্যাঙ্গালুরী রচিত সালতানাতে খোদাদাদ

www.boimate.com

ইংরেজদের তল্পিবাহক হয়ে থাকতো। অথচ হায়দার আলী ছিলেন তাদের ধর্মেরই অনুসারী। যার বিপরীতে ইংরেজরা ছিলো ইসলামের চরম শত্রু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি হায়দার আলী এতোটাই শ্রদ্ধাশীল ও প্রীতিময় ছিলেন যে, তিনি বলতেন– স্রেফ হযরত ফাতিমা রাদি.-ই 'বিবি'। অন্য কোনো মহিলা 'বিবি' হতে পারেন না। তাঁর তুলনায় অন্য সকল নারী দাসীতূল্য। এমন বিশ্বাসের কারণেই তিনি অন্যদেরকে 'লোন্ডিবাচ্চা' বলে সম্বোধন করতেন। সবাই যেহেতু এ নামটির প্রেক্ষাপট জানতেন; এজন্যে কেউ এভাবে সম্বোধন করাটা দোষণীয় মনে করতো না।

হায়দার আলী উলামায়ে কেরামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাদের মূল্যায়ণ করতেন। হিজায, ইরান ও তুর্কিস্থান থেকে অনেকগুলো মুসলিম জ্ঞানী পরিবারকে নেমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে সালতানাতে খোদাদাদে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ইরানের শিরাজ নগরী থেকে এক হাজার মুসলিম সিপাহিকে ডেকে এনে নিজ সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেন। একজন নিরক্ষক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি মতাদর্শ অনুসরণে এতোটাই প্রবল ছিলেন যে, তিনি শৈশবেই সুলতান টিপুর কাছ থেকে খোদ তার কলম দিয়েই এ স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেন যে, 'আমি কোনো কাজে আল্লাহর অবাধ্যতা করলে যে কোনো ন্যায্য দণ্ড মাথা পেতে মেনে নেবো'। হায়দার আলীর রাজ্যে মিথ্যা, চুরি ও গাদ্দারির শাস্তি ছিলো মৃত্যুদণ্ড। যদিও এ কথা আপন স্থানে সত্য যে, দ্বীনদারি, খোদাভীরুতা ও বুযুর্গির ক্ষেত্রে তার সঙ্গে তার সন্তান টিপুর বিস্তর ফারাক ছিলো।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক কর্মকৌশল

পশ্চিমা ঐতিহাসিকরাও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামরিক কর্মকৌশলের ক্ষেত্রে ওই যুগে গোটা ভারতবর্ষে হায়দার আলীর কোনো সমকক্ষ ছিলো না। তিনি ছিলেন ইংরেজদের চরম শত্রু। নবাব মুহাম্মদ আলী ও হায়দারাবাদের নিযামের সঙ্গে তার যেই শত্রুতা ছিলো, সেটা ছিলো স্রেফ ইংরেজদের সহায়তার কারণে গড়ে ওঠা সাময়িক শত্রুতা। হায়দার আলী মনে-প্রাণে কামনা করতেন যে, হায়! ভারতবর্ষের সবগুলো ছোট-বড় রাজ্য যদি জোট বেঁধে

www.boimate.com

দেশের মাটি থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতো। হাজার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

হায়দার আলী সবসময় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এ কথা বলতেন যে, আল্লাহ যদি তাওফীক দেন তাহলে অব্যশই আমি আমার এই জন্মভূমিকে মুশরিক ফেরেঙ্গিদের থেকে পবিত্র করবো। ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও যুদ্ধের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। এ কারণে তিনি চাইতেন যে, পশ্চিমা শক্তির কোমর ভাঙ্গার কাজ পশ্চিমা শক্তি দিয়েই করা হোক। এ উদ্দেশ্য থেকেই তিনি ফরাসিদের কাছ থেকে সামরিক সহায়তা নিতেন। ওই সময় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফরাসি ও বৃটিশরা একে অপরের ঘোরতর রাজনৈতিক শত্রু ছিলো। দু' দেশের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। ইংরেজদের মতো ফরাসিদের হাতেও ভারতবর্ষের কিছু অঞ্চল চলে গিয়েছিলো। পান্ডেচেরি ছিলো তাদের নিয়ন্ত্রণে। সমুদ্রোপকূল থেকে যথেষ্ট দূরে, কোকন থেকে আড়াই হাজার মাইল দূরত্বে, মারিশে তাদের বিশাল সামরিক শিবির ছিল। কিন্তু ওই সময় এশিয়া মহাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিমত্তা এতো দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো যে, এখানে ফরাসিদের বৃহৎ শক্তিকে আবির্ভূত হওয়ার স্বপ্ন দিনদিন ফিকে হচ্ছিলো। সামগ্রিকভাবে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ছিলো ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে। হায়দারাবাদের নিযাম ও নবাব মুহাম্মদ আলীর বিশ্বাসঘাতকার পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহায়তা করার মতো এদেশে ফরাসি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। যদিও খ্রিস্টধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে ফরাসিরাও ইংরেজদের মতোই ইসলাম-দুশমন ছিলো; কিন্তু ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণে সামরিক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তারা হায়দার আলীর আনুকূল্য পেতে চাচ্ছিলো। ওদিকে হায়দার আলীরও ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক বন্ধুর প্রয়োজন ছিলো। মহিসুরের দ্বিতীয় যুদ্ধে ফরাসিরা অঙ্গীকার মুতাবেক হায়দার আলীকে সামরিক সহায়তা প্রদান করেছিলো।

সামরিক কর্মকৌশল ও প্রাশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিচারে হায়দার আলী ছিলেন ওই যুগের সবচেয়ে সফল ও দক্ষ শাসক। সবাইকে ছাপিয়ে তাঁর অগ্রযাত্রা ছিলো ঈর্ষণীয়। হায়দার আলী কী পরিমাণ সামরিক উন্নতি সাধন করেছিলেন, তার সম্পর্কে ধারণা পেতে শুধু এতোটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে, ১৭৬১ সালে তিনি যখন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তখন থেকে

www.boimate.com

১৭৬৭ সাল পর্যন্ত তার সৈন্যসংখ্যা ছিলো মাত্র ২০ হাজার। কিন্তু ১৭৮২ সালে তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন মহিসুরের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ৮৮ হাজারেরও অধিক সৈন্য বেতন পেতো। এর বাইরে তাঁর হাতে দেড় হাজার ইউরোপিয়ান সৈন্য ছিলো। যেহেতু ফরাসি সামরিক কর্মকর্তারা হায়দার আলীর সৈন্যদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতো, এজন্যে তখনকার মারাঠি ও হায়দারাবাদী সৈন্যদের তুলনায় মহিসুরের সৈন্যরা সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে ঢের অভিজ্ঞ ও অগ্রসর ছিলো। কেল্লা ও সীমান্ত চৌকিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পৃথক বাহিনী ছিলো। গেরিলা আক্রমণের জন্যে স্বতন্ত্র বাহিনী ছিলো। সামরিক তথ্য আদান-প্রদান ও রসদ সরবরাহের জন্যে ভিন্ন সৈন্যদল ছিলো। প্রচুর সামরিক রসদের জোগাড়, জিওগ্রাফিক তথ্যের সমাহার ও কার্যকর সামরিক কৌশলের কারণে হায়দার আলী সাধারণত তার প্রতিপক্ষকে স্রেফ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতেন। শুধু তোপখানা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের কাজে সহায়তার জন্যে তার সেনাবাহিনীতে ৮ হাজারেরও অধিক মহিষ পালন করা হতো। হায়দার আলীর সেনাবাহিনী গোয়েন্দাবৃত্তির কাজেই এতোটাই ধূর্ত ও চৌকস ছিলো যে, খোদ ইংরেজ সেনাবাহিনীর জনৈক কর্নেল অকুণ্ঠে এ কথা স্বীকার করেছে যে, আমাদের ফৌজি ব্যাটালিয়ন যখনই সংগোপনে মহিসুরের সৈন্যদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন অবশ্যই হায়দার আলী তা ধরে ফেলে। অথচ হায়দার আলীর পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনার যৎসামান্যও আমরা জানতে পারি না।

যেসকল শিশু যুদ্ধে বন্দী হতো, তাদেরকে দিয়ে হায়দার আলী 'চিলা ব্যাটালিয়ন' নামে একটি পৃথক ব্যাটালিয়ন তৈরি করেছিলেন। ঘটনাক্রমে তাদের অধিকাংশ সদস্যই ছিলো মালাবারের নায়ার ও মারাঠি ফৌজদের হিন্দু সন্তান। পরবর্তীকালে এই ব্যাটালিয়নের একটি বৃহৎ অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

কৃষকরা শষ্যক্ষেত থেকে ফসল কাটার পর যেন কোনোভাবেই দস্যুদলের কবলে না পড়ে, তাদের দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল যেন কোনো লুটেরাদের ছোবলের শিকার না হয়, এজন্যে কয়েক মাস পর্যন্ত মহিসুরের সেনাবাহিনীর একটি দল তাদের প্রহরা দিতো। এই ব্যাটালিয়নের নাম ছিলো 'কুন্দাচার হারকারে'। এই ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা বছরের অবশিষ্ট

www.boimate.com

সময় সেনাবাহিনীর অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতো। সে হিসেবে মহিসুরের সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। তবে এরা ছিলো অনিয়মিত সিপাহি। তারা স্রেফ প্রয়োজনের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সহায়তা করতো। এর বাইরে এরা যুদ্ধপথ পরিষ্কার করা, পরিখা খনন করা ও সামরিক জিনিসপত্রের স্থানান্তরের দায়িত্ব পালন করতো।

হায়দার আলীর শাসনামলে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি

হায়দার আলীর শাসনামলে রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস ছিলো যুদ্ধলব্ধ মালে গনীমত। এর বাইরে কৃষক, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শুল্কও রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস বিবেচিত হতো। যেহেতু মালাবারের সমুদ্রোপকূলে বিদেশীদের সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, এজন্যে রপ্তানীকৃত পণ্যের ওপর বিশেষ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিলো। মহিসুর সাম্রাজ্যের সীমারেখার ভেতর ব্যবসা করার জন্যে ইংরেজদেরকে শতকরা দেড়ভাগ কাস্টম ডিউটি প্রদান করতে হতো। অনাবাদী জমিন দীর্ঘ মেয়াদে কৃষকদেরকে বর্গা দেয়া হতো। এর ফলে শষ্য উৎপাদনের পরিমাণ মুহুর্মুহু বৃদ্ধি পেয়েছিলো। যেহেতু আমদানিকৃত পণ্যের ওপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শুল্ক আরোপিত ছিলো, অন্যদিকে উৎপাদিত শষ্যের পরিমাণ ছিলো অনেক বেশি, এছাড়া সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসা মেঘবাহী বাতাসের কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় মহিসুরে শস্যের ফলন হতো অনেক বেশি, এ কারণে হায়দার আলীর শাসনামলে কখনই অনাবৃষ্টি, মঙ্গা বা দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি। জনগণের কাছ থেকে খুব সহজেই শুল্ক উসূল হতো।

এসব কারণে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক এ কথা পর্যন্ত লেখেছেন যে, মহিসুর রাজ্যের বাসিন্দারা উন্নত খাদ্যের কারণে ইংরেজ জমিদারদের চেয়েও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলো।[৪৬]

কেউ আইন লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্র তার কাছ থেকে জরিমানা উসূল করা হতো। কাঁচা সোনা, হাতির দাঁত, বাঁশ ও 'সাগ' শষ্যের বৃক্ষ থেকে অর্জিত

[৪৬]. নরেন্দ্র কিষাণ সিনহা রচিত তারীখে হায়দার আলী।

www.boimate.com

আয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগার সবসময় টইটুম্বুর থাকতো। এর বাইরে আশপাশের বিভিন্ন রাজা ও নবাবরা বার্ষিক কর প্রদান করতো। এগুলোর মাধ্যমে মহিসুরের রাজকোষ বেশি সমৃদ্ধ হতো। মালাবার থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কালো ও লাল মরিচ, চন্দন, এলাচি ও চাউল রফতানি হতো। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সুপারি বাজার ছিলো মহিসুর অন্তর্গত 'সারসি' নগরীতে। মোটকথা, 'হায়দার আলী' গ্রন্থের লেখকের বক্তব্য অনুসারে মহিসুর রাজ্যের বার্ষিক আয় ছিলো সাড়ে সাত কোটি রুপিরও অধিক।[৪৭] সামষ্টিকভাবে রাজ্য হিসেবে মহিসুর একটি সচ্ছল জনগণের দেশ হিসেবে পরিগণিত হতো।

৪৭. প্রাগুক্ত

www.boimate.com

অষ্টম অধ্যায়

সুলতান টিপু শহীদ রহ.

জন্ম থেকে সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত

www.boimate.com

জন্মগ্রহণ

হায়দার আলীর জীবনীতে পারিবারিক ইতিহাস শিরোনামের অধীনে এ অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে যে, বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাসুরে টিপু ছিলেন আরব ও কুরাইশ বংশোদ্ভূত। যুগের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের শিকার হয়ে তারা মককা মুকাররমা থেকে বাগদাদ, আফগানিস্তান, পাঞ্জাব, দিল্লি ও আজমীর হয়ে একসময় গুলবার্গা (Gulbarga) নগরীতে উপনীত হন। টিপুর পিতা হায়দার আলীর দু'জন স্ত্রী ছিল। তিনি প্রথম বিয়ে করেন ১৯ বছর বয়সে সিরা (Sira) প্রদেশের পীরজাদা সাইয়্যেদ শাহবায মিয়ার কন্যাকে। যিনি সন্তান প্রসবের সময় অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু অসতর্কতার কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশিষ্ট জীবন শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

এ ঘটনার কয়েক বছর পর হায়দার আলী প্রথমা স্ত্রীর উপর্যপুরি অনুরোধের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিয়ে করেন কাডাপ্পা (Kadapa)-এর গভর্নর মুঈনুদ্দীন খানের কন্যা ফাতেমা বেগম ওরফে ফখর-উন-নিসাকে। তাঁরই গর্ভে ২০ যিলহজ্জ ১১৬৩ হিজরী, মুতাবেক ১০ নভেম্বর ১৭৫০ শনিবার সকালে টিপু জন্মগ্রহণ করেন। কোলার (Kolar) নগরী থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, ব্যাঙ্গালুরু থেকে উত্তর দিকে ৩৩ কিলোমিটার দূরবর্তী 'দিভানাহল্লী' (Devanahalli) নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে টিপু এ নগরীটির নাম বদলে রাখেন 'ইউসুফাবাদ'। এখানে তিনি একটি ফৌজি কেল্লাও নির্মাণ করেছিলেন।

হায়দার আলী কেন তার সন্তানের নাম টিপু রাখলেন, এ সম্পর্কে ইতিহাসে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি হল, দ্বিতীয় বিয়ের পর হায়দার আলী দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান জন্মগ্রহণের কোনো আলামতই পরিলক্ষিত হচ্ছিলো না। তখন এ বিষয়ে দুআ পেতে তিনি নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আরকাটের বিখ্যাত বুযুর্গ মাস্তান টিপুর দরগাহে হাজির হন এবং সন্তান লাভের দুআ প্রার্থনা করেন।

www.boimate.com

অন্য বর্ণনামতে, প্রথম স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় মারাত্মক জটিলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যখন দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি প্রসবকালীন যাবতীয় জটিলতা থেকে সহজে উত্তরণের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ প্রার্থনার নিয়তে আরকাটের বিখ্যাত বুযুর্গ টিপু মাস্তান শাহের মাযারে হাজির হন। তার সেই দুআ কবুল হয়েছিল। প্রসবের এ স্তরটি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে নিষ্পন্ন হয়।

তৃতীয় বর্ণনামতে, হায়দার আলীর মনে ছেলে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিলো। এজন্যে তিনি মাস্তান টিপু শাহের দরবারে হাজির হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে ছেলে সন্তানের দুআ চেয়েছিলেন।

মোটকথা, এই তিন বর্ণনার পরস্পরে খুব বেশি বৈপরীত্ব নেই। হতে পারে, তারা তিনজনই একসঙ্গে ওই দরবারে হাজির হয়ে দুআ প্রার্থনা করেছিলেন। এই মহান বুযুর্গের বরাত দিয়ে প্রার্থিত দুআ আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে দেননি। এ কারণেই হায়দার আলী তার অনাগত সন্তানের নাম সেই বুযুর্গের নামের সঙ্গে মিলিয়ে 'টিপু' এবং নিজ পিতা ফাতাহ মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিয়ে 'ফাতাহ আলী' রেখেছিলেন।[৪৮] কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি টিপু নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, টিপুর সঙ্গে 'সুলতান' শব্দ কখন যুক্ত হল। কিছু ঐতিহাসিকের গবেষণা হলো, হায়দার আলী নিজ সন্তানের নাম শুধু 'টিপু'-ই রেখেছিলেন। মহিসুরের সিংহাসনে আরোহণের পর তার নামের সঙ্গে 'সুলতান' শব্দ যুক্ত হয়। এর বিপরীতে 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থে মীর হুসাইন আলী কিরমানী গবেষণা করে এ তথ্য পেশ করেছেন যে, প্রথম থেকেই 'সুলতান' শব্দটি টিপুর নামের অংশ ছিলো।

ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করায় হায়দার আলী চল্লিশ দিন পর্যন্ত আনন্দ উৎসব করেছিলেন। গোটা শহরবাসীকে নিমন্ত্রণ করেন। গরিব-মিসকিনদের মাঝে টাকা বিলি করা হয়। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন।[৪৯] অথচ তখনও তিনি মহিসুরের সিংহাসনে আরোহণ করেননি। স্রেফ মহিসুরের সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন।

---

৪৮. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম

৪৯. সাওয়ানেহে টিপু সুলতান

www.boimate.com

বংশলতিকা

প্রচুর গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরও আমরা টিপু সুলতানের পূর্ণ বংশলতিকা উদ্ধার করতে পারিনি। এরপরও যতোটুকু হাতে এসেছে, তা নিম্নরূপ—

টিপু সুলতান ইবন হায়দার আলী ইব্ন ফাতাহ মুহাম্মদ ইন মুহাম্মদ আলী ইব্ন ওয়ালী মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ বাহলুল ইব্ন হাসান ইবন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল গনী ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন ইয়াহইয়া। যিনি ৮৭৪ হিজরী, মুতাবেক ১৪৬৯ ঈসাব্দে ইনতিকাল করেন।

টিপুর জন্ম হায়দার আলীর জীবনে কল্যাণের শুভবার্তা

টিপুর জন্মগ্রহণের পূর্বে হায়দার আলী ছিলেন মহিসুরের রাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার (Krishnaraja Wodeyar)-এর সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ কর্মচারী। তিনি তখনকার মহিসুর সৈন্যবাহিনীর 'নায়েক' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু টিপুর জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাগ্যের তারকা জ্বলে উঠতে শুরু করে। মাত্র দু' বছরের মাথায় তিনি ডান্ডেগালের গভর্নর নিযুক্ত হন। এর কিছু দিন পর সেনাবাহিনীর সেনাপতি মনোনীত হন। দশ বছরের মাথায় তিনি গোটা মহিসুর রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক রূপে আবির্ভূত হন।

শিক্ষা ও প্রতিপালন

টিপু সুলতান যখন পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন একজন নিরক্ষর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হায়দার আলী ওই যুগের প্রথানুসারে প্রিয় সন্তানের সর্বপ্রথম দ্বীনি শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। কুরআন শরীফ ও আরবি-ফারসি ভাষা শেখার জন্যে শিক্ষক নিয়োগ দেন। ওই যুগের বিখ্যাত আলেম ও কবি 'আলী হুসাইন' ও নাসীরুদ্দীন প্রমূখ টিপুর শিক্ষক ছিলেন। এরপর টিপুকে হাদীস, ফেকাহ ইত্যাদি শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

আমজাদ আলী আশহুরীর গবেষণামতে, কানড়ু ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা শেখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো।[৫০]

---

[৫০]. আমজাদ আলী আশহুরী রচিত 'সাওয়ানেহে টিপু সুলতান'

www.boimate.com

হায়দার আলী যখন শ্রীরঙ্গপত্তনমে থাকতেন তখন নিজে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের পড়াশুনার তদারকি করতেন। পড়াশুনার অগ্রগতি জানতে তিনি নিজেই টিপুকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। মোটকথা, জ্ঞানচর্চার প্রতিটি শাস্ত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্যে হায়দার আলী যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। টিপু যেহেতু জন্মগতভাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, এজন্যে বেশ দ্রুততার সঙ্গে তিনি শিক্ষা-দীক্ষার সকল শাস্ত্রে দক্ষ হয়ে ওঠেন।

ওই যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে যুদ্ধের বিভিন্ন শাস্ত্র, অশ্বারোহণ, তীরন্দাযি, সৈন্য পরিচালনা ইত্যকার বিষয়েরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো। এজন্যে রীতিমতো তার জন্যে ইংরেজ ও ফরাসি যোগ্য প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। মহিসুর সেনাবাহিনীর দক্ষ ও চৌকস অফিসার 'গাজী খান' হায়দার আলীর নির্দেশে টিপু সুলতানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। টিপু সুলতান অশ্বারোহণের প্রতি সবচেয়ে বেশি শখ ছিলো। পালকিতে আরোহণ করাকে তিনি চরম দোষণীয় ও পৌরুষ পরিপন্থী মনে করতেন। যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এই ধারাবাহিকতা ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ের ভেতর তিনি স্বশরীরে অনেকগুলো যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

টিপুর শৈশব

টিপুর শৈশব কীভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে, তার বিবরণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে খুব একটা পাওয়া যায়নি। মাহমুদ ব্যাঙ্গলোরী তাঁর শৈশবের একটি ঘটনা নকল করেছেন। টিপুর বয়স তখন ৬/৭ বছর। একদিন তিনি সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে শ্রীরঙ্গপত্তনমে খেলাধুলা করছিলেন। ওই সময় তাদের পাশ দিয়ে একজন ফকির গোছের লোক যাচ্ছিলেন। তিনি টিপুর চেহারা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এ ছেলেটি বড় হয়ে এ রাজ্যের শাসক হবে। অথচ ওই সময় পর্যন্ত হায়দার আলী ছিলেন মহিসুর সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ কর্মচারী। ওই ফকির টিপুকে বলেছিলেন, তুমি যখন রাজত্ব লাভ করবে তখন এ স্থানে একটি শানদার মসজিদ নির্মাণ করবে। ১৭৮২ সালে হায়দার আলীর ইনতিকালের পর যখন টিপু তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন তখন ফকিরের নির্দেশনা অনুসরণ করে ১৭৮৭ সালে সেই স্থানে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করেন। যার নাম রেখেছিলেন, 'মসজিদে আ'লা'।

www.boimate.com

শৈশব থেকেই হায়দার আলী টিপুকে সবগুলো যুদ্ধাভিযানে সঙ্গে রাখতেন। যার সুবাদে মাত্র ১৬/১৭ বছর বয়সে পৌঁছেই টিপু একজন যোগ্য সিপাহি ও দক্ষ অফিসারে পরিণত হন। ১৭৬৫ সালে মালাবারের অভিযানেও তিনি পিতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথচ ওই সময় তার বয়স হয়েছিলো মাত্র ১৫ বছর। সেই যুদ্ধেই এক পর্যায়ে তিন হাজার সৈন্যের একটি প্লাটুন দিয়ে তাকে পালিগারদের দমন করতে প্রেরণ করেছিলেন। টিপু সেই অভিযান সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। তার সেই বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে হায়দার আলী তাকে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ৫০০ সৈন্যদের অফিসার নিযুক্ত করেন। ১৭৬১ সালে যখন খণ্ডেরাও মারাঠিদের সহায়তায় শ্রীরাঙ্গাপত্তনামের দরিয়া দৌলতবাগে অবস্থানরত হায়দার আলীকে গ্রেফতার করার জন্যে অবরোধ করে তখন হায়দার আলী যদিও কোনোমতে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে ব্যাঙ্গালুরু নগরীতে চলে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু হায়দার আলীর পুরো পরিবার তখন শ্রীরঙ্গাপত্তনমেই রয়ে গিয়েছিলো। খাণ্ডেরাও তাদেরকে কেল্লার ভেতর মসজিদের কাছাকাছি একটি স্থানে আটকে রাখে। সেখানে পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে টিপু সুলতানও ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীরঙ্গপত্তনম জয় করার পর হায়দার আলী তাকে সহ পরিবারের সকল সদস্যকে ব্যাঙ্গালুরু পাঠিয়ে দেন।

এছাড়া ১৭ বছর বয়সে ১৭৬৭ সালে যখন হায়দার আলী মঙ্গলোরের ইংরেজদেরকে অবরোধ করেন ওই যুদ্ধে টিপু মহিসুর সেনাবাহিনীর ৭ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পরিচালনা করেন। ১৭৬৭ সালে হায়দার আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের প্রথম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ চলাকালে হায়দারাবাদের নিযামকে ইংরেজদের থেকে আলাদা রাখার জন্যে তার কাছে একটি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। ওই প্রতিনিধিদলে মহিসুরের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা যথা, মীর আলী রেযা ও মাহফুয খান প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিনিধিদলটিতে হায়দার আলীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব খোদ টিপু সুলতানই পালন করেন। টিপু তার পিতার পক্ষ থেকে নিযামের খেদমতে ১০ টি ঘোড়া, ৫টি হাতি ও প্রচুর হীরা-জওহরাত ছাড়াও প্রচুর অর্থ পেশ করেন। এর বাইরে তিনি তার সঙ্গে এমন কর্মকুশীলতার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন যে, ওই যুদ্ধে নিযাম

www.boimate.com

ইংরেজদের সঙ্গ না দিতে রাজি হন। মুগ্ধ নিযাম এতোটুকুতেই থেমে যাননি; বরং তিনি ওই সময় টিপুকে 'নসীব-উদ-দ্দৌলা' অর্থাৎ সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য নামে অভিহিত করে 'ফাতাহ আলী খান বাহাদুর' উপাধীতে ভূষিত করেন।

টিপুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে হায়দার আলীর সবিশেষ মনোযোগ

ব্যক্তিগতভাবে হায়দার আলী নিজে যদিও নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু তার তত্ত্বাবধানে টিপু এতোটাই শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠেন যে, একদিকে তিনি যেমন দ্বীন-দুনিয়ার নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানে যোগ্য হয়ে ওঠেছিলেন, অন্যদিকে যুদ্ধের ময়দানে একজন সফল সেনাধ্যক্ষ হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছিলেন। এর পেছনে মূল কারণ হলো, হায়দার আলী মহিসুরের রাজসিংহাসনে আরোহণের পর এ অনুভূতি সুতীব্রভাবে বোধ করছিলেন যে, রাজ্যপরিচালনার জন্যে নিরেট মেধা, বাহাদুরি ও সুব্যবস্থাপনাই যথেষ্ট নয়; এসকল যোগ্যতা ও দক্ষতার পাশাপাশি শাসক যদি শিক্ষা-দীক্ষার অলঙ্কারে সুসজ্জিত না হন তাহলে তার মন্ত্রীবর্গ ও অফিসাররা তার নিরক্ষতার সুযোগে অবৈধ ফায়দা লুটে যেকোনো সময় তাকে ধোঁকা দিতে পারে। এজন্যে যখন থেকেই হায়দার আলীর মনে তার পরবর্তীকালে নিজ স্থানে প্রিয় পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করার সংকল্প গড়ে উঠতে শুরু করে তখন সর্বপ্রথম তিনি তাকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এজন্যে তিনি যেমন তার মাঝে সকল জ্ঞান-বিদ্যার সমাহার ঘটাতে তৎকালীন যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর শরণাপ্ন হয়েছিলেন, অন্যদিকে তার মাঝে দ্বীনি মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিকাশের ক্ষেত্রেও কোনো ধরনের গাফলতি করেননি। এর ওপরও তিনি তার সজাগ দৃষ্টি প্রতিনিয়ত নিবদ্ধ রেখেছিলেন।

হায়দার আলীর দৃষ্টিতে বিষয়টি কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তার খানিকটা আভাস সেই স্বীকারোক্তিনামা থেকেও পরিস্ফুট হয়– যা তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর টিপু সুলতান থেকে খোদ তার হাত দিয়ে ফারসী ভাষায় লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

স্বীকারোক্তিনামাটি একদিকে হায়দার আলীর অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধ ও ব্যবস্থাপনার সাক্ষ্য বহন করে, অন্যদিকে তা টিপুর নৈতিক ও ধর্মীয় শক্ত

www.boimate.com

বুনিয়াদের ওপর নির্মিত চিন্তাধারার খানিকটা প্রমাণ প্রকাশ করে। পিতার নির্দেশনা অনুসারে টিপু সুলতান সেই স্বীকারোক্তিনামা ফারসী ভাষায় লিখেছিলেন। টিপুর স্বহস্তে লেখা সেই ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তির প্রতিচিত্র এখনও বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে আমরা তার সরল অনুবাদ তুলে ধরছি।

স্বীকারোক্তিনামা

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোনো কাজ করবো না। এর অন্যথা হলে যেকোনো যথোপযুক্ত শাস্তি মেনে নেবো।

২. যদি রাষ্ট্রের কোষাগারে চুরি বা আত্মসাৎ করি তাহলে আমাকে যেন ফাঁসি দেওয়া হয়।

৩. মিথ্যা বা প্রতারণা করলে তার জন্যে ফাঁসির দণ্ড দেয়া হোক।

৪. আব্বাজানের অনুমতি ব্যতিরেকে কারো কোনো উপহার বা হাদিয়া গ্রহণ করবো না। এর অন্যথা হলে আমাকে নাক কেটে দেশান্তর করা হোক।

৫. রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিষয়ে যদি আমি কারো সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি বা কাউকে ধোঁকা দিই তাহলে ফাঁসির উপযুক্ত বিবেচিত হবো।

৬. যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমার ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয় অথবা আমার নেতৃত্বে সৈন্যদল দেওয়া হয় তাহলে আমি আমি সেই সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ করেই নিজ দায়িত্ব প্রতিপালন করবো– যাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ কাজের জন্যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর অন্যথা হলে আমি ফাঁসির উপযুক্ত বিবেচিত হবো।

৭. কারো সঙ্গে চিঠি-পত্র বা কোনো ধরনের লেনদেন করতে হলে আপনার পক্ষ থেকে নিযুক্ত পরামর্শকদের সঙ্গে রায় নিয়েই সম্পন্ন করবো।

৮. এই বাক্যগুলো আমি স্বেচ্ছায় লিখে সেগুলোকে মনের মাঝে গেঁথে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথার স্বীকারোক্তিও দিচ্ছি যে, যাবতীয় কাজ এই নির্দেশনা অনুসারে নিষ্পন্ন করবো। এর অন্যথা হলে যেই শাস্তি বিবেচনা করবেন মাথা পেতে মেনে নেবো।

www.boimate.com

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে উজ্জ্বল অবদান

সুলতান হায়দার আলীর জীবনীতে আমরা বিশদাকারে আলোচনা করেছি যে, কীভাবে ১৭৬৭ সালে ইংরেজরা আরকাটের নবাব মুহাম্মদ আলী, হায়দারাবাদের নিযাম ও মারাঠাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াইয়ের সূচনা করেছে। হায়দার আলী তাদের সম্মিলিত আক্রমণ বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেছিলেন। প্রজ্ঞাদীপ্ত যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে তিনি গোটা বাহিনীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পাঁচ কমান্ডারের নেতৃত্বে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই পাঁচ বাহিনীর একটির নেতৃত্ব দান করেন টিপু সুলতান। মাত্র ১৭ বছরের তরুণ টিপু সুলতান ৭ হাজার সৈন্যের একটি প্লাটুনের নেতৃত্ব দান করেন। হায়দার আলী টিপু সুলতানকে মঙ্গলোরে অবস্থিত ইংরেজদেরকে আকস্মিক অবরোধ করার অভিযানে প্রেরণ করেন। পিতার আস্থার যথাযোগ্য প্রদান দিয়ে টিপু সুলতান মঙ্গলোরের দুর্ভেদ্য কেল্লা বিজয় করতে সমর্থ হন। শুধু এতোটুকুই নয়; বরং তিনি ইংরেজদেরকে সমুদ্রপথে মুম্বাই পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। মোটকথা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের প্রথম যুদ্ধে হায়দার আলীর বিজয় লাভের ক্ষেত্রে একজন স্বল্পবয়সী যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও টিপু সুলতান বেশ বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। সকল ঐতিহাসিক এ কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন।

মারাঠাবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণ

মাদ্রাজ সন্ধিনামার পরপরই ১৭৬৯ সালে এক লক্ষ মারাঠি ফৌজ তুরমুক রাওয়ের নেতৃত্বে শাহনূরের নবাবকে সঙ্গে নিয়ে যখন দ্বিতীয়বারের মতো মহিসুর আক্রমণ করে, ওই যুদ্ধেও টিপু সুলতান পিতার কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। হায়দার আলী তখন তাকে এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, শত্রুদলের আসার পথে যেখানে যতো শষ্য-ফসল পড়বে, তা ধ্বংস করে রসদের সবগুলো উৎস যেন ধ্বংস করে দেয়। এর বাইরে পথের সমস্ত জলাধারে যেন বিষ মিশিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য হলো, শত্রুদল যেন এই প্রাকৃতিক উপকরণগুলো থেকে উপকৃত হতে না পারে এবং বাধ্য হয়ে ফিরে যায়।

মারাঠাদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের প্রথম দিকে হায়দার আলীকে এক পর্যায়ে পেছন দিকে সরে আসতে হয়। ঘটনাক্রমে একদিন শত্রুদের ওপর

www.boimate.com

আক্রমণ করতে টিপু অনেক দূর এগিয়ে যান। শত্রুদের অঞ্চলে ঢুকে এক পর্যায়ে নিখোঁজ হয়ে যান। কোথাও তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না। টিপু শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছে কি-না, এমন আশঙ্কা হায়দার আলীর মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। হায়দার আলী তার এই পুত্রকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। পুত্রের বিচ্ছেদ তাকে ভীষণ চিন্তিত করে তোলে। তিনি তীব্র অস্থিরতা বোধ করতে থাকেন। তৎক্ষণাৎ এক বুযুর্গের মাযারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে টিপুকে ফিরিয়ে দেওয়ার দুআ প্রার্থনা করলেন।

একদিন ফকিরের পোশাক পরে, গোপন বেশ ধারণ করে টিপু শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনম পৌঁছতে সমর্থ হন। প্রিয় সন্তানকে ফিরে পেয়ে হায়দার আলীর আনন্দের সীমা রইলো না। বাঁধভাঙ্গা সুখের আতিশয্যে হায়দার আলী রাজকোষের ফটক খুলে দিলেন। দু'হাতে দান-খয়রাত করতে লাগলেন। অভিজাতদের হাতে উপহার-উপঢৌকনের স্তূপ তুলে দিলেন। একাধারে একমাস অবরোধ করেও মারাঠা বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তনম জয় করতে পারেনি। অগত্যা ৪ লক্ষ নগদ রুপি নিয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যায়। দেশরক্ষার এই যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টিপু সুলতান পিতার সঙ্গে ছিলেন।

বিয়ে

হায়দার আলীর একান্ত বাসনা ছিলো, তিনি দ্রুত প্রিয় সন্তান টিপুর বিয়ের কাজ সম্পন্ন করবেন। কিন্তু একের পর এক যুদ্ধ লেগে থাকার কারণে তিনি নিজেও যেমন ব্যস্ত ছিলেন, তদ্রূপ ছেলের হাতেও কোনো অবসর ছিলো না। ১৭৭৪ সালে সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুর রীতিমত যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। ওই বছর টিপু সুলতানের বয়স হয়েছিলো ২৪ বছর। যার ফলে হায়দার আলী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, দেশের এই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে টিপুর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এসে দাঁড়ালো যে, এমন সুযোগ্য শাহযাদার জন্যে উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী কোথায় পাওয়া যাবে? টিপু সুলতান একদিকে যেমন সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন, অন্যদিকে চরিত্র ও নৈতিকতার বিচারেও তিনি ছিলেন আদর্শ যুবক। দ্বীনদারি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে তার মতো যুবক কদাচিৎ চোখে পড়ে। এর

www.boimate.com

পাশাপাশি তিনি ছিলেন তাঁর সম্রাট পিতার সুনিশ্চিত স্থলবর্তী। তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাকে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে হবে। যার কারণে মহিসুরের প্রত্যেক কন্যার পিতা মনে-প্রাণে এটাই কামনা করতো যে, টিপু সুলতানই হোক তার জামাতা।

সৌভাগ্যবান ছেলে হিসেবে টিপু সুলতান তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের পূর্ণ এক্তিয়ার পিতা-মাতার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারাই তার জন্যে বধূ নির্বাচন করবেন। সালতানাতে খোদাদাদে ওই যুগে 'আহলে নাওয়াইত' নামে একটি গোত্র বসবাস করতো। তারা ছিলো আরব বংশোদ্ভূত। সেই গোত্রের কিছু সদস্য ছিলেন ইয়ামানের হাদরা মাউত থেকে আগত। তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অবতরণ করেছিলো। তারা ছিলো আরব বণিক। এর বাইরে কিছু আরব হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অত্যাচারে আরব ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসে নিবাস পেতেছিলেন। তারা হলো আরব মুহাজির। সেই আরব বণিক ও মুহাজিররা যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করতে করতে এদেশের নাগরিক হয়ে গিয়েছিলো। তারাই 'আহলে নাওয়াইত' নামে পরিচিত ছিলো। ওই যুগের মুসলিম রাজাদের দরবারে তারা অত্যন্ত সম্মানিত বিবেচিত হতো। দ্বীনি-দুনিয়াবি শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার কারণে ওই যুগে কাজী, খতীব, হিসাবরক্ষক, পর্যবেক্ষক ইত্যকার বড় বড় ধর্মীয় পদ-পদবিতে সিংহভাগ তারাই অধিষ্ঠিত হতো। তাদের অনেকেই যেহেতু কুরাইশ বংশোদ্ভূত ছিলো, এজন্যে সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভক্তি করতো। এমনকি অমুসলিমরাও তাদেরকে সমীহ করতো।

টিপুর দাদা ফতেহ আলীর একজন স্ত্রী অর্থাৎ হায়দার আলীর জননী ছিলেন সেই আহলে নাওয়াইত বংশোদ্ভূত। এ জাতীয় কিছু কারণে হায়দার আলীর আন্তরিক অভিপ্রায় ছিলো— তিনি সেই অভিজাত গোত্রের কোনো কন্যাকে প্রিয় সন্তান টিপুর বউ করে রাজমহলে নিয়ে আসবেন। তারই সূত্র ধরে ইমাম বখশী নাওয়াইতী সাহেবের কন্যা সুলতানা বেগমকে তিনি টিপুর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে চয়ন করেন।

কিন্তু টিপুর জননী ফাতেমা বেগমের ইচ্ছে ছিলো, মহিসুর সেনাবাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিসার শায়খ বুরহানুদ্দীনের বোন, অর্থাৎ লালা মিয়া শহীদ চরকুলীর কন্যা রুকাইয়া বেগমকে টিপুর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ

www.boimate.com

করবেন। যার ফলে পাত্রী নির্বাচন প্রক্রিয়া কয়েকদিন পর্যন্ত অমীমাংসিত অবস্থায় ঝুলন্ত থাকে।

কিছু কিছু ঐতিহাসিক এ প্রসঙ্গে লেখেন যে, পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফাতেমা বেগমের বিরোধিতার কারণ হলো, খোদ আহলে নাওয়াইত-ই টিপুর সঙ্গে তাদের বংশের কোনো মেয়ের বিয়েবন্ধনের প্রতি আন্তরিক ছিলো না। হায়দার আলী স্রেফ তার শক্তির জোরে সম্পর্ক বাঁধতে অনড় ছিলেন। এর কারণ হলো, আহলে নাওয়ায়েত غیرکفو তথা নিজেদের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করাটা দোষণীয় মনে করতো। এ কথা যদিও আপন স্থানে সঠিক যে, আহলে নাওয়াইতদের নিজস্ব সামাজিকতা, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-কালচার ছিলো। সেই স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বজায় রাখা সহ অপরাপর বিভিন্ন কারণে তারা যথাসম্ভব চেষ্টা করতো যে, বৈবাহিক সম্পর্ক যেনো নিজেদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাদের এই ভাবনা ইসলামি চেতনার পরিপন্থী নয়। কিন্তু এ কথা কিছুতেই বাস্তবাশ্রিত হতে পারে না যে, টিপু আহলে নাওয়ায়েতের জন্যে کفو ছিলেন না। কারণ, খোদ টিপুর দাদাও 'আহলে নাওয়ায়েত' বংশোদ্ভূত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে টিপুর পরিবার আরব থেকে এসেছে এবং তারা কুরাইশ বংশেরই একটি শাখা। কাজেই একজন আরব যুবক কীভাবে আরব নারীর জন্যে غیرکفو বা ভিন্ন ও নিম্নস্তরের হয়! সবচেয়ে বড় কথা হলো, হায়দার আলীও তার মৃত ভাই শাহবাযের ছেলের বিয়ে নাওয়ায়েত বংশের তরবিয়ত আলী খানের কন্যার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। মোটকথা, নাওয়ায়েত বংশের কন্যার সঙ্গে টিপুর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করাটা আহলে নাওয়ায়েতের কাছে অপ্রিয় বিবেচিত হয়েছিলো, এ তথ্য সঠিক নয়। এটা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ।

টিপু সুলতান পিতা-মাতার কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চাননি। তিনি উভয়ের মন রক্ষার্থে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পছন্দের দু' কন্যাকে একসঙ্গে বিয়ে করতে রাজি হন। ১৭৭৪ সালের কোনো এক রাতে এক ঘন্টার বিরতিতে তাদের দু'জনের সঙ্গে টিপু সুলতানের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। প্রথমে বখশী নায়েতার কন্যা সুলতানা বেগমের সঙ্গে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর লালা মিয়ার কন্যা রুকাইয়া বেগমের সঙ্গে বিয়ের আকদ সম্পন্ন হয়। টিপু সুলতানের বিয়ে উপলক্ষ্যে গোটা মহিসুরের উৎসব-উল্লাসের হিল্লোল

www.boimate.com

ছড়িয়ে পড়ে। মহিসুরের জনগণকে পূর্ণ একমাস ভূরিভোজন করা হয়। হায়দার আলী প্রিয় সন্তান টিপুকে হাতির ওপর বসিয়ে রাজকীয় জুলুশ সহকারে বিয়ের মজলিসে প্রেরণ করেন।

রুকাইয়া বেগম ১৭৯২ সালে এবং মুহিব্বুল হাসান সাহেবের গবেষণা অনুসারে ১৭৯০ সালে টিপুর জীবদ্দশাতেই ইনতিকাল করেন।[৫১] অবশ্য সুলতানা বেগম টিপুর ইনতিকালের পরও জীবিত ছিলেন। তারীখে টিপু সুলতান গ্রন্থের লেখকের ভাষ্য অনুসারে রুকাইয়া বেগমের ইনতিকালের পর টিপু সুলতান সাইয়্যেদ মুঈনুদ্দীন সাহেবের কন্যা খাদিজা জামান বেগমকে বিয়ে করেছিলেন।[৫২] ১৭৯৭ সালে তিনিও এক সন্তান রেখে ইনতিকাল করেন।

কিছু কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, টিপু সুলতান কাশ্মিরের এক আমীর মীর মুহাম্মদ পসন্দ বেগ, যিনি ওই যুগে দিল্লিতে বসবাস করতেন, তার কন্যা বুরাম্তি বেগমের সঙ্গেও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে এতোটুকু নিশ্চিত যে, টিপুর শহীদ হওয়ার সময় শুধু সুলতানা বেগম নামের স্ত্রীই জীবিত ছিলেন। এই স্ত্রীদের গর্ভে যেসকল সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের বিশদ বিবরণ সামনে আসছে।

হায়দার আলীর শেষ যুদ্ধে টিপুর কৃতিত্ব

১৭৮০ সালে ইংরেজদের সঙ্গে মহিসুরের দ্বিতীয় যুদ্ধের নেপথ্য কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমরা 'হায়দার আলীর জীবনী গ্রন্থে' বিশদ আলোচনা করেছি। যেহেতু এ যুদ্ধ ১৭৮০ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো এবং ১৭৮২ সালে এ যুদ্ধ চলাকালেই হায়দার আলী ইনতিকাল করেন, আর তার স্থানে টিপু সুলতান স্থলাভিষিক্ত হন, সেহেতু ইতিহাসের পাতায় এটি হায়দার আলীর শাসনামলের দ্বিতীয় যুদ্ধ ও টিপুর শাসনামলের প্রথম যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। হায়দার আলীর জীবদ্দশাতেই পাইনঘাট অভিযানের নেতৃত্ব টিপুর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো। জেনারেল আয়ারকোটের নেতৃত্বে যখন ইংরেজরা মাহমুদ বন্দর দখল করে ফেলে তখন হায়দার আলী তা ইংরেজদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার

---

[৫১]. মুহিব্বুল হাসান রচিত 'তারীখে টিপু সুলতান'।

[৫২]. মীর হুসাইন আলী কিরমানী রচিত 'নিশানে হায়দারী'।

www.boimate.com

করার জন্যে টিপু সুলতানকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পুলিলুর নামক স্থানে ইংরেজ কর্নেল বেলির সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে টিপু সুলতানের দেওয়া যুদ্ধকৌশলই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ওই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর প্রায় ৩৬ জন উচ্চপদস্থ অফিসার ও হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। প্রায় ৫০ জন বড় বড় সামরিক কর্মকর্তাকে বন্দী করে শ্রীরঙ্গপত্তনমে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

১৭৮০ সালে নিলোর, কাভেরিপটন, উরনী, আরকাট, সাতগড়, আমবূর, তিয়াকগড় প্রভৃতি এলাকা সুলতান টিপুর দুর্বিনীত প্রচেষ্টার ফলেই বিজিত হয়। ১৭৮১ সালে মাহিমণ্ডল কেল্লার বিজয়ের একক কৃতিত্বও টিপুর। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনজুরের ময়দানে টিপু সুলতান কর্নেল বার্থভেট-কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। যার ফলে জেনারেল আয়ারকোটের পুরো যুদ্ধ পরিকল্পনা চরমভাবে ভেস্তে যায়। হায়দার আলীর ইনতিকালের কিছু দিন পূর্বে যখন কিছু দিনের জন্যে মালাবারের নায়ার গোত্রের লোকজন দ্বিতীয়বারের মতো বিদ্রোহের দুঃসাহস দেখায় এবং কালীকাট প্রভৃতি নগরী ইংরেজ কর্তৃক দখলের সংবাদ আসতে শুরু করে তখন হায়দার আলী তাঁর আস্থাভাজন সেনাপতি মাখদুম আলীকে তা অবদমন করার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই অভিযান তিনি সম্পন্ন করার পূর্বেই শহীদ হন। তখন সেখানকার পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে তিনি টিপু সুলতানকে প্রেরণ করেন। এখানেও সুযোগ্য সন্তান টিপু পিতার আস্থার পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে শক্ত হাতে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

হায়দার আলীর মৃত্যু ও টিপুর স্থলাভিষিক্তি

টিপু যখন মালাবারের সেই অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই একটি নাতিদীর্ঘ অসুস্থতার পর হায়দার আলী পরকালে পাড়ি জমান। যার ফলে নবাব হায়দার আলীর হাতে প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য সালতানাতে খোদাদাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্বভার সন্তান টিপু সুলতানের হাতে চলে আসে। ইনতিকালের সময় হায়দার আলী সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীলদের অসিয়ত করেছিলেন যে, আপনারা যেরকম বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার সেবা-সহায়তা করেছেন, ঠিক সেভাবেই আপনারা টিপু সুলতানকেও সহায়তা করবেন।

www.boimate.com

ইনতিকালের একদিন আগে অভিযান থেকে ফিরে আসার নির্দেশ জানিয়ে হায়দার আলী টিপু সুলতানকে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু টিপুর পৌঁছানোর আগেই তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। টিপুর শ্রীরঙ্গপত্তনমে প্রত্যাবর্তনের আগপর্যন্ত তার ছোট ভাই করীম শাহকে মহিসুরের অন্তর্বর্তীকালীন সম্রাট মনোনীত করা হয়। ওই সময় সুলতান টিপুকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে রাখার জন্যে যেসব চক্রান্ত হয়েছে তার বিশদ বিবরণ হায়দার আলীর জীবনীর শেষাংশে বিবৃত রয়েছে।

২০ মুহাররম ১১৯৬ হিজরী, মুতাবেক ২৭ ডিসেম্বর ১৭৮২ ঈসাব্দ শনিবার টিপু সুলতান তার ছোট ভাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজক্ষমতা বুঝে নেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি সম্মানীত জননীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে দুআ নেন। দু' রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে এই কঠিন আমানত যথাযোগ্যভাবে প্রতিপালন করার তাওফীক চেয়ে দুআ প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন।

রাজদরবারের প্রথম মজলিসের সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। কারী সাহেব সূরা হাশরের সর্বশেষ রুকু তিলাওয়াত করেন। কারী সাহেব যখন لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ তিলাওয়াত করছিলেন তখন যেহেতু টিপু সুলতান আলেম ছিলেন এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, এজন্যে আয়াতাংশটি কানে পড়তেই তার দু'চোখ বেয়ে টপটপ অবিরাম অশ্রু ঝরতে শুরু করে। গোটা রাজদরবারে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পিনপতন নীরবতা বিরাজ করে।

এরপর ওই রাজদরবারে উপস্থিত একজন বড় আলেমের মুবারক হস্তে রাজমুকুট টিপু সুলতানের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়। টিপু রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের সকল গভর্নরের নামে এ নির্দেশনা জারি করেন যে, ক্ষমতার হস্তান্তর সত্ত্বেও রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না। প্রত্যেকেই তার পূর্বের পদে বহাল থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাবেন। ওই সময় যেহেতু ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের যুদ্ধ চলছিলো, এজন্যে রাজসিংহাসনে আরোহনের সকল রাষ্ট্রীয় প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা যায়নি। ১৭৮৪ সালে ইংরেজদের

www.boimate.com

বিরুদ্ধে মহিসুরের যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর অসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

জনগণের নামে প্রথম রাষ্ট্রীয় বার্তা

ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহণের পর টিপু সুলতান তার জনগণের উদ্দেশ্যে যেই প্রথম রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা জারী করেছিলেন, সেখানে তার সৎ সংকল্প, জনতার সেবা করার চেতনা, সদিচ্ছা ও সহমর্মিতার চিত্রই ফুটে ওঠেছে। সেই নির্দেশনার সারমর্ম ছিলো—

১. মহিসুরের সালতানাতে খোদাদাদের শাসক হিসেবে আমি টিপু সুলতান এ কথা বিশ্বাস করি যে, আমার দায়িত্ব হলো– ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে কোনো ধরনের বিভাজন না করে আমি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নৈতিক উপকার করবো।

২. জনগণের সচ্ছলতা এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্যে সবসময় সচেষ্ট হবো।

৩. অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত সালতানাতে খোদাদাদের একেক ইঞ্চি ভূমি সুরক্ষিত রাখবো।

৪. মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সংশোধনের জন্যে বিশেষ পদক্ষেপ নেবো।

৫. ইংরেজরাই আমাদের প্রধান শত্রু। তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়ন করার জন্যে আমি গোটা ভারতবর্ষের জনগণকে একত্র করবো।

৬. নিপীড়িত ও অসহায় জনগণকে জমিদার ও জায়গীরদারদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবো। প্রত্যেকের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গতভাবে অভিন্ন আচরণ করবো।

৭. দেশের জনগণের মাঝে বিদ্যমান ধর্মীয় নিন্দা ও শ্রেণিভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাদেরকে এক পতাকার নিচে সমবেত করবো।

৮. প্রয়োজন দেখা দিলে মাতৃভূমি সুরক্ষিত রাখার জন্যে বিদেশীদের কাছ থেকেও সামরিক সহায়তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবো না। সালতানাতে মহিসুরের সীমারেখার ভেতর বিদেশী বাণিজ্য ও পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে

www.boimate.com

এখানকার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উন্নতি ও সচ্ছলতার উদ্যোগ গ্রহণ করবো।[৫৩]

রাজ্য সম্প্রসারণে টিপুর ভূমিকা

টিপু সুলতান যখন ১৭৮২ সালে সালতানাতে খোদাদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ওই সময় মহিসুরের দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় চার শ মাইল। সামষ্টিক আয়তন আশি হাজার বর্গমাইলেরও অধিক। রাজ্যপরিচালনার সুবিধার্থে পুরো রাজ্যকে ২০ টি জেলায় ভাগ করা হয়েছিলো। প্রতিটি জেলায় গড়ে ৪০ টি করে তালুক ছিলো। মহিসুরের সীমান্ত ছিলো উত্তর পূর্ব দিকে কৃষ্ণা নদী। উত্তর-পশ্চিমে ধারওয়ার (Dharwar)। দক্ষিণ-পূব দিকে বর্তমানের তামিলনাড়ু প্রদেশের মাদুরাই (Madurai) নগরী। এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কোচি নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব দিকে তার সীমান্ত মাশরেকি ঘাট থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে আরব সাগরের উপকূলীয় এলাকা ভাটকাল ও কারওয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও যেই প্রদেশটির কথা খোদ উত্তর ভারতের জনগণও জানতো না, এখন তার প্রসিদ্ধি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হায়দার আলীর পূর্বে মহিসুরের পূর্ণ ইতিহাসে এই এলাকাগুলো কখনই কোনো একক শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো না। এতদাঞ্চলের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোনো একক রাজার নিয়ন্ত্রণে এতোগুলো ছোট-বড় দ্বীপরাজ্য অন্তর্ভুক্ত হয়। হায়দার আলী যখন ইনতিকাল করেন তখন একের পর এক যুদ্ধ সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নগদ তিন কোটি রুপি, স্বর্ণ-রৌপ্য ও হীরা-জওহরাতের বিশাল স্তুপ সঞ্চিত ছিলো। এর বাইরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে অসংখ্য স্থাবর সম্পত্তি, বাগান, শষ্যক্ষেত, ভবন ও প্রচুর মূল্যবান সমৃদ্ধ স্থাপনাও ছিলো।

ওই সময় নিদেনপক্ষে এক লক্ষ সৈন্য রাজধানীর আশপাশে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। এর বাইরে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রশাসন ও সুব্যবস্থাপনার কাজে ১ লক্ষ ৮০ হাজার আধাসামরিক সিপাহি কাজ করতো। সেনাবাহিনীতে ষাট হাজার ঘোড়া ছিলো। যার প্রায় অর্ধেকই ছিলো চৌকস আরবী ঘোড়া। এর বাইরে ৬ হাজার উট, ৯ শ হাতি, ২

৫৩. সুলতানে জমহুর। লেখক, মুসলিম ভিলোরি

www.boimate.com

লক্ষাধিক তরবারি, ২২ হাজার তোপ, বিভিন্ন সাইজের ৬ লক্ষ বন্দুক ও অসংখ্য-অগণিত যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা-বারুদের বিশাল সংগ্রহ ছিলো। জনসংখ্যার পরিধি ও ফসল উৎপাদনের ব্যাপকতার বিচারেও মহিসুরকে ওই যুগে গোটা ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের তালিকায় অন্যতম শীর্ষদেশ বিবেচনা করা হতো। জনসংখ্যা ছিলো ৭ মিলিয়ন তথা ৭০ লাখ। রাজ্যটির আবহাওয়া ছিলো যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ। সালতানাতে খোদাদাদের অধীনে ৫১ টি করদ রাজ্য ছিলো। মহিসুরের বাৎসরিক আয় ছিলো সাড়ে ৭ কোটিরও ঊর্ধ্বে। খনিজ সম্পদ, জনগণের সচ্ছলতা ও রাজার সুশাসন ও সুব্যবস্থাপনার কারণে মহিসুরের সুখ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। যার ফলে সালতানাতে খোদাদাদ ওই যুগের একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হতো। এ কারণেই আশ-পাশ থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের অনেকগুলো রাজ্য থেকে বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রের মানুষ নিজেদের দেশ ত্যাগ করে হায়দার আলীর রাষ্ট্রে যথারীতি বসবাস শুরু করে দেয়। এমনকি বেশ কিছু বিদেশীও রাষ্ট্রের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মহিসুরে নিবাস পাতে। যাদের কেউ কেউ সরকারি চাকুরিতেও যোগদান করে।

www.boimate.com

নবম অধ্যায়

রাজসিংহাসনে আরোহণ থেকে মঙ্গলোর চুক্তি পর্যন্ত

www.boimate.com

রণদামামা বেজে চলছে

হায়দার আলীর ইনতিকালের পর যখন টিপু সুলতান মহিসুরের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন তখন ইংরেজদের সঙ্গে মহিসুরের যুদ্ধ চলছিলো। অনেকগুলো রণাঙ্গনে মহিসুরের সেনাবাহিনী ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করছিলো। যার কারণে সিংহাসনে আরোহণের পর টিপু সুলতান কালবিলম্ব না করে যুদ্ধের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। যদিও রাজকোষে অর্থের অভাব ছিলো না; কিন্তু নিয়মিত যুদ্ধ অব্যাহত থাকার কারণে সৈনিকরা তাদের বেতন-ভাতা ঠিকমতো পাচ্ছিলো না। সুলতান সর্বপ্রথম এ নির্দেশ জারি করেন যে, অতিসত্তর সৈনিকদের বেতন বুঝিয়ে দেয়া হোক। আগামীতে যেন মাস শেষেই তারা বেতন হাতে পেয়ে যায়, তার নির্দেশনা জারি করেন। টিপু সুলতান আরও নির্দেশ করেন যে, যেসকল সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে ব্যস্ত রয়েছে, তাদের খাবার-দাবার প্রেরণের ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণ বিলম্ব করা যাবে না। ইংরেজ কয়েদিদের সঙ্গে সবসময় সুন্দর আচরণ করতে হবে।

টিপু সুলতান ফরাসি কর্মকর্তাদের সহায়তায় তার তোপখানা নতুন করে ঢেলে সাজান। অস্ত্র তৈরির কারখানায় কাঁচামাল পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করেন। এভাবে তিনি সৈনিকদের জন্যে সবধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেন।

ইংরেজদের বেদনুর (Bednore) দখল

ইতিহাসের পাতা থেকে বুঝে আসে যে, বেদনুর (Bednore) ছিলো একটি সচ্ছল হিন্দু অধ্যুষিত জনপদ। হায়দার আলী এ নগরীটি জয় করে সাল্তানাতে খোদাদাদে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আয়ায খান নামে হায়দার আলীর একজন রাজকর্মচারী ছিলেন। যিনি ছিলেন মালাবারের নায়ার বংশোদ্ভূত। হায়দার আলী তাকে বেদনুরের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু হায়দার আলীর ইনতিকালের পর এই আয়ায খান গাদ্দারি করে বসে। সে মুম্বাইয়ের ইংরেজ জেনারেল ম্যাথিউজের হাতে এ এলাকাটি এ

www.boimate.com

শর্তের ওপর তুলে দেয় যে, তাদের অধীনে তাকেই এ এলাকার গভর্নরের পদে বহাল রাখা হবে।

এলাকাটি দখলের পেছনে ইংরেজদের অনেকগুলো স্বার্থ জড়িত ছিলো। প্রথম স্বার্থ হলো, যেহেতু এলাকাটি সমুদ্রোপকূলের খুব কাছেই অবস্থিত; কাজেই এ এলাকা দখল করা গেলে এখান থেকে টিপুর বিরুদ্ধে তাদের সামরিক পদক্ষেপ নিতে সুবিধে হবে। দ্বিতীয় স্বার্থ হলো, এটি সম্পদ-প্রাচুর্যে টইটুম্বুর একটি নগরী। কাজেই এখান থেকে তাদের যাবতীয় সামরিক প্রয়োজন অতি সহজেই পূরণ করা যাবে। তৃতীয় স্বার্থ হলো, বেদনুর (Bednore) এলাকাটি প্রাকৃতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সালতানাতে খোদাদাদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী। এ এলাকার ওপর ইংরেজদের দখল প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজদের ধারণামতে, টিপু সুলতানকে খুব সহজেই সন্ধিচুক্তিতে বাধ্য করা যাবে। এ ধরনের একটি সুযোগের জন্যে তারা কয়েক মাস ধরে অধীর অপেক্ষা করছিলো।

কিন্তু দেখা গেলো, এলাকাটি দখলে নেয়ার পরও ইংরেজ কোম্পানি সেখান থেকে কোনো অর্থনৈতিক সুফল পাচ্ছে না। কারণ হলো, এলাকাটি দখল করার পর ইংরেজ সিপাহিরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সহ অন্যান্য দৌলত নিজেদের মাঝেই বণ্টন করে ফেলে। সেখান থেকে কোম্পানি কোনো ধরনের মুনাফা পায়নি। এছাড়া প্রশাসনের ষড়যন্ত্রে ইংরেজরা এলাকাটি দখল করে নেওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় জনগণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যা দমন করার জন্যে ইংরেজরা দৈত্যসুলভ নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। নির্বিচারে তারা পুরুষদের হত্যা করে। চার শ মহিলাকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে।[৫৪] ইংরেজদের পাশবিক অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে অনেক মহিলা জলাধারে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করে।

ইংরেজরা এলাকাটির ওপর তাদের অবৈধ নিয়ন্ত্রণ খুব বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। ২৮ এপ্রিল ১৭৮৩ সালে টিপু সুলতান ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের ওপর আক্রমণ করে এলাকাটি উদ্ধার করতে সমর্থ হন। ওই যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যরাও টিপুর নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তিনি মঙ্গলোর থেকে বেদনুর (Bednore)-গামী রাস্তা দখল করে তাদের জন্যে

---

[৫৪]. প্রফেসর মুহিব্বুল হাসান রচিত 'তারীখে টিপু সুলতান'

www.boimate.com

রসদের জোগান দেওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেন। সবশেষে কৃপা করে তিনি ইংরেজ সিপাহিদেরকে সদাশ্বঘর-এর রাস্তা ধরে মুম্বাই ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

কিন্তু টিপুর উদারতার অপব্যবহার করে তারা নিজেদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বিপুল অংশ লুটতরাজ করে নিয়ে যায়। যখন টিপুর নির্দেশে তাদের কিছু সৈন্যের শরীর তল্লাশি করা হয় তখন প্রায় ৪০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে আসে। যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

মঙ্গলোর অবরোধ

বেদনুর (Bednore) অভিযান চলাকালে টিপু সুলতান দ্বিতীয়বারের মতো মঙ্গলোর জয় করার জন্যে চৌকস সেনাপতি হুসাইন আলী খানের নেতৃত্বে চার হাজার সিপাহির একটি দল প্রেরণ করেন। কিন্তু মাদ্রাজের গভর্নর জেনারেল ক্যাম্পবেলের হাতে এই সৈন্যদলটি পরাজিত হয়। মহিসুর সেনাবাহিনীর প্রায় দু' শ সৈন্য নিহত হয়।

বেদনুরের সেনা অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করার পর টিপু সুলতান নিজেই মঙ্গলোর পৌঁছেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বন্দরনগরীটি তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বিবেচিত হতো। জেনারেল ক্যাম্পবেল সসৈন্য মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে টিপু সুলতান অনায়াসে ইংরেজদের পরাজিত করেন। ওই অভিযানে এতো প্রচুর যুদ্ধসম্পদ হস্তগত হয় যে, মহিসুরের সেনাবাহিনীর কয়েক মাসের প্রয়োজন এথেকে উঠে আসে।

টিপু সুলতান সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে শহরের সামরিক কেল্লা অবরোধ করেন। মুষলধারে বৃষ্টি সত্ত্বেও কয়েক দিনের যুদ্ধেই টিপু সুলতান তা বিজয় করেন। হায়দার আলী ইয়ায খানকে এই নগরীটির গভর্নর মনোনীত করেছিলেন; কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করে বেদনুরের মতো এ নগরীটিকেও ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। যুদ্ধে পরাজয়ের লক্ষণ দেখেই ইয়ায খান পালিয়ে যায় এবং সূরাট নগরীতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তার সঙ্গে মহিসুর সেনাবাহিনীর অন্য যেসকল সৈন্য গাদ্দারির অপকর্মে সহযোগিতা করেছিলো, তাদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করা

www.boimate.com

হয়। সমস্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে শ্রীরঙ্গপত্তনমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসিদের সন্ধিচুক্তি হয়। যার ফলে মহিসুরের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ফরাসিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ থেকে বিরত থাকে।

কাডাপ্পা (Kadapa)-এরর বিদ্রোহ

টিপু সুলতান যখন মঙ্গলোরের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার মনোযোগ সেখান থেকে সরানোর জন্যে মাদ্রাজের ইংরেজরা কাডাপা (Kadapa)-এর সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তিকে লেলিয়ে দেয়। তাকে সামরিক সহায়তা দিয়ে এলাকা দখল করতে সহায়তা করে। অথচ মহিসুরের পক্ষ থেকে এলাকাটি মীর কমরুদ্দীনকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করা হয়েছিলো। এজন্যে টিপু সুলতান মীর কমরুদ্দীনের নেতৃত্বেই একদল সেনাবাহিনীকে সেই বিদ্রোহ দমন অভিযানে প্রেরণ করেন। একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ শেষে মহিসুর বাহিনী এখানেও সাইয়্যেদ মুহাম্মদকে পরাস্ত করে শহরটির ওপর দ্বিতীয়বারের মতো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ইংরেজদের সেই সৈন্যদল স্বপ্রণোদিত হয়ে কাডাপ্পার নবাবকে সহায়তার উদ্দেশ্যে আসছিলো, পথিমধ্যে তাদেরকেও মহিসুরের সৈন্যরা পরাস্ত করে।

শ্রীরঙ্গপত্তনমে নানা চক্রান্ত

সামষ্টিকভাবে হায়দার আলীর ইনতিকালের পর টিপু সুলতান ক্ষমতারোহণের সময় গভর্নর ও অফিসারদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হননি। অবশ্য আশপাশের কিছু এলাকা যেমন, বুদনুর, কাডাপ্পা (Kadapa) প্রভৃতি নগরীতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। টিপু সুলতান দক্ষতার সঙ্গে সেই বিদ্রোহ সামাল দিতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৭৮৩ সালের মধ্যভাগে শ্রীরঙ্গপত্তনমে টিপুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গভীর ফাঁদ ফেলা হয়েছিলো। তখন একটি দুষ্ট চক্র টিপু সুলতানকে সরিয়ে তার স্থানে মহিসুরের প্রাচীন শাসক হিন্দু রাজার পরিবারকে ইংরেজদের সহায়তায় পুনর্বহালের পরিকল্পনা আঁটে। কিন্তু আল্লাহর কৃপায় তাদের সেই ষড়যন্ত্র সাফল্যের মুখ দেখার পূর্বেই নস্যাৎ হয়ে যায়। কিছু হিন্দু অফিসার ইংরেজদের কাছে সামরিক সহায়তা চেয়ে পত্র লেখে। কিন্তু মাঝপথেই

www.boimate.com

সেই চিঠি টিপু সুলতানের হাতে চলে আসে। ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু পুলিশের ঊর্ধ্বতন অফিসার সিজিয়া ও নরসিজ্যা রাও-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অপর দু' গুরু রাঙ্গা আইঙ্গর ও শামা আইঙ্গর-কে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়। দুষ্টচক্রের এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে টিপুর সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন ও চৌকস অফিসার মুহাম্মদ আলী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বিশ্বস্ত সেনাপতির নির্বুদ্ধিতা ও পরিণতি

বেদনুর (Bednore) নগরী ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তে ইয়ায খানের সঙ্গে কেল্লারক্ষী মুহাম্মদ কাসেম খানও সম্পৃক্ত ছিলো। ইয়ায খান যদিও সূরাটে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে; কিন্তু কাসেম খান টিপুর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে। বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় টিপু সুলতান তার ফাঁসির দণ্ড ঘোষণা করেন। ওই সময় মহিসুরের সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি মুহাম্মদ আলীর সঙ্গে কাসেম খানের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো। শাস্তি স্থগিত করার জন্যে সে মুহাম্মদ আলীকে দিয়ে সুপারিশ পেশ করে। অথচ তার অপরাধ ছিলো ক্ষমার অযোগ্য। সে ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে সমাঝেতা করে টিপুর সেনাবাহিনীর ভেতরগত সকল তথ্য পাচার করেছিলো এবং হায়দারনগরের যে কেল্লাটি তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো, কোনো ধরনের প্রতিরোধ না করেই সে তা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। টিপুর কাছে সে তার এই জঘণ্য অপরাধের স্বীকারোক্তিও পেশ করেছিলো। এজন্যে অন্যদেরকে সতর্ক করার জন্যে টিপু সুলতান উলামায়ে কেরাম ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তার পূর্বের শাস্তি বহাল রাখেন।

ওদিকে টিপুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকার পরও যেহেতু তিনি তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেহেতু মুহাম্মদ আলী ওমন প্রত্যাখ্যানকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। যখন কাসেম খানকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে হত্যাগৃহে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন মুহাম্মদ আলী আবেগতাড়িত হয়ে কাসেম খানকে সিপাহীদের হাত থেকে ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। টিপুর নির্দেশে তাদের সবাইকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। তৎক্ষণাৎ কাসেম খানের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। অপরাপর বিদ্রোহী অফিসার ও

www.boimate.com

সিপাহিদেরকেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়। অতীতের বিশ্বস্ততা ও যুদ্ধনৈপূণ্য বিবেচনা করে মুহাম্মদ আলীকে শুধু বন্দী করে শ্রীরঙ্গপত্তনমে নজরবন্দী রাখার শাস্তি ঘোষণা করা হয়। নিজের এমন অপমান মুহাম্মদ আলীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। পথিমধ্যে সে আত্মহত্যা করে। একজন দেশদ্রোহীকে সমর্থন করা মুহাম্মদ আলীর জীবনে চরম সর্বনাশ বয়ে আনে। যার প্রায়শ্চিত্ত তাকে জীবন বিসর্জনের মাধ্যমে করতে হয়েছিলো। তার এই নির্বুদ্ধিতার কারণে খোদ টিপু সুলতানও কষ্ট পেয়েছিলেন। এজন্যে তিনি তার পরিবার-পরিজনকে খোদ তার রাজপ্রাসাদেই আশ্রয় দেন। তিনি সবসময় তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজনাদির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

পাইনঘাটে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও পরাজয়

নবাব হায়দার আলীর ইনতিকালের পর পুনরায় পাইনঘাট নগরীতে বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পর্দার আড়াল থেকে এখানেও ইংরেজরা তাদের সমর্থন ও সহায়তা করছিলো। কিছু দিন পর তারা বিদ্রোহীদের প্রকাশ্য সহায়তাও শুরু করে দেয়। যার ফলে পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে মহিসুরের সেনাবাহিনীর সংঘাত বেঁধে যায়। সাম্রাজ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্যে তাদেরকে দমন করা ছাড়া টিপুর সামনে দ্বিতীয় কোনো বিকল্পপথ ছিলো না। তিনি মীর মুঈনুদ্দীনের নেতৃত্বে ৭ হাজার সৈন্যের একটি সেনাদল পাইনঘাট অভিমুখে প্রেরণ করেন। ওই অভিযানে বদরুজ্জামান খান নায়েতা, সলাবত খান বখশী ও মীর গোলাম আলী প্রমুখও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অন্যদিকে ইংরেজ সেনাবাহিনী ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli) থেকে বেরিয়ে করোড় ও ডিন্ডিগাল (Dindigal) নগরীদ্বয় দখল করার জন্যে জেনারেল লাঙ্গের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। মীর মুঈনুদ্দীনের নেতৃত্বে বদরুজ্জামান খান তাদের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু কেল্লারক্ষী উসমান খান কাশ্মিরী মহিসুরের সেনাবাহিনীর নিষেধ অমান্য করে করোড় নগরীর সামরিক কেল্লা কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই ইংরেজদের হাতে তুলে দেয় এবং গভর্নর পদের লোভে সে নিজেও ইংরেজদের আশ্রয়ে চলে যায়। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে তার এই গাটছাড়া খুব বেশি দীর্ঘ হয়নি। অল্প ক'দিনের মাথায় ইংরেজদের সঙ্গে

www.boimate.com

তার ঐক্য ভেঙ্গে যায়। মীর মুঈনুদ্দীন তাকে গ্রেফতার করে ফাঁসি কার্যকর করেন।

করোড় নগরী দখলের পর ইংরেজদের সাহস বেড়ে যায়। তারা নিকটবর্তী আরেকটি কেল্লা দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। বদরুজ্জামান খান নায়েতার নেতৃত্বাধীন মহিসুরের সেনাবাহিনী ইংরেজদের মুখোমুখী হয়। কিন্তু যেহেতু তাদের তুলনায় ইংরেজ সেনাবাহিনী অপেক্ষাকৃত ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলো, এজন্যে ওই রণাঙ্গনে প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও মহিসুরের সেনাবাহিনীকে পেছন দিকে সরে আসতে হয়। ইংরেজরা এই সামরিক কেল্লাটিও দখল করে নেয়। অগত্যা বদরুজ্জামান খান তার সৈন্যদলকে নিয়ে ধারাপুর চলে আসেন।

কিডলোরের যুদ্ধ ও মহিসুরের সেনাবাহিনীর বিজয়

১৭৮৩ সালের মধ্যভাগে ইংরেজদের সঙ্গে মহিসুরের সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেঁধে যায়। এ যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যরা মহিসুরের সেনাবাহিনীর সহায়তা করে। মহিসুরের দশ হাজার সৈন্যের একটি দল কুদলুরের পথে ইংরেজদের একটি মজবুত কেল্লা 'করিমঘড়' দখল করে। ইংরেজদের সেনাপতি ছিলো জেনারেল স্টুয়ার্ট। কুদলুর রণাঙ্গনে দু'দলের মাঝে সমান্তরালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ফরাসি সৈন্যদের সহায়তা মহিসুরের সেনাবাহিনী জয়লাভে সমর্থ হয়। ওই যুদ্ধে ইংরেজদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয় এবং প্রচুর সম্পদ মহিসুরের হাতে চলে যায়।

ইংরেজ শিবিরে নৈরাশ্য ও সন্ধির আবেদন

ইংরেজরা সবসময় এই কৌশল অবলম্বন করতো যে, তাদের প্রতিপক্ষ যদি তাদের তুলনায় দুর্বল হয়, শত্রুপক্ষের পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক হয় তাহলে তারা যেকোনো কৌশলে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। এর বিপরীতে যদি শত্রুপক্ষ শক্তিশালী হয় এবং তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় তখন তারা যেকোনো মূল্যে সন্ধি করিয়ে অতিরিক্ত জীবন ও সম্পদের ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষার চেষ্টা করে। মহিসুরের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রথম যুদ্ধেও তারা এই কৌশল অবলম্বন করেছিলো। হায়দার আলীর উদারতা ও দয়াদ্রতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাদ্রাজ চুক্তির ওপর সাক্ষর করাতে সফল হয়।

www.boimate.com

এই যুদ্ধেও তারা একই কৌশল বেছে নেয়। যখন তারা দেখতে পাচ্ছিলো যে, একের পর এক যুদ্ধে তারা মহিসুরের কাছে হেরে চলেছে। সাফল্যের কোনো ধরনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না; বরং আশঙ্কা হচ্ছিলো যে, যদি এভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয় তাহলে খুব শিগগিরি টিপুর সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণশীল নীতি সাফল্যের মুখ দেখতে পাবে।

ওদিকে কর্নাটকের নবাব মুহাম্মদ আলীও টিপুর সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে। ইংরেজরা মাদ্রাজ থেকে লর্ড ম্যাকার্টনির ব্যক্তিগত সচিব জর্জ লিউনার্ড স্ট্যান্টন ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্য এন্থনী স্যাডলার-কে এ দায়িত্ব দিয়ে টিপুর দরবারে প্রেরণ করে। এ দু'জন ছিলো অত্যন্ত ধূর্ত। কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা ছিলো নেহায়েত দক্ষ। তারা আসার সময় প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান উপহার-নযরানা নিয়ে এসে সুলতান টিপুর সামনে পেশ করে এবং তাকে আশ্বস্ত করতে সমর্থ হয় যে, আগামীতে তারা এই অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা শতভাগ মেনে চলবে।

মঙ্গলোর চুক্তি ও তার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা

অবশেষে দীর্ঘ আলাপচারিতা ও তর্ক-বিতর্কের পর টিপুর প্রস্তাবিত শর্তাবলির ওপর ১১ মার্চ ১৭৮৪ সালে ইংরেজরা একটি চুক্তিনামার ওপর সাক্ষর করে। ওই চুক্তিনামার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা নিম্নে পেশ করছি—

১. দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে যেসব এলাকা যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো, তা তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে।

২. উভয়পক্ষের যুদ্ধবন্দীদের তাৎক্ষণিক বিনিময় হবে।

৩. সাক্ষরকারীগণ কখনই একে অন্যের শত্রুপক্ষকে সরাসরি বা ভায়া হয়ে সহায়তা করবে না। এবং তারা নিজেদের বন্ধুপ্রতীম ও রাজনৈতিক মিত্রদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা সহায়তা করবে না।

টিপুও মনে মনে কামনা করছিলেন যে, যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার প্রস্তাব যেন ইংরেজদের পক্ষ থেকেই আসে। গোটা ভারতবর্ষে মঙ্গলোরের এই চুক্তিনামা ইংরেজদের পরাজয় ও তার বিপরীতে টিপুর বিজয় বিবেচিত হয়। ইংরেজরা যদিও মুখ ফুটে তাদের পরাজয়ের কথা স্বীকার করেনি; কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে এই চুক্তিনামার মাধ্যমে নিজেদের পরাজয় ও প্রতিপক্ষের বিজয় মেনে নেয়।

www.boimate.com

টিপু কেন সন্ধির পথে হাঁটলেন?

মঙ্গলোরের এই চুক্তিনামাকে কিছু ঐতিহাসিক টিপুর চরম ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভুল অভিহিত করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, সন্ধির সময় বিজয়ের পাল্লা টিপুর দিকেই হেলে পড়েছিলো। এর বিপরীতে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজরা একের পর এক পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছিলো। যার ফলে তাদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা তলানীতে এসে ঠেকেছিলো। সিপাহিরা বারো মাস ধরে বেতন পাচ্ছিলো না। ঋণের চাপে কোম্পানির ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। স্রেফ মুম্বাই গভর্মেন্টই ২ কোটি ২০ লাখ রুপি ঋণী ছিলো। ধারাবাহিক যুদ্ধে লিপ্ততার কারণে তাদের বাণিজ্যিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো।

এর বিপরীতে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে যদিও ফরাসিরা সরে দাঁড়িয়েছিলো; কিন্তু তাদের এই পশ্চাদসরণ টিপুর সামরিক সক্ষমতার মাঝে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসেনি। তিনি একাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিলো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিজয়ের কারণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। সামষ্টিকভাবে সামরিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে টিপু তার প্রতিপক্ষের তুলনায় স্পষ্টত এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি এমন কিছু শর্তের ওপর সন্ধিচুক্তিতে রাজি হয়েছেন, যেই শর্তগুলো শত্রুবাহিনীর জন্যে সুফল বয়ে আনবে। উপরন্তু তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে পূর্বের যুদ্ধগুলোর ক্ষতিপূরণও আদায় করেননি। বাস্তবতা হলো, ওই সময় টিপুর সামনে ভারতবর্ষের মাটিতে ইংরেজদের যাবতীয় খোয়াব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ ছিলো। কুদরত তাকে সেই সুযোগ দিয়েছিলো; তিনি তা কাজে লাগাতে পারেননি।

বাস্তবতা হলো, টিপু সুলতানের এই উদারতা তার ভুল নয়। এর পেছনে তার রাজনৈতিক কর্মকৌশলও নিয়ামক ছিলো। কারণ হলো, ১৭৮০ সালে শুরু হওয়া এই যুদ্ধটি ১৭৮২ সালে হায়দার আলীর ইনতিকালের পরও শেষ হয়নি। ক্ষমতার মসনদে আরোহণের পর থেকে অদ্যাবধি টিপু সুলতান তার জনগণের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো বুঝে তার সমাধানের

www.boimate.com

দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগ পাননি। তিনি চাননি, জনগণের মূল্যবান পুঁজি ধারাবাহিকভাবে চলমান যুদ্ধের আগুনে ভস্মিভূত হয়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি বাঁধাগ্রস্থ হোক। উন্নতির সুফল থেকে রাষ্ট্রের জনগণ বঞ্চিত হোক। টিপুর হাতে জনগণের সচ্ছলতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির এমন কিছু পরিকল্পনা ছিলো, যুদ্ধ অব্যাহত রেখে যেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিলো না। সেই পরিকল্পনা বাস্তবে যুদ্ধ বন্ধ করা, নিদেনপক্ষে স্থগিত রাখা আবশ্যক ছিলো। মঙ্গলোরের সেই চুক্তিনামার ধারাগুলো লক্ষ্য করলে বুঝে আসবে, এটি ছিলো একপ্রকার যুদ্ধবিরতি। টিপুর এই কর্মকৌশল যে যথার্থ ছিলো, তা পরবর্তীকালের বিভিন্ন যুদ্ধে টিপুর বিজয়লাভ থেকেও প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো, টিপু যদি যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন তাহলে খোদ তার শত্রুদের প্ররোচনায় তার অধীনস্থ করদ রাজ্যগুলোর বিদ্রোহ ঘোষণার তীব্র আশঙ্কা ছিলো। অন্যদিকে টিপু এ আশঙ্কাও বোধ করছিলেন যে, মারাঠা ও দাকানের নিযাম যেকোনো মুহূর্তে মহিসুরের ওপর আক্রমণ করে তার শক্তির দেয়ালে ফাঁটল ধরাতে পারে। কারণ, নিয়মিত তাদের পক্ষ থেকে হুমকি-ধমকি শোনা যাচ্ছিলো। মোটকথা, এতোগুলো শক্তির সঙ্গে একাকী মুকাবিলা করা সুলতান টিপুর পক্ষে যদিও অসম্ভব ছিলো না; কিন্তু অবশ্যই তা জটিল ও বিপদজনক ছিলো। এই কারণগুলোর দিকে তাকিয়েই তিনি যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তে একমত হতে বাধ্য হন। এ বিরতির মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে, সতেজ শক্তি নিয়ে দেশ ও রাষ্ট্রের শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে।

সৌভাগ্যক্রমে টিপু মনে মনে যা কামনা করছিলেন, তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ইংরেজদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব চলে আসে। যেই সন্ধিকে জনগণ টিপুর জন্যে বিজয় মনে করেছে। এ কারণে দেখা যায় যে, টিপুর সঙ্গে ইংরেজদের ওই সন্ধি মারাঠা-শিবিরে প্রচণ্ড নৈরাশ্য ছড়িয়ে দেয়। খোদ ইংরেজ শিবিরের সিংহভাগ ওই সন্ধির ওপর সন্তুষ্ট ছিলো না।

সংক্ষেপে কিছু কারণ ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরলাম। যার পরিপ্রেক্ষিতে টিপু সুলতান ইংরেজদের আবেদন মঞ্জুর করে সন্ধিচুক্তিতে সম্মত হন। নয়তো টিপু চাইলে যুদ্ধ অব্যাহত রেখে সেটিকে একটি প্রাকৃতিক পরিণতির দিকে

www.boimate.com

ঠেলে দিতে পারতেন। অধীনস্থ সৈন্যদের বিশ্বস্ততা, সম্পদ ও যুদ্ধোপকরণের প্রাচুর্য্য, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে একের পর এক বিজয় টিপুর দৃঢ়প্রত্যয়কে সামনে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হতে পারতো। কিন্তু টিপু সে পথে অগ্রসর হননি। তিনি উপরিউক্ত কারণ ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সঙ্গত মনে করেননি। ইতিহাস দেখেছে, মঙ্গলোরের সেই চুক্তি টিপুর রাজনৈতিক ভুল ছিলো না। তার এ সিদ্ধান্ত মহিসুরের জন্যে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভূত অর্জনের পথ খুলে দিয়েছে।

বিজয়ের উৎসব

একের পর এক যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধগুলোতে স্বশরীরে অংশগ্রহণের কারণে টিপু সুলতান তার রাজ্যাভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারেননি। এমনকি তিনি রাজধানীতেও খুব একটা বসবাসের সুযোগ পাননি। সেমতে মঙ্গলোরের চুক্তির পর যখন টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনমে ফিরে আসেন তখন বাস্তবতার চোখে তিনি ছিলেন ইংরেজবিরোধী যুদ্ধের বিজয়ী সমরনায়ক। তার চুক্তি পক্ষান্তরে তার জন্যে বিজয়ের নামান্তর ছিলো। এটাই ছিলো রাজধানীতে দীর্ঘ দিন বসবাসের নিয়তে প্রথম প্রত্যাবর্তন। এ কারণেই সালতানাতে খোদাদাদের হিন্দু-মুসলিম নাগরিকগণ তার নগরীতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাকে জমকালো, রাজসিক ও ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা জানায়। ওই সময় যেই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো, তা ইতোপূর্বে এদেশের জনগণ কখনই চাক্ষুষ দেখেনি। আশপাশের শত সহস্র জনগণ সুলতানকে এক পলক দেখার জন্যে রাজধানীতে সমবেত হয়। রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বে টিপু নগরীর বাইরে তাবু স্থাপন করে সেখানেই রাত্রিযাপন করেন। সকালের নামায পড়ে ব্যক্তিগত আমল সম্পন্ন করেন। এরপর অনাড়ম্বর পোশাক পরিহিত অবস্থায় সুবিশাল ও রাজসিক জুলুশ সহকারে তিনি যখন রাজধানীতে প্রবেশ করেন ওই সময় তার সঙ্গে ছিলো কয়েক মাইল দীর্ঘ মানবমিছিল। দু' পাশে ছিলো সারিবদ্ধ হাতি ও ঘোড়ার প্রলম্বিত ধারা। রাজপরিবারের সদস্যবর্গ ছাড়াও সকল করদ রাজা, নবাব ও সেনাপতিগণ সেই জুলুশে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

www.boimate.com

টিপু সুলতানের মসনদে আরোহণের আনুষ্ঠানিক আয়োজন

যেহেতু টিপুর রাজ্যাভিষেক ঘটেছিলো যুদ্ধের মাঝপথে। যার কারণে তার ক্ষমতারোহণের রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়নি। এজন্যে রাজধানীতে টিপু সুলতানের সাথে সাথেই পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা অনুসারে রাজদরবার বিশেষভাবে সুসজ্জিত করা হয়। সেখানে নতুন সম্রাটের ইচ্ছে-অভিপ্রায় অনুসারে বিশেষভাবে নির্মিত রাজসিংহাসন স্থাপন করা হয়। রাজ্যাভিষেকের সকল আনুষ্ঠানিকতা যথারীতি সম্পন্ন হয়। প্রথমে নিয়ম অনুসারে দরবারের কার্যক্রম কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত হয়। এরপর দিনভর রাষ্ট্রের কার্যক্রম চলতে থাকে। দরবার চলাকালে সমস্ত ফরয নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করা হয়।

বিভিন্ন সেবামূলক কীর্তির ওপর মীর সাদেককে প্রশাসনের দেওয়ান তথা অর্থমন্ত্রী মনোনীত করা হয়। অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে মন্ত্রণালয় ও সামরিক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। যুদ্ধে বিজয় ও রাজ্যাভিষেকের এই উৎসব প্রায় এক মাস পালিত হয়। টিপু সুলতান মারাঠা ও হায়দারাবাদের নিযামের কাছে পত্র লেখেন। মারাঠাদের পত্রে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও নিযামের পত্রে ইসলামি ঐক্যের কারণ দেখিয়ে ইংরেজদেরকে কোনোরূপ সহায়তা না করার আবেদন জানানো হয়। টিপুকে অভিবাদন জানাতে মারাঠা ও নিযামের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিদল মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন সহকারে রাজধানীতে উপস্থিত হয়। টিপু সুলতান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করেন এবং তারচেয়েও অধিক মূল্যমানের দামী উপহার তাদের সকাশে প্রেরণ করেন এবং দেশমাতৃকার সুরক্ষায় তাদেরকে আরেকবার ইংরেজ প্রতিরোধে সম্মিলিত প্লাটফর্ম গড়ে তোলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

'ফাতহুল মুজাহিদীন' গ্রন্থ সংকলন

ওই সময় পর্যন্ত সামরিক রীতি-নীতি ও যুদ্ধনীতির যাবতীয় পরিভাষা ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাতেই ব্যবহৃত হতো। এজন্যে ইংরেজবিরোধী প্রথম যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি সেই পরিভাষাগুলোকে ফারসিতে অনুবাদ করিয়ে একটি নির্দেশনামূলক গ্রন্থ সংকলন করেন। 'ফাতহুল মুজাহিদীন' নামের এই বইটি টিপুর তত্ত্বাবধানে যাইনুল

www.boimate.com

আবিদীন শাস্ত্রী সংকলন করেন। বইটিতে সামরিক নিয়ম-কানুন ছাড়াও মুসলিম সিপাহিদের বিশ্বাস, মাসআলা, ইবাদত ও লেনদেনের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। বইটির অসংখ্য অনুলিপি তৈরি করে সর্বস্তরের সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সালতানাতে মহিসুরের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যেও বইটির অনুলিপি প্রেরণ করা হয়। বইটিতে মোট ৮ টি অধ্যায় ও ১ টি সংযোজনী রয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সৈনিকদের করণীয় সম্পর্কেও বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে।

www.boimate.com

দশম অধ্যায়

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও মারাঠা যুদ্ধ

www.boimate.com

বিভিন্ন করদ রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন

টিপু সুলতান ইংরেজবিরোধী দ্বিতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত করার পর শ্রীরঙ্গপত্তনামে ফিরে আসেন। আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, বেশ কিছু করদ রাজা ও নবাব সালতানাতে খোদাদাদের অনুগত ছিলো। তাদের কেউ কেউ ওই সময় বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। টিপু সুলতান তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ নির্মূল করার ওপর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। অবাধ্য রাজাদেরকে শক্ত হাতে দমন করার উদ্দেশ্যে তিনি আস্থাভাজন সেনাপতিদের নেতৃত্বে অনেকগুলো সৈন্যদল প্রেরণ করেন। টিপুর যথোপযুক্ত পরিচালনায় কয়েক দিনের ভেতর বিদ্রোহের সেই আগুন নিভে যায়।

রাজা পঙ্কনোজের অবাধ্যতা

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দমন করার পর টিপু সুলতান মাত্র স্থির হয়েছেন। এর মধ্যেই সংবাদ চলে আসে যে, পঙ্কনোজের রাজাও বিদ্রোহ করে বসেছে। শুধু তাই নয়; বরং সে নরগন্ডা ও মদনহিলির রাজাদের সঙ্গে জোট বেঁধে আশপাশের অন্য এলাকাগুলো দখল করার ফন্দি আঁটছে। সে এ খোয়াব দেখছে যে, কৃষ্ণা নদী (Krishna River) ও তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করে সুলতানের চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ করে তুলবে। তাকে দমন করার জন্যে টিপু সুলতান আস্থাভাজন সেনাপতি সাইয়্যেদ উমরকে ২ হাজার সৈন্য সহকারে প্রেরণ করেন। সাইয়্যেদ উমর পঙ্কনোজের রাজাকে প্রথমে সন্ধির আহ্বান জানান। তার সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে রাজা তাকে যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসতে বলে। তার সঙ্গে ছিলো ১২ হাজার সৈন্যের অপেক্ষাকৃত বিশাল বাহিনী। কিন্তু সেই যুদ্ধে হাজার হাজার সৈন্য সহকারে রাজা নিজেও মারা পড়ে। তার অবশিষ্ট সৈন্য তখন পালিয়ে নিকটবর্তী নগরী 'বহভিকুণ্ডা' নগরীতে আশ্রয় নেয়। সাইয়্যেদ উমরের নেতৃত্বাধীন মহিসুরী বাহিনী তাদেরকে সেখানেও ধাওয়া করে। মহিসুরের

www.boimate.com

সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা দেখে সেখানকার রাজা পায়েল নিজেও এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে। এভাবে টিপু সুলতান মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে পঙ্কনোজ পুনর্দখল করতে সমর্থ হন। যুদ্ধের কয়েক মাস পর টিপু সুলতান সেখানে গমন করেন। তিনি সেখানকার পাহাড়ের ওপর একটি মজবুত সামরিক কেল্লা নির্মাণ করে তার নাম রাখেন 'রহমানগড়'।

নরগণ্ডা বিজয়

পঙ্কনোজের রাজার মতো নরগণ্ডার রাজা ভেঙ্কট রায়-ও বিদ্রোহ শুরু করেছিলো। অথচ সেও ছিলো সালতানাতে খোদাদাদের করদ রাজা। কিন্তু একাধারে দু' বছর সে তার নির্ধারিত কর আদায় করেনি। এক্ষেত্রে তাকে বিদ্রোহের জন্যে উস্কে দিয়েছিলো মিরিচের মারাঠি সর্দার পুরশিরাম। টিপু যখন ভেঙ্কটের বিদ্রোহের সংবাদ পান তখন তিনি তার সেনাপতি বুরহানুদ্দীনকে ৫ হাজার সৈন্য দিয়ে বিদ্রোহ নির্মূল অভিযানে প্রেরণ করেন।

টিপু সুলতানের নির্দেশনা অনুসারে সুলতান বুরহানুদ্দীন প্রথমে ভেঙ্কট রাও-কে দ্বিতীয়বারের মতো মহিসুরের অধীনতা স্বীকার করার আহ্বান জানান। কিন্তু যেহেতু সে মারাঠি সর্দার নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর সমর্থন পেয়েছিলো; এজন্যে সে আস্কারা পেয়ে অধীনতা স্বীকারের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। টিপু নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর কাছে নিজের পক্ষ থেকে দূত পাঠিয়ে তাকে ভেঙ্কট রাওয়ের সমর্থন থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানান। কিন্তু টিপু সুলতানের এই আহবানে সে সাড়া দেয়নি। নিরূপায় হয়ে বুরহানুদ্দীনের নেতৃত্বে মহিসুরের সেনাবাহিনী নরগন্ডা আক্রমণ করে স্থানীয় কেল্লার ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। উভয় বাহিনীর মাঝে তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেঁধে যায়। বীরযোদ্ধা সলাবত জঙ্গ (Salabat Jung) শহীদ হন। এছাড়াও মহিসুরের ২০০ সৈন্য নিহত হয়। এতদসত্ত্বেও বুরহানুদ্দীন মনোবল হারাননি। তিনি পূর্বাপেক্ষা তীব্রাকারে কেল্লা অবরোধ করে রাখেন। ভেঙ্কট রাও-কে সহায়তা করার জন্যে পুরসি রাম ৫ হাজার মারাঠি সৈন্য প্রেরণ করে। ওদিকে সুলতান টিপুও মীর কমরুদ্দীনের নেতৃত্বে আরেকটি সৈন্যদল মহিসুরের যোদ্ধাদের সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে মীর কমরুদ্দীন এ সংবাদ পান যে, কাডাপ্পা

www.boimate.com

(Kadapa)-এর গভর্নরের জামাতা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ পীরযাদা স্থানীয় জনগণের ওপর সীমাহীন নির্যাতন করছে। মীর কমরুদ্দীন সেখানে আক্রমণ করেন। সাইয়্যেদ পীরযাদা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়; কিন্তু তার গোটা সৈন্যবাহিনী নিহত হয়। ওদিকে নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis) নরগন্ডার রাজাকে সহায়তা করার জন্যে অতিরিক্ত ৩০ হাজার মারাঠি সৈন্য প্রেরণ করে। এই সৈন্যরা যখন নরগন্ডায় প্রবেশ্যের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণা নদী (Krishna River) পাড়ি দিচ্ছিলো, তখন মীর কমরুদ্দীনের অধীনস্থ মহিসুর সৈন্যরা তাদের ওপর এমন প্রাণঘাতী আক্রমণ করে বসে যে, তৎক্ষণাৎ হাজার হাজার মারাঠি সৈন্য ঘটনাস্থলে বেঘোরে মারা পড়ে। নিহতের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সৈন্য বন্দী হয়।

ভেঙ্কট রাও যখন লক্ষ্য করলো যে, মহিসুর বাহিনী শক্ত হাতে অনবরত কেল্লা অবরোধ করে রেখেছে; ওদিকে মারাঠিরা চরম মার খেয়ে পালিয়ে গেছে এবং এখন আর তার সহায়তায় কোনো সামরিক মদদ আসার পথ খোলা নেই, তখন সে মহিসুর বাহিনীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে। কিন্তু ততোক্ষণে সন্ধির সকল পথ কার্যত শেষ হয়ে গেছে। বুরহানুদ্দীন পরাজিত রাজা ভেঙ্কটকে সপরিবারে বন্দী করে মির্যা হায়দার আলী বেগের তত্ত্বাবধানে শ্রীরঙ্গপত্তনম প্রেরণ করে। কথিত আছে যে, রাজার এক মেয়ে ছিলো অতিশয় রূপসী। সে ওই সময় মুসলামন হয়ে যায়।

কোর্গ (Coorg) অধিবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা

কোর্গ হলো বর্তমানের তামিলনাড়ু প্রদেশে পশ্চিম ঘাটে অবস্থিত দৃষ্টিনন্দন প্রকৃতি সমৃদ্ধ সবুজ-শ্যামল নগরী। এর উত্তরে হাসান (Hassan) জেলা, পূর্বে 'মহিসুর' জেলা, দক্ষিণ পশ্চিমে কেরালার কাননুর (Cannanore) জেলা অবস্থিত। গরম মশলা, সাগওয়ান গাছ, চন্দন ও বাঁশের জন্যে এলাকাটি বিখ্যাত। এছাড়া গোটা অঞ্চল জুড়ে প্রচুর বন-বাদাড়, দৃষ্টিনন্দন ঝিল, খরস্রোতা ঝরনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা গভীর জঙ্গলও রয়েছে। জঙ্গলের ভেতর প্রচুর পরিমাণে বাঘ, সিংহ, হাতি, সাপ, বিচ্ছু সহ নানা হিংস্র প্রাণী অবলীলায় ঘুরে বেড়ায়। এসব কারণে এ অঞ্চলের সুখ্যাতি গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। স্থানীয় অধিবাসীগণ যদিও হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলো; কিন্তু তারা ছিলো সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে যোজন যোজন দূরে। স্থানীয় মহিলারা অর্ধউলঙ্গ থাকতো।

www.boimate.com

উন্মুক্ত বক্ষে তারা বাজার-ঘাটে হেঁটে বেড়াতো। যার কারণে তাদের রূপ, সৌন্দর্য, অশ্লীলতা, অনৈতিকতা ও নির্লজ্জতার দুর্নাম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

একজন নারী একসঙ্গে চার-চারজনের সংসার করতো। যার কারণে সন্তানের বংশপরিচয় মায়ের দিকে সম্বন্ধিত হতো এবং ওই সন্তান একসঙ্গে চার পিতারই ওয়ারিস হতো।[৫৫]

নবাব হায়দার আলী ক্ষমতার মসনদে আরোহণের পর ওই এলাকায় আক্রমণ করেন। তখন স্থানীয় রাজা বার্ষিক ২৪ হাজার রুপি কর পরিশোধের অঙ্গীকার করে বশ্যতা মেনে নিলে হায়দার আলী তাকে তার পদে বহাল রাখেন। তখন থেকে এ অঞ্চলটি সালতানাতে মহিসুরের করদ রাজ্য হিসেবে চলে আসছিলো। হায়দার আলীর যুগেও একাধিকবার এখানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু প্রতিবার তিনি দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হন। ১৭৮৪ সালের শেষ দিকে পুনরায় স্থানীয় জনগণ টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা দিয়ে বসে। মনুমেত রায় নামের এক দুর্বৃত্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা জড়ো হয়। রাঙা নায়ের নামের এক ব্যক্তি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। ওই এলাকার গভর্নর ছিলো যাইনুল আবেদীন খান মাহদাভী। লোকটি ছিলো বিলাসী প্রকৃতির। অযোগ্যতার কারণে সে বিদ্রোহ সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। তখন টিপু সুলতান তার সামরিক অফিসার হায়দার আলী বেগের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু কোর্গ-এর রহস্যময় ভৌগলিক অবস্থান, দুর্গম গিরি, ঘন ঝোপঝাড় ও জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকা কোর্গ-বাসীদের গেরিলা আক্রমণের কারণে হায়দার আলী বেগ বিশেষ কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। যার ফলে মহিসুরের সেনাবাহিনী সরে আসতে বাধ্য হয়।

যেহেতু টিপু সুলতান পিতার সাহচর্যে থেকে এ ধরনের দুর্গম অঞ্চলে যুদ্ধ করার কৌশল রপ্ত করেছিলেন; এজন্যে তিনি ২২ হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে কোর্গ (Coorg) অভিমুখে রওয়ানা হন। তুমুল সংঘর্ষ, প্রচুর রক্তক্ষয় ও জীবন বিনাশের পর কোর্গ-বাসী পরাজয় স্বীকার করে। টিপু সুলতান যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো কোর্গ নগরী দখল করতে সমর্থ হন।

---

[৫৫]. মীর হুসাইন আলী কিরমানী রচিত 'নিশানে হায়দারী'

www.boimate.com

ওই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের আট হাজার নারী-পুরুষ বন্দী হয়। এই বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে টিপুর আস্থাভাজন চৌকস অফিসার হুসাইন আলী খান বখশী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোর্গ-এর জনগণ যখন গেরিলা আক্রমণের উদ্দেশে গহীন জঙ্গলে লুকিয়ে পড়তো তখন তিনি বাইরে থেকে জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিতেন। যার ফলে সেখানে তারা জ্বলে-পুড়ে ভস্মিভূত হতো।

কোর্গ (Coorg) জয় করার পর টিপু সুলতান এলাকাটির নাম রাখেন 'যাফরাবাদ'। যাইনুল আবিদীন মাহদাভী-কে কঠোরভাবে সতর্ক করে তিনি তাকে এখানকার গভর্নরের পদে বহাল রাখেন এবং সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনমে ফিরে আসেন। মুহিব্বুল হাসান সাহেবের বক্তব্য হলো, টিপু সুলতান রাজধানীতে ফিরে আসার পর কোর্গ-এর জনগণ পুনরায় বিদ্রোহ করে বসে। যার ফলে সুলতানকে পুনরায় কোর্গ ফিরে আসতে হয়। এর বিপরীতে আমজাদ আলী আশহুরী, মাহমুদ ব্যাঙ্গলোরী ও সাদেক সারধানভী প্রমুখের অভিমত হলো, কোর্গ অভিযান একবারই হয়েছে। সেখানকার বিদ্রোহ দমন করার জন্যে টিপু সুলতানকে একবারই কোর্গ আসতে হয়েছে।

কাননুর (Cannanore)-এর রানীর আনুগত্য স্বীকার

কোর্গ-এর জনগণকে বিদ্রোহ করতে দেখে মাপলা গোত্র বংশোদ্ভূত কাননুর (Cannanore)-এর মুসলিম রানী 'বিল্লা বানু'-ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের মতো সেও স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বসে। কিন্তু কোর্গ নগরীতে টিপু সুলতানের আগমন, শক্ত হাতে বিদ্রোহ দমন ও দুর্বৃত্তদের পরাজিত হতে দেখে সে ঘাবড়ে যায় এবং মহামূল্যবান উপহার-উপঢৌকন সহকারে সুলতানের খেদমতে উপস্থিত হয়। তার উপহার সামগ্রীর মাঝে অনেকগুলো হাতিও ছিলো। উপরন্তু অতীতের আচরণের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে পূর্বের দু' বছরের বকেয়া শুল্কও পরিশোধ করে। আগামীতে কোনো ধরনের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ ঘোষণা না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। সুলতান তখন তাকে বলেন, 'যেহেতু তুমি নারী। আর নারীর সঙ্গে লড়াই করা পুরুষের শোভা পায় না। এজন্যে তোমার বিদ্রোহ দমন করার জন্যে আমি কোনো সৈন্যদল প্রেরণ করিনি। তুমি যেহেতু এখন আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দ্বিতীয়বারের মতো

www.boimate.com

আনুগত্যের অঙ্গীকার করছো, এজন্যে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি।' সুলতানের অভয় পেয়ে সে কাননুর (Cannanore) ফিরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যুদ্ধবন্দীদের ইসলাম গ্রহণ

কোর্গ (Coorg) থেকে শ্রীরঙ্গপত্তনমে যেই আট হাজার বন্দী প্রেরণ করা হয়েছিলো তাদের মাঝে বিদ্রোহের নাটের গুরু মনুমেত রায় ও রাঙ্গা নায়ের-ও ছিলো। এখানে এসে মনুমেত রায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। টিপুর পক্ষ থেকে তার জন্যে সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। টিপুর নির্দেশে সকল যুদ্ধবন্দীর জন্যে বসবাস ও পানাহারের সুবন্দোবস্ত রাখা হয়।

বন্দী হয়ে মহিসুরে আসার পূর্বে কোর্গ-এর জনগণ হিন্দুধর্মে বিদ্যমান জাত-পাতের বৈষম্য, সামাজিক ও বংশীয় বিভাজন ও অসম অধিকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তারা তখনই ধর্ম পরিবর্তনের প্রস্তুতি নিয়েছিলো। ওই সময় হিন্দুস্তানে বসবাসরত খ্রিস্টান মিশনারীরা সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে কোর্গ-এর অনেক নাগরিককে ধর্মান্তরের ফাঁদে ফেলতে সমর্থ হয়।

টিপু তখন কোর্গ-বাসীকে পত্রে জানান যে, 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ছেড়ো না। যদি একান্তই ধর্মত্যাগ করতে হয় তাহলে তোমরা তোমাদের সম্রাটের ধর্ম গ্রহণ করো'। টিপুর এই বারণ সত্ত্বেও অবুঝ-সরল জনগণের বৃহদাংশ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। যখন ওই লোকেরাই যুদ্ধবন্দী হয়ে সুলতানের কাছে আসে তখন তাদেরকে সঠিক পথ বোঝানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। টিপু তখন সাম্রাজ্যের নৃপতি হিসেবে নয়; ইসলামের প্রচারকের ভূমিকায় অবতরণ করেন। তিনি তাদের সামনে ইসলামের মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলেন। তাদের বোঝান যে, তিনি ইচ্ছে করলে নিজ শক্তি ও দাপট ব্যবহার করে তাদেরকে গায়ের জোরে ইসলামে দীক্ষিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইসলামের সাচ্চা সিপাহি ও দ্বীনদার আলেম হিসেবে বিশ্বাস করেন যে, لا إكراه في الدين তথা 'দ্বীনের ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তি অন্যায়'। এই নীতি অবলম্বন করে তিনি সর্বপ্রথম সেই যুদ্ধবন্দীদের সর্দার রাঙ্গা নায়েরের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাকে বোঝালেন যে, তোমরা যেই মিথ্যা উপাস্যের

www.boimate.com

পূজা করছো, তা তোমাদের জীবনে কোনো ধরনের লাভ-ক্ষতি বয়ে আনার ক্ষমতা রাখে না। তোমাদের জীবনে কোনো অর্থবহ উপকার বর্ষণের ক্ষমতা তার নেই। মহান আল্লাহ– যিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এককভাবে তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। মুসলমান একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। এরই নাম ইসলাম। ইসলামের মাঝে কোনো শ্রেণিবৈষম্য নেই। এখানে রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, ধনী-গরিবের মাঝে ব্যবধান নেই।'

টিপু সুলতানের কথাগুলো তার মনে গভীর প্রভাব ফেললো। সর্বাগ্রে নাঙ্গা নায়ের নিজেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার দেখাদেখি অন্য যুদ্ধবন্দীরাও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করলো। কয়েদীদের সিংহভাগ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হলো।

টিপু সুলতান রাঙ্গা নায়েরের নাম পরিবর্তন করে 'শায়খ আহমদ' নাম রাখলেন। তার অনুরোধে তার সঙ্গে যেসকল নওমুসলিম ছিলো, তাদেরকে তিনি মহিসুরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে তাদের জন্যে একটি পৃথক ব্যাটালিয়ন গঠন করলেন। তাদের জন্যে দীর্ঘকেশী সিংহের চামড়া দিয়ে প্রস্তুত উর্দি নির্ধারণ করলেন। পৃথক এই সৈন্যদলটির নাম ছিলো জামা'আতে আহমদী। টিপু সুলতান তাদের সর্দারদের জন্যে বিশেষ পুরস্কার প্রবর্তণ করলেন। এভাবে এককালের অসভ্য এই জাতিটি ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে একটি সুসভ্য সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবে আবির্ভূত হলো।

কোর্গ-বাসীদের ইসলাম গ্রহণের এটাই আসল ইতিহাস। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক এই ইতিহাসের ব্যবচ্ছেদ করে, টিপু সুলতানের ওপর গায়ের জোরে মুসলিম বানানোর কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করেছে।

মারাঠা ও নিযামের উন্মত্ত আক্রমণ ও পশ্চাদসরণ

১৭৮৪ সালে যখন ইংরেজরা টিপুর সঙ্গে সন্ধি করে তখন ওই সন্ধিটিকে ভারতবর্ষের জনগণ টিপু সুলতানের বিজয় হিসেবে বিবেচনা করতো। সন্ধিচুক্তিটি প্রকারান্তরে ইংরেজদের পরাজয় ছিলো। ওই চুক্তির ফলে গোটা দেশে টিপুর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। চারদিকে সুলতানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার এই সুখ্যাতি আশপাশের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগুলোর মনে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে তোলে।

www.boimate.com

বিশেষত হায়দারাবাদের নিযাম ও মারাঠি সর্দারদের বুক হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাড়খার হচ্ছিলো। কেননা প্রথম থেকেই তাদের খেয়াল ছিলো, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কারণে টিপু সুলতানের শক্তি-সামর্থ্য চিরদিনের জন্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মঙ্গলোর চুক্তিনামা তাদের আশার ফানুস চুপসে দেয়। তাদের সেই খেয়াল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চুক্তির ফলে টিপু সুলতান পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও বিজয়ী নৃপতি হিসেবে আবির্ভূত হন। যার ফলে মারাঠা ও নিযাম আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি সম্পন্ন করে টিপু সুলতান তাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। মনের সেই আশঙ্কা চেপে না রাখতে পেরে মারাঠা সর্দার নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis) নিযামের কাছে পত্র লেখে যে, ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তির পরে এখন এই আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠেছে যে, টিপু যেকোনো মুহূর্তে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে। কাজেই আমাদেরকে একজোট হয়ে তাকে প্রতিহত করতে হবে।

একজন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিযাম ছিলো সীমাহীন ক্ষমতালোভী ও ব্যক্তিস্বার্থান্ধ। এই লোভ ও স্বার্থপরতার কারণে সে প্রথম থেকেই সালতানাতে খোদাদাদের অনিষ্টকামী ছিলো। সে কখনই কামনা করতো না যে, তার প্রতিবেশী দেশটিতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ দৃঢ় হোক। কারণ, সে মহিসুরের সালতানাতকে তার অস্তিত্বের হুমকি মনে করতো। এ কারণেই বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ ও মারাঠিরা খুব সহজেই তাকে মহিসুরের বিরুদ্ধে ময়দানে নামাতে পেরেছে। পূর্বের সেই ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় এবারও ঘটেনি। যথারীতি সে মারাঠি সর্দারের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সম্মত হয়ে যায়। তার খোয়াব ছিলো, এই বাহানায় সে টিপুর কাছ থেকে তার হারানো এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

যুদ্ধের জন্যে অজুহাত সন্ধান

১৭৮০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মারাঠি সেনাবাহিনী হায়দার আলীর সঙ্গে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো যে, কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাঞ্চলের এলাকাগুলোর ওপর হায়দার আলীর একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নিলে তিনি মারাঠিদেরকে প্রতি বছর ১২ লক্ষ রুপি ওই অঞ্চলের কর হিসেবে প্রদান করবেন।

www.boimate.com

হায়দার আলীর মৃত্যুর পর মারাঠিরা সেই অঙ্গীকার লংঘন শুরু করে দেয়। তারা চুক্তিনামার বিপরীতে টিপু সুলতানের কাছে এ দাবী তোলে যে, সে যেন ওই এলাকাগুলো পুনরায় তাদের হাতে তুলে দেয়। টিপু দু' বছর ধরে মারাঠিদেরকে ওই অঞ্চলের কর প্রদান করছিলেন না। কারণ, অব্যাহত যুদ্ধের কারণে এতো বড় অংকের অর্থ পরিশোধ করা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

১৭৮২ সালে মারাঠি সর্দাররা পুনরায় টিপু সুলতানের কাছে চার বছরের বকেয়া কর পরিশোধের দাবী তোলে। সুলতান তাদের সেই দাবী মেনে নিয়ে বলেন যে, অব্যাহত যুদ্ধের কারণে মহিসুরের বিপুল পরিমাণের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিধায় ওই অর্থ পরিশোধের জন্যে আরও কিছু দিন অবকাশ দিতে হবে। আসলে এটি ছিলো টিপু সুলতানের উন্নত নৈতিকতার পরিচয়। তিনি ইচ্ছে করলে শক্তির দাপটে তাদের সেই দাবী অস্বীকার করতে পারতেন।

আসলে ওই সময় মারাঠিরা টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলো। সেই সুযোগ বের করতেই তারা কর পরিশোধের বাহানা তোলে। সেমতে শুল্ক পরিশোধ না করাকে তারা অজুহাত বানিয়ে যুদ্ধের হুঙ্কার ছুড়ে দেয়। ৮০ হাজার অশ্বারোহী ও ৪০ হাজার পদাতিক সৈন্যের বিশাল জনবল নিয়ে অগ্রসর হয়। ওদিকে হায়দারাবাদের নিযামের ৯০ হাজার সৈন্যও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

যুদ্ধ এড়াতে টিপুর প্রচেষ্টা

টিপু সুলতান তাদের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পাওয়া মাত্রই পুনা (Puna)-য় অবস্থানরত মারাঠি সর্দার নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর কাছে পত্র প্রেরণ করে। পত্রে তিনি লেখেন, 'আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র তৈরির পরিবর্তে আপনি যদি এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন করার পরিকল্পনা করতেন, সেটাই সর্বোত্তম হতো'।

হায়দারাবাদের নিযামের সঙ্গেও তিনি চিঠি আদান প্রদান করেন। তাকে লেখেন, 'আমি আমার জীবন মুসলমানদের উন্নয়নের কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছি। একজন মুসলমান হিসেবে আপনার দায়িত্ব ছিলো, আমাকে সঙ্গ দেওয়া। কিন্তু তার বিপরীতে আপনি একটি ইসলামি সাম্রাজ্য ধ্বংস

www.boimate.com

করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।' এমনকি মহিসুরের সঙ্গে হায়দারাবাদের সম্পর্ক পুনর্বহাল করার জন্যে টিপু সুলতান নিজের পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাবনাও পেশ করেছিলেন। তিনি দু' পরিবারের মাঝে বৈবাহিক বন্ধন রচনা করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আশা করি এর মাধ্যমে চিরদিনের জন্যে বন্ধুত্ব ও সন্ধির সম্পর্ক গড়ে ওঠবে।

কিন্তু অপরিনামদর্শী উযিরদের অশুভ পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে নিযাম টিপুর সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। যার ফলে টিপু সুলতানের দূত নিযামের দরবার থেকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ওদিকে নিযামের সঙ্গে মারাঠিদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ভীষণ মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। নিযাম মারাঠিদের কাছে এ দাবী তোলে যে, স্রেফ মারাঠিদের দিকে তাকিয়েই তিনি টিপুর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজেই যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে তাকে অগ্রিম ৫০ লক্ষ রুপি পরিশোধ করতে হবে। পাশাপাশি আহমদনগর ও বেজাপুরের সামরিক কেল্লাও তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

মারাঠারা যদিও তার সবগুলো দাবী গ্রহণ করেনি; কিন্তু 'ইয়াদগীর' নামক স্থানে নিযামের সঙ্গে তাদের একটি সাময়িক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। সেখানে তারা একমত হয় যে, ফিলহাল দু' রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে মহিসুরের ওপর থাবা বিস্তার করবে। সর্বপ্রথম তারা তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) ও কৃষ্ণা নদী (Krishna River)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চল জয় করার চেষ্টা করবে। এরপর উভয় পক্ষ টিপুর কাছ থেকে নিজ নিজ অধিকৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করবে। যুদ্ধশেষে নতুন অধিকৃত এলাকাগুলো তারা পরস্পরে সমানভাবে বণ্টন করে নেবে। মোটকথা, টিপু সুলতান তার নিজের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব এই যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখেনি।

বাদামি (Baddami) নগরীর পতন

যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নিযাম হায়দারাবাদ থেকে রওয়ানা হয়। কিন্তু যেমনটি আমরা পূর্ব থেকে অবহিত যে, আদতে সে ছিলো ভীষণ কাপুরুষ। এজন্যে অজুহাত দাঁড় করিয়ে সে নিজে ফিরে যায়।

www.boimate.com

হায়দারাবাদের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের ভার অর্পণ করে সেনাপতি তেহওয়ার জঙ্গের হাতে। নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর মারাঠি ফৌজ হায়দারাবাদের সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে মহিসুর রাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকাগুলো তাণ্ডব চালিয়ে সর্বপ্রথম বাদামি (Baddami) নগরীর দিকে অগ্রসর হয়। ওই সময় এলাকাটি ছিলো সালতানাতে খোদাদাদের উত্তর সীমান্তের অবস্থিত একটি কেল্লা ঘেরা নগরী। আশপাশে বিস্তীর্ণ তেপান্তর। ওই সামরিক কেল্লায় ওই সময় মহিসুরের ৩ হাজার সৈন্য বিদ্যমান ছিলো। তারা শত্রুপক্ষের ধেয়ে আসার তথ্য পেয়ে কেল্লার চতুর্দিকে মাটির গভীর বারুদ পুতে রাখে। যার বিস্ফোরণের শিকার হয়ে অসংখ্য শত্রুসৈন্য নিহত হয়। এতদসত্ত্বেও তারা কেল্লাটিকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে রাখে। দীর্ঘ ৯ মাস অবরোধ অব্যাহত রেখে যতোক্ষণে তারা কেল্লাটি জয় করতে সমর্থ হয় ততোক্ষণে সম্মিলিত বাহিনীর ১৮০০ সৈন্য মারা যায়। এর বিপরীতে মহিসুরের সেনাবাহিনীর মাত্র ৪০০ সৈন্য শহীদ হয়। বাদামি নগরীর পতনের পর নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis) মারাঠি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার হরিপন্থের হাতে তুলে দিয়ে পুনায় ফিরে যায়। কারণ সেখানে তার প্রতিপক্ষ পুনার রাজপ্রাসাদে তার অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে শুরু করেছিলো।

ধারওয়ার নগরীর কেল্লারক্ষীর বিশ্বাসঘাতকতা

বাদামি (Baddami) নগরীর পতনের পর সম্মিলিত বাহিনী ধারওয়ার (Dharwar) নগরীর দিকে অগ্রসর হয়। যেহেতু বাদামি নগরীতেই তারা মহিসুরের সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও সামরিক নৈপূণ্যের সাক্ষর পেয়েছিলো; এজন্যে তারা এখানকার কেল্লারক্ষীর সামনে অর্থের টোপ ফেলে বশীভূত করার চেষ্টা করে। ধারওয়ার নগরীর কেল্লারক্ষী হায়দার বখশ সেই প্রতারণার ফাঁদে ফেসে যায়। মাত্র ৩ হাজার রুপির লোভে সে কেল্লাটি নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর হাতে তুলে দিয়ে সপরিবারে পুনায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে কোনো ধরনের প্রতিরোধ ও রক্তপাত ব্যতিরেকেই ধারওয়ার (Dharwar)-এর এই মজবুত কেল্লাটি মারাঠিদের দখলে চলে যায়।

www.boimate.com

ধারওয়াড় জয় করার পর মারাঠি ফৌজ কুঞ্চনগড় ও নরগুন্ডা নগরীর দিকে অগ্রসর হয়। সেখানকার কেল্লারক্ষীদেরকেও মারাঠি সৈন্যরা অর্থের ফাঁদে ফেলতে সমর্থ হয়। স্রেফ ঘুষের বিনিময়ে, কোনো ধরনের লড়াই ব্যতিরেকে মারাঠিদের হাতে মহিসুরের একের পর এক নগরী বিজিত হতে দেখে আশপাশের অনেকগুলো করদ রাজ্যের রাজা ও জমিদাররা টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

আদোনী (Adoni) নগরীর ওপর টিপুর আক্রমণ

টিপু যখন সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পান, তখন বুঝতে পারেন যে, এখন যুদ্ধের ময়দানের অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। সেমতে তিনি তার সমরনীতি অনুসারে বিপক্ষদলের মনোযোগ দূরে সরানোর জন্যে প্রথমে ৬ শা'বান ১১৯৯ হিজরী, মুতাবেক মার্চ ১৭৮৬ সালে আদোনী (Adoni) নগরীর দিকে অগ্রসর হন। যা ওই সময় নিযামের শাসনাধীন ছিলো। বিপক্ষ দলের দুই লক্ষ সৈন্যের বিপরীতে টিপুর অধীনে ছিলো ছিলো স্রেফ ৩০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতিক সৈন্য। পথিমধ্যে বিভিন্ন করদ রাজ্যের রাজা ও নবাবগণ তাদের সৈন্য নিয়ে টিপুর সঙ্গে মিলিত হন। আদোনী (Adoni) নগরীতে নিযামের জামাতা মাহাবত জঙ্গ ইবনে বাসালত জঙ্গ গভর্নর ছিলেন। সমতল ভূমি থেকে অস্বাভাবিক উঁচুতে অবস্থিত এই কেল্লায় তখন নিযামের ৭ হাজার সৈন্য বিদ্যমান ছিলো। টিপুকে আক্রমণ করতে দেখে মাহাবত যঙ্গ ভড়কে যায়। সে টিপুর সঙ্গে সন্ধি করার জন্যে নিজ প্রতিনিধি আসাদ আলী খানকে অনেক বড় অঙ্কের অর্থ সহকারে প্রেরণ করে। তার ইচ্ছে ছিলো, এ বাহানায় যুদ্ধপক্রিয়া বিঘ্নিত করা। টিপু তখন উত্তরে জানিয়ে দেন যে, 'মাহাবত যঙ্গের বিরুদ্ধে আমার কোনো বৈরীতা নেই। কিন্তু তার শ্বশুর অকারণে একটি উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংস করতে ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এজন্যে মনের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছি।'

টিপুর এই উত্তরে মাহাবত যঙ্গ নিরাশ হয়ে তার পরিবার-পরিজনকে সেখানে রেখেই মাহবত যঙ্গ আদোনী (Adoni) থেকে পালিয়ে যায়। মহিসুরের সেনাবাহিনী অনেক উঁচুতে অবস্থিত এই কেল্লার ওপর নিজেদের তোপ থেকে এমনভাবে গোলা ছুড়তে থাকে যে, পুরো কেল্লা

www.boimate.com

বিজিত হওয়া সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ওই সময় টিপু শুনতে পায় যে, মাহাবত যঙ্গ তার স্ত্রী অর্থাৎ নিযামের মেয়েকে সন্তান সমেত এই কেল্লায় ফেলে একাকী পালিয়ে গেছে। এজন্যে উদারতা ও মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়ে টিপু তার সৈন্যদের নির্দেশ করেন যে, নিযামের মেয়ে ও তার সন্তানরা কেল্লা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কোনো ধরনের আক্রমণ চালাবে না। সেমতে আঠারো দিন অপেক্ষার পর যখন মাহাবত যঙ্গের পরিবার কেল্লা থেকে বেরিয়ে রাইচপুর চলে যায় তখন মহিসুরের সেনাবাহিনী কেল্লার ওপর পুনরাক্রমণ শুরু করে। এতোদিন পর্যন্ত যে কেল্লাটিকে দুর্ভেদ্য মনে করা হতো, তা মহিসুরের সেনাবাহিনী দখল করতে সমর্থ হয়। ওই সময় টিপু সুলতান চাইলে নিযামের কন্যাকে গ্রেফতার করে নিযামকে তার দেওয়া শর্ত মানতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু তার দ্বীনি আত্মসম্মানবোধ ও জাত্যাভিমান তাতে সায় দেয়নি।

টিপু সুলতান যেই সামরিক কৌশল নিয়ে আদোনী (Adoni)-এর ওপর আক্রমণ করেন তা সফলতার মুখ দেখতে শুরু করে। শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনী এতোদিন পশ্চিমাঞ্চলের রণাঙ্গনে ব্যস্ত ছিলো। তারা আদোনী (Adoni)-এর ওপর টিপুর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ওই রণাঙ্গন ছেড়ে আদোনী বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তারা এসে দেখতে পায় যে, আদোনী (Adoni)-এর ওপর মহিসুরের পতাকা উড়ছে। যার ফলে সম্মিলিত বাহিনীর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। টিপু সুলতানের হাতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্রের পাশাপাশি প্রচুর ধন-সম্পদ চলে আসে। আদোনী কেল্লার ওপর কুতুবুদ্দীন খানকে এবং আদোনী নগরীর ওপর দৌলত রায়কে দায়িত্বশীল বানিয়ে টিপু সেখান থেকে কুঞ্চনগড় অভিমুখে রওয়ানা হন। বাদামি নগরীর যেই কেল্লাটি জয় করতে সম্মিলিত বাহিনীর দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করতে হয়েছিলো, তারচেয়েও অনেক সুরক্ষিত ও দৃঢ় কেল্লা আদোনী টিপু সুলতান মাত্র ১৮ দিনের যুদ্ধেই জয় করতে সমর্থ হন।

কুঞ্জনগড় দখল ও রাজকুমারের ইসলাম গ্রহণ

আদোনী জয় করার পর টিপু কুঞ্চনগড়ের দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার রাজা ছিলেন মহিসুরের অধীনস্থ করদ রাজা। তার মৃত্যুর পর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো বড় কোনো ছেলে সন্তান না থাকায় রানী নিজেই ক্ষমতার

www.boimate.com

মসনদে আরোহণ করে। বাদামি (Baddami) নগরীর পতনের পর মারাঠিদের প্ররোচনায় এই রানীও মহিসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে স্বাধীন রানী ঘোষণা করেছিলো। তাকে দমন করার জন্যে টিপু সুলতানের আগমনের সংবাদ শুনে সে সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। পালিয়ে পুনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যার কারণে তার মন্ত্রীরা বাধ্য হয়ে তার ১২ বছর বয়সী কিশোর ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। টিপু সুলতানের কুঞ্চনগড় আগমনের সংবাদ শুনে এই কিশোর রাজাও ভড়কে যায়। কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যতিরেকে সেই টিপু সুলতানের হাতে কেল্লার চাবি তুলে দেয়। ওই অভিযানের সময় টিপু সুলতান স্থানীয় জনগণ ও রাজকুমারের সঙ্গে কোমল আচরণ করেন। টিপুর চরিত্র মাধুরিমায় মুগ্ধ হয়ে ১২ বছর বয়সী ওই রাজকুমার ইসলাম গ্রহণ করে। টিপু সুলতান তার নাম রাখেন মারওয়ান আলী। এভাবে কোনো ধরনের রক্তপাত ব্যতিরেকে কুঞ্চনগড় নগরীও দ্বিতীয়বারের মতো টিপুর অধীনে চলে আসে।

অনৈতিক আচরণের দায়ে কিছু সৈন্যের দণ্ডপ্রয়োগ

কুঞ্চনগড় জয়ের পর টিপু কোনো ধরনের রক্তপাত ব্যতিরেকে সুন্দুর নগরীর হিন্দু কেল্লারক্ষীকে পুনরায় নত স্বীকার করতে সমর্থ হন। ইতোপূর্বে সে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় টিপু তাকে কেল্লারক্ষীর পদে পুনর্বহাল করেন। সেখান থেকে মারাঠাদের অধীনস্থ ক্যাম্পলি ভূ-খণ্ড তুমুল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর জয় করতে সক্ষম হন। ওই অভিযানে ২ হাজার মারাঠি সৈন্য নিহত হয়; অথচ এর বিপরীতে মহিসুরের সেনাবাহিনীর মাত্র সোয়া শ জীবন খোয়াতে হয়।

ক্যাম্পলী নগরীতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন মিলে-মিশে বসবাস করতো। তাদের জীবিকার প্রধান উৎস ছিলো মৎস শিকার। যার কারণে তাদের আর্থিক অবস্থা সামষ্টিকভাবে সমৃদ্ধ ছিলো। বিজয়ের আতিশয্যে মহিসুরের সেনাবাহিনীর কতিপয় দূরাচার— যাদের মাঝে হিন্দু ও মুসলিম দু'ধর্মেরই সৈন্য ছিলো— স্থানীয় জনগণের গৃহে প্রবেশ করে চরম অনৈতিক অপকর্ম করে বসে। নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। নারীত্ব রক্ষার্থে কিছু কুমারী নারী গ্রামের পাশ দিয়ে বহমান তুঙ্গভদ্রা

www.boimate.com

(Toongabhaddra) নদীতে ঝাপিয়ে আত্মহত্যা করে। তাদের এই অনাচারের কথা টিপু সুলতানের কানে পৌঁছলে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান করে প্রকৃত অপরাধীদের ধরে আনার নির্দেশ করেন। ৫০ জন সিপাহির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। টিপু সুলতান তখন ধর্ম-গোত্রের বাছ-বিচার না করে সবাইকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রকাশ পেলো টিপুর বুযুর্গি

ক্যাম্পলী বিজয়ের পর টিপু ধারওয়াড় অভিমুখে অগ্রসর হন। এটি তুঙ্গভদ্রার ওপর তীরে অবস্থিত ছিলো। সেখানে নিযাম ও মারাঠি সৈন্যরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমবেত হচ্ছিলো। রমাযানুল মুবারকের বরকতময় মাস শেষ হতে চলেছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও টিপু সুলতান নিজেও রোযা পালন করতেন, অধীনস্থ মুসলিম সৈন্যদেরকেও রোযা পালনে উদ্বুদ্ধ করতেন। পথিমধ্যেই ঈদুল ফিতরের বাঁকা চাঁদ হেসে ওঠে। মহিসুরের সেনাবাহিনী যাত্রা বিরতি করে ঈদ উদযাপন করেন।

এদিকে টিপু সুলতান নদী পাড়ি দিয়ে সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবিলা করতে উদগ্রীব হয়ে আছেন। ওদিকে বর্ষাকাল চলছে। যার কারণে নদীর পানি ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও টিপু সুলতান নদী পাড়ি দিয়ে সম্মিলিত বাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছেন। বাহ্যত নদী পার হয়ে ওপারে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। ওই সময় হযরত আমর ইবনু আস রাদি.-এর ঘটনা টিপুর মনে পড়লো। যখন নীলনদের পানি শুকিয়ে যায় তখন সেখানে উমর ফারুক রাদি.-এর নির্দেশে একটি চিঠি লিখে ফেলা হয় যে, 'যদি তুমি আল্লাহর নির্দেশে অদ্যাবধি প্রবাহিত হয়ে থাকো তাহলে এখনই বইতে শুরু করো। অন্যথায় শুকিয়ে যাও।' সঙ্গে সঙ্গে নীলনদের বুকে পানির প্রবাহ বইতে শুরু করে।

টিপু সুলতান গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সাচ্চা মুসলমানের মুখে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ও শক্তি রেখেছেন। এজন্যে তিনি দুআ করলেন যে, 'হে আল্লাহ, শত্রুদের প্রতিহত করার পথে এ নদীটি আমার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি এই নদীর প্রবাহ থামিয়ে দিন'। দুআর পর টিপুর নির্দেশে নদীর বুকে ২১ টি গোলা

www.boimate.com

নিক্ষেপ করা হয়। গোলা নিক্ষেপের পরপরই আকস্মিক তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) নদীর প্রবাহ হ্রাস পেতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো নদীর পানি তলানীতে নেমে আসে।

টিপু সুলতানের চাক্ষুষ কারামত দেখতে পেয়ে সেনাবাহিনী খুবই অবাক হয়। আনন্দের আতিশয্যে সবাই 'আল্লাহু আকবার'-এর শ্লোগান তুলে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। ঘটনাটি সৈন্যদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। সুলতানের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি অমুসলিমরাও টিপুকে একজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ জ্ঞান করে ভক্ত হয়ে পড়ে।

নদী পেরিয়ে মারাঠাদের ওপর গেরিলা আক্রমণ

যখন নদীর বুকে পানির প্রবাহ কমে আসে তখন টিপু ইশার নামাযের পর রাতের অন্ধকারে দু' হাজার পদাতিক সৈন্য ও দু' হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে উপস্থিত হন। তাদের সঙ্গে তোপখানাও ছিলো। যখন নদীর প্রবাহ কমিয়ে আনার পদক্ষেপ হিসেবে গোলা দাগানো হয় তখন ওপারে উপস্থিত মারাঠি সৈন্যরা তোপের বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ভড়কে যায়। তাদের সেনাপতি অধীনস্থ ১২ হাজার সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে শাহনুর (Savanur) পালিয়ে যায়। এরপরও সেখানে সহস্রাধিক সৈন্য উপস্থিত চিলো। মহিসুরের সেনাবাহিনী রাতের অন্ধকারে বিপক্ষদলের বিভিন্ন ক্যাম্পে উপস্থিত সম্মিলিত বাহিনীর ওপর এমন গেরিলা আক্রমণ করে বসে যে, তৎক্ষণাৎ এক হাজার মারাঠি ও নিযামী সৈন্যের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এরচেয়ে কয়েক গুণ বেশি সৈন্য আহত হয়। ৭০০ ঘোড়া, ৫০ টি হাতি ও প্রচুর পরিমাণ নগদ অর্থ ফেলে জীবন বাঁচাতে দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করে। টিপুর সৈন্যদলের হাতে গনীমতের সম্পদ চলে আসে। ওই সময় যারা জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলো, তারা শাহনূরে আশ্রয় নেওয়া তাদের সেনাপতির শরণাপন্ন হয়; অথচ এই সেনাপতি নিজের জীবন বাঁচাতে তাদেরকে ফেলেই পালিয়ে গিয়েছিলো।

মারাঠাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সংঘাত ও টিপুর সফল যুদ্ধকৌশল

মারাঠাদের ওপর সফল গেরিলা আক্রমণ পরিচালনার পর দ্বিতীয় দিন সকালে টিপু সুলতান তার সৈন্যদেরকে নদী পার করিয়ে এপারে নিয়ে আসেন। নদীর পাড়েই তাবু স্থাপন করা হয়। ওদিকে মহিসুরের

www.boimate.com

সেনাবাহিনী থেকে মাত্র চার ফারলং দূরে একদল মারাঠি সৈন্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পেতে ছিলো। টিপু সুলতান তাদের মতি-গতি আঁচ করতে সক্ষম হন এবং মোকাবেলার প্রস্তুতি শুরু করেন।

তিনি একটি উঁচু টিলার পাদদেশে দু' হাজার বন্দুকবাজ সৈন্যকে লুকিয়ে রাখেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ করেন যে, টিপুর কাছ থেকে ইঙ্গিত না পাওয়া পর্যন্ত তাদের কেউ গোপন স্থান থেকে বেরোবে না। ওই গোপন স্থানে তিনি কয়েকটি তোপ স্থাপন করলেন। তোপগুলোকে আগাছার আড়ালে লুকিয়ে সেগুলোর নিরাপত্তায় আড়াই শ সৈন্য নিযুক্ত করলেন। পুরো ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর সুলতান সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মারাঠাদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলো গাজী খান, ওলী মুহাম্মদ খান কাবুলী, ইবরাহীম খান ও হুসাইন আলী খানের মতো আস্থাভাজন যোদ্ধা। তাদেরকে তিনি নির্দেশ করলেন যে, মারাঠাদের ওপর আক্রমণ করার সময় তারা এমনভাবে পেছন থেকে সরে আসতে শুরু করবে যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে– তাদের পরাজয় হচ্ছে। পালিয়ে পেছন দিকে সরতে সরতে তারা ধাবমান মারাঠি সৈন্যদেরকে সেই গোপন স্থানে নিয়ে আসবে, যেখানে তোপগুলো স্থাপন করা আছে এবং বন্দুকবাজ সৈন্যরা ওঁৎ পেতে বসে আছে।

যথারীতি যুদ্ধ শুরু হলো। টিপুর পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে মহিসুরের সৈন্যরা পেছন থেকে সরে যেতে লাগলো। বিজয়ে উন্মাদনায় মারাঠি সৈন্যরাও তাদেরকে এমনভাবে ধাওয়া করতে লাগলো যে, তোপখানা অনেক পেছনে রেখে এসেছিলো। যখনই মহিসুরের সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ তাদেরকে ওই টিলার কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, যেখানে তোপগুলো স্থাপিত ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে টিপু তোপ দাগানোর নির্দেশ প্রদান করেন। চোখের পলকে হাজার মারাঠি সৈন্য জমিনে লুটিয়ে পড়ে। তাদের দুর্ভাগ্যের কপালে পেরেক ঠুকে বন্দুকবাজ সৈন্যদের গুলিবৃষ্টিও শুরু হয়ে যায়। কয়েক হাজার মারাঠি সৈন্যদের মধ্য হতে কোনোক্রমে দু'-তিন শ সিপাহি জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে আসার সুযোগ পায়।

মারাঠিদের ফৌজি ক্যাম্পের অফিসারদের কাছে যখন এমন শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে তখন তাদের চোখে-মুখে রাজ্যের হতাশা নেমে আসে। চোখের পলকে শুরু হয়ে যায় পলায়নের প্রতিযোগিতা।

www.boimate.com

কিছুক্ষণের মধ্যে মহিসুরের সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়ে তাদের ক্যাম্প দখল করে নেয়। সহস্রাধিক ঘোড়া, উট ও হাতি মহিসুরের সৈন্যদের হস্তগত হয়। এর বাইরে প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্রও হাতে আসে। টিপুর এই অভূতপূর্ব রণকৌশল আশাতীত সাফল্য বয়ে আনে। বিজয়ের উল্লাসে সেনাপতি টিপু সুলতান যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি বিপুল অংশ ওই অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

শত্রুপক্ষের একের পর এক পরাজয় ও মহিসুরের সেনাবাহিনীর বুদ্ধিমত্তা

মারাঠাদেরকে দ্বিতীয়বারের মতো পদর্যুস্ত করার পর টিপু আর শ্রীরঙ্গপত্তনমে ফিরে আসেননি। বরং তাদের দখলকৃত ক্যাম্পগুলোতেই অবস্থান করতে থাকেন। ওই সময় একদিন তিনি শুনতে পান যে, কটক নদীর ওপারে মারাঠি ফৌজরা সমবেত হচ্ছে। তখন সুলতান বালাপুর নদীর পাড়ে ক্যাম্প স্থানান্তর করেন। শত্রুবাহিনীর ওপর গেরিলা আক্রমণ করার জন্যে ফাযেল খান, ইমাম খান ও মীর মাহমুদকে চৌকস সৈন্যদল সহকারে প্রেরণ করেন। তাদেরকে সামরিক রসদের জোগান দেওয়ার জন্যে দশ হাজার সৈন্যের আরেকটি দল গাজী খান ও কাদের খানের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। এই দলগুলো শত্রুদেরকে এমনভাবে চমকে দেয় যে, খোদ টিপু সুলতানও তাদের আকস্মিক বুদ্ধিদীপ্ত আক্রমণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা রাতের অন্ধকারে মারাঠি সৈন্যদের বেশ ধারণ করে তাদের ক্যাম্পে গিয়ে ওঠে। যখন ক্যাম্পের প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছো? তখন তারা মারাঠি ভাষাতেই উত্তর দেয় যে, আমরা মোঘল। টিপুর সৈন্যদের বিরুদ্ধে আপনাদেরকে সহায়তার উদ্দেশ্যে রাইচপুর থেকে এসেছি। স্মর্তব্য যে, মারাঠি ভাষায় 'মোঘল' শব্দ বলে হায়দারাবাদীদেরকে বোঝানো হতো। আর ওই সময় তারা মহিসুরের বিরুদ্ধে মারাঠিদের সামরিক মিত্র ছিলো। এভাবে তারা মারাঠিদের ক্যাম্পে অনুপ্রবেশ করে।

গভীর রাতে যখন মারাঠি সৈন্যরা ঘুমিয়ে পড়ে তখন মহিসুরের সৈন্যরা এলোপাতাড়ি ফায়ারিং শুরু করে দেয়। চোখের পলকে হাজার হাজার মারাঠি সৈন্যের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। কিছু লোক উর্দ্ধশাসে পালিয়ে কোনোমতে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। প্রত্যুষে এই ক্যাম্পের ওপরও মহিসুরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.boimate.com

যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সদাচরণ

টিপুর নির্দেশে আটক নারী-শিশুদের জন্যে পৃথক তাবু স্থাপন করে তাদেরকে সেখানে সম্মান-নিরাপত্তার সঙ্গে রাখা হয়। কয়েক দিনের মাথায় টিপু মহিলাদের জন্যে যথোচিত উৎকৃষ্ট পোশাক ও শিশুদের জন্যে স্বর্ণের বালা উপহার প্রদান করেন। এরপর তিনি ব্যক্তিগত প্রহরীদের তত্ত্বাবধানে পালকিতে চরিয়ে তাদেরকে নিজ নিজ কুটিরে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেন। ওই নারীরা মারাঠিদের কাছে ফিরে টিপুর উন্নত চরিত্র মাধুরির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। এর বাইরে মারাঠি সর্দারদের মধ্য হতে হরি পণ্ডিত ও রস্তিয়া মাধুমাপতি-এর জন্যে টিপুর পক্ষ থেকে ৭ টি ঘোড়া, ৪টি হাতি, নগদ অর্থ সহ কিছু হীরা-জওহরাত প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিলো, যেন টিপুর সৌহার্দ্যমূলক আচরণ ও উত্তম চরিত্রমাধুরিমার প্রকাশ দেখতে পেয়ে তারা অনাগত দিনগুলোতে সবধরনের উগ্র ও হিংস্রাত্মক কর্মসূচি ত্যাগ করে। দুঃখের বিষয় হলো, এমন মানবিক আচরণ ও সম্প্রীতিমূলক সদ্ভাব তাদের হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণ রেখাপাত করেনি। তারা পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের লেজুড়বৃত্তির কাজে সমান তালে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

আবার রণাঙ্গনে

এই অভিযানে মারাঠিদেরকে তৃতীয়বারের পদর্যুস্ত করে টিপু তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) ও পালান্দি নদীর মোহনায় ক্যাম্প স্থাপন করেন। ওদিকে মারাঠিদের পরাজিত সৈন্যরা হায়দারাবাদি সৈন্যদের সঙ্গে একত্র হয়ে টিপুর ক্যাম্প থেকে মাত্র দু' ক্রোধ দূরত্বে শাহনূরের আশপাশে সমবেত হতে থাকে। ওই সময় বেদনুরের গভর্নর বদরুজ্জামান খান নায়েতা যুদ্ধের রসদের জোগান নিয়ে টিপুর সঙ্গে যোগদান করে। ৫/৬ দিন পর টিপু তার সৈন্যদেরকে পুনরায় বিন্যস্ত করে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। পূব দিক থেকে মীর মুঈনুদ্দীনের নেতৃত্বে মাইমানা (ডানব্যূহ), পশ্চিম দিক থেকে শাইখ বুরহানুদ্দীনের নেতৃত্বে মায়সারা (বামব্যূহ) রওয়ানা করিয়ে দেন। শত্রুদের মাঝমাঠের ব্যাটালিয়নের ওপর আক্রমণের জন্যে টিপু নিজেও একদল সৈন্য সহকারে বেরিয়ে পড়েন। তিন বাহিনী মিলে রাতের অন্ধকারে শত্রুদের ক্যাম্পের ওপর প্রচণ্ড গেরিলা আক্রমণ করেন। আক্রমণের তীব্রতা দেখে মনে

www.boimate.com

হচ্ছিলো, শত্রুদলের ওপর প্রলয়ের বিভীষিকা নেমে এসেছে। তোপের গোলায় সম্মিলিত বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য ময়দানেই ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। অবশিষ্টরা কোনোমতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। মারাঠি সর্দার হরিপণ্ডিত ও রাস্থিয়া মাধুমাপতি ঊর্ধ্বশাসে পালিয়ে যায়। চোখের পলকে শত্রুদলের পুরো ক্যাম্প জনশূন্য হয়ে পড়ে। তাদের খুব কাছাকাছি, মাত্র এক ক্রোশ দূরে মারাঠিদের আরেকটি দল অবস্থান করছিলো। টিপুর নির্দেশে শায়খ হামেদ, শায়েখ আনসার ও আহমদ বেগ প্রমুখ তাদের ওপর আক্রমণ করে তোপখানা দখল করতে সমর্থ হন। এবারের অভিযানে শত্রুবাহিনীর ৭ হাজার সৈন্য নিহত হয়। অগুণতি সম্পদ রণক্ষেত্রে ফেলে পালিয়ে যায়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ টিপুর নির্দেশে তৎক্ষণাৎ সিপাহিদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

শাহনুর (Savanur) জয়

এই বিশাল বিজয়ের পর টিপু হুবেলী ও কোর্গ-এর কাছাকাছি শহর শাহনূরের দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার নবাব আবদুল হাকীম খান সালতানাতে খোদাদাদের করদ রাজা ছিলো। ১৭৭৬ সালে একবার সে হায়দার আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মারাঠিদের সঙ্গে ঐক্য গড়েছিলো। ওই সময় হায়দার আলী তাকে সমুচিত জবাব দেওয়ার ইচ্ছে নিয়েছিলেন। তখন সে ভীত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে হায়দার আলী তা মঞ্জুর করে, বার্ষিক ৪ লক্ষ রুপি কর প্রদানের অঙ্গীকারের ওপর স্বপদে বহাল রাখেন। মারাঠিরা তার হাতে যেসকল এলাকা দখল করে নিয়েছিলো, হায়দার আলী তা পুনরুদ্ধার করে তার হাতে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু হায়দার আলীর মৃত্যুর পর পুনরায় সে মারাঠিদের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। মারাঠি ও হায়দারাবাদীদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলে। অথচ হায়দার আলী তার ছোট ছেলে করীম শাহের বিয়ে শাহনূরের পরিবারেই সম্পন্ন করেছিলেন। এরপরও সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে বসে। যার কারণে টিপু তার বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করতে বাধ্য হন। ওদিকে পরাজিত মারাঠি সৈন্যরাও তার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলো। শাহনূরের দিকে টিপুর এগিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে তারা পালিয়ে যায়। নবাব আবদুল হাকীম খান যখন দেখতে পেলেন যে, মারাঠি সর্দাররা তাকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের জীবন

www.boimate.com

বাঁচাতে কেটে পড়েছে তখন ছেলে আবদুল খবীর খানের হাতে শাহনূরের ক্ষমতা অর্পণ করে সে নিজেও পালিয়ে যায়। নগরী দখল করার জন্যে টিপু সাইয়্যেদ হামেদ, সাইয়্যেদ আবদুল গফ্‌ফার, মীর সাদেক, মাহদী আলী বখশ প্রমুখকে সামনে বাড়িয়ে দেন। তারা ২ অক্টোবর ১৭৮৬ সালে কোনো ধরনের রক্তপাত ব্যতিরেকেই গোটা এলাকা দখল করে নিতে সক্ষম হন। আবদুল খবীর খানকে নজরবন্দি করা হয়। অবশ্য টিপুর নির্দেশে তার আরাম-আয়েশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়।

মহিসুরের সৈন্যরা যখন বিভিন্ন রণাঙ্গনে

শাহনুর (Savanur) বিজয়ের পর টিপু যখন তার সৈন্যদেরকে নতুন করে বিন্যস্ত করে দেখতে দেখতে পান যে, করদ রাজা, নবাব ও জমিদারদের সৈন্যদেরকে একত্র করার পর দেখা যাচ্ছে, তার অধীনে বিশাল বড় একটি সৈন্যদল রয়েছে। এতে টিপু সুলতানের সাহস বেড়ে যায়। তিনি সৈন্যদেরকে নতুন করে বিন্যস্ত করে ৫ টি পৃথক দলে বিভক্ত করেন। একটি অংশকে নিজের হাতে রেখে অন্যদেরকে চার ভাগে, যথাক্রমে মীর মুঈনুদ্দীন খান, বুরহানুদ্দীন খান, মহা মির্যা খান ও হুসাইন আলী খানের নেতৃত্বে তুলে দেন। প্রতিটি দলে ২৫ হাজার অশ্বারোহী, ১৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিলো। অথচ টিপুর হাতে ছিলো মাত্র ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও তারচেয়ে কমসংখ্যক পদাতিক সৈন্য। সেই চারটি দলকে তিনি পুনা, হায়দারাবাদ, রাইচপুর ইত্যকার নগরী অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। বুরহানুদ্দীন বঙ্কাপুর ও মিসরি কোটা আক্রমণ করে সেখানকার মজবুত কেল্লাগুলো জয় করেন। মীর মুঈনুদ্দীন খানের নেতৃত্বাধীন বাহিনী নিজ অধীনস্থ দুই অফিসার সাইয়্যেদ আবদুল গফুর ও সাইয়্যেদ হামেদকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্ররুগি ওয়াঘা জয় করেন।

হুসাইন আলী খান ও মহা মির্যা খানের অধীনস্থ সৈন্যরা টিপুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিযাম ও হায়দারাবাদের সৈন্যদের ওপর এমন তীব্র আক্রমণ করে যে, তাদের সবগুলো সারি এলোমেলো হয়ে যায়। মারাঠি সর্দার হরি পণ্ডিত পালিয়ে যায়। কয়েক হাজার সৈন্য নিহত হয়। যখন মহিসুরের সৈন্যরা রসদ-সামান নিয়ে ক্যাম্পের দিকে ফিরছিলো তখন মারাঠি সৈন্যরা পথিমধ্যে তাদের ওপর গেরিলা আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। সংবাদ পেয়ে টিপু সুলতান মারাঠি সর্দার রাজা নিকুজী রায়

www.boimate.com

হালকার-এর নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের ওপর এমন প্রাণঘাতী আক্রমণ করে বসেন যে, উপায়ন্তর না দেখে জীবন বাঁচাতে তারা ঊর্ধ্বশাসে পালাতে শুরু করে। বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। এরপর হুসাইন আলী খান, মাহদী খান ও মহা মির্যা খান যূথবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর ওপর একযোগে আক্রমণ করেন। শত্রুদের প্রতিরক্ষাবুহ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। হায়দারাবাদী সৈন্যদলের সেনাপতি সাইফ জঙ্গ কোনোমতে পালিয়ে জান বাঁচাতে সক্ষম হয়। মারাঠি অফিসাররা তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ময়দানে ফেলেই পালিয়ে যায়। যুদ্ধবন্ধী সেই নারীদেরকে টিপু সুলতান উপহার সমেত, সসম্মানে পুনায় পালিয়ে যাওয়া তাদের স্বামীদের কাছে পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্য হতে এক চতুর্থাংশ তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করেন। এছাড়াও পুরস্কার হিসেবে সিপাহিদেরকে অতিরিক্ত দু' মাসের বেতন প্রদান করেন।

সন্ধিচুক্তি

টিপুর উদারতা ও উন্নত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে পুনার বাইরে অবস্থানরত মারাঠি সেনাপতি হরি পণ্ডিত ও রাজা হালকার সন্ধি করার জন্যে নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করেন। তারা বলেন, এখনও যদি যুদ্ধ স্থগিত রেখে সন্ধি না করা হয় তাহলে মহিসুরের সেনাবাহিনী যেকোনো সময় পুনায় চলে আসতে পারে। মারাঠিদের মাঝে সন্ধির কথাবার্তা হচ্ছে, শুনতে পেয়ে টিপু সুলতান বদরুজ্জামান খান নায়েতাকে মূল্যবান উপহারসামগ্রী ও হীরা-জওহরাত সহকারে পুনায় অবস্থানরত মারাঠি সর্দারদের কাছে প্রেরণ করেন। জনগণের ভোগান্তির দিকে তাকিয়ে টিপু সুলতান সন্ধি করতে সম্মত হয়েছেন, এ কথা বদরুজ্জামান খান তাদেরকে অবহিত করেন। যেহেতু মারাঠিরা পূর্ব থেকেই সন্ধির অপেক্ষায় ছিলো, এজন্যে তৎক্ষণাৎ তা মঞ্জুর করে নেয় এবং নিজেদের পক্ষ থেকে টিপুর কাছেও মহামূল্যবান উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা

এপ্রিল ১৭৮৭ সালে উভয়পক্ষের প্রতিনিধিগণ যেই শান্তিচুক্তির ওপর স্বাক্ষর করেন তার মাঝে নিম্নের এই উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সন্নিবেশিত ছিলো–

www.boimate.com

১. সন্ধির পর টিপু উপহার হিসেবে নরগন্ডাহ, বাদামি (Baddami) ইত্যকার এলাকাগুলো মারাঠাদের ফিরিয়ে দেবেন।
২. মারাঠারা টিপুকে তার সমস্ত অধিকৃত এলাকা ফিরিয়ে দেবে।
৩. আগামীতে মারাঠিরাও টিপুকে 'বাদশাহ' উপাধীতে সম্বোধন করবে।
৪. টিপু সুলতান মারাঠিদেরকে বকেয়া ৩০ লক্ষ রুপি ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবেন।

এই সন্ধির পর মারাঠিরা টিপুর কাছে এ অনুরোধ পেশ করেন যে, তিনি যেন শাহনূরের নবাবকে পুনরায় তার পদে বহাল করেন। সুলতান তাদের এ অনুরোধ মঞ্জুর করে হাকিম আবদুল হাকীম খানকে শাহনূরের নবাবের পদে পুনর্বহাল করেন। তার নজরবন্দী ছেলে আবদুল খবীর খানকে মুক্তি দেন। সন্ধিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মারাঠি সর্দার হরি পণ্ডিত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এজন্যে টিপু সুলতান তাকে জায়গীর স্বরূপ কাঞ্চনগড় প্রদান করেন। রায়দুর্গের রাজা ওই সময় টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ শুনে সে ঘাবড়ে যায়। স্বউদ্যোগী হয়ে আনুগত্য স্বীকার করার আগ্রহ প্রকাশ করে। টিপু সুলতান তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে গ্রেফতার করে ব্যাঙ্গালুরু পাঠিয়ে দেন। যেহেতু এ যুদ্ধে হায়দারাবাদের নিযাম মারাঠিদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলো; এজন্যে সন্ধির সকল ধারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের ওপরও প্রযোজ্য হয়।

www.boimate.com

একাদশ অধ্যায়

অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলির ওপর মনোযোগ প্রদান ও উসমানি খলীফার কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ

www.boimate.com

রাজধানী প্রত্যাবর্তন ও বিজয়-উৎসব

মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার পর টিপু সুলতান রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনম অভিমুখে রওয়ানা হন। খোদ মারাঠা ও নিযামের দৃষ্টিতেও এই সন্ধিচুক্তিটি ছিলো টিপুর জন্যে বিজয়। যার কারণে যুদ্ধ শেষে টিপু যখন রাজধানী প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাকে সেখানকার জনগণ বিজয়োচিতভাবে স্বাগত জানায়। পথিমধ্যে তিনি ব্যাঙ্গালুরু নগরীতে ১৫ দিন অবস্থান করেন। এরপর যখন তিনি জুম্মাবার শ্রীরঙ্গপত্তনম পৌঁছেন তখন সেখানে সাড়ম্বর বিজয়োল্লাস উদযাপিত হয়। মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল জনগণ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে। ওই সময় তিনি গরিব-মিসকিনদের মাঝে কয়েক লাখ রুপি বিতরণ করেন। এক নাগাড়ে এক মাস পর্যন্ত কাঙ্গালি ভোজ চলতে থাকে। সামরিক বাহিনীর সদস্যবর্গ ছাড়াও অন্যান্য প্রাশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে সুলতানের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন অফিসারকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। নগরীর সকল মহিলাকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক জোড়া পোশাক প্রদান করা হয়। গোটা নগরবাসীকে রাষ্ট্রীয় ভবনে নিমন্ত্রণ করা হয়। মারাঠাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি মুতাবেক এখন থেকে টিপু নিজের জন্যে 'বাদশাহ' পদবির ব্যবহার শুরু করেন। জুমার খুতবাগুলোতেও মোঘল সম্রাটদের স্থলে তার নাম পঠিত হওয়ার প্রচলন শুরু হয়ে যায়।

রাজ্যের প্রাশাসনিক কাঠামোর সুব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগ

বিজয়-উৎসব শেষে টিপু সুলতান প্রশাসন ঢেলে সাজানোর কাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার নিরীক্ষণ করেন। সুলতানের উপস্থিতিতে মীর সাদেক ছিলো প্রশাসনের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। সুলতান গোপনসূত্রে সংবাদ লাভ করেন যে, সে কোষাগারের সম্পদে তছরুপ করেছে। গভীর তদন্তের পর তার ঘর থেকে এক লক্ষ স্বর্ণরুপি ও দশ লক্ষ রুপি ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে হীরা-জওহরাত উদ্ধার হয়। ওদিকে

www.boimate.com

জনগণও তার রুক্ষ আচরণ, অত্যাচার, ঘুষগ্রহণ-সহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষুব্ধ ছিলো। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সুলতান তাকে সেই পদ থেকে বহিস্কার করে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তার স্থলে মাহদী আলী খান নায়েতা-কে 'দিওয়ান' নিযুক্ত করা হয়।

এছাড়াও টিপু সুলতান 'আহমদী' নামে নতুন এক ধরনের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। যার একপাশে লেখা ছিলো, دین احمد در جهاں روشن از فتح حیدر است—'হায়দারের বিজয় আহমদ সা.-এর ধর্মকে পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল করেছে।' মুদ্রার ওপিঠে লেখা ছিলো, هو السلطان الوحید العادل سنه—'তিনি হচ্ছেন ন্যায়পরায়ণ একক সম্রাট'। টিপু সুলতান হিজরী সনের স্থলে আহমদী সন প্রবর্তন করেন। এই সন নবীজির হিজরতের সময়কাল থেকে শুরু না হয়ে নবুওয়াতের সময়কাল থেকে শুরু হয়েছে। প্রতিটি কেল্লা, থানাশহর ও সাধারণ শহরে প্রতি এক মাইল দূরে একটি করে কাঁটা ঘেরা পৃথক ছাউনী নির্মাণ করেন। ওই সেনাছাউনিতে চারটি করে দরোজা হতো। সবসময় প্রহরীর তত্ত্বাবধানে প্রহরার ব্যবস্থা ছিলো। উদ্দেশ্য হলো, কোনো অচেনা মানুষ যেন অনুমতি ব্যতিরেকে কেল্লা বা শহরে প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে সীমান্তের ওপর কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করা হয়। সীমান্তগুলো প্রহরা দেওয়ার জন্যে ১২ হাজার পদাতিক ও ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করা হয়।

রাজ-সিংহাসনের নবরূপ দান

নবাব হায়দার আলী নিজের জন্যে কোনো যথোপযুক্ত সিংহাসন তৈরি করেননি। এমনকি খোদ টিপু সুলতানও এতোদিন এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগ পাননি। এখন শান্তিময় পরিবেশের সুযোগ কাজে লাগিয়ে এবং রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে 'সম্রাট' হিসেবে সত্যায়ন লাভের পর তিনি বাঘের আকৃতিতে, স্বর্ণ দিয়ে একটি উৎকৃষ্ট সিংহাসন তৈরি করেন। সেই সিংহাসনটি মহামূল্যবান হীরা-জওহরাত দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। সিংহাসন তৈরির কাজে তিনি ফরাসি কারিগরদের কাছ থেকেও সহায়তা গ্রহণ করেন। সুলতান যখন সেই রাজসিংহাসনের ওপর আরোহণ করেন তখন মনে হচ্ছিলো, বাঘের পিঠে বাঘ বসে আছে। ১৭৯৯ সালে টিপুর শাহাদাতের পর ইংরেজরা ওই সিংহাসন টুকরো

www.boimate.com

টুকরো করে ইংল্যান্ড পাঠিয়ে দেয়। টিপুর শাহাদাত পরবর্তী আলোচনায় এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

টিপুর জনক হায়দার আলী যদিও নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু তিনি তার সুযোগ্য পুত্র টিপুকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৎকালীন সকল শাস্ত্রে দক্ষ করে তুলেছিলেন। যার কারণে টিপু সুলতান শিক্ষার মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে শতভাগ সচেতন ছিলেন। যেহেতু ওই যুগে মহিসুরের জনগণের মাঝে সামষ্টিকভাবে নিরক্ষরতার হার বেশি ছিলো; এজন্যে তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনমে 'জামিউল আযহার' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে দ্বীনি-দুনিয়াবি শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ছিলো। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উচ্চ বেতনে সবগুলো জ্ঞান-বিদ্যার বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়।

মসজিদে আ'লা নির্মাণ

রাজধানী অবস্থানের এই দিনগুলোতে অতীতের একটি স্মৃতি টিপুর মনে পড়ে। একবার তিনি ৬/৭ বছর বয়সে একজন দরবেশের সঙ্গে একটি মসজিদ নির্মাণের অঙ্গীকার করেছিলেন। ঘটনা হলো, সম্রাট হওয়ার অনেক দিন আগে শিশু টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনমের একটি মাঠে খেলা করছিলেন। ওই দরবেশ তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তুমি সম্রাট হলে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে। জায়গাটি ছিলো শাহীমহল-লাগোয়া। সেই স্থানে তিনি বেজাপুরের আদেল শাহী মসজিদের নির্মাণশৈলী অনুকরণ করে ১২০২ হিজরী, মুতাবেক ১৭৮৭ সালে মসজিদ-নির্মাণ শুরু করেন। দু' বছরের মধ্যে নির্মাণ-কাজ সম্পন্ন হয়। মসজিদ-নির্মাণে তৎকালীন ৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। মসজিদের মিনারা এতোটাই উঁচু ছিলো যে, কেল্লার প্রাচীরের বাইরে থেকেও তা দেখা যেতো। 'মসজিদে আকসা' ছন্দে এ মসজিদের নাম রাখেন 'মসজিদে আ'লা'। দক্ষ লিপীকারকদের মাধ্যমে ওই মসজিদে চারটি 'শিলালিপী' লেখানো হয়। যার একটিতে মসজিদ নির্মাণের ইতিহাস, দ্বিতীয়টিতে আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি নাম, তৃতীয়টিতে নবী করীম সা.-এর ৯৯ নাম ও চতুর্থ শিলালিপীতে জিহাদের বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়।

www.boimate.com

টিপু সুলতান অনুমান করেছিলেন, তিনি যখন রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মসজিদে আসবেন তখন সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে। এতে নামাযীদের কষ্ট হবে। এজন্যে তিনি শাহী মহল থেকে মসজিদে আসার জন্যে উত্তর দিকে একটি পৃথক দরোজা তৈরি করেন। ওই দরোজা দিয়ে এমনভাবে নিঃশব্দে মসজিদে প্রবেশ করতেন যে, উপস্থিত লোকজন তার আগমনের বিষয়টি টের পেতো না।

টিপুর কারামত ও জনতার বিস্ময়

১২০৪ হিজরী, মুতাবেক ১৭৯০ সালে ঈদুর ফিতরের দিন মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।[৫৬] সুলতানের দাওয়াতে ওই দিন মহিসুরের সকল উলামা-মাশায়েখ সমবেত হন। টিপুর ইচ্ছে ছিলো, এমন কোনো বুযুর্গ মসজিদটির উদ্বোধন করবেন যিনি সাহিবে তারতীব। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি যার কোনো ফরয নামায কাযা হয়নি। সমকালীন উলামা-মাশায়েখ সহকারে যেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের একজনেরও নিজের ব্যাপারে এ আত্মবিশ্বাস হয়নি যে, সে সাহিবে তারতীব। কাউকে অগ্রসর হতে না দেখে অগত্যা টিপু সুলতান নিজেই অগ্রসর হয়ে, ইমামতির দায়িত্ব পালন করলেন। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি সাহিবে তারতীব।

টিপু সুলতানের এতো দিনের লুকিয়ে রাখা এই বুযুর্গির সংবাদ জানতে পেরে সবাই বিস্মিত হল। কারণ, দিনের পর দিন যিনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তিনি যতো বড় আলেম হোন না কেন, তারপক্ষে নামায কাযা না রাখা নিতান্তই কষ্টকর।

কারখানা স্থাপন

রাজসিংহাসনে আরোহণের পর থেকে টিপু সুলতান এতোদিন পর্যন্ত জনগণের অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি ও জীবিকার সচ্ছলতার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগ পাননি। এখন খানিকটা অবসর হতেই তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার শুরু করে দিলেন। ব্যাঙ্গালুরু, বেদনুর (Bednore), চিত্রাদুর্গা (Chitaldroog) ও শ্রীরঙ্গাপত্তনামে চারটি বৃহৎ কারখানা নির্মাণ করলেন।

---

[৫৬]. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম। খণ্ড : ৬।

www.boimate.com

সেখানে হাতিয়ার, থালা-বাসন, কলসি, কেচি ইত্যাদি তৈরি হতো। এই কারখানাগুলো প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় যে দুটি উপকার হয়েছে তাহলো, এখন একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্য মহিসুরের ভেতরেই তৈরি হচ্ছে। রপ্তানির ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসতে শুরু করে। বাইরের রাষ্ট্রগুলোতে আমদানির হার বেড়ে যায়। অন্যদিকে হাজার হাজার বেকার যুবকের আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ওই কারখানাগুলোতে স্থানীয় লোকদেরকে প্রশিক্ষিত করার জন্যে উচ্চ বেতনে ফরাসি ও ইংরেজ কারিগর নিয়োগ দেয়া হয়।

খিলাফতে উসমানিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

টিপু সুলতান নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিক ছিলেন; কিন্তু তারচেয়েও বেশি ছিলেন ইসলামপ্রেমী। বৃহত্তর পরিসরে ইসলামের স্বার্থে মুসলমানদের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলাই ছিলো তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। এ কারণেই তিনি হায়দারাবাদের নিযাম ও কর্নাটকের নবাবের সঙ্গে যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন। চিরস্থায়ী ঐক্য গড়ে তুলতে তিনি একাধিকবার নিযামের কাছে নিজের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। টিপু সুলতানের সেই পত্রগুলো পড়লে বুঝে আসে যে, ইসলামি ঐক্যের চেতনা সবসময় তার অন্তরে জাগ্রত ছিলো। ১৭৮৪ সালে নিযামের উদ্দেশে লেখা একটি চিঠিতে টিপু সুলতান লেখেন, 'আমি সবসময় মুসলিম দেশগুলোকে শক্তি যোগাতে চাই। ইসলামের জন্যে নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করা আমার একান্ত অভিপ্রায়। কাজেই বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সকল মুসলমানের দায়িত্ব আমার বিরুদ্ধে না গিয়ে আমাকে সঙ্গ দেওয়া।'

দু' পক্ষের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে হায়দারাবাদ ও মহিসুরের রাজ-পরিবারদ্বয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনেও টিপু সুলতান আগ্রহী ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, এর মাধ্যমে সবাই যেন এ দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের মাঝে ঐক্যের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে যাওয়া ওই সকল শাসক সবসময় টিপুকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখতো।

টিপু সুলতান স্বদেশের, স্বধর্মের এই সম্রাটদের কাছ থেকে যখন পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েন তখন তিনি নিরুপায় হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার চলমান যুদ্ধে সহায়তার জন্যে ফরাসিদের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কয়েকটি অভ্যন্তরীণ জটিলতার কারণে তাদের সেই মৈত্রী বেশি দিন টেকেনি।

www.boimate.com

স্থানীয় শক্তিগুলো থেকে নিরাশ হয়ে টিপু সুলতান হিন্দুস্তানের বাইরে আফগানিস্তান, ইরান ও উসমানিয়া খেলাফত থেকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সামরিক সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ সালে সর্বপ্রথম উসমান আলী খানকে কনস্টান্টিনোপল প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন, তুমি খলীফার মনোভাব জানার চেষ্টা করবে যে, দ্বীনি স্বার্থে তার সঙ্গে মহিসুর রাষ্ট্রের কোনোভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তিস্বাক্ষরের সম্ভাবনা কতোটকু?

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরুত্ব

ভারতবর্ষের বাইরে ওই সময় মুসলিম বিশ্বে বৃহৎ রাষ্ট্র ছিলো তিনটি। ইরান, আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তান। এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে তুর্কিস্তানই ছিলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' গ্রন্থে এর কিছু কারণ তুলে ধরেছেন। তিনি লেখেন,

> 'আফগানিস্তান ও ইরানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ব্যতীত আমরা সেই উসমানিয়া রাজত্ব থেকেও চোখ বন্ধ করতে পারি না, যা দশম শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে রক্ষা করে যাচ্ছিলো খিলাফতের মসনদ, যার অবস্থান ভৌগোলিকভাবে ভারত থেকে অনেকদূরে ইউরোপ ও এশিয়া মাইনরের মাঝামাঝি ছিল। কিন্তু আরব দেশগুলো (মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামেন, নজদ, হিজায ও উত্তর আফ্রিকার এক বিরাট অংশ) তার শাসনাধীন ছিল। হেরেম শরিফ ও পবিত্র স্থানগুলোর তত্ত্বাবধায়ক ও মুতাওয়াল্লী ইসলামী খিলাফতের ধারক ও রক্ষক হওয়া, একটি বৃহৎ শক্তি ও রাজত্বের মর্যাদা হিসাবেও এবং পাশ্চাত্য ও ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলোর দৃষ্টিতে ইসলামী শক্তির নিদর্শন, বহুবিধ ইসলামী স্বার্থরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী ও কর্ণধার হওয়ার কারণেও তামাম পৃথিবীর মুসলমান একে সম্মানের চোখে দেখত। সেখানকার নিত্যদিনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বিশ্ববাসী নিছক আগ্রহই রাখতো না; বরং বিরাটভাবে প্রভাবিত হতো এবং শিক্ষাগ্রহণ করত।' [তারীখে দাওয়াত ও আযীমত : ৫/২৬]

কনস্টান্টিনোপল থেকে টিপুর কূটনীতিবিদ উসমান আলী খান যখন ফিরে এসে তুর্কি খলীফার আশাব্যঞ্জক উত্তর পৌঁছে দেন তখন টিপু রীতিমত

www.boimate.com

১০ মার্চ ১৭৮৬ সালে মঙ্গলোরের সমুদ্রবন্দর থেকে মীর গোলাম আলী লুঙ্গড়া-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিদলটিতে ছিলেন লুতফ আলী বেগ খান, জা'ফর খান ও নুরুল্লাহ খান। মিশনের সচিবর দায়িত্বে ছিলেন সাইয়্যেদ জাফর ও খাজা আবদুল কাদের। তাদেরকে টিপু সুলতান ৭ নভেম্বর ১৭৮৫ সালেই রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনম থেকে পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানান। ওই মিশনে মহিসুর থেকে চারটি সামুদ্রিক নৌযান রওয়ানা হয়। নৌযানগুলোর নাম হলো, ১. ফখরুল মারাকিব ২. নবীবখশ ৩. গর্ভে সূরাটি ৪. ফতহে শাহী মু'আযী। জাহাজটিতে ৯০০ জন সরকারি আমলা অংশগ্রহণ করেন। তাদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি চৌকস দল, বাবুর্চি ও অন্যান্য কর্মচারী ছিলো। টিপু সুলতান এই প্রতিনিধিদলটিকে কনস্টান্টিনোপলে তাদের কূটনৈতিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যাওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, তারা ওই দেশগুলোতে গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রপরিচালকদের কাছে মহিসুর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ অনুরোধ উপস্থাপন করবে যে, তারা যেন মারাঠা ও নিযামের সামরিক বাহিনীকে কোনো ধরনের সামরিক সহায়তা প্রদান না করে। কিন্তু অনিবার্য প্রতিবন্ধকের কারণে তারা সুলতানের সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারেননি। প্রতিনিধিদলটি কনস্টান্টিনোপল থেকেই ভারতে ফিরে আসে।

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আসল উদ্দেশ্য

টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে এতো বড় প্রতিনিধি দল কনস্টান্টিনোপলে প্রেরণের হেতু কী? এর যেই কারণ সাধারণত ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন তাতে টিপুর দূরদর্শী দৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং তার ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও দ্বীনি আত্মসম্মানবোধের যথাযথ চিত্র ফুটে ওঠেনি। আসলে তারা তা বোঝার আন্তরিক চেষ্টা করেননি। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক ও সামরিক রণশক্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং সেই রণশক্তির মাঝে উসমানি খলীফাকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন'।

আসলে এটি টিপু সুলতানের অনেকগুলো উদ্দেশ্যের একটি মাত্র; কিন্তু এটাই মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং এই প্রতিনিধিদল প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য হল, উসমানি খলীফার প্রতি সহমর্মিতাবোধ এবং তাকে একটি বিশাল

www.boimate.com

আশঙ্কা সম্পর্কে সচেতন করা। সুলতান সলীম সেই আশঙ্কাটির পূর্বানুমান হয়তো করতে পেরেছেন, বা পারেননি। কিন্তু তিনি তার চারপাশের শক্ত রাজনৈতিক বেষ্টনীর কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুলতান টিপুর সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করতে পারেননি। টিপু এ কথা ভালোভাবেই জানতেন যে, আব্বাসী সালতানাতের পতনের পর মুসলিম জাহানের ইসলামি খেলাফতের মর্যাদা উসমানি সালতানাতের দিকে স্থানান্তর হয়েছে। যার কারণে তুর্কি খলীফাই মুসলিম জাহানের একক খলীফা। পশ্চিমা শক্তিগুলোও মুসলিম জাহানের বিভিন্ন বিষয়ে তাকেই মুসলমানদের মুখপাত্র মনে করে। এহেন প্রেক্ষাপট ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলি সত্ত্বেও তুর্কিস্তানের রাজনৈতিক চিত্র অভ্যন্তরীণভাবে অবর্ণনীয় পর্যায়ের শোচনীয় হয়ে গেছে। সুলতান সলীম খেলাফতের মসনদে স্রেফ নামকাওয়াস্তে বসে আছেন। তিনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বৃটিশ সম্রাটের অভিপ্রায় অনুসারেই নিয়ে থাকেন। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিটি ময়দানে ইউরোপিয়ান জাতিগুলোই চালকের আসনে বসে আছে। ইসলামি খেলাফতের ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর কর্তৃত্ব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহগুলো পুরো উসমানি সালতানাতকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে। দ্বীনি ও নৈতিক অধঃপতনের মাত্রা দিনদিন শোচনীয় হতে চলেছে।

মোটকথা, উসমানি সালতানাত তার গোটা ইতিহাসের সবচেয়ে নাজুক সময় অতিক্রম করছে। তৎকালীন পৃথিবীতে শক্তিমত্তার বিচারে এগিয়ে থাকা দু'টি শক্তি– ফরাসি ও ইংরেজ নিজেদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। রাজনীতির ময়দানে তুর্কিস্তানকে কে নিজেদের বন্ধু বানাতে সক্ষম হবে, তা নিয়ে এ দু' শক্তির মাঝে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। যেহেতু ওই সময় ফরাসিরা বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ জটিলতার শিকার; এজন্যে তুর্কিরা বৃটিশদের সঙ্গে মৈত্রী গড়তে এগিয়ে আসে। ইংরেজদের সঙ্গে তুর্কিস্তানের এই রাজনৈতিক ও সামরিক ঐক্য মূলত রুশসম্রাট ক্যাথরিন দ্বিতীয় ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট যোসেফ দ্বিতীয়-এর পক্ষ থেকে ধেয়ে আসা ভীষণ আশঙ্কার কারণে অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সামরিক ঐক্যের আড়ালে ইংরেজরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে সংগোপনে কতোটা ভয়ানক চক্রান্ত পূরণ করতে চাইছে, সে সম্পর্কে তুর্কি খলীফা সম্রাট সলীম পুরোপুরি অবগত ছিলেন না। কিন্তু হাজার মাইল দূরে বসে খলীফা সলিমের স্বধর্মী শাসক টিপু সুলতানের রাজনৈতিক দূরদর্শী চোখ

www.boimate.com

তুর্কিস্তানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের নোংরা অভিপ্রায়গুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া থেকে ধেয়ে আসা সম্ভাব্য আশঙ্কা থেকে তুর্কিস্তান হয়তো এ যাত্রায় বেঁচে যাবে; কিন্তু এ সুযোগে ইংরেজ তুর্কিস্তানকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজদের থাবা প্রতিনিয়ত মজবুত হচ্ছে। তুর্কিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলে ইংরেজরা অপরাপর আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দিকে অগ্রসর হবে। কাজেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে এখনই প্রতিহত করা এবং মুসলিম সালতানাতগুলোর পরস্পরে ঐক্য গড়ে তুলে তাদের অগ্রযাত্রা রুখে দাঁড়ানোই টিপুর চোখে ওই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এখন রুখতে না পারলে আগামীতে তাদেরকে প্রতিহত করা অপেক্ষাকৃতভাবে আরও কঠিন হয়ে পড়বে। যেহেতু উসমানি খলীফা এ মুহূর্তে মুসলিম জাহানের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করছেন; কাজেই তাকে শত্রুদের গতি-বিধি ও উচ্চাভিলাষী অভিলিপ্সা সম্পর্কে সতর্ক করা একজন মুসলিম শাসক হিসেবে টিপু নিজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করতেন। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ১৭৮৬ সালে একটি বিশাল প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। সুলতান সলীম যখন টিপু সুলতানকে ফরাসিদের ওপর ভরসা না করা এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই না করার পরামর্শ জানিয়ে ঠিঠি লেখেন, তখন তার জবাবি পত্রে টিপু তার এই প্রতিনিধি দল প্রেরণের উদ্দেশ্য খোলাসা করে দিয়ে বলেন, 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমি স্রেফ ভারতবর্ষের জনগণের দায়িত্ব মনে করি না; বরং এই জিহাদ সকল মুসলমানের ওপর ফরয মনে করি। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের নিজ মাতৃভূমি রক্ষা করা যতোটা উদ্দেশ্য; তারচেয়ে বেশি উদ্দেশ্য ইসলামের হিফাযত করা। আফসোসের বিষয় হলো, টিপুর সেই খাঁটি দ্বীনি সহমর্মিতা তুর্কিস্তানের সুলতান সলীম বুঝতে পারেননি।

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক কারণ

এই মহান উদ্দেশ্যের বাইরেও টিপুর আরও কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য ছিলো। তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হলো, ইংরেজদেরকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে তুর্কিস্তানের সামরিক সহায়তা অর্জন করা। এজন্যেই তিনি বাঙ্গলা সহ অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের ওপর ইংরেজদের অমানুষিক অত্যাচারের উদ্ধৃতি দেন এবং তিনি এ অঙ্গীকারও

www.boimate.com

করেন যে, উসমানি সালতানাত সামরিক সহায়তা করতে রাজি হলে তার যাবতীয় ব্যয়ভার টিপু নিজেই বহন করবেন। নৌশক্তি ও পৃথিবীর অনেকগুলো সামুদ্রিক বন্দরের ওপর ইংরেজদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে দিনদিন তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিলিপ্সার বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে, সাফল্যের সঙ্গে। তাদের মুকাবিলার জন্যে টিপুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কিছু সামুদ্রিক নৌবন্দর। এজন্যে তিনি উসমানি সম্রাটের কাছে এ আবেদন পেশ করেন যে, তাকে যেন বসরার নৌবন্দর ভাড়া দেয়া হয়। এর বিনিময়ে তিনি তাকে মঙ্গলোরের নৌবন্দর প্রদানের অঙ্গীকার করেন। এতে করে একে অপরের যুদ্ধ জাহাজ ও ব্যবসায়িক জাহাজের আগমন-নির্গমনের মাধ্যমে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হতে পারবে এবং সমুদ্রোপকূলগুলো বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

টিপুর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো, দু'টি মুসলিম দেশের মাঝে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে দু'দেশের পরস্পরে শিল্প ও কারিগরি দক্ষতার আদান-প্রদান করা যাবে।

টিপুর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো, ইরাকের ঐতিহাসিক নগরী নাজিফ আশরাফ-এর দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর দর্শনার্থী আগমন করে থাকে। কিন্তু বারো মাসই সেখানে সুপেয় পানির প্রচণ্ড অভাব বিরাজ করে থাকে। সুলতান টিপুর একান্ত ইচ্ছে ছিলো, তিনি উসমানি সুলতানের অনুমতিক্রমে নিজস্ব অর্থায়নে ফোরাত নদী থেকে নাজিফ আশরাফ পর্যন্ত সুপেয় পানির একটি খাল খনন করবেন। এটি ছিলো টিপুর চোখে একটি সৌভাগ্যময় স্বপ্ন।

টিপু সুলতান উসমানি খলীফার নামে লেখা সেই পত্রগুলোতে উক্ত উদ্দেশ্যগুলো লিখে জানিয়েছেন। পাশাপাশি প্রেরিত দূতকেও তিনি কথাগুলো মৌখিকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে মহিসুরের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী, হীরা-জওহরাতের পাশাপাশি প্রচুর নগদ অর্থ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। দূতের সঙ্গে চারটি হাতিও দিয়েছিলেন। চারটি হাতির একটি ছিলো সুলতান সলীমের জন্যে উপহার। দ্বিতীয় হাতিটি ছিলো ইংল্যাণ্ড-সম্রাট ও তৃতীয় হাতিটি ফরাসি-সম্রাটের জন্যে উপহার। চতুর্থ হাতিটি দিয়েছিলেন, প্রয়োজনের সময় বিক্রি করে যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার পূরণের উদ্দেশ্যে।

www.boimate.com

উসমানিয়া খেলাফত কর্তৃক সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি

টিপু সুলতান প্রতিনিধিদলের সদস্যদেরকে এ কথা বলেছিলেন যে, তারা উসমানি খলীফার পক্ষ থেকে তার জন্যে 'সুলতান'-এর সনদ অর্জন করে নেবে। কারণ, খোদ ভারতবর্ষেই মারাঠিরা ছাড়াও হায়দারাবাদের নিযাম ও কর্নাটকের নবাবও তাকে একজন জবরদখলকারী সম্রাট মনে করে। যেহেতু ওই যুগে তুর্কি সুলতানকেই খলীফাতুল মুসলিমীন মনে করা হতো; কাজেই তার পক্ষ থেকে সুলতান হওয়ার স্বীকৃতি পাওয়া গেলে তা দিয়ে শত্রুদের মুখ বন্ধ করা সহজ হবে। টিপু সুলতান ইচ্ছে করলে দিল্লীর মোঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকেও নিজের জন্যে 'নবাব' সনদ মঞ্জুর করে নিতে পারতেন। প্রথমদিকে তিনি সে উদ্দেশ্যেই মোঘল দরবারে উপস্থিত নিজ প্রতিনিধি স্বজন রাও ও মৌল চান্দ প্রমুখের মাধ্যমে একটি বড় অংকের অর্থ বিনিময় হিসেবে প্রদান করেন। কিন্তু শাহ আলমের তল্পিবাহক উযির মাজদুদ্দৌলা ও দিল্লীতে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি মেজর ব্রাউনের যৌথ চক্রান্তের কারণে তার সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। দিল্লী দরবারের পক্ষ থেকে এ বক্তব্য আসে যে, মোঘল সালতানাতের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ভারতের জন্যে প্রতিনিধি হিসেবে হায়দারবাদের নিযাম মনোনীত রয়েছেন।

এ জাতীয় আরও কিছু কারণ ও প্রেক্ষাপট সামনে চলে আসায় টিপু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি সরাসরি উসমানি সুলতানের পক্ষ থেকে নিজের জন্যে 'সুলতান'-এর স্বীকৃতি সংগ্রহ করবেন। আর ভারতবর্ষের মুসলিম সম্রাটদের জন্যে বিষয়টি নতুন নয়। ইতোপূর্বে মাহমুদ গজনবী বাগদাদের আব্বাসী খলীফার কাছ থেকে, মুহাম্মদ ইবনে তুঘলক মিসরের তৎকালীন খলীফার কাছ থেকে নিজেদের রাজ্যাভিষেকের স্বীকৃতি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে উসমানি সুলতানের কাছে প্রেরীত প্রতিনিধিদলটি শুধুমাত্র এই প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ টিপুর সুলতান হওয়ার স্বীকৃতিটুকু আদায় করতে সক্ষম হয়। স্বীকৃতি লাভের পর টিপু নিজের জন্যে বাঘের আকৃতির একটি সিংহাসন তৈরি করান, জুমু'আর খুতবার মাঝে নিজ নামের প্রচলন শুরু করেন এবং স্বনামে মুদ্রা তৈরি করেন।

এই প্রতিনিধিদলটি মঙ্গলোর থেকে রওয়ানা হয়েছিল ১০ মার্চ ১৭৮৬ সালে। ১৮ এপ্রিল ১৭৮৬ সালে প্রতিনিধিদলটি ওমানের মাস্কাট শহরের

www.boimate.com

উপকূলে অবতরণ করে। তারা সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেন। ওমানের ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ২ জুন সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে ২২ আগস্ট বসরা নগরীতে এসে পৌঁছেন। ওই সময় 'নবীবখশ' নামের জাহাজটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল। ওই জাহাজের ৫০ জন আরোহী আগুনে পুড়ে মারা যায়। ওদিকে যাত্রার সূচনাতেই 'ফখরুল মারাকিব' নামের জাহাজটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। যার কারণে তার পরিবর্তে অন্য একটি জাহাজ ভাড়া নেওয়া হয়েছিলো। ৩ ডিসেম্বর 'ফতহ শাহী মু'আযী' ও 'গরবে সূরাটি' নামের জাহাজদু'টি সমুদ্রে ডুবে যায়। অবশেষে ভাড়াকৃত জাহাজেই প্রতিনিধিদলটি রওয়ানা হয়.। ২৫ ডিসেম্বর ১৭৮৭ সালে বাগদাদ হয়ে, নাজিফ আশরাফ ও কারবালা যিয়ারত শেষে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছায়। ৫ নভেম্বর তারা খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়।

খলীফা বরাবর টিপুর পত্র প্রেরণ

প্রতিনিধিদলটির প্রধান মীর গোলাম আলী সুলতান সলীমের কাছে টিপুর পক্ষ থেকে নগদ ১০ লক্ষ রুপি ও মহামূল্যবান হীরা-জওহরাত সহকারে টিপুর পত্র পেশ করেন। ওই পত্রে টিপু সুলতান লেখেছিলেন, '৩৫ বছর ধরে খ্রিস্টানরা তৈমুর পরিবার (মোঘল)-এর দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা অপব্যবহার করে ভারতীয় উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর ওপর বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। তারা এখানকার সুজলা ভূমির খোঁজ জানতে পেরে দলে দলে ভারতবর্ষে পাড়ি জমাচ্ছে। ছলে বলে কৌশলে বিভিন্ন নগরী দখল করে নিচ্ছে। বঙ্গদেশ সরকারের বার্ষিক ৩৫ কোটি টাকার আমদানিও দখল করে নিয়েছে। তারা তাদের চারিত্রিক অসততা ও ধর্মীয় গোড়ামির কারণে একের পর এক অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ-পরিস্থিতির এমন বিপর্যয় সম্পর্কে অবগত করতেই আমার পক্ষ থেকে আপনার সকাশে এই প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছে। ইসলামের শক্তিবর্ধন ও তার শত্রুদের বিনাশ-সাধনের আমরা আপনার সার্বিক সহায়তা কামনা করছি।

চুক্তির খসড়া

প্রতিনিধিদলটি চিঠির ভাষ্য তুর্কি সুলতানকে মৌখিকভাবেও অবহিত করে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে টিপুর সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তিনামার অনুরোধ

www.boimate.com

পেশ করে। চুক্তিনামার খসড়া স্বয়ং টিপু সুলতানই প্রস্তুত করেছিলেন। স্বাক্ষরের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে তারা ওই খসড়া চুক্তি সুলতানের সামনে উপস্থাপন করে। খসড়া চুক্তির কয়েকটি দফা নিম্নরূপ–

১. ভ্রাতৃপ্রতীম এই দুই ইসলামি রাষ্ট্রের পরস্পরে সবসময় সুসম্পর্ক বহাল থাকবে।

২. বসরার নৌবন্দর টিপু সুলতানকে ভাড়া হিসেবে দেয়া হবে।

৩. তার বিনিময়ে উসমানি সুলতান সালতানাতে খোদাদাদের যেকোনো নৌবন্দর পসন্দ করে নিতে পারবেন। নৌবন্দরের এই বিনিময় এই দুই মুসলিম রাষ্ট্রের মাঝে আমদানি-রফতানি পাবে। নৌজাহাজের আগমন-নির্গমনের পথ উন্মোচিত হবে। রাষ্ট্রদ্বয়ের এই কল্যাণকামী চেতনার ফলে ইসলামের প্রভূত উপকার সাধিত হবে।

৪. ক. ইংরেজদের বিরুদ্ধে উসমানি খেলাফতের সামরিক সহায়তার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার খোদ টিপু সুলতান বহন করবেন।

খ. এর বিনিময়ে প্রয়োজনের সময় মহিসুরের সেনাবাহিনী নিজ খরচে উসমানি খেলাফতকে সামরিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫. মহিসুরে যদিও প্রচুর অস্ত্র কারিগর রয়েছে; এতদসত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে অস্ত্র তৈরির কিছু বিশেষজ্ঞ তুর্কিস্তানের পক্ষ থেকে সালতানাতে খোদাদাদে প্রেরণ করা হবে।

৬. এর বিনিময়ে সালতানাতে খোদাদাদের পক্ষ থেকে তুর্কি প্রশাসনকে প্রার্থিত বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা হবে।

চিঠি লেখা হয়েছে সোমবার ১৪ মুহাররম ১২০০ হিজরী, মুতাবেক ১৭ নভেম্বর ১৭৮৫ ঈসাব্দ। স্থান, শ্রীরঙ্গপত্তনম।

খলীফার উত্তর

অভ্যন্তরীণ নানা জটিলতার কারণে তুর্কিস্তানের খলীফা সুলতান সলীম সালতানাতে খোদাদাদের সঙ্গে কোনো ধরনের লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরে নিজ অপরাগতা প্রকাশ করেন। প্রতিনিধিদলটি যখন নাজিফ আশরাফ থেকে ফোরাত পর্যন্ত সুমিষ্ট পানির খাল তৈরির আবেদন পেশ করেন তখন খলীফার বুঝে আসছিলো না যে, এমন প্রকল্প কীভাবে সম্ভব? সম্ভবত তিনি মনে করেছিলেন যে, মহিসুর সম্রাট খাল খননের অজুহাত তুলে তুর্কি

www.boimate.com

সরকারের কিছু এলাকা দখল করে নিতে চাচ্ছে। ইত্যকার কিছু কারণে প্রতিনিধিদলটি মূল মিশন বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। অবশ্যই প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য, যেমন খলীফার পক্ষ থেকে টিপুর নামে 'সুলতান'-এর স্বীকৃতি সংগ্রহ করতে সফল হয়। সুলতান সলীম তাকে 'নাসিরুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন' উপাধীতে ভূষিত করেন। জবাবী পত্রে তিনি টিপুকে এ কথা লেখেন যে, 'তিনি নিজেও তার পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে জিহাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। রুশ প্রশাসন মুসলমানদের বিরুদ্ধে দিন-রাত একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তাদেরকে দমন করার জন্যে আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের সীমান্তে নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিনিধিদলটি আপনার পক্ষ থেকে মৌখিক ও লিখিত আকারে যেই অনুরোধগুলো পেশ করেছে, তার বিশদ উত্তর তাদের মুখ থেকেই আপনি জানতে পারবেন।'

ব্যর্থ মনোরথে প্রতিনিধিদলের ব্যর্থতা, খলীফার দুর্ভাগ্য

প্রতিনিধিদলটি যখন কনস্টান্টিনিপোলে অবস্থান করছিলো, ওই সময় সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে।[৫৭] যাত্রার সূচনালগ্নে যেই প্রতিনিধিদলটি শুধু আমলার সংখ্যাই ছিলো চারশ, ১৭৮৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে তাদের মধ্য হতে স্রেফ ৭০ জন বেঁচে থাকতে সমর্থ হন। খোদ প্রতিনিধিদলটির নেতা গোলাম আলী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তৎকালীন পৃথিবীর প্রবল দু' পরাশক্তি বৃটেন ও ফ্রান্সের মাঝে সাময়িক সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যে, কেউ কারো বিরুদ্ধে এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে না, যা উভয়পক্ষের মধ্য হতে কোনো পক্ষকে উত্তেজিত করে তুলবে। এ কারণেই প্রতিনিধিদলের উপর্যপুরী অনুরোধ-আব্দার সত্ত্বেও তাদেরকে সেখান থেকে ফ্রান্স যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি।

যার ফলে এই বিশাল প্রতিনিধিদলটি যেই বৃহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই ব্যয়বহুল, বিপদসংকুল, কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, অর্থ ও জীবনের প্রচুর ক্ষতি সহ্য করে কনস্টান্টিনিপোল অবতরণ করে, তা কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দ্বীনি, সামরিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যগুলো সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। ৯০০ সদস্যের এই বিশাল

---

৫৭. মুহিব্বুল হাসান রচিত 'তারীখে টিপু সুলতান'

www.boimate.com

প্রতিনিধিদলটি শেষ পর্যন্ত মুষ্ঠিমেয় সংখ্যায় নেমে আসে। নির্দেশনা অনুসারে ইস্কান্দারিয়া, কায়রো ও জিদ্দা হয়ে ১৭৮৯ সালে মক্কা-মুকাররমার যিয়ারত সম্পন্ন করে কালিকাট ফিরে আসে।

প্রতিনিধিদলের এই ব্যর্থতার কারণে টিপু সুলতান নিরাশ হননি। তিনি এর কিছু দিন পর উসমানি খলীফার উদ্দেশে দ্বিতীয় আরেকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ১৭৯৮ সালে এই প্রতিনিধিদল টিপু সুলতানের নামে সুলতান সলীমের উত্তর নিয়ে ফিরে আসে। ওই চিঠিতে সুলতান সলীম টিপুকে এ পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন ফরাসিদের ওপর ভরসা না করেন। বরং ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি সম্পন্ন করেন। এ কথা স্পষ্ট যে, টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে তার এই পরামর্শ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না।

মুসলমানদের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলার মিশন নিয়ে টিপু সুলতান উসমানি খলীফার পর ইরানের শাসক করীম খান যেষাদ ও আফগানিস্তানের শাসক যামান শাহ দুররানীর কাছেও প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। যার উত্তরে ইরান বাণিজ্যিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক নৌবন্দর টিপুর হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়। অন্যদিকে যামিন শাহ-ও টিপুকে সামরিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ভারত-সীমান্তে চলে আসে। কিন্তু ওই সময় ইরান আকস্মিক আফগানিস্তানের ওপর আক্রমণ করলে তিনি মাঝপথ থেকেই আফগানিস্তান প্রত্যাবর্তন করেন।

কোর্গ (Coorg) নগরীতে পুনরায় বিদ্রোহ

১৭৮৯ সালে সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে কোর্গ নগরীর অধিবাসীরা দ্বিতীয়বারের মতো বিদ্রোহ করে। অবাধ্য বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্যে টিপু প্রথম দিকে গোলাম আলী খানের নেতৃত্বে বিশাল সৈন্যদল প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। তখন শায়খ বুরহানুদ্দীনকে প্রেরণ করেন। তিনিও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেননি। ওই সময় যেহেতু মালাবারেও নায়ার জনগোষ্ঠীর লোকজন বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন, টিপু সুলতান সেই বিদ্রোহ দমাতেই ব্যস্ত ছিলেন; এজন্যে আন্তরিক ইচ্ছে সত্ত্বেও তিনি কোর্গ যেতে পারেননি। বরং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ মালাবার নগরীতে উত্থিত বিদ্রোহ দমনের প্রতিই অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করেন।

www.boimate.com

মালাবারে করদ রাজাদের অবাধ্যতা

মালাবারের ওই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলো কালিকাট নগরীর নায়র সম্প্রদায়ের লোকজন। টিপু আরশাদ বেগ খানকে নগরীটির গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তার পক্ষে একা বিদ্রোহ সামাল দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কালিকাটের নায়ার সম্প্রদায়ের লোকজনকে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উস্কানি ছিলো কোচি (Cochin) ও ট্রাভাংকুর (Travancore)-এর রাজারা। এই বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্যে টিপু সুলতান তিন হাজার চৌকস সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন। ওদিকে সুলতানের আগমনের সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীরা পাহাড়-জঙ্গলে আত্মগোপন করে। শায়খ মাহতাব খান বখশ-কে সেখানকার হাকিম নিযুক্ত করে যখন সুলতান সেখান থেকে রওয়ানা হন তখন ওই নায়াররা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। নিরূপায় হয়ে সুলতান কালিকাট ফিরে আসেন এবং একটি সহজ যুদ্ধ শেষে তাদের কুপোকাত করতে সমর্থ হন।

কোচি (Cochin) ও ট্রাভাংকুর (Travancore)-এর রাজাদের শায়েস্তা

নায়ারদের এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের পেছনে অনুঘোটক ছিলো কোচি (Cochin) রাজ্যের রাজা। এজন্যে কালিকাটের বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণের পর তাকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে টিপু সুলতান কোচি (Cochin) নগরী অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সংবাদ শুনে ট্রাভাংকুরের রাজা রমাভার্মা-ও টিপুর বিরুদ্ধে সসৈন্য রওয়ানা হয়ে কোচি (Cochin) নগরীতে উপস্থিত হয়। ট্রাভাংকুরের রাজা কোচি (Cochin)-এর রাজার এলাকায় শক্ত প্রতিরোধব্যূহ প্রতিষ্ঠা করে। কোচি ছিলো মহিসুরের করদ রাজ্য। টিপু তখন কোচি রাজ্যের সম্রাটকে একাধিকবার অনুরোধ করেন যে, আপনার রাজ্য থেকে ট্রাভাংকুর (Travancore) সম্রাটকে উচ্ছেদ করুন। কিন্তু প্রতিবারই সে কোনো না কোনো অজুহাত পেশ করে টিপুর অনুরোধ মেনে নিতে অস্বীকার করে। এছাড়াও সে হলিন্ডিউ-দের কাছ থেকে আই কোটা ও কঙ্গানুর কেল্লা কিনে নেয়; অথচ টিপু সুলতান নিজেই সেই কেল্লা ক্রয় করতে আগ্রহী ছিলেন। এভাবে সে টিপুর বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মন বিষিয়ে তুলেছিলো।

www.boimate.com

কোচি (Cochin) নগরীতে দু' পক্ষের সৈন্যদলের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায়। পরামর্শকদের অভিমত অগ্রাহ্য করে টিপু সুলতান নদী পেরিয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর এমন প্রবল আক্রমণ করে বসে যে, তাদের হাজার হাজার সৈন্য মারা পড়ে।

তখন ছিল বর্ষাকাল। নদীর বুকে থৈ থৈ পানি ছিলো। শত্রুবাহিনীর রাতের অন্ধকারে নদীর মুখ বন্ধ করে পানির প্রবাহ থামিয়ে দেয়। গতদিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তারা প্রত্যুষে নদীর মুখ খুলে দেয়। ফলশ্রুতিতে চারদিক থেকে পানি এসে মহিসুরের সৈন্যদেরকে ঘিরে ফেলে। সামরিক রসদের সবগুলো পথ বন্ধ হয়ে যায়। শত্রুবাহিনী বেশ সহজেই মহিসুরের সৈন্যদেরকে অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। মহিসুরের সৈন্যদেরকে বাগে পেয়ে শত্রুরা নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। ঘটনাস্থলেই ৪ হাজার সৈন্য নিহত হয়। ওদিকে ৯ লক্ষ রুপি ব্যয় করে তৈরি করা মহামূল্যবান রাজকীয় পালকি শত্রুপক্ষের হাতে চলে যায়।[৫৮]

টিপু সুলতান কোনোমতে শত্রুদের হাত থেকে জীবন রক্ষা করে নদী পেরিয়ে এপার চলে আসতে সক্ষম হন। আশপাশের বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে পুনরায় একত্র করে শত্রুবাহিনীর ওপর এমন প্রবল আক্রমণ শুরু করে দেন যে, তাদের নিশ্চিত জয় মুহূর্তেই পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। কোচি রাজ্যের রাজা কোনোমতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। টিপু সুলতান শত্রুবাহিনীর কেল্লা দখল করে প্রচুর মালে গনীমত লাভ করেন।

ওই যুদ্ধে টিপু সুলতান সাহসিকতা ও বীরত্বের এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, শত্রুপক্ষও তার সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। টিপুর একক নৈপুণ্যেই যুদ্ধের ফলাফল বদলে যায়। নিশ্চিত হারের মুখ থেকে তিনি ছিনিয়ে আনেন মহিসুরের বিজয়ের গৌরব।

---

[৫৮]. আমজাদ আলী আশহারী রচিত 'সওয়ানেহে টিপু সুলতান'

www.boimate.com

দ্বাদশ অধ্যায়

তৃতীয় যুদ্ধ থেকে শ্রীরঙ্গপত্তনম চুক্তি পর্যন্ত

www.boimate.com

ইংরেজদের গোপন রণপ্রস্তুতি

টিপু সুলতান যখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান এবং বিভিন্ন স্থানে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা নানা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, তখন ইংরেজরা ১৭৮৪ সালে মহিসুরের বিরুদ্ধে সংঘটিত দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে অস্থির ছিল। এজন্যেই তারা নিযাম ও মারাঠাদেরকে টিপুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, টিপুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই তার শক্তিমত্তা দুর্বল করে ফেলা। এজন্যেই ইংরেজরা মারাঠা ও নিযামের সঙ্গে টিপু সুলতানকে ব্যস্ত রেখে নিজেরা সংগোপনে টিপুর বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপক রণপ্রস্তুতি নিতে থাকে।

তাদের রণপ্রস্তুতির ব্যাপকতা বোঝাতে শুধু এতোটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটনিগার টিপুর কাছে তার সেনাবাহিনীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে ১৭৮৬ সালে তদানিন্তন ভারতবর্ষে তাদের গভর্নর জেনারেল ওয়ার্ন হিস্টিংগনকে সরিয়ে লর্ড কার্নুওয়াস-কে নিয়োগ দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, ইংল্যান্ডের অধীনতা থেকে মার্কিন নব উপনিবেশ বেরিয়ে যাওয়ার কারণে যেই আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, ভারতবর্ষ দখলের মাধ্যমে সেই ক্ষতি যেন পুষিয়ে আনা যায়। ওই সময় মাদ্রাজে নিযুক্ত গভর্নর মিস্টার হল্যান্ডো-কেও বরখাস্ত করা হয়। তার স্থলে নতুন অভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ জেনারেল ম্যাথুজকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই দুই যুদ্ধবাজ ইংরেজ টিপুর বিরুদ্ধে নানা আশঙ্কার ধুয়া তুলে মারাঠা ও নিযামকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরির তোড়জোড় শুরু করে দেয়। তাদের পরিকল্পনা ছিলো, ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত নিযাম ও হায়দারাবাদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কারণে ইতোমধ্যে টিপু সুলতানকে অর্থ ও জনবলের সীমাহীন ক্ষয়-ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কাজেই সেই ক্ষতিপূরণের সুযোগ না দিয়েই তাকে যদি পুনরায়

www.boimate.com

যুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তা ইংরেজদের জন্যে বিরাট উপকারের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অজুহাত সন্ধান

টিপু সুলতান জানতেন যে, ট্রাভাংকুরের রাজার উস্কানি ও আস্কারা পেয়েই মালাবারে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। এজন্যে তিনি নিজেই সেখানে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কোচি রাজ্যের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেন। তখন তারা টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাছে সামরিক সহায়তা কামনা করে। ইংরেজরা যেহেতু পূর্ব থেকেই টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাত খুঁজছিলো, এজন্যে তাদের কাছ থেকে সহায়তার আবেদন পেয়ে তারা তৎক্ষণাৎ টিপুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস জানিয়ে দেয়।

ইংরেজদের এই মনোভাব জানতে পেরে টিপু সুলতান মঙ্গলোর চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি মাদ্রাজের গভর্নরকে চিঠি লেখে জানান যে, যদি উভয় পক্ষের মাঝে কোনো ধরনের ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তা নিরসনের জন্যে যুদ্ধই একমাত্র পথ নয়; বরং আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করাই দু'পক্ষের জন্যে সর্বোত্তম হবে। উত্তরে জেনারেল ম্যাথুজ পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, ট্রাভাংকুরের রাজা যেহেতু ইংরেজদের মিত্র; কাজেই সেখানে কোনো ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক সংকট সৃষ্টি হলে তা এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ তারা কূটনীতির ভাষায়, যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে দেয়।

প্রথম সংঘাত

মাদ্রাজের গভর্নরের কাছ থেকে পত্রটি পাওয়ার পর টিপু সুলতান ইংরেজদের নাপাক দূরভিসন্ধি বুঝে পেলেন। তিনি ইংরেজদের অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তার স্বশস্ত্র বাহিনীকে পাইনঘাট অভিমুখে কোচ করার নির্দেশ প্রদান করেন। কোয়েম্বটুর ও সতি মঙ্গল-এ দু' বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী হয়। ওদিকে বঙ্গদেশ থেকে ইংরেজ সৈন্যদের সহায়তা করার জন্যে একদল সৈন্য অগ্রসর হয়। তারা পথিমধ্যে ওয়াম্বাড়ি ও ত্রিপাপুর এলাকাদ্বয় দখল করে ফেলে। সেখানে

www.boimate.com

তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে টিপু সুলতান শায়খ বুরহানুদ্দীনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। শায়খ বুরহানুদ্দীন সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্‌ফারের সঙ্গে যূথবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ইংরেজদের প্রতিরোধ করেন। তাদের হাজার হাজার সিপাহী তার হাতে বন্দী হয়। পরবর্তীকালে মাদ্রাজ থেকে খোদ জেনারেল ম্যাথুজ এসে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বভার তুলে নেয়। তার বিচক্ষণিক পরিচালনায় ইংরেজদের আক্রমণের গতি তীব্র আকার ধারণ করে। যার ফলে মহিসুর বাহিনীকে খানিকটা পেছন দিকে সরে আসতে হয়। সংবাদ পেয়ে টিপু সুলতান দ্রুত সেখানে পৌঁছে যান এবং মহিসুরের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বভার তুলে নেন। টিপুর বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ আক্রমণের কাছে ইংরেজ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। প্রচুর অস্ত্র, শস্ত্র, গোলা, বারুদ রেখে তারা ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli)-এর দিকে পালিয়ে যায়।

শায়খ বুরহানুদ্দীনের শাহাদাতলাভ

মহিসুরের সৈন্যরা পেছন থেকে ইংরেজ সৈন্যদেরকে ধাওয়া করতে থাকে। ওই সময় আকস্মিকভাবে শত্রুপক্ষের কিছু সৈন্য আচমকা আক্রমণ করে বসে। দিকভ্রান্ত একটি গুলি হঠাৎ টিপুর সুযোগ্য, পরীক্ষিত, চৌকস সেনাপতি শায়খ বুরহানুদ্দীনের শরীরে বিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। সৈন্যরা যখন পালকিতে চড়িয়ে তার লাশ টিপু সুলতানের সামনে নিয়ে আসেন তখন অজান্তেই তার দু'চোখ বেয়ে টপটপ অশ্রু ঝরতে শুরু করে। ওই সময় তিনি এতোটাই শোক-বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও উপর্যপুরী অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সৈন্যদেরকে ইংরেজদের পশ্চাদ্ধাবন করতে নিষেধ করেন। অথচ ওই সময় মহিসুরের সৈন্যবাহিনী বিজয়ের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলো। পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রেখে আরও ইংরেজ সৈন্য পাকড়াও করা যেতো।

জেনারেল ম্যাথিউজের পলায়ন

মহিসুরের বাহিনী ইংরেজদের পশ্চাদ্ধাবন স্থগিত রাখার কারণে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর প্রধান জেনারেল ম্যাথিউজ মাদ্রাজ পালিয়ে যেতে সমর্থ

www.boimate.com

হয়। শায়খ কমরুদ্দীনের নেতৃত্বে মহিসুরের সৈন্যদল সতীমঙ্গল ও তার আশপাশের এলাকাগুলো পুনর্দখল করে। হাজার হাজার ইংরেজ সিপাহি ও মহিলা যুদ্ধবন্দী হওয়ায় তাদেরকে শ্রীরঙ্গপত্তনম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেসকল লোক ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে দায়মুক্তি দিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে নেওয়া হয়। এভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের তৃতীয় যুদ্ধের প্রথম সংক্ষিপ্ত পর্ব টিপুর বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। এই পর্বের যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল ছিল মে ১৭৯০ সাল থেকে ডিসেম্বর ১৭৯০ সাল পর্যন্ত। খোদ ইংরেজ জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালস (Lord Cornwallis)-ও এ কথা স্বীকার করেছে যে, ওই বিরতিতে আমরা আমাদের সময় নষ্ট করি। আর শত্রুপক্ষ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

রণপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে সম্মিলিত বাহিনী গঠনের তোড়জোড়

ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধের প্রথম পর্বে এভাবে পরাজিত হওয়াটা ইংরেজরা মেনে নিতে পারেনি। এই পরাজয় তাদেরকে তাতিয়ে তোলে। গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালস (Lord Cornwallis)-এর সামনে এখন একটাই পথ, পরাজয়ের যেই কালিমা কপালে লেপ্টে গেছে, তা মুছতে হলে অবশ্যই নতুন যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। অথচ ১৭৮৪ সালের মঙ্গলোর সন্ধিচুক্তির আলোকে ইংরেজদের ওপর আবশ্যক ছিল, তারা এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে না, যা সন্ধির অপর পক্ষ টিপুকে উত্তেজিত করতে পারে। কিন্তু ইংরেজদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যই হলো, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এ কারণেই ট্রাভাংকুর (Travancore)-এর রাজা —যিনি ইংরেজদের মিত্র ছিলেন— তার ওপর টিপুর আক্রমণকে অজুহাত বানিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত যোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। এবং এ নিয়ে সম্ভাব্য মিত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে।

ইংরেজরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতো যে, তাদের একার পক্ষে এই যুদ্ধ সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সেমতে কলকাতা থেকে লর্ড কর্নওয়ালস (Lord Cornwallis) মাদ্রাজের গভর্নর ম্যাথুজকে পত্র লিখে জানায় যে, ইংরেজদের মান-মর্যাদা ধুলিস্যাৎ হতে চলেছে। এই সম্মান পুনরুদ্ধার করতে হলে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ

www.boimate.com

নেই। বর্তমানে আমাদের সামনে টিপুর শক্তি খতম করে দেওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর চেয়ে বড় সুযোগ আর হতে পারে না। নয়তো এ আশঙ্কা রয়েছে যে, সে ফরাসিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদেরকে ভারতবর্ষ থেকে বের করে দিতে পারে।

অন্যদিকে হায়দারাবাদের নিযামকে তার প্রধান উযির মুশীরুল মুলক টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে অনেক দিন ধরেই উদ্বুদ্ধ করছিল। কাজেই সম্মিলিত বাহিনীর মাঝে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে ইংরেজদের খুব বেশি বেগ পোহাতে হয়নি।

মারাঠারা যেহেতু টিপুর রণশক্তি ও সামরিক কৌশলের বারবার মুখোমুখি হয়েছে; এজন্যে এবার তারা টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তাবে সায় দিতে ইতস্তত বোধ করছিল। কিন্তু ইংরেজরা এই যুদ্ধে মারাঠাদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক মনে করতো। তারা টিপুর বিরুদ্ধে তাদেরকে উত্তেজিত করার জন্যে ধর্মীয় আবেগ উস্কে দেওয়ার পথ অবলম্বন করে। কারনোয়াস পেশওয়াকে পত্র লিখে জানায় যে, টিপু ও তার পিতা হায়দার আলী এতোদিন আপনাদের ওপর যেই অবিচার করে এসেছে, এখন তার শোধ নেওয়ার সুযোগ আপনাদের হাতে ধরা দিচ্ছে।

ইংরেজরা নাগপুরে রাজা রাঘুজি ভোঁসলের কাছেও একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। তাকে অবহিত করে যে, 'এখন আপনার সামনে টিপুর কাছ থেকে তার পূর্বের ক্ষতিপূরণ ও অধিকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। টিপু হচ্ছে গোটা মানব জাতির দুশমন। সে সকল ধর্ম ও সকল বিশ্বাস ধ্বংস করতে তেতে আছে। কাজেই তার বিরুদ্ধে আপনি হাতিয়ার ধরলে আমরা আপনাকে সহায়তা করতে পূর্ণ প্রস্তুত।' ইংরেজরা মাধুজি সিন্ধিয়া ও নিকুজি হোল্কারের কাছেও এ ধরনের পত্র প্রেরণ করে।

নিযামের সঙ্গে সমঝোতা গড়ে তুলতে টিপুর প্রচেষ্টা

ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহিসুরবিরোধী সম্মিলিত বাহিনী গঠনের তোড়জোড়ের সংবাদ যখন টিপু সুলতান অবহিত হন তখন তিনি হায়দারাবাদের নিযামের সঙ্গে সন্ধি গড়ার উদ্দেশ্যে আরেকবার চেষ্টা

www.boimate.com

করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি নিযামকে চিঠি লেখেন যে, নিযামের পক্ষ থেকে ইতোপূর্বে যেই বাড়াবাড়িগুলো হয়েছে, সেগুলো তিনি ভুলে যেতে পূর্ণ প্রস্তুত। একজন মুসলিম শাসক হিসেবে ধর্মশত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যুদ্ধের সময় আপনার যেই এলাকাগুলো আমি দখল করেছিলাম, তা বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে হাতছাড়া করতে আমি প্রস্তুত। আমার এ প্রস্তাবের স্বচ্ছতা ও আমার নিয়তের সততা প্রমাণ করার জন্যে আমি আমার ছেলের জন্যে আপনার মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে আসতে চাচ্ছি।'

যেহেতু নিযামের উযির 'মীর আলম' তলে-তলে জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালস (Lord Cornwallis)-এর সঙ্গে গোপন সমঝোতা গড়ে তুলেছিল, এজন্যে সে মহিসুর-নিযামের সম্পর্ক সুন্দর করার প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে দেয়নি। মীর আলম নিযামকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, টিপুর পরিবর্তে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুললেই বেশি লাভ হবে। মোটকথা, একজন সাচ্চা মুসলমান হিসেবে টিপু সুলতান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্যমতা চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি মারাঠাদের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, ধূর্ত ইংরেজ ছলে বলে কৌশলে তাদেরকে টিপু থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়। এবং মহিসুরবিরোধী বৃহৎ যুদ্ধে তাদেরকে সম্মিলিত বাহিনীর অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

তিন বাহিনীর জোট

দীর্ঘ প্রস্তাব, আলোচনা ও শ্রম ব্যয়ের পর ইংরেজরা মারাঠা ও নিযামকে টিপুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে নিজেদের সঙ্গে জোটবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। ইংরেজরা তাদেরকে এতদসংক্রান্ত একটি লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। চুক্তির কয়েকটি ধারা নিম্নরূপ–

১. যুদ্ধে বিজয় লাভের পর মারাঠা পেশোয়া-এর যেই এলাকাগুলো টিপু দখল করে রেখেছে, তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

২. কাডাপ্পা (Cuddapa)-এর ওপর হায়দারাবাদের নিযামের নিয়ন্ত্রণ পুনর্বহাল করা হবে।

www.boimate.com

৩. যে সকল রাজা, নবাব, করদ রাজা এই যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীকে সঙ্গ দেবে তাদেরকে তাদের পূর্বের পদে বহাল রাখা হবে।

৪. নতুন অধিকৃত এলাকাগুলো তিন পক্ষের মাঝে সমান হারে বণ্টিত হবে।

৫. যদি যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধিচুক্তি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তিনপক্ষ সানন্দে তার ওপর স্বাক্ষর করবে।

৬. যদি যুদ্ধের পর সম্মিলিত বাহিনীর কারো ওপর টিপু আক্রমণ করে তাহলে নিপীড়িত পক্ষের ইচ্ছাস্বাপেক্ষে অন্যরা তাকে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবে।

৭. টিপুর যিম্মায় পেশওয়া-এর যেই শুল্ক বকেয়া রয়েছে, তা উসূল করে তার হাতে অর্পণ করা হবে।

৮. সকল পক্ষের দায়িত্ব হবে, সাধ্যের সবটুকু সামর্থ্য ব্যয় করে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। তবে প্রতিটি পক্ষ ন্যূনতম ২৫ হাজার সৈনিক সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

হায়দারাবাদের নিযাম এই সম্মিলিত চুক্তি সত্ত্বেও আশঙ্কা করতেন যে, যুদ্ধ শেষ হলে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে মারাঠারা তার ওপর আক্রমণ করতে পারে; এজন্যে তিনি আলাদাভাবে গভর্নর জেনারেল কারনোয়াসের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার উসূল করে নেন যে, তার ওপর মারাঠারা কোনো সময় আক্রমণ করে বসলে ইংরেজ সরকার তাকে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবে।

বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে ধূর্ত ইংরেজ

পূর্বের যুদ্ধগুলো থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ইংরেজরা এ কথা ভালোভাবে জানতো যে, স্রেফ শক্তি দিয়ে তাদের পক্ষে টিপুকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। কারণ, তার বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। কারণ, তারা ইংরেজদেরকে তাদের দেশ ও জাতি– উভয়েরই শত্রু মনে করে। যদি কোনো ভাবে তাদের সেই বিশ্বস্ততা কিনে নেওয়া যায় তাহলে হতে পারে, রণাঙ্গনের ছক বদলে যাবে এবং বিজয় ইংরেজদের পদচুম্বন করবে।

www.boimate.com

টিপুর সৈন্যবাহিনীদের মধ্য হতে গাদ্দারদের সন্ধান করে বের করার দায়িত্ব তারা কর্নেল রেড-এর হাতে অর্পণ করে। এ মিশন বাস্তবায়নের জন্যে তারা তাকে সালতানাতে মহিসুরের পশ্চিম সীমান্ত শহর 'আম্বুর' প্রেরণ করে। সে সর্বপ্রথম টিপুর অধীনস্থ ওই সকল করদ রাজা ও জমিদারদেরকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে উস্কানি দিতে শুরু করে, যাদেরকে গাদ্দারি ও অবিশ্বস্ততার অভিযোগে টিপু সুলতান ইতোপূর্বে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। ক্ষমতা খোয়ানো এই সকল ব্যক্তি এখন অনেকটা যাযাবরের জীবন অতিবাহিত করছে।

কর্নেল রেড তাদেরকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, যদি টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী জয় লাভ করতে সমর্থ হয় তাহলে তাদেরকে তাদের পূর্বের পদে পুনর্বহাল করা হবে। এমন লোকদের তালিকার শীর্ষে রয়েছে, ব্যাঙ্গালুরুর রাজা কিষণ রাও, পনকুন্ডার রাজা নায়েক। এছাড়া মদনপুলী, চিকবালাপুর (Chikballapur) ও পঙ্কনোজ প্রভৃতি এলাকার করদ রাজাও ইংরেজদের প্রতারণার ফাঁদে ধরা দেয়। এর বিনিময়ে তাদেরকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ দেওয়া হয়েছিলো। তখন তারা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণ করে মহিসুরের সেনাবাহিনীর মাঝে গোয়েন্দাবৃত্তি শুরু করে দেয়।

এদের যোগসাজশে মহিসুর সেনাবাহিনীর বেশ ক'জন মুসলিম অফিসার ও সিপাহিকে অর্থের টোপ ফেলে কিনে নেওয়া হয়। এদের মধ্যে রয়েছে, সাইয়্যেদ ইমাম, লাল খান বখশ, মীর নযর আলী, মীর ইসমাঈল খান ও মীর ইমামুদ্দীন প্রমুখ।

ঘটনাক্রমে সাইয়্যেদ ইমাম গোয়েন্দাবৃত্তি করার সময় ধরা পড়ে। নিবীড় তথ্যানুসন্ধানের পর আরও কয়েকজন গাদ্দারের খোঁজ পাওয়া যায়। টিপুর নির্দেশে তাদের সবাইকে পাকড়াও করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অবশ্য মীর ইমামুদ্দীন পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

এই মিশন ব্যর্থ হওয়ার কারণে ইংরেজরা থেমে যায়নি। তারা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে মহিসুরের সেনাবাহিনীর আরও কিছু সদস্যকে কিনে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে গোয়েন্দাবৃত্তির কার্যক্রম চালিয়ে নেয়।

www.boimate.com

ফরাসিদের কাছে সহযোগিতার আহ্বান

ফরাসিরা যদিও টিপুর প্রকৃত মিত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ ছিলো না; কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে ইংরেজদের প্রবল প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণে এবং হিন্দুস্তানে তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের স্বার্থে এতোদিন তারা টিপু সুলতানকে সহায়তা দিয়ে আসছিলো। এ কারণেই যখন উসমানি খলীফার দরবারে মহিসুরের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল আগমন করে ওই সময় টিপু তাদেরকে নির্দেশ করেছিলেন, তারা যেন ফ্রান্সে গিয়ে সেখানকার সম্রাট লুই দশমের কাছে এ আর্জি পেশ করেন যে, তারা যেন হিন্দুস্তানে তাদের বিরুদ্ধে মারাঠাদেরকে সামরিক সহায়তা প্রদান থেকে বিরত থাকে। কিন্তু ওই সময় খোদ ফরাসিরাই বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যার শিকার ছিল। উপরন্তু ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাদের সামরিক সন্ধি সম্পন্ন হওয়ায় এই প্রতিনিধিদল প্যারিস যাত্রা স্থগিত রাখে। যেহেতু ইতোপূর্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের দু'টি যুদ্ধে ফরাসিরা সালতানাতে খোদাদাদকে সামরিক সহায়তা প্রদান করেছিলো; এজন্যে এ যুদ্ধেও তারা সহায়তা করতে পারে, এ আশায় তিনি তাদের শরণাপন্ন হন। তাদেরকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, ইংরেজদের এই যুদ্ধ স্রেফ মহিসুরের বিরুদ্ধে নয়। হিন্দুস্তানে বিদ্যমান ফরাসিরাও ইংরেজদের চোখে শত্রু। তারা যেন নামকাওয়াস্তে হলেও স্রেফ ইংরেজদের চোখে ধুলো দেওয়া বা তাদেরকে প্রভাবিত করার স্বার্থে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

এ ব্যাপারে টিপু সুলতান ফরাসি সম্রাট লুই দশমের সঙ্গে বেশ কয়েকবার চিঠি আদান-প্রদান করেন। টিপু নিজেই পান্ডেচেরীতে অবস্থিত ফরাসি গভর্নর কানওয়ে-এর কাছেও এ অনুরোধ জানান যে, তারা যেন নিদেনপক্ষে তার পক্ষে দু' হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। এর বিনিময়ে যুদ্ধ শেষ হলে তিনি নতুন অধিকৃত ভূখণ্ডগুলো থেকে একটি অংশ ফরাসিদের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু যেহেতু ওই সময় ফরাসিদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো। খোদ পান্ডেচেরীতে তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার ইংরেজদের দেয়া অর্থে পূরণ হচ্ছিলো; এজন্যে কানওয়ে অপরাগতা জানিয়ে বলে, ইংরেজদেরকে অসন্তুষ্ট করে টিপুকে সামরিক সহায়তা করা এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যার ফলে প্রথম দু'টি যুদ্ধের বিপরীতে এবারই প্রথম ইংরেজ ও তার মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে টিপু সুলতানকে একাকী রণক্ষেত্রে অবতরণ করতে হয়।

www.boimate.com

রণক্ষেত্র অভিমুখে সম্মিলিত বাহিনী

ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালস (Lord Cornwallis) ওই সময় কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। তৃতীয় যুদ্ধের প্রথম পর্বে টিপুর এই বিজয় তাকে চরমভাবে তাতিয়ে তোলে। সে তখন সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বভার জেনারেল ম্যাথিউজের হাত থেকে সরিয়ে নিজের হাতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তার উদ্দেশ্য ছিলো, এতে রণাঙ্গনে উপস্থিত ইংরেজ ও সম্মিলিত বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। কলকাতা থেকে সাত হাজার সৈন্য নিয়ে সামুদ্রিক পথে সে মাদ্রাজে এসে পৌঁছে। সেখানে এক মাস অবস্থান করে পুরো যুদ্ধের একটি ছক তৈরি করে। অতপর ২২ হাজার সৈন্যকে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯১ সালে সে বিল্লোর উপনীত হয়। ব্যাঙ্গালুরু থেকে তিন ক্রোশ দূরত্বের কৃষ্ণা রাজপুর এলাকায় সামরিক শিবির স্থাপন করে। ওদিকে মুম্বাই থেকে ৯ হাজার সৈন্যের একটি দল তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

অন্যদিকে হায়দারাবাদ থেকে নিযাম দুই শাহযাদা— আলী জাহ ও সেকান্দার জাহ-কে সঙ্গে নিয়ে ৬০ হাজার সৈন্যের একটি বিশাল সেনাবহর নিয়ে রওয়ানা হয়ে 'আনিকাল' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। মারাঠা সর্দার হরিপন্থ-এর নেতৃত্বে ১২ হাজার সিপাহি ও পরশুরাম ভাও-এর নেতৃত্বে ২০ হাজার মারাঠি সৈন্য সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এভাবে এক লক্ষাধিক সৈন্যের একটি বিশাল সেনাবাহিনী সালতানাতে খোদাদাদ-কে চিরকালের জন্যে ধ্বংস করার মিশন নিয়ে সমবেত হয়।

তাদের এই মিশনটি ছিলো মহিসুর ধ্বংসের মাধ্যমে জেনে-না জেনে চিরকালীন শত্রু ইংরেজদের গোপন অভিলিপ্সা অনুসারে হিন্দুস্তানীদের গলায় ইংরেজ-দাসত্বের শেকল পরিয়ে দেওয়ার অভিযান। অস্ত্র বহনকারী জন্তু ও অন্যান্য কর্মচারী ও নারীদের সংখ্যা ছিলো সৈন্যদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। অর্থাৎ সব মিলিয়ে দুই লক্ষ সৈন্যের বিশাল এই দলটির প্রতিপক্ষ ছিলো টিপুর কয়েক হাজার সৈন্য।

www.boimate.com

ব্যাঙ্গালুরু অভিমুখে টিপুর অভিযাত্রা এবং হোস্কোটা ও কোলার নগরীদ্বয়ের ওপর ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার

মহিসুরের সীমান্ত অতিক্রম করে সম্মিলিত বাহিনীর রাজ্যের ভেতরে অনুপ্রবেশের সংবাদ টিপু সুলতান যথেষ্ট বিলম্বে শুনতে পান। কারণ, অর্থের বিনিময়ে ইংরেজদের হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়া সৈন্যরা সুলতানের গোয়েন্দা কার্যক্রমে পদে পদে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছিলো। যার কারণে টিপু সুলতান যথাসময়ে শত্রুবাহিনীকে সীমান্তের ওপারে রুখতে পারেননি। সেই বিলম্বের ওপর হাপিত্যেশ করে টিপু সুলতান অতিরিক্ত সময় নষ্ট করতে চাননি; এজন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সেনাবহরকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্গালুরুর পথে রওয়ানা হন এ উদ্দেশ্যে যে, যেন সেখানেই ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। শত্রুবাহিনীর দু' লক্ষ সৈন্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যখন টিপু সুলতান রওয়ানা হন, তখন তার হাতে সর্বসাকুল্যে ৪৫ হাজার সৈন্য ছিলো। ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে, জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালস (Lord Cornwallis)-এর সৈন্যরা কোলার (Kolar) ও 'হোসকোটা' দখল করে ফেলেছে। এর পেছনে কারণ হল, টিপু এই এলাকাদ্বয়ের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও সেখানকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করার প্রয়োজনীয় সময়টুকু পাননি। এবং ওই সময় এ দু'টি কেল্লার ওপর কোনো মজবুত নিরাপত্তা দলও ছিলো না। যার পরিণতিতে ইংরেজদের প্রাথমিক আক্রমণেই এ দু'টি কেল্লার দায়িত্বশীল বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। টিপু ব্যাঙ্গালুরুর কেল্লা নিজ সেনাপতি সাইয়্যেদ হামেদের হাতে অর্পণ করে শত্রুবাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

প্রথম সংঘাত ও ইংরেজদের পশ্চাদসরণ

৬ মার্চ ১৭৯১ সালে জেনারেল ফ্লয়েড-এর নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্য এক হাজার মহিসুরী সৈন্যের ওপর বিনা উস্কানিতে আক্রমণ করে। যেহেতু শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অধিক ছিলো; এজন্যে প্রথমদিকে তারা খানিকটা সরে আসতে বাদ্য হয়। কিন্তু খুব দ্রুতই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের ওপর এমন জবাবী হামলা করে বসে যে, ঘটনাস্থলেই ৪০০ ইংরেজ সিপাহি মারা পড়ে। শ'খানেক বন্দী হয়। খোদ

www.boimate.com

জেনারেল ফ্লয়েড গুলির আঘাতে আহত হয়ে ঘোড়ার ওপর থেকে ভূপাতিত হয়। বাকশক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে; কিন্তু ওই সময় তার নিরাপত্তারক্ষী তাকে উদ্ধার করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।[৫৯]

যেহেতু ইংরেজদের ওই আক্রমণ ছিলো ঘোর অন্ধকার রাতে। এজন্যে মহিসুরী ফৌজ পলায়নরত ইংরেজদের পশ্চাদ্ধাবন করেনি। টিপুর নির্দেশে বন্দী ইংরেজদের মধ্য হতে যারা আহত ছিলো, তাদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক বন্দীর জন্যে এক রুপি করে অর্থ বরাদ্দ করে পৃথক পৃথক তাবুতে আশ্রয় দেওয়া হয়। কেল্লার নিরাপত্তায় দু' হাজার সৈন্য মোতায়েন করে টিপু ব্যাঙ্গালুরু থেকে ৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত কঙ্গিরি চলে যান। প্রাথমিক এই বিজয় অর্জন সত্ত্বেও তিনি শত্রুদের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে বেখবর হননি। যার কারণে তিনি তার পূর্ণ শক্তি স্রেফ ব্যাঙ্গালুরু রক্ষার কাজে নিয়োজিত করাকে সামরিক কর্মকৌশলের পরিপন্থী মনে করেছেন।

ব্যাঙ্গালুরু নগরীর পতন

সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালস কোলার ও হোসকোটা দখল করে নেওয়ার পরও জনবল ও যুদ্ধোপকরণের এমন বিপুল ক্ষতির কারণে সীমাহীন পেরেশানি অনুভব করছিলো। যদিও তার অধীনস্থ সৈন্যদল ব্যাঙ্গালুরু থেকে খুব কাছেই, মাত্র তিন ক্রোশ দূরত্বে কৃষ্ণরাজপুরে অবস্থান করছিলো, কিন্তু ইতোমধ্যে মহিসুরের সৈন্যরা তাদের জন্যে রসদ জোগানের সম্ভাব্য সকল পথ বন্ধ করে ফেলে। শত্রুপক্ষের জন্তুগুলোর প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের পথ বন্ধ করতেই মহিসুরের সৈন্যরা আশপাশে যতোগুলো ক্ষেত ছিলো, তা পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে ফেলে। অন্যদিকে মারাঠা ও নিযামের সৈন্যরা জেনারেল কর্নওয়ালস-কে সহায়তা না করে উল্টো তাদের নিজেদের সহায়তার জন্যে তাকে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে ডাকতে শুরু করে। এখন কর্নওয়ালসের সামনে একটাই পথ। তাহলো, এক মুহূর্ত নষ্ট না করে অনতিবিলম্বে ব্যাঙ্গালুরু আক্রমণ করে তা দখল করা। কেননা এই ব্যাঙ্গালুরু শহরটি সামরিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা মহিসুর রাজ্যে

---

[৫৯]. মুহিব্বুল হাসান বিরচিত 'তারীখে টিপু সুলতান'

www.boimate.com

শ্রীরঙ্গাপত্তনমের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। ওই সময় শহরটির বিস্তৃতি ছিল এক বর্গমাইল। ইংরেজদের কাছে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ হল, মহিসুরের সেনাবাহিনীর যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির কারখানা এখানেই স্থাপিত। কাজেই এ শহরটি জয় করা গেলে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ইংরেজদের হাতে চলে আসবে। অন্যদিকে এখানকার জনগণ অন্য যেকোনো এলাকার তুলনায় সচ্ছল। শহরের চারপাশে পঁচিশ ফিট গভীর পরিখা রয়েছে। শহরে প্রবেশ করার জন্যে দু'টি মজবুত প্রশস্ত ফটক রয়েছে। একটি ফটকের নাম 'মইসুরি ফটক'। অন্যটির নাম 'দিহলী ফটক'। ঈসায়ি ষোড়শ শতাব্দীতে শহরটির গোড়াপত্তন হয়। শহরের ভেতর ডিম্বাকৃতির একটি কেল্লা ছিল। পূর্বে যার প্রাচীর ছিল মাটির তৈরি। নবাব হায়দার আলী ও টিপু সুলতান সেই প্রাচীর নতুন করে পাথর দিয়ে নির্মাণ করে ইস্পাত মজবুত করে তোলেন।

৭ মার্চ ১৭৯১ সকালবেলা জেনারেল কর্নওয়ালস শহরে টিপুর অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। জেনারেল ম্যাথুজের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী তীব্র গতিতে হামলে পড়ে। ওই সময় শহর রক্ষার কাজে স্রেফ দু' হাজার সৈন্য ছিল। তারা সবটুকু সাধ্য ব্যয় করে ইংরেজদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সংখ্যায় প্রচুর স্বল্প হওয়ার কারণে তাদের পক্ষে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বাহিনী শহর দখল করে নিতে সমর্থ হয়। শহরের স্থানীয় জনগণের বৃহদাংশ পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। যারা রয়ে গিয়েছিল ইংরেজরা তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। ইংরেজ সৈন্যরা নির্বিচারে নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। অগণিত ধন-সম্পদ তাদের হস্তগত হয়। মহিসুরের সিপাহিরা চলে যাওয়ার সময় যথাসম্ভব নগদ অর্থ ও অলঙ্কার সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু এর বাইরে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা-বারুদ শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়। শহর দখলের এই যুদ্ধে দু' পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য হতাহত হয়। ইংরেজ কর্নেল মোর্স নিহত হয়। শহর দখলের পর ইংরেজ সৈন্যরা কেল্লার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে।

টিপু সুলতান ব্যাঙ্গালুরু পতনের অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিমর্ষ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ কানগিরি থেকে ব্যাঙ্গালুরুর দিকে অগ্রসর হন। ফৌজি অফিসার কমরুদ্দীনের নেতৃত্বে ৬ হাজার সৈন্যের একটি দল শহর অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু এ দলটির পক্ষে খুব বেশি ক্ষণ শত্রুদের

www.boimate.com

মুকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। মহিসুর বাহিনীর ৫০০ সৈন্য শাহাদাত বরণ করে। টিপু তখন সামরিক কৌশল পরিবর্তন করেন। তিনি সরাসরি শত্রুপক্ষের মুকাবিলা না করে কেল্লার আশপাশে অবস্থিত টিলাগুলো দখল করে সেখান থেকে ইংরেজ সৈন্যদের ওপর গোলা বর্ষণ শুরু করেন। এতোক্ষণ পর্যন্ত যেই ইংরেজ সৈন্যরা শহর অবরোধ করে ছিলো, তারা টিপুর এই গোলা বর্ষণের আওতায় চলে আসে। অন্যদিকে রসদ জোগানের সবগুলো বন্ধ হওয়ার কারণে তাদের ঘোড়া সহ অন্য বাহনজন্তুর তীব্র খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। যার ফলে একাধারে দু' সপ্তাহ অবরোধ করেও ইংরেজ বাহিনী কেল্লা দখল করতে ব্যর্থ হয়।

কৃষ্ণা রাওয়ের বিশ্বাসঘাতকতা

ব্যাঙ্গালুরু কেল্লার নিরাপত্তায় টিপু কৃষ্ণারাওয়ের অধীনে একদল সৈন্য নিয়োজিত করেছিলেন। ইংরেজরা তাকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কিনে নেয়। ইংরেজরা তাকে নির্দেশ দিয়েছিলো, সে যেন কেল্লার ভেতরের সব সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছে দেয়, যেন সে আলোকে তারা আক্রমণের রূপরেখা তৈরি করতে পারে। যখন ইংরেজরা ক্রমাগত গোলা বর্ষণ করে কেল্লার প্রাচীরের একাংশে ফাটল তৈরি করতে সমর্থ হয় তখন ওই দিকের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সৈন্যদের সংখ্যা কমিয়ে কৃষ্ণারাও ওদিক দিয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার গোপন সংবাদ প্রেরণ করে। পরিকল্পনা অনুসারে ইংরেজরা রাতের অন্ধকারে কেল্লার সেই অংশে আক্রমণ করে। মহিসুর বাহিনীর প্রতিরোধ যুদ্ধ সত্ত্বেও ইংরেজরা তা দখল করতে সমর্থ হয়। মহিসুর বাহিনীর এক হাজার সৈন্য নিহত হয়। তিন শতাধিক সৈন্য আহত হয়।

টিপু সুলতান সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাদের সহায়তার জন্যে দু' হাজার সৈন্যের একটি চৌকস দল প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের পৌঁছানোর পূর্বেই ইংরেজরা কেল্লাটি দখল করে ফেলে। তীব্র রক্তক্ষয়ী সেই যুদ্ধে টিপু সুলতানের আস্থাভাজন যোদ্ধা সাইয়্যেদ হামেদ ও বাহাদুর খান কলন্ধরী শাহাদাত বরণ করেন। শায়খ আনসারকে ইংরেজরা গ্রেফতার করে। শত্রুবাহিনীর স্রেফ ১৩১ জন সিপাহি নিহত হয়। মীর মুঈনুদ্দীন ও মীর কমরুদ্দীন ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে পুনরায় ব্যাঙ্গালুরু আক্রমণ করার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু টিপু সুলতান

www.boimate.com

সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে তাদের সেই প্রস্তাব নাকচ করেন।

কৃষ্ণারাওয়ের গাদ্দারির কথা সুলতান পরবর্তীকালে অবহিত হন। তিনি তাকে শ্রীরঙ্গাপত্তনমের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সামাল দিতে প্রেরণ করেছিলেন। ওই সময় টিপু সুলতান তার মায়ের লেখা একটি চিঠি পেয়ে যান। যেই চিঠিতে টিপুর জননী ব্যাঙ্গালুরু পতনের পর কৃষ্ণারাওয়ের গাদ্দারির ও কৃতঘ্নতা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলো। তিনি লিখেছিলেন, ইংরেজরা তাকে শ্রীরঙ্গাপত্তনমের রাজসিংহাসনে পুনরায় মহিসুরের প্রাচীর হিন্দু রাজার পরিবারকে অধিষ্ঠিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

গাদ্দারির পরিণতি

কৃষ্ণারাওয়ের গাদ্দারির রহস্য টিপু সুলতানের জননীর কাছে তখন ফাঁস হয় যখন ইংরেজ জেনারেল রেড-এর এক গোয়েন্দা কানাড়ি ভাষায় লেখা একটি চিঠি 'আব্বাস' নামের এক ব্যক্তির কাছে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে মহিসুরের বাহিনী তাকে পাকড়াও করে ফেলে। ওই গোয়েন্দা চিঠিটি বাঁশ গাছের একটি লাঠিতে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। ওই চিঠির ভেতর ষড়যন্ত্রের পুরো বিবরণ লেখা ছিলো। ওই সময় যেহেতু টিপু সুলতান অনেক দূরে অবস্থান করছিলেন; এজন্যে সৈন্যরা ওই পত্রটি টিপুর জননীর কাছে পৌঁছে দেন। যেন তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে টিপুর কাছে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পৌঁছিয়ে তাকে সতর্ক করতে পারেন।

টিপু সুলতানের নির্দেশে মীর মুঈনুদ্দীন কৃষ্ণরাও ও এ চক্রান্তে শামিল তার অন্য তিন ভাইকে পাকড়াও করে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেন। চরম শিক্ষা হিসেবে তাদের লাশগুলো বাজারের মোড়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কৃষ্ণরাও মৃত্যুর আগে নিজ গাদ্দারির কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে বলেছিলো, 'আমার ছড়িয়ে দেওয়া এই বিপর্যয়ের আগুন টিপু কখনই নেভাতে পারবে না'। পরবর্তীকালের ইতিহাস তার সেই কথার জীবন্ত সাক্ষী।

কিছু বর্ণনায় এসেছে, টিপুর জননীকে কৃষ্ণরাওয়ের গাদ্দারির সংবাদ খোদ তার স্ত্রী-ই দিয়েছিলো। সুলতানের জননীর কাছে উপস্থিত হয়ে সে অবহিত করে যে, স্বামীকে বারংবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে কিছুতেই এই ষড়যন্ত্র থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না। যার কারণে কৃষ্ণরাওয়ের পরিবারের সবাই এখন তার প্রাণের শত্রু হয়ে গেছে। তার আবেদনের

www.boimate.com

প্রেক্ষিতে টিপু তাকে রাজপ্রাসাদের সেবিকার দায়িত্বে নিয়োগ দিয়ে তার জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

টিপুর চিকবালাপুর (Chikballapur) পুনর্দখল

ব্যাঙ্গালুরু জয়ের পর ইংরেজরা 'দিভানাহল্লি' (Devanahalli)-এর করদ রাজাকে লোভ দেখিয়ে বিনা যুদ্ধে দখল করে। এরপর তারা চিক বালাপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে সেটাও দখল করে নেয়। ইংরেজরা এই এলাকা বার্ষিক এক লক্ষ রুপি শুল্কের বিনিময়ে সেখানকার পুরাতন করদ রাজার পরিবারের সদস্য রাম স্বামী গৌডা-এর হাতে অর্পণ করে। টিপু যখন এ সংবাদ পান যে, চিক বালাপুরের রাজা বিদ্রোহ করেছেন তখন তার বিহিত করার উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যদল নিয়ে নিজেই রওয়ানা হন। প্রথম আক্রমণেই তা দখল করে নিতে সমর্থ হন। বিদ্রোহীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন। গুরুতর অপরাধকারী বিদ্রোহীদের ফাঁসি কার্যকর করেন।

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন

চিকবালাপুর (Chikballapur) পুনর্দখলের পর টিপু মহিসুর বাহিনীর নেতৃত্বভার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী মীর কমরুদ্দীনের হাতে অর্পণ করে রাজধানী শ্রীরঙ্গাপত্তনাম নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে ফিরে যান। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, শ্রীরঙ্গাপত্তনামে তার অনুপস্থিতির সুযোগ সদ্ব্যবহার করে শত্রুরা ব্যাঙ্গালুরুর মতো এই নগরীও অবরোধ করতে পারে। এই আশঙ্কার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল, ব্যাঙ্গালুরুর পতনের পর এখন গোটা মহিসুর রাজ্যে শ্রীরঙ্গাপত্তনামই সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মীর কমরুদ্দীনের কৃতিত্ব

মীর কমরুদ্দীন অনেক দিন যাবত পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে মহিসুর বাহিনীর সেবা করছেন। টিপু সুলতান তার নেতৃত্বে দশ হাজার সিপাহির একটি চৌকস দল নির্বাচিত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ করেছিলেন। নির্দেশনা মুতাবেক তিনি ব্যাঙ্গালুরুর দিকে অগ্রসর হন। সতর্কতাস্বরূপ মাঝপথেই প্রচুর পরিমাণে রসদ সংগ্রহ করে নেন। সর্বপ্রথম তাদের সামনে ইংরেজদের যেই দলটি পড়ে, সে দলে

www.boimate.com

হায়দারাবাদের সিপাহিরাও ছিল। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত দু' দলের মাঝে গুলি বিনিময় চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যরা পেছন দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়। মীর কমরুদ্দীন সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করে পাঁচ শতাধিক মহিষ দখল করতে সমর্থ হন। মহিষপালটি ইংরেজদের জন্যে খাবার বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো। দু' শ ইংরেজ ও হায়দারাবাদি সৈন্য ধরা পড়ে। এই যুদ্ধের ফলে দু'টি উপকার সাধিত হয়। একটি হল, সম্মিলিত বাহিনী ময়দান ছেড়ে পেছন দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে তাদের শিবিরে প্রচণ্ড খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। বেশ কিছু দিন তাদেরকে খাদ্যের সংকট পোহাতে হয়। এভাবে টিপুর আস্থার প্রতিদান দিয়ে তিনি শত্রু-শিবিরে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

মারাঠা ও নিযামের যৌথবাহিনীর আক্রমণ

এখন পর্যন্ত মহিসুরের বাহিনীর সঙ্গে শুধু ইংরেজ সৈন্যদেরকেই সংঘাত করতে হয়েছে। মারাঠা ও নিযামের বাহিনী অদ্যাবধি এই যুদ্ধে কার্যত অংশগ্রহণ করেনি। ইংরেজরা ব্যাঙ্গালুরু জয়ের পর তাদের আশার বেলুন ফুলে ওঠতে শুরু করে। নিযাম তার সেনাবাহিনী সহকারে রওয়ানা হয়ে হায়দারাবাদের উপকণ্ঠে 'পিঙ্গল' নামক স্থানে উপনীত হন। তিনি এ স্থানটিকে সামরিক প্রাণকেন্দ্র ঘোষণা করে মহাবত যঙ্গের নেতৃত্বে হায়দারাবাদী সৈন্যদেরকে কৃষ্ণা নদী (Krishna River) পেরিয়ে রাইচপুর প্রেরণ করেন।

হায়দারাবাদি বাহিনী এই সীমান্ত দিয়ে মহিসুর প্রবেশ করে। পথিমধ্যে কোপাল, সিদহুট, গুঞ্জিকোটা, কাডাপ্পা (Kadapa), গুট্টি (Gutti) ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল দখল সম্পন্ন করে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। ওদিকে মারাঠি বাহিনী তাদের সর্দার হরি পণ্ডিতের নেতৃত্বে হিরাপ্পনপল্লী ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো দখল করে সিরা নগরীতে প্রবেশ করে।

মারাঠাদের তাণ্ডব ও নিজেদের মন্দিরের অবমাননা

সিরা (Sira) নগরীতে প্রবেশের পর মারাঠিরা বর্ণনাতীত বর্বরতা ও হিংস্রতা শুরু করে দেয়। সম্পদের লোভে তারা তাদের ধর্মীয় মন্দিরগুলোও লুণ্ঠন শুরু করে। আশপাশের অঞ্চলগুলোর হিন্দু

www.boimate.com

ধর্মাবলম্বীদের চোখে 'সুরঙ্গিরী' ছিলো পুণ্যনগরী। সেখানকার মন্দিরে খাঁটি সোনা দিয়ে নির্মিত ও তার ওপর মহামূল্যবান মাণিক্য জড়ানো পালকি ছিলো। মারাঠারা সেই পালকি সহ সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র লুটতরাজ করে। মন্দিরের ভেতরে 'সারদা' নামের একটি দেবী মূর্তি ছিল। তারা সেই মূর্তি উপড়ে বাইরে নিক্ষেপ করে। এভাবে তারা সেখান থেকে ৬০ লক্ষ রুপির সম্পদ লুণ্ঠন করে। এর বাইরে যা ছিল তা ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। মন্দিরের পূজারী ও ব্যবস্থাপক 'শঙ্কর জগৎগুরু'-ও তাদের নির্মমতার হাত থেকে রেহাই পাননি। তিনি কোনোমতে জীবন বাঁচিয়ে 'কারকুল' নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে সুলতান টিপুর কাছে এ পত্র লেখেন যে, 'আপনার রাজ্যসীমার ভেতরে বর্বর মারাঠিরা প্রবেশ করে পশুসুলভ হিংস্রতা শুরু করে দিয়েছে।'

উত্তরে টিপু সুলতান গুরুজীকে সান্ত্বনা জানিয়ে বলেন যে, 'এই শত্রুদেরকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো, যারা আমার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে আমার প্রজাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে।'

গুরুজীকে লেখা অন্য এক পত্রে টিপু সুলতান লেখেন যে, 'যারাই কোনো ধর্মের পবিত্র স্থানগুলোর অবমাননা করবে, মৃত্যুর পর তাদের প্রত্যেককে অবশ্যই নিজ অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মানুষ মন্দকাজগুলো হাসিমুখে করে বেড়ায়; অথচ তার পরিণাম ভোগ করতে হয় অশ্রুভরা মুখে। ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করার অর্থ হল, নিজের উত্তরসূরিদের জন্যে ধ্বংস ডেকে আনা।' টিপু সুলতান গুরুজীর আবেদন মঞ্জুর করে সুরঙ্গিরী মন্দিরে সারদা দেবীর মূর্তি প্রতিস্থাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। টিপুর ধর্মীয় সম্প্রীতির অধ্যায়ে আমরা বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোচনা করবো।

ধারওয়াড় নগরীতে মহিসুর বাহিনীর পশ্চাদসরণ

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা— এ দু'টি নদীর মাঝখানে 'ধারওয়াড়' নগরীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি মজবুত কেল্লা ছিলো। নবাব হায়দার আলী কেল্লাটি দখল করে সালতানাতে খোদাদাদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মারাঠিরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পুনরায় কেল্লাটি দখল করতে

www.boimate.com

অস্থির হয়ে ওঠে। ধারওয়াড় কেল্লার হিফাযতে টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে তার অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য কমান্ডার বদরুজ্জামান খান নায়েতা দশ হাজার সিপাহি সহকারে নিয়োজিত ছিলেন।

মারাঠা সর্দার পুরসি রাম ভাও-এর ধারওয়াড় নগরীর দিকে এগিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে টিপু অতিরিক্ত চার হাজার সৈন্য বদরুজ্জামানের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে মারাঠিদেরকে সহায়তা করার জন্যে লেফটেন্যান্ট ফোস্টার ও ক্যাপ্টেন লিটলের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী যোগ দেয়। প্রথমদিকে মহিসুর বাহিনীর বিরুদ্ধে মারাঠিরা বিশেষ কোনো সাফল্য পায়নি; কিন্তু ইংরেজ বাহিনী যোগ দিতেই তারা নগরী দখল করতে সমর্থ হয়। তবে তারা ফৌজি কেল্লা জয় করতে পারেনি।

৭ মাস পর্যন্ত তাদেরকে মহিসুরের সেনাবাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন কেল্লার ভেতরে রসদ ও অস্ত্র-শস্ত্রের সংকট দেখা দেয়, পানির তীব্র হাহাকার দেখা দেয় তখন মহিসুরের সেনাবাহিনীর হাজার হাজার সিপাহি মৃত্যু বরণ করে। কয়েক হাজার সিপাহি হতাশ হয়ে পালিয়ে যায়। স্রেফ তিন হাজার সিপাহী রয়ে যায়। এতো অল্প সৈন্য দিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। যার কারণে ৪ এপ্রিল ১৭৯১ বদরুজ্জামান খান নায়েতা সম্মানজনকভাবে অস্ত্র, খাজানা ও অবশিষ্ট সিপাহিদেরকে সঙ্গে নিয়ে শিমুগা (Shimoga) চলে আসেন। শূন্য কেল্লার ওপর মারাঠিরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে মারাঠি ফৌজ রামগিরি, চিনগিরি, চিত্রাদুর্গ, শাহনূর, আংকুলা, মারযান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল দখল করে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অভিমুখে এগুতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিলো, ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে মিলে রাজধানী অবরোধ করবে।

ওদিকে কার্নুওয়ালসের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যরাও রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে তাদেরকে বারংবার মহিসুর সেনাদের গেরিলা আক্রমণের ধকল সহ্য করতে হয়েছে। গেরিলা সৈন্যরা সুযোগ পেলেই ইংরেজদের খাদ্য ও রসদবাহী জন্তু জানোয়ার দখল করে তাদের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতো।

www.boimate.com

রাজধানীর নিষ্ফল অবরোধ

সম্মিলিত বাহিনীর কাছে এই যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো রাজধানী অবরোধ করে তার ওপর বিজয় কেতন উড্ডীন করা। বিজয়ের সাফল্য-ব্যর্থতা এর ওপরই নির্ভর করতো। এ কারণেই রাজধানী অবরোধ করার জন্যে জেনারেল কর্নওয়ালস ধারওয়াড় থেকে মারাঠি ফৌজের যোগ দেওয়ার অপেক্ষা করছিল। তারা যোগ দিলে তাদের সঙ্গে যূথবদ্ধ হয়ে রাজধানী অবরোধ করার যুৎসই পরিকল্পনা তৈরি করবে। তারই অংশ হিসেবে হরি পণ্ডিত পুনা থেকে ১০ হাজার সিপাহি সঙ্গে নিয়ে এই কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল থেকে অপর মারাঠি সর্দার পুরশি রাম অগ্রসর হয়। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ ফৌজদের পেছন দিকে থেকে মহিসুর বাহিনীর কিছু চৌকস দল বারবার আক্রমণ করে তাদের রসদ-সামান লুটতরাজ করছিলো; যা তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলছিলো। ফেরেঙ্গিদের পেরেশানির মাত্রা এতোটাই বেড়ে যায় যে, তারা সৈন্যদেরকে প্রদত্ত রেশনের হার অর্ধেকে কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এতোটাই পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার যথাযথ পরিমাণে সরবরাহ করাটাও ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সৈনিকদের খাবার নির্বিঘ্ন রাখতে যুদ্ধোপকরণ বহনের জন্তুগুলো পর্যন্ত যবেহ্ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

অন্যদিকে গ্রীষ্মকাল ঘনিয়ে আসে। আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ইংরেজ শিবিরে বিভিন্ন মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। বসন্ত রোগের ভয়াবহ প্রকোপ দেখা দেয়। জীব-জন্তুর পাল মরতে শুরু করে। সিপাহিদের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। প্রাণান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় রসদ-সামান ইংরেজ ক্যাম্পগুলোতে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিলো না। মহিসুরের সৈন্যরা তা রাস্তা থেকেই লুট করে নিয়ে যেতো। যার ফলে নিরূপায় হয়ে কার্নওয়ালস অবরোধ তুলে নেওয়ার মাঝেই নিজেদের কল্যাণ খুঁজতে শুরু করে। অথচ টিপু অবরোধের পূর্বে তার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো। কার্নওয়ালস সন্ধির সেই প্রস্তাব নিজের জন্যে অবমাননাকর মনে করে ঠুকরে দিয়েছিলো। কিন্তু এখন আর তার সামনে কোনো বিকল্প নেই। এজন্যে সে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেহেতু যুদ্ধোপকরণ বহনের বাহনগুলোর সিংহভাগ

www.boimate.com

রোগাক্রান্ত হয়ে মরে গেছে। যার কারণে বিশালাকৃতির তোপখানা ও গোলা-বারুদ বহন করে ফিরে যাওয়া ইংরেজ সৈন্যদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন; এজন্যে কার্নওয়ালসের নির্দেশে এই যুদ্ধোপকরণগুলো মাটিতে পুতে বা পানিতে নিক্ষেপ করা হয়, যেন মহিসুর বাহিনী সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।

গরমকুণ্ডা নগরীতে টিপুর রাজপুত্রের বীরত্ব

টিপু ইচ্ছে করলে লাঞ্ছনা ও অবমাননার সঙ্গে ফিরে যাওয়া কার্নওয়ালসের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ সৈন্যদেরকে পশ্চাদ্ধাবণ করে খুব সহজেই তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারতেন। কিন্তু এধরনের কাজ তার রণকৌশলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়ায় তিনি সে পথে পা বাড়াননি। ইংরেজ বাহিনী ফিরে যাওয়ার পর শাহযাদার নেতৃত্বে একটি চৌকস সেনাদল গরমকুণ্ডা অভিমুখে প্রেরণ করেন। নিযামের সৈন্যরা তাদের সামরিক অফিসার হাফেয ফরীদুদ্দীনের নেতৃত্বে সেখানকার সামরিক কেল্লা অবরোধ করে রেখেছিলো। শাহযাদা ফতেহ হায়দার যদিও ওই সময় বেশ তরুণ ও অনভিজ্ঞ ছিলেন; ওই সময় তার বয়স ছিলো মাত্র ১৮ বছর। কিন্তু টিপু সুলতান তাকে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যেই ওই অভিযানে প্রেরণ করেন। ফতেহ হায়দার বেশ সহজেই অভিযান শেষে জয় তুলে নেন। হাফেয ফরীদুদ্দীনকে কয়েকজন সিপাহি সহকারে পাকড়াও করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। নিযামের ফৌজ ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। তাদের পরিত্যাক্ত অস্ত্র, গোলা-বারুদ, প্রচুর নগদ অর্থ মহিসুর বাহিনীর হস্তগত হয়।

শাহযাদার নেতৃত্বেই সে বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়। একটি সংক্ষিপ্ত লড়াই শেষে মুদগিরির কেল্লা পুনর্দখল করে। মারাঠিরা ওই কেল্লা অবরোধ করে রেখেছিলো। এখানে তাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। এর কিছু দিন পর মীর কমরুদ্দীনের নেতৃত্বে মহিসুর সেনাবাহিনীর একটি দল কোয়েম্বাটুর (Coimbatore) নগরী দখল করে নেয়।

শ্রীরঙ্গপত্তনম পুনঃঅবরোধ

প্রচণ্ড বর্ষার কারণে মারাঠি ফৌজ শ্রীরঙ্গাপত্তনম প্রথম অবরোধ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তারা পথিমধ্যেই ফেঁসে গিয়েছিলো। ওদিকে

www.boimate.com

নিযামের সেনাবাহিনীও ওয়াম্বাড়িতে অবস্থান করছিলো। ব্যর্থ অবরোধের পর যখন ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ফিরে যাচ্ছিলো তখন পথিমধ্যে মারাঠি ফৌজের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তারা ইংরেজদের জন্যে রসদ-সামান বহন করে নিয়ে আসছিলো। মারাঠিরা তখন গো ধরেছিলো যে, তাৎক্ষণিক রাজধানী অবরোধ করা হোক। কিন্তু কার্নওয়ালস এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

অবশেষে যখন বর্ষাকাল শেষ হয় তখন ১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯২ সালে সম্মিলিত বাহিনী দ্বিতীয়বারের মতো শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অভিমুখে রওয়ানা হয়। ওদিকে টিপু সুলতানও তাদের প্রতিহত করার জন্যে ৪০ হাজার সৈন্য ও শ'খানেক তোপ সঙ্গে নিয়ে কাভেরি নদীর উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত একটি ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করেন। পেছন থেকে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যে ৫ হাজার অশ্বারোহীর একটি চৌকস দল প্রস্তুত ছিলো। সম্মিলিত বাহিনীতে সবার আগে ছিলো কার্নওয়ালসের নেতৃত্বাধীন ২২ হাজার সৈন্যের বহর। তাদের পেছনেই ছিলো নিযামের শাহযাদা সিকান্দার জাহ-এর নেতৃত্বে ১৮ হাজার হায়দারাবাদি সৈন্য। তাদের সঙ্গে খানিকটা দূরত্বে হরিপণ্ডিতের নেতৃত্বে ১২ হাজার মারাঠি ফৌজ অগ্রসর হচ্ছিলো। মোটকথা সামষ্টিকভাবে দু' পক্ষের সৈন্যসংখ্যার মাঝে সংখ্যার বিচারে খুব বেশি পার্থক্য ছিলো না।

জনগণকে টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে ইংরেজদের চক্রান্ত

টিপু সুলতান যেহেতু একজন শাসকের পাশাপাশি একজন আলেমও ছিলেন; এজন্যে তিনি জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই অন্তর থেকে বিদ'আত-কুপ্রথা ঘৃণা করতেন। তার শাসিত অঞ্চলে মুসলমানদের মাঝে যেসকল জাহেলি প্রথা, ভুল বিশ্বাস, অর্থহীন কর্মকাণ্ড ছিলো, তিনি সেগুলো নির্মূলে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। পীর-মুরিদির আবডালে চলমান বাণিজ্য তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মুহাররম এলে শিয়াদের মাঝে; এমনকি তাদের দেখাদেখি সুন্নিদের মাঝে যেই হিন্দুসুলভ প্রথা শুরু হয়ে যায়, তিনি সেগুলোও কঠোরতার সঙ্গে নিষিদ্ধ করেন। ঘটনাক্রমে মহিসুরের রাজধানীতে যখন ইংরেজদের প্রথম অবরোধ চলছিলো তখন মুহাররম মাস চলে আসে। জেনারেল কর্নওয়ালস একজন সফল সেনাপতির

www.boimate.com

পাশাপাশি একজন মেধাবী রাজনীতিবিদ ও প্রাজ্ঞ কূটনীতিবিদও ছিলেন। তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে স্রেফ শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগের ওপর নির্ভর করেননি। বরং কীভাবে প্রতিপক্ষের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের শক্তি নিঃশেষ করা যায়, তার সর্বাত্তকরণে চেষ্টাও করেছেন। সেই ভাবনা থেকেই তিনি প্রথমে টিপুর কতিপয় সামরিক অফিসার যেমন, কৃষ্ণারাও প্রমুখকে কিনে নিয়েছিলেন। তার গাদ্দারির কারণেই কর্নওয়ালস ব্যাঙ্গালুরু জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহিসুরের এই তৃতীয় যুদ্ধেও তিনি তার সেই সফল যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করেন।

মহিসুর সাম্রাজ্যে প্রচুর শিয়া বসবাস করতো। ওদিকে কিছু শিয়া ইংরেজদের অধীনেও চাকুরি করতো। যেহেতু মুহাররমের প্রথাগুলো সাধারণত শিয়ারাই পালন করে থাকে। কিন্তু আহমদনগর ও বীজাপুরের সালতানাতের পাশাপাশি বসবাসের কারণে তাদের সেই প্রথা অনেক সুন্নির মাঝেও ঢুকে পড়ে। এজন্যে সর্বপ্রথম কর্নওয়ালস এ ঘোষণা জানিয়ে দেন যে, তার ফৌজে অন্তর্ভুক্ত মুসলমান সিপাহিদেরকে মুহাররমের ধর্মীয় প্রথা পালন করার জন্যে দশ মুহাররম পর্যন্ত ১০ দিন রাষ্ট্রীয় ছুটি দেওয়া হবে। মাস শেষে তারা অতিরিক্ত এক মাসের বেতনও পাবে। তিনি তার অধীনস্থ ইংরেজ সৈন্যদেরকেও এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, এ সকল মুসলমানের প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা যেনো এ সময় যথাসম্ভব যুদ্ধ পরিহার করে চলে। ইংরেজদের অধীনে যেসকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকা রয়েছে, সেখানে ইংরেজ অফিসারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা'যিয়া উঠবে। সবচেয়ে সুন্দর তা'যিয়া অনুষ্ঠান পালনকারীদেরকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

তার এই ঘোষণা মুসলমানদের অন্তরে প্রচণ্ড আবেদন সৃষ্টি করে। যেহেতু ওই যুগের মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা-দীক্ষার প্রচণ্ড অভাব ছিলো। নিরক্ষরতার জয়জয়কার ছিলো। যার কারণে খুব সহজেই তাদের মনে ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। যেসব মুসলমান এ জাতীয় প্রথার অন্ধ ভক্ত, তারা প্রকাশ্যে অন্য মুসলমানদেরকে টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকে। ধূর্ত কার্নওয়ালসের এই পদক্ষেপ সফল হয়। তারা টিপুর বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদেরকে অসন্তুষ্ট করার সবগুলো সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে। অশিক্ষিত মুসলমানদের ঠুনকো আবেগ উস্কে

www.boimate.com

দিয়ে তা টিপুর বিরুদ্ধে সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করার হেন পন্থা নেই, যা ইংরেজরা প্রয়োগ করেনি। সালতানাতে খোদাদাদের পতনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বড় ভূমিকা রেখেছিলো। আজ পর্যন্ত যতো ঐতিহাসিক সালতানাতে খোদাদাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই উদীয়মান শক্তির পতনের প্রেক্ষাপট চিত্রায়ণ করার সময় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও তুলে ধরেছেন।

যুদ্ধ হলো শুরু

ইংরেজ বাহিনীর মাঝে জেনারেল ম্যাথুজের অধীনে ৯০০ ইউরোপিয়ান ও ২ হাজার হিন্দুস্তানি সিপাহির একটি চৌকস সেনাদল ছিলো। এই সেনাদলটিই যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। তারা সর্বপ্রথম শ্রীরঙ্গাপত্তনামের ঈদগাহের পেছনে 'গুনজাম' শহরের কেল্লা ও লালবাগের ওপর আক্রমণ করে। এখানে টিপুর পক্ষ থেকে সাইয়্যেদ হামেদের নেতৃত্বে মহিসুর বাহিনীর একটি সেনাদল নিয়োজিত ছিলো। প্রথমদিকে তারা পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুদের মুকাবিলা করে। কিন্তু সাইয়্যেদ হামেদের শাহাদাতের পর তাদের পা ফসকাতে শুরু করে। মহিসুর বাহিনীর ৪০০ সৈন্য শাহাদাত বরণ করে। ইংরেজরা কেল্লাটি দখল করে নেয়। কিন্তু এই প্রাথমিক বিজয় অর্জনের জন্যে তাদেরকে ৮০ জন সিপাহি ১১ বিখ্যাত ফৌজি অফিসার খোয়াতে হয়েছিলো। মাহদী আলী খান নামে টিপুর একজন উযির ছিলো। লোকটি ছিলো শিয়া মতালম্বী। গুনজাম শহরের কেল্লা ও লালবাগ হাতছাড়া হওয়ার ক্ষেত্রে লোকটির গাদ্দারি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলো। ইংরেজরা তাকে সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে কিনে নিয়েছিলো। সাইয়্যেদ হামেদের মৃত্যুর পর মহিসুর বাহিনীর এ দলটির নেতৃত্বভার তার হাতে চলে যায়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এ লোকটিই সুলতানের সিপাহিদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

তুমুল সংঘর্ষ

শত্রুবাহিনীর ওপর গেরিলা আক্রমণ পরিচালনার জন্যে টিপু সুলতান দু'টি পৃথক বাহিনী যথাক্রমে ইমাম খান কান্দাহারী ও মীর মাহমুদের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। কিন্তু রাতের প্রচণ্ড অন্ধকারের কারণে এ দু'টি দল একে

www.boimate.com

অপরকে চিনতে পারেনি। ভুল করে তারা শত্রু মনে করে একে অপরের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে মহিসুর বাহিনীর এ দু'টি দলের অধিকাংশ সিপাহি নিহত হয়। খোদ ইমাম খান কান্দাহারি ও মীর মাহমুদও শাহাদাত বরণ করেন। রাতে জেনারেল কর্নওয়ালসের নেতৃত্বে একটি চৌকস ইংরেজদল রাজধানীর দরিয়া দৌলতবাগের ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু মহিসুর বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধ ও জবাবি গোলা-বারুদের কারণে তাদেরকে পেছনে সরে আসতে হয়। ওদিকে জেনারেল ম্যাকোলসের নেতৃত্বে শত্রুবাহিনী পূর্বাঞ্চলের মোর্চাগুলো দখল করার জন্যে উপর্যপুরি আক্রমণ করতে থাকে। মহিসুর বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের ভেতর দিয়েও তারা কাবেরি নদী অতিক্রম করে দরিয়া দৌলতবাগ ও শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা দখল করতে সমর্থ হয়। তাদের এই বিজয় টিপুর মনোবলে সামান্যতম চিড় ধরাতে পারেনি; বরং তিনি পূর্ণ শক্তি একত্র করে প্রত্যুষে শত্রুবাহিনীর মোর্চাগুলোর ওপর এমন কঠিন আক্রমণ করেন যে, দরিয়া দৌলতবাগ ও গুনজাম নগরীদ্বয় পুনর্দখল করতে সমর্থ হন। ইংরেজ সিপাহিরা সেই কাবেরি নদী পেরিয়ে নিজেদের ঢেরায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

টিপুর ভুল সিদ্ধান্ত ও তার প্রায়শ্চিত্ত

ইংরেজ বাহিনী যখন টিপুর পাল্টা আক্রমণের মুখে কাভেরি নদী পার হয়ে ওপারে পালিয়ে যায় তখন মহিসুর বাহিনীর কয়েকজন অফিসার টিপুকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু টিপু তাদের সেই পরামর্শে সায় দেননি। যার পরিণতিতে দেখা যায়, তারা রাতভর কাছাকাছি অবস্থান করে তাদের সেনাসদস্যদেরকে পুনর্বিন্যাস করে। এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে এসে সকালবেলা রাজধানী অবরোধ করে। টিপু যদি তার অফিসারদের পরামর্শ মেনে অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করার নির্দেশ দিতেন তাহলে সম্ভবত তারা এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে, পুনর্বিন্যস্ত হয়ে দ্বিতীয়বার রাজধানী অবরোধ করার সুযোগ পেতো না। এরপর টিপুকে তাদের সঙ্গে অবমাননাকর শর্তে সন্ধি করার মতো পরিবেশও সৃষ্টি হতো না। এটাই টিপুর সেই ঐতিহাসিক ভুল— যা তার জেতা যুদ্ধকে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত টিপুকে পরবর্তীকালে ভোগ করতে হয়েছে।

www.boimate.com

অবরোধ দীর্ঘতর হওয়ায় সন্ধির জল্পনা

প্রত্যুষে যখন সম্মিলিত বাহিনী দ্বিতীয়বারের মতো রাজধানী অবরোধ করে তখন টিপু সুলতানের বাহিনী চতুর্দিক থেকে আটকা পড়ে। বাইরে থেকে কোনো রসদ আসার পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। আশপাশে যতোগুলো শষ্যক্ষেত ছিলো, তা শত্রুপক্ষ জ্বালিয়ে ব্যবহার অনুপোযগী করে ফেলে। টিপুর শাসনাধীন এমন কিছু এলাকা ইংরেজরা দখল করে ফেলেছিলো যেখান থেকে তার কাছে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করা হতো।

অন্যদিকে সম্মিলিত বাহিনী ছিলো সংখ্যায় বেশি। কিন্তু তাদের কাছে যুদ্ধোপকরণের ঘাটতি ছিলো। খাদ্যদ্রব্য দিনদিন হ্রাস পাচ্ছিলো। কোনো ধরণের পরিণতি ছাড়াই যুদ্ধ প্রলম্বিত হচ্ছিলো। ক্ষণে-ক্ষণে উভয়পক্ষের ছোট ছোট বাহিনীর মাঝে সংঘর্ষ বাঁধছিলো। কিন্তু এই সংঘর্ষগুলো যথার্থ কোনো পরিণতি নিশ্চিত করার মতো ছিলো। অবরোধ দীর্ঘ হলে জোটের অন্য দু' শরিকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা ইংরেজদের সবসময় তাড়িয়ে বেড়াতো। ওদিকে ইংরেজ বাহিনী একাকী এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো সক্ষমতার অধিকারী ছিলো না।

ওদিকে টিপু মাঝে-মধ্যেই তার কিছু উযির ও কমান্ডারদের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাচ্ছিলেন। তারা ইংরেজদের পক্ষ থেকে ঘুষ পেয়ে বিভিন্ন কেল্লা সম্মিলিত বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। এজন্যে তিনি যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে নিজ সেনাবাহিনীর গাদ্দারদেরকে শত্রুবাহিনীর সহায়তা করার কোনো সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন না। এ কারণেই তিনি কয়েক দিন পূর্বে কর্নওয়ালকে সন্ধি করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু সে ওই প্রস্তাবনা এমনভাবে ঠুকরে দেয় যে, টিপুর ওই চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। এখন সেই কর্নওয়ালস নিজেই অবরোধের দীর্ঘাঙ্গিকতার ওপর বিরক্ত হয়ে সন্ধি করতে উৎসাহ দেখাচ্ছেন। কিন্তু তার সঙ্গের কমান্ডার জেনারেল ম্যাথুজ সন্ধি করতে রাজি হচ্ছিলেন না। তার বক্তব্য হলো, টিপু এখন হয়তো নত হয়ে সন্ধি করবে; কিন্তু এরপর সে তার শক্তি পুনরায় একত্র করে আমাদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ম্যাথুজের মনে এই অনুভূতি কাঁটার মতো বিঁধছিলো যে, এই যুদ্ধে কোনো ধরনের পরিণতিতে পৌঁছানোর আগেই তার নেতৃত্বাধীন সেনাদলের দু' হাজার সৈন্য টিপুর বাহিনীর হাতে নিহত

www.boimate.com

হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য ইংরেজ কমাণ্ডার সুযোগ পেলেই তাকে খোঁচা দিচ্ছে। এমনকি জেনারেল ম্যাথুজ এই লজ্জা লুকানোর জন্যে নিজের ওপর গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তার সঙ্গী কর্নেল ম্যালকম তাকে বাঁচাতে সমর্থ হয়। টিপুর সঙ্গে সন্ধিচুক্তির সিদ্ধান্তে তাকে সম্মত করাতে অন্যান্য ইংরেজ অফিসারদের প্রচণ্ড বেগ পোহাতে হয়েছিলো। এরপরই ইংরেজ শিবির থেকে যুদ্ধ স্থগিত হওয়ার ঘোষণা আসে।

চুক্তির খসড়া

শ্রীরঙ্গাপত্তনমের কেল্লাটি যেহেতু এখন পর্যন্ত টিপুর নিয়ন্ত্রণেই ছিলো, এজন্যে শহরের বাইরে ঈদগাহের কাছে সমবেত হয়ে সন্ধির খসড়া প্রস্তাবনার ওপর টিপু ও সম্মিলিত বাহিনীর প্রতিনিধিগণ মতবিনিময় করেন। ইংরেজ বাহিনীর পক্ষ থেকে জেনারেল কন্যাওয়ে, নিযামের পক্ষ থেকে মীর আলম ও মারাঠাদের পক্ষ থেকে গোবিন্দ রাও ও বাচ্চা জী মেহেন্দাল এবং টিপুর পক্ষ থেকে গোলাম আলী খান ও আলী রেযা খান প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রথম দিকে সম্মিলিত বাহিনী অনেকগুলো কঠিন শর্ত পেশ করে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ টিপুর কাছ থেকে ৮ কোটি রুপি দাবী করে। কিন্তু পরবর্তীতে তা হ্রাস করতে করতে ৩ কোটি রুপিতে সম্মত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৯২ দু' পক্ষ খসড়া চুক্তির নিম্নের ধারাগুলো ওপর সম্মত হয়–

১. যুদ্ধের পূর্বে যেই এলাকাগুলোর ওপর টিপুর নিয়ন্ত্রণ ছিলো, তার অর্ধ এলাকা সম্মিলিত বাহিনীকে দেওয়া হবে। সম্মিলিত বাহিনীর শরিকগণ নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত অঞ্চল থেকে নিজ ইচ্ছায় এলাকা চয়ন করবেন।

২. যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ টিপু সম্মিলিত বাহিনীকে ৩ কোটি রুপি আদায় করবেন। তাকে নগদ ৬৫ লাখ টাকা দিতে হবে। অবশিষ্ট অংক চার মাসের মধ্যে তিন কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

৩. সালতানাতে খোদাদাদের কারাগারে রয়েছে নবাব হায়দার আলীর সময়কাল হতে অদ্যাবধি সম্মিলিত বাহিনীর যতো বন্দী রয়েছে, তাদেরকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিতে হবে।

www.boimate.com

৪. চুক্তি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জামানত হিসেবে টিপুর দু' রাজপুত্র বন্ধক স্বরূপ ইংরেজদের হিফাযতে থাকবে।

আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন টিপু কীকরে এই লাঞ্ছনাকর প্রস্তাব মেনে নিলেন?

এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, টিপু সুলতান ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন সম্রাট। তাঁর মতো জাত্যাভিমানী সম্রাট শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসেই নয়; মানবেতিহাসেও খুব কম দেখা গেছে। তিনি কীভাবে এমন লাঞ্ছনাকর, অবমাননাজনক, একপক্ষীয় শর্ত সম্বলিত সন্ধিচুক্তিতে সম্মত হলেন?

আসলে টিপু সুলতান যেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন, আমরা যদি তার পূর্ণ প্রেক্ষাপট নিরীক্ষণ করে দেখি তাহলে আমাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হবে যে, ওই সময় টিপুর সামনে অন্য কোনো বিকল্প পথ ছিলো না। তিনি একজন সফল সেনাপতির পাশাপাশি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গণনেতা ছিলেন। বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ নীতি হলো, মাথা তুলে দাঁড়ানোর আগেই তা দমন করতে হবে। কিন্তু যখন কোনো সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় পর্যায়ে এই মহামারী ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে আর রণাঙ্গনে অবস্থানরত সম্রাট তা জানতে পারেন তখন তার সামনে একটাই পথ খোলা থাকে। তাহলো, ওই সময় তাকে প্রতিপক্ষের শত্রুদের কথা ভুলে গিয়ে আস্তিনের নিচে লুকিয়ে থাকা সাপের বাসা ধ্বংস করার ওপরই অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়। কারণ, এই সাপ বাঁচিয়ে রাখা আর নিজের মৃত্যুকে আহ্বান জানানো– দু'টোই সমান।

মহিসুরের এই তৃতীয় যুদ্ধে টিপু সেই পরিস্থিতিরই শিকার হয়েছিলেন। মুহাররমের রুসম-রেওয়াজ ও জাহেলি কুসংস্কৃতি নিষিদ্ধ করার কারণে তিনি পূর্বেই তাঁর অজ্ঞ প্রজাদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিলেন। এখন ইংরেজ গভর্নর কর্তৃক মুহাররমের প্রথা পালনের অনুমতি প্রদান ও তার ওপর পুরস্কার ঘোষণা তাদের সেই ক্রোধের আগুন দ্বিগুণ করেছে। উপরন্তু যখন সাম্রাজ্যের মৌ–লোভী মৌলভিরাও ইংরেজ গভর্নরের সুরের

www.boimate.com

সঙ্গে সুর মেলাতে শুরু করে তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যদিও টিপু সুলতান প্রশাসনের ঊর্ধ্বমহলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ পেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি এ কথা ভেবে তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করেননি যে, কোনোমতে যুদ্ধ শেষ হোক, তারপরেই বিহিত করবো। টিপু সুলতান রাজধানীর আশপাশে অবস্থিত কেল্লাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাদেরকে সপেছিলেন, তাদের অধিকাংশ মুহাফিজকেই ইংরেজরা টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছিলো। কেল্লারক্ষী কৃষ্ণারাওয়ের বেঈমানির কারণেই ব্যাঙ্গালুরু কেল্লার পতন ঘটেছিলো। মাহদী আলী খানের গাদ্দারীর কারণেই গুনজাম নগরী ও দরিয়া দৌলত বাগ টিপুর হাত থেকে ছুটে যায়। খোদ শ্রীরঙ্গাপত্তনামের কেল্লার ভেতরে অবস্থানরত অনেক সামরিক কর্মকর্তাকে ইংরেজরা ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে বাগিয়ে নিয়েছিলো। তাদের মাধ্যমেই ইংরেজরা কেল্লার ভেতরের প্রতিমুহূর্তের সংবাদ জেনে যাচ্ছিলো। এই গাদ্দারদের কারণেই সম্রাটের গোয়েন্দা কার্যক্রম প্রচণ্ড রকম বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। সম্মিলিত বাহিনীর ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছানোর ঘটনা থেকেই টিপু বুঝতে সক্ষম হন যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চলাকালে বিদ্রোহীদেরকে কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে তা হিতে বিপরীত হবে।

খসড়া চুক্তির এই ধারাগুলো টিপু সুলতান প্রথমেই গ্রহণ করতে পরিষ্কার অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু ওই গাদ্দাররাই তাকে তা মেনে নিতে বাধ্য করে। তিনি যদি তা মেনে নিতেন তাহলে আশঙ্কা ছিলো যে, এ কারণে আগামীতে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে এবং আবডালের বিদ্রোহীরা দৃশ্যপটে চলে আসতে পারে। ঘরের শত্রু বিভীষণদের প্রতিহত করা ওই সময় প্রচণ্ড কঠিন হয়ে পড়তো। এ কারণেই টিপু সুলতান সালতানাতের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, সাময়িক ক্ষতি ও অবমাননার প্রস্তাব একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেন। যদি টিপু সুলতানের সামনে সম্মিলিত বাহিনী না এসে স্রেফ ইংরেজরা আসতো তাহলে এই যুদ্ধের চিত্র ও পরিণতি অন্য রকম হতো। এ কথা ইংরেজরাও জানতো। এ কারণেই তারা একাকী যুদ্ধের দুঃসাহস দেখায়নি।

www.boimate.com

চুক্তি বাস্তবায়ন

চুক্তি পূরণ না-করা পর্যন্ত দু' শাহযাদা ইংরেজদের হিফাযতে জামানত হিসেবে থাকবে; এই প্রস্তাব যদিও টিপু সুলতান প্রথম দিকে পরিষ্কার অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু যখন তার ওপর অনাহুত চাপ বাড়তে থাকে এবং সম্মিলিত বাহিনী পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার হুমকি দেয় তখন ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৯২ ঈসাব্দে তিনি অশ্রুভেজা চোখে তার দু' নিষ্পাপ সন্তান– আবদুল খালেক ও মুঈযুদ্দীনকে তাদের হাতে তুলে দেন। ওই সময় তাদের বয়স হয়েছিলো, যথাক্রমে ৭ বছর ও ৫ বছর। সম্মিলিত বাহিনীকে কোর্গ এলাকা দেওয়ার কথা সন্ধিচুক্তিতে ছিলো না। এ এলাকাটি তাদের সাম্রাজ্য-সংলগ্নও ছিলো না। কিন্তু সামরিক গুরুত্বের কারণে জেনারেল কর্নওয়ালসের ক্ষুধার্ত চোখ প্রথম থেকেই এ এলাকার ওপর নিবদ্ধ ছিলো।

সুলতান যখন তার সেই দাবী অস্বীকার করেন তখন ইংরেজরা চুক্তি লংঘন করে পুনরায় রাজধানী অবরোধ করে বসে। শাহযাদাদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে যেই সিপাহিদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো, তাদেরকে নজরবন্দি করে তারা মাদ্রাজ পাঠিয়ে দেয়। কিছু ইংরেজ কাবেরি নদী পেরিয়ে লুটতরাজ শুরু করে দেয়। যাদেরকে মহিসুরের সিপাহিরা মেরে তাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মীর কমরুদ্দীনের নেতৃত্বে মহিসুরের একদল সৈন্য বেদনুর (Bednore) থেকে প্রচুর রসদ-যুদ্ধপোকরণ নিয়ে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পৌঁছে যায়। তখন টিপু সুলতান চাইলে দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু ইংরেজদের কাছে বন্ধক হিসেবে রয়ে যাওয়া শাহযাদাদ্বয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন ছিলেন। যায় কারণে যুদ্ধ ছড়িয়ে তিনি তাদের জীবন আশঙ্কার মুখে ফেলতে রাজি হননি। এহেন প্রেক্ষাপটে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোর্গ নগরী ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হন। অঙ্গীকার অনুসারে মার্চ মাসের শেষ দিকে দু' পক্ষের বন্দী-বিনিময় প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়।

সম্মিলিত বাহিনী কী পেল?

ওই যুগে সালতানাতে খোদাদাদের আয়ের যতোগুলো উৎস ছিলো, সবগুলো মেলালে দেখা যাবে, সালতানাতের বার্ষিক আয় ছিলো ২ কোটি

www.boimate.com

৩৭ লক্ষ। চুক্তি অনুসারে সম্মিলিত বাহিনী ১ কোটি ১৮ লক্ষ রুপি আয় সমপরিমাণ এলাকা পায়। তিন অংশিদারের প্রত্যেকে পেয়েছে ৩৯ লক্ষ রুপি সম্পরিমাণ এলাকা। কেরালার উপকূলীয় এলাকা যথা, কালীকাট (Calicut), কন্যানুর (Cannanore) ছাড়াও কোর্গ (Coorg), বারা মহল, দিন্দিগাল (Dindigal), সায়লাম ইত্যাদি ইংরেজদের ভাগে চলে আসে। হায়দারাবাদের নিযাম তার পুরনো এলাকাগুলো ফিরে পায়। যার মধ্যে রয়েছে বিলারি (Bellary), পানপারী ইত্যাদি। মারাঠারাও তাদের পুরনো এলাকাগুলো ফিরে পায়। অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা (Toongabhaddra) নদীর উত্তরাঞ্চলী এলাকাগুলো। সামষ্টিকভাবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে ইংরেজরা। বর্গকিলোমিটার হিসেবে তারাই সবচেয়ে বেশি ভূমি বগলদাবা করতে সমর্থ হয়। এলাকাগুলো ছিলো নতুন করে আবাদ করা, উর্বর ও মূল্যবান শষ্য সমৃদ্ধ। কিন্তু ট্রাভাংকুর (Travancore)-এর যেই রাজাকে সহায়তার নামে ইংরেজরা এই যুদ্ধ শুরু করেছিলো, তাকে কানা-কড়িও দেওয়া হয়নি। সম্ভবত এর কারণ হলো, ইংরেজদের চোখে সেই রাজা নিযাম ও মারাঠিদের মতো বিপদজনক ছিলো না।

অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে মহিসুরের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ রুপির যুদ্ধ-সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করার মতো সঙ্গতি ছিলো না। তারপরও বিশ্বস্ত জনগণের বৃহৎ কল্যাণের কথা ভেবে টিপু সুলতান সেই অর্থ সংগ্রহ করেন এবং অঙ্গীকার মুতাবেক তা যথাসময়ে পূরণ করেন।

সাম্রাজ্যের ওপর চুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

সম্মিলিত বাহিনী সালতানাতে মহিসুরের অর্ধেক অংশ নিজেদের মাঝে এমনভাবে ভাগ-বটোয়ারা করে নিয়েছিলো যে, এখন সালতানাতে খোদাদাদ চতুর্দিক থেকে অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল টিপুর হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন যে কেউ অনায়াসে এ দু'টি দিক থেকে এসে রাজধানীর ওপর আক্রমণ করতে পারবে। দিন্দিগাল (Dindigal) থেকেই টিপুর কোষাগারে সবচেয়ে বেশি শষ্য সরবরাহ হতো। এখন এ অঞ্চলটিও শত্রুবাহিনীর হাতে চলে গেছে। সমুদ্রোপকূলীয় এলাকাগুলো ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ায় গরম মশলা রফতানির ব্যবসায় হাতছাড়া

www.boimate.com

হয়ে যায়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নগদ উসূল করার কারণে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে যায়। অর্ধরাজত্ব সম্মিলিত বাহিনীর হাতে চলে যাওয়ার কারণে বার্ষিক আয় ২ কোটি রুপি থেকে হ্রাস পেয়ে ১ কোটির নিচে নেমে আসে। মোটকথা, আয়ের অনেকগুলো উৎস শত্রুপক্ষের হাতে চলে গিয়েছিলো; তারপরও টিপু সুলতান এই চুক্তিপত্রের ওপর সম্মত হয়েছিলেন স্রেফ নিমকহারাম উযিরদের চক্রান্তের কারণে গোটা রাজ্য শত্রুদের হাতে চলে যাওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে। কাজেই টিপুর এই সম্মতি ছিলো রাজনৈতিক বাধ্য-বাধ্যকতা প্রসূত।

পরাজয়ের মাঝেও বিজয়ের সুর

স্রেফ ৪০-৪৫ হাজার সৈন্য দিয়ে পুরো এক বছর ২ লক্ষ সৈন্যবহর সমৃদ্ধ সম্মিলিত বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা টিপু সুলতানের কারামত বৈ কি! প্রায় বছরখানেক সময় অবরোধ করে, একের পর এক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েও তারা রাজধানী দখল করতে পারেনি। ইংরেজরা টিপু সুলতানের জনগণের মাঝে ধর্মীয় উস্কানি ছড়িয়ে দিয়েছিলো। প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অনেককেই সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কিনে নিয়ে খোদ তাদের হাত দিয়ে সিংহাসন উল্টে দেওয়ার চক্রান্ত বুনেছিলো। কিন্তু টিপু সুলতানের বুদ্ধিমত্তা ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত এবং সন্ধিচুক্তির ওপর অভাবিত সম্মতির কারণে পুরো রাজ্য না হলেও অর্ধরাজ্য শত্রুপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা গিয়েছিলো।

টিপু সুলতান যদি ওই চুক্তির ওপর সম্মত না হতেন তাহলে প্রচণ্ড আশঙ্কা ছিলো যে, বাকি অর্ধেক রাজ্যও সম্মিলিত বাহিনী গায়ের জোরে দখল করে নেবে। যার কারণে টিপু সুলতান এই চুক্তির কারণে মন না ভেঙ্গে, একজন সাচ্চা মুসলমান ও সফল রাষ্ট্রনায়ক-দেশপরিচালক হিসেবে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রের আলোকিত ভবিষ্যত বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পূর্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পূর্ণ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সঙ্গে নিজ মন্ত্রীপরিষদ ও সামরিক কর্মকর্তাদের আস্থা পুনরায় অর্জন করে গোটা মনোযোগ রাষ্ট্রের উন্নতি ও সচ্ছলতার ওপর নিবদ্ধ করেন।

www.boimate.com

এককথায় একাধারে এক বছর তিন-তিনটি শক্তির সম্মিলিত আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা, ক্ষমতার মসনদে উল্টে দেওয়ার চতূর চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করে অর্ধরাজ্য স্বাধীন রাখাটা বাহ্যিক এই পরাজয়ের ভেতর দিয়ে টিপু সুলতানের প্রকৃত বিজয়।

www.boimate.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ও বিদেশী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ

www.boimate.com

যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন

টিপু সুলতান সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার মেনে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি শোধ করেন। এরপর পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রের যেই ক্ষতিগুলো হয়েছে, সেগুলোর প্রতিকারের উদ্যোগ নেন। এখন তার চোখে প্রজাদের সচ্ছলতা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিই সর্বাধিক অগ্রাধিকারের হকদার। শত্রুপক্ষ ভেবেছিলো, এখন টিপু সুলতানকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধকল পোহাতে হবে। তিনি তাদের আশায় গুড়ে বালি দিয়ে পূর্ণ সাহসিকতা ও উদ্যমের সঙ্গে রাষ্ট্রের আগামী নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। যুদ্ধ চলাকালে যে সব নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিলো, তিনি সেগুলোর পুনর্নির্মাণ করেন। অব্যবহৃত ভূমি কৃষকদের মাঝে কৃষিশষ্য উৎপাদনের শর্তে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ফলশ্রুতিতে শস্যের উৎপাদন স্বয়ংক্রীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

যুদ্ধাস্ত্র ও নানা সাজ-সরঞ্জামের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। রাষ্ট্রের যেই অতিগুরুত্বপূর্ণ নগরীগুলোতে ইতোপূর্বে যুদ্ধোপকরণ তৈরি হতো, সেই এলাকাগুলো চুক্তি অনুসারে সম্মিলিত বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হয়। যার কারণে এখন যুদ্ধাস্ত্র, গোলা-বারুদ ইত্যাদি তৈরির জন্যে অধীনস্থ নগরীগুলো যথা, শ্রীরঙ্গাপত্তনাম, বেদনুর (Bednore), তথা মহিসুরের অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন এলাকায় কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও বেকারত্ব দূরভিত করার উদ্দেশ্যে কাপড়, বাসন ইত্যাদি তৈরির নতুন নতুন কারখানা স্থাপন করেন। কাপড়ের কারখানাগুলোতে সুতি, পশমি, রেশমি কাপড়ের পাশাপাশি গালিচা তথা জীবন যাপনের নিত্যব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী বুননের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। এই কারখানাগুলোতে উৎপাদিত পণ্য গুণগত মানে উৎকৃষ্ট হওয়ায় দ্রুত সেগুলোর সুখ্যাতি রাষ্ট্রের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্যের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যেই আয়ের হার অভাবনীয় উচ্চতায় উন্নীত হয়। যার

www.boimate.com

ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, মাত্র দু' বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রের রাজকোষগুলোর ইতোপূর্বেকার শূন্যতা হারিয়ে সেগুলো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যার কারণে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট কিস্তি পরিশোধ করার জন্যে পূর্বের মতো জনগণের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার পর টিপু সুলতান নতুন বাণিজ্য নীতি প্রবর্তন করেন। যার অধীনে বহির্বিশ্ব তথা, ইরান, তুর্কিস্তান, হিজায প্রভৃতি দেশ থেকে মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে সালতানাতে খোদাদাদে এসে বিনিয়োগ করার জন্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সবিশেষ ছাড় ঘোষণা করা হয়। খোদ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক কোম্পানি গঠন করা হয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মহিসুর রাজ্যের যেকোনো নাগরিক ওই কোম্পানিতে তার নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ করার সুযোগ পেতো। এই পুঁজি নেওয়া হতো লাভ-ক্ষতিতে অংশিদারিত্বের ইসলামি মূলনীতি অনুসারে। কোম্পানিটি গঠন করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনীশ্রেণিদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সদস্যরাও অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। যার ফলে বিপনী বিতানগুলোতে বণিক শ্রেণির একক আধিপত্য নিঃশেষ হয়ে সেখানে সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদের অবাধ প্রবাহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দু' শাহযাদার প্রত্যাবর্তন

অঙ্গীকার মুতাবেক টিপু সুলতান চার মাসের বিরতিতে এক কোটি ৩৫ লক্ষ রুপি নিজের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করেন। যার ফলে ১৭৯৪ পর্যন্ত জামানত হিসেবে গ্রহণ করা দু' নিষ্পাপ শিশু শাহযাদা– আবদুল খালেক ও মুঈযুদ্দীনকে ইংরেজদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সুলতানের কাছে প্রত্যাবর্তন করা হয়। ক্যাপ্টেন ডিউটন-সহ কয়েক জন ইংরেজ কর্মকর্তা তাদেরকে নিয়ে আসে। খুশির আতিশয্যে টিপু সুলতান তাদের যথোপযুক্ত সমাদর করেন। মহামূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়ে তাদের দু'হাত ভরিয়ে দেন। শহরের বাইরে দিভানাহাল্লী এসে তিনি নিজেই শাহাযাদাদ্বয়কে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। তাদের আগমন উপলক্ষ্যে গোটা রাষ্ট্রে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। গরিব-মিসকিনদের ওপর দান-খয়রাতের বৃষ্টি ঝরতে শুরু করে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

www.boimate.com

প্রজাতন্ত্র প্রবর্তন ও সংসদ গঠন

অর্থনৈতিক ও জীবিকাপোর্জনের যাবতীয় সমস্যার মোটামুটি সমাধান সম্পন্ন করার পর টিপু সুলতান প্রশাসনকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শেষ যুদ্ধ থেকে টিপু সুলতান পরিষ্কার অনুভব করেন যে, যদি জনগণকে সরাসরি রাষ্ট্রীয় বিষয়-আশয়ে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, যদি তাদের আস্থা অর্জন না করা হয়, রাষ্ট্রপ্রধান যদি স্রেফ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন তাহলে এর পরিণতি শুভ হয় না। এজন্যে তিনি পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে মহিসুর রাজ্যে প্রজাতন্ত্রের প্রচলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্য থেকেই زمزمة غم نباشد (যমযমা গম নাবাশদ) নামের একটি সংসদ গঠন করেন। টিপুর সমবয়সী ঐতিহাসিক 'মীর হুসাইন আলী কিরমানী' তাঁর লেখা 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থে লেখেন যে, غم نباشد (গম নাবাশদ) বাক্য দিয়ে আরবি বর্ণমালা অনুসারে টিপু সুলতান নিম্নের জাতি-গোষ্ঠীগুলো বোঝাতে চেয়েছেন–

غ = غير وطني — গায়রে ওয়াতানী তথা বিদেশী

م = مغل ومرهته — মোঘল ও মারাঠা

ن = نوائط —নাওয়ায়েত

ب = برهمن — ব্রাহ্মণ

ا = افغان — আফগানি

ش = شيعة — শিয়া

د = اهل دائرة — আহলে দায়েরা অর্থাৎ মাহদী

মাহদী আলী খান এতোদিন পর্যন্ত টিপুর প্রধান উযির ছিলেন। কিন্তু পূর্বের যুদ্ধে তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার গুরুতর অভিযোগ ওঠে। যার পরিপ্রেক্ষিতে টিপু সুলতান তাকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে মীর সাদিককে নিয়োজিত করেন। তাকে নতুন সংসদের প্রধানের পদেও নিয়োগ দেন। ব্রাহ্মণ হিন্দু পুর্নিয়া-কে অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাইয়্যেদ হামেদকে বেদনুর (Bednore)-এর গভর্নর করা হয়। সালতানাতের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১০ হাজার সংসদ সদস্য নির্বাচিত করা হয়। টিপু সুলতান প্রতিটি এলাকার নাগরিকদের এ অধিকার দিয়েছিলেন যে, তারা তাদের এলাকার জন্যে উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে

www.boimate.com

যে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবে। অবশ্য কয়েক জন সংসদ সদস্যকে টিপু নিজেই মনোনীত করেছিলেন। এ ছাড়া সমস্ত এলাকার গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা বছর শেষে অর্থাৎ ঈদুল আযহার পর তার এলাকার বার্ষিক রিপোর্ট সংসদে, রাষ্ট্রপতির সামনে উপস্থান করতে বাধ্য থাকবে। সংসদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টিপু প্রতিদিনের ছোট ছোট বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও প্রতিকার বিধানের দায়িত্ব থেকে অবসর পেয়ে যান। পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে টিপু প্রশাসনের একটি বৃহদাংশ জনগণের কাছে স্থানান্তর করে দেন। তবে দেশের অতিগুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়গুলো যথারীতি টিপুর হাতেই ন্যস্ত ছিলো।

সামরিক বাহিনীর পুনর্বিন্যাস ও নৌশক্তির ওপর মনোযোগ

তৃতীয় যুদ্ধে যদিও বড় ধরনের সংঘর্ষ খুব বেশি হয়নি, এতদসত্ত্বেও ওই সময় টিপুর হাতে যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা-বারুদের বড় কোনো ভাণ্ডার ছিলো না। এখন যদিও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে; তারপরও ইংরেজ ও মারাঠিদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ ছিলো না। যেকোনো সময় তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি লংঘনের কাণ্ড ঘটে আক্রমণ চলে আসতে পারে। ইতোপূর্বে টিপু সুলতান বারবার এমন লংঘন ঘটতে দেখেছেন।

যুদ্ধাস্ত্র হ্রাস পাওয়ার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, যেসকল এলাকায় যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানা ছিলো, তার সিংহভাগ চুক্তির কারণে সম্মিলিত বাহিনীর অংশিদারদের রাজ্য-লাগোয়া হওয়ার কারণে তাদের হাতে তুলে দিতে হয়। এহেন কারণে যুদ্ধাস্ত্র হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক। রাজধানীর পূব ও পশ্চিম দিক অরক্ষিত হওয়ার কারণে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজনীয় পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বেড়ে গেছে। যদিও অভ্যন্তরীণ নানা জটিলতা ও উপকরণ-উৎসের সংকটের কারণে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষাখাতের বিপুল ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা কমে এসেছিলো। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগও ছিলো না।

এ কারণে টিপু সুলতান বেদনুর (Bednore), মহিসুর ও রাজধানীতে অস্ত্র তৈরির কয়েকটি নতুন কারখানা স্থাপন করেন। সেই কারখানাগুলো নতুন ডিজাইনের, ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন তোপ তৈরি করা হতো। সিপাহিদেরকে

www.boimate.com

প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে ভাটকাল প্রমুখ এলাকায় সবিশেষ সামরিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। গোটা সেনাবাহিনী নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়। টিপু সুলতান বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নৌশক্তির কারণে ইংরেজ বাহিনী এ যুদ্ধে অনেকগুলো সামরিক সুবিধা লাভ করেছে। নবাব হায়দার আলী বিষয়টি জানতেন, বলেই তার আমলে সালতানাতে খোদাদাদের নৌবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিলো। কিন্তু তার আকস্মিক ইনতিকালের কারণে এই সবিশেষ শাখার উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। টিপু সুলতান ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধের পর নৌবাহিনীর ওপর বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করে অনেকগুলো নতুন যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করেন। নৌ যুদ্ধজাহাজ তৈরির জন্যে একটি বিশালকার কাঠ-বন বরাদ্দ দেওয়া হয়। যার সুফল অল্প ক'দিনের মাঝেই দৃশ্যমান হতে শুরু করে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মহিসুরের নৌবাহিনীতে ২২ টি যুদ্ধজাহাজ ও ২০ টি বাণিজ্যিক জাহাজের সংযোজন ঘটে। মাত্র অল্প ক'দিনের ভেতর টিপু সুলতানের নৌবাহিনীর এমন উন্নতি শত্রুপক্ষের চোখে ধাধা ধরিয়ে দেয়।

আনুগত্যের অঙ্গীকার নবায়ণ

এভাবে টিপু সুলতান তৃতীয় যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষয়-ক্ষতি সামলে ওঠেন। শত্রুপক্ষের দাবী করা ক্ষতিপূরণের সবগুলো কিস্তি পরিশোধ করে দু' শাহযাদাকে মহিসুরে ফিরিয়ে আনেন। সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর পর ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির নতুন দিগন্ত সূচনা করেন। অতীব প্রয়োজনীয় এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের পর টিপু পূর্বের যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে আরও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ চলাকালে যেহেতু টিপু বেশ ক'দিন মন্ত্রী ও সামরিক কর্মর্কতাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখেছেন এজন্যে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এখন যদি তাদের সবার বিরুদ্ধে ব্যাপকাকারে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে রাজ্যজুড়ে নতুন করে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এজন্যে তিনি মানবিকতা ও উদারতা প্রদর্শন করে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন এবং সবার কাছ থেকে আনুগত্য ও বশ্যতা নতুন অঙ্গীকার গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেমতে তিনি প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাকে একত্র করে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। সেখানে তিনি তাদের

www.boimate.com

উদ্দেশে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মাঝে তিনি ইসলামবৈরী শক্তিগুলোর বিভিন্ন অপকীর্তি, পরিকল্পনা ও অপবিত্র সম্পর্কে সতর্ক করেন। সালতানাতে খোদাদাদকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে তিনি যেই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তার পূর্ণ বিবরণ তাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি সবাইকে এ কথা বোঝান যে, 'এই যুদ্ধ স্রেফ মহিসুরকে রক্ষা ও ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের যুদ্ধ নয়। বরং এই যুদ্ধের নেপথ্যে কিছু মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। এই যুদ্ধ শুধু ভারতবর্ষের আগামীর ইতিহাসের ওপর দাঁগ ফেলবে না; বরং মুসলিম উম্মাহর আগামী প্রজন্মগুলো-ও এই জিহাদের সুফল ভোগ করবে। কাজেই মূলত এটি দেশরক্ষার যুদ্ধের আড়ালে খোদ ইসলাম-রক্ষার জিহাদ।'

এরপর তিনি সবাইকে পারস্পরিক ঐক্য বজায় রাখা ও যেকোনো ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ পরিহার করার উপদেশ করেন। টিপু সুলতান তার এই বয়ানে বারবার জিহাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করেন। তার এই বয়ান উপস্থিত সুধিমণ্ডলীর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তারা তাদের বিভিন্ন বিদ্রোহব্যঞ্জক পদক্ষেপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা সানন্দ্যে টিপু সুলতানের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হয়। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে লিখিত আকারে আনুগত্যের অঙ্গীকার লিখিয়ে তা জনসম্মুখে পাঠ করিয়ে শোনানো হয়। টিপু সুলতান বেশ ভালো ভাবেই জানতেন যে, এগুলো হলো বিদ্রোহের মুখ বন্ধ করার স্রেফ আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক আয়োজন। নয়তো তাদের অন্তরের চিত্র ও গতিবিধি এক আল্লাহই সম্যক অবগত।

আনুগত্যের অঙ্গীকারের আড়ালে মীর সাদিকের গাদ্দারি

প্রথমদিকে সালতানাতের দিওয়ান (প্রধান উযির) মীর সাদেক নিজের ব্যাপারে শুধু মৌখিক হলফনামা দেওয়ার পীড়াপীড়ি করছিলো। কিন্তু যখন টিপুর অন্যান্য বিশ্বস্ত সঙ্গীরা তার অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার থেকে লিখিত হলফনামা নেওয়ার পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয় তখন সে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। মীর সাদিক সংসদের একজন সদস্য এবং প্রজাতন্ত্রের দিওয়ান হিসেবে বিশ্বস্ত থাকার হলফ লিখে দেয়। যদিও পরবর্তীকালের তার রাজনৈতিক অপকর্মগুলো তার সেই অঙ্গীকারের

www.boimate.com

অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত করেছে। 'মডার্ন মহিসুর' গ্রন্থের লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে 'সুলতানুল মুজাহিদীন' গ্রন্থের লেখক সেই হলফনামার বাক্যগুলো উপস্থাপন করেছেন। যা নিম্নরূপ—

'আমি মীর সাদিক নিমক হারাম ও সালতানাতে খোদাদাদের কর্মচারী। আমি আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল ও কুরআনকে হাযির-নাযির-সাক্ষী মনে করে, আল্লাহর নামে শপথ করে সাচ্চা অন্তরে এ কথা স্বীকার করছি যে, আমি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার মনিব সুলতান টিপুর আনুগত্য করবো। যেকোনো বিষয়ের ওপর তার নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেবো। আমার অন্তর তার আনুগত্য থেকে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হবে না। আমার চোখ তার বিপরীতে কোনো মন্দ জিনিসের দিকে তাকাবে না। আমার কান কখনও তার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনবে না। আমার দু' হাত সবসময় তার কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত থাকবে।

আমি এ স্বীকারোক্তিও প্রদান করছি, মহামান্য সুলতানের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে পেলে, বা দেখতে পেলে তৎক্ষণাৎ সে সম্পর্কে সুলতানকে অবহিত করবো।

যদি কখনও উল্লেখিত শর্তের কোনো একটির লঙ্ঘন করে ফেলি অথবা মনিবের আনুগত্যে শিথিলতা প্রদর্শন করি তাহলে আমার প্রভু —যার সম্পর্কে আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে পূর্ণ সক্ষম, যিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন— সেই আল্লাহকে বলবো, আমি আমার ওপর গযব ফেলে আমাকে ধ্বংস করে দিন।'

প্রায় কাছাকাছি স্বীকারোক্তি সম্বলিত হলফনামা রাষ্ট্রের অন্যান্য উযির ও সামরিক কর্মকর্তা, যথা মীর গোলাম আলী ল্যাঙ্গড়া, মীর কমরুদ্দীন, বদরুজ্জামান খান নায়েতা, হুসাইন আলী খান, সাইয়্যেদ গাফ্ফার, শায়খ উমর, মীর কাসেম আলী ও মীর মুঈনদ্দীন প্রমুখের কাছ থেকেও গ্রহণ করা হয়। এঁদের সিংহভাগ সেই হলফনামার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই মর্যাদা ধরে রেখেছেন।

www.boimate.com

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন

তৃতীয় যুদ্ধ চলাকালে টিপুর কয়েকজন করদ রাজা, জমিদার ও তালুকদার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তারা যদিও ইংরেজদের সঙ্গে তলে তলে সখ্যতা রেখে চলছিলো; কিন্তু টিপু সুলতান বেশ সহজেই সেই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। তবে বেশ কয়েকজন করদ রাজা ও জমিদার ইংরেজ ও সম্মিলিত বাহিনীর মদদ নিয়ে নিজের এলাকা টিপুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়।

যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর টিপু সুলতান প্রথমে প্রশাসনের নানা জঞ্জাল দূর করে তা স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা সফল হওয়ার পর তিনি বিদ্রোহ দমন ও পুনরুদ্ধারের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। বিদ্রোহী তালিকার সর্বশীর্ষে ছিলো, হরিপ্পনহাল্লীর রাজা। ১৭৯৩ সালে টিপু সুলতান সাইয়্যেদ গাফ্ফারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য হরিপ্পনহাল্লীর বিদ্রোহী রাজা বিসওয়াপ্পা নায়েক-কে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ অভিযানে সফল হননি। তখন টিপু সুলতান মীর কমরুদ্দীনকে এই অভিযানে প্রেরণ করেন। তাকে শক্তি যোগাতে তার পেছনে খান জাহান খানের নেতৃত্বে আরেকটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। দু' দলের মাঝে থেমে থেমে তিন মাস তীব্র সংঘাত চলতে থাকে। অবশেষে মীর কমরুদ্দীন হিরাপ্পনহাল্লী পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। ৪০০ সৈন্য সহকারে বিসওয়াপ্পা নায়েক ধৃত হয়।

ওদিকে কাঙ্গিরির করদ রাজাও বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু সে যখন স্বউদ্যোগী হয়েই টিপুর আনুগত্যে সম্মতি প্রকাশ করে তখন তাকে তার দায়িত্বে বহাল রাখা হয়।

রত্নাগিরি ও মুদগিরি এলাকাতেও বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মাত্র ৩ মাসের মধ্যে মুঈনুদ্দীন তাদের সবাইকে পরাজিত করে পুনরায় সালতানাতে খোদাদাদের সীমারেখার ভেতর অন্তর্ভুক্ত করেন।

মারাঠা যাযাবরের ইসলামগ্রহণ

চিঙ্গিরিতে 'ঢুণ্ডিয়াবাগ' নামের এক মারাঠি ফৌজ তৃতীয় যুদ্ধ চলাকালে মহিসুরের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধের ভেতর কোনো

www.boimate.com

কারণে সে তার কয়েকজন সঙ্গী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে টিপুর চোখে ধুলো দিয়ে 'লক্ষ্মীওয়ার' এলাকায় পালিয়ে যায় এবং সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মহিসুরের ধারওয়ার (Dharwar), হাভেড়ি ও শাহনুর (Savanur) প্রভৃতি এলাকা চলে যায় মারাঠিদের নিয়ন্ত্রণে। তখন ঢুণ্ডিয়াবাগ এই এলাকাতে লুটতরাজ শুরু করে দেয়। এখন সে পুনরায় টিপুর সঙ্গে মিলে, তার সহায়তা নিয়ে শাহনুর নগরী দখল করে গোটা অঞ্চল টিপুর হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করে। একজন প্রতিনিধি মারফত সে তার প্রস্তাব টিপুর সামনে উপস্থাপন করে। কিন্তু সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধশেষে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে টিপু নতুন কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিলেন না। এজন্যে তিনি এ বিষয়ে তাকে কোনো ধরনের ফৌজি সহায়তা করতে পরিষ্কার অস্বীকার জানিয়ে দেন।

ওদিকে 'পুনা'-এর মারাঠি সর্দার তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে দু' হাজার সিপাহির একটি দল প্রেরণ করে। ঢুণ্ডিয়াবাগ তাদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম উপস্থিত হয় এবং টিপুর নিঃশর্ত আনুগত্য স্বীকার করে। টিপু সুলতান সন্তুষ্টচিত্তে তাকে ক্ষমা করেন এবং মহিসুর বাহিনীর উচ্চপদে নিয়োগ দেন। টিপুর এই উদারতা ও মহৎ আচরণ দেখে সে ইসলাম গ্রহণ করে। টিপু সুলতান তার নাম রাখেন 'শেখ আহমদ'। কিন্তু সে নিজের জন্যে 'মালিক জাহাঁ খান' নাম চয়ন করে।

একবার টিপুর বিরুদ্ধে তার উযির 'পুর্নিয়া'-এর একটি ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি সে ধরে ফেলে। যেখানে মীর সাদেক নিজেও সম্পৃক্ত ছিলো। তখন মীর সাদেক তার বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ তুলে টিপুর চোখে তাকে দোষী করে তুলে এবং লোকটি আপনার বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহের ফন্দি আঁটছে, এ কথা বলে চাতুর্য্যের সঙ্গে তাকে নজরবন্দি করাতে সক্ষম হয়।

টিপু সুলতান চেয়েছিলেন তাকে ক্ষমা করে পুনরায় সামরিক পদে পুনর্বহাল করবেন। কিন্তু মীর সাদেকের পীড়াপীড়ির কারণে তিনি তাকে মুক্ত করতে পারেননি। লোকটি যে টিপুর বিশ্বস্ত ছিলো, তার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, টিপু যখন ইংরেজদের হাতে শহিদ হন তখন তিনি ইংরেজদের হাত থেকে পালিয়ে সুলতানের বড় শাহযাদা ফতহ হায়দারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাকে পরাজয় স্বীকার না করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ওপর উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতনের

www.boimate.com

পরও লোকটি ইংরেজদের ওপর চোরাগুপ্তা আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিলো। অবশেষে ১৮০০ সালে ইংরেজ কর্নেল ওয়েলেসলি-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে। 'টিপুর বিশ্বস্ত সঙ্গী' শিরোনামে এ সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা আসছে।

নিযাম ও মারাঠিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গঠনের পুনর্চেষ্টা

পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে টিপু সুলতান বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধুমাত্র ইংরেজরাই আমাদের স্বদেশ ও আমাদের স্বধর্মের প্রকৃত শত্রু। তার সঙ্গে মারাঠি ও নিযামের শত্রুতা চতুর ইংরেজদের প্রতারণা ও কু-মতলবের ফসল মাত্র। এ দু'টি দেশ সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়; তারা বরং নিজ রাষ্ট্রের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার ভাবনা থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নয়তো টিপু নিজেই স্বদেশী হওয়ার কারণে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক সহায়তার প্রকৃত হকদার। যদি এ দু'টি রাজ্য নিরপেক্ষ থাকে তাহলে তার একার পক্ষে ইংরেজদের প্রতিহত করা সম্ভব। এ কারণেই এ দু'টি রাজ্যের সঙ্গে বিদ্যমান বৈরীতা দূর করে, পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের জন্যে টিপু সুলতান বারবার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং অসংখ্যবার তাদের কাছে কূটনৈতিক দূত প্রেরণ করেছেন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে টিপুর পক্ষে যতোরকম ছাড় দেওয়া সম্ভব, তা প্রদানেরও প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, তারা হয়তো টিপুর সদিচ্ছা বুঝতে পারেনি, অথবা নিজেদের সাময়িক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে তার বিরুদ্ধে ইংরেজদেরকে সহায়তা করতে বাধ্য ছিলো।

তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও টিপু সুলতান নিরাশ হননি। তিনি পুনরায় সম্পর্ক পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অতীতের তিক্ততা ভুলে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। সিন্ধিয়া ও হরিপণ্ডিতের মৃত্যুর পর মারাঠি পেশওয়া-এর সকাশে শোকবার্তা প্রেরণ করেন। যার উত্তরে পেশওয়ার পক্ষ থেকে টিপুর দু' শাহযাদার বিয়ের প্রাক্কালে শুভেচ্ছা ও শুভাষিশ-জ্ঞাপক চিঠিও এসেছিলো। কিন্তু বিষয়টি এখানেই থেমে যায়।

হায়দারাবাদের নিযাম 'কারনূল' নগরীর ওপর দাবী তুলে যদিও পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তুলেছিলো; কিন্তু টিপু তা ভুলে তার সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৭৯৫ সালের মার্চ

www.boimate.com

মাসে যখন মারাঠিরা হায়দারাবাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তখন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে সে কিছু দিনের জন্যে টিপুর ঘনিষ্ট হয়। নিযামের ভ্রাতুষ্পুত্র ইমতিয়াজুদ্দৌলা উভয় পক্ষের মাঝে ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে দৃঢ় ঐক্য তৈরির ন্যায়নিষ্ঠ প্রস্তাবনাও পেশ করে। কিন্তু ইংরেজদের মোক্ষম চাতূর্য্য ও মীর আলমের চক্রান্তের কারণে খোদ নিযামের অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও এই ঐক্য স্থায়ী হয়নি।

ইংরেজ প্রশাসনের রদ-বদল

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম চুক্তির এক বছর পর ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিন্দুস্তানে নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালসকে বদলি করে আয়ারল্যান্ড প্রেরণ করে। তার স্থানে স্যার জনশাওয়ারকে গভর্নর জেনারেল বানিয়ে হিন্দুস্তান পাঠানো হয়। তার আমলেই যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণের শেষ কিস্তি আদায়ের পর জামানত রাখা টিপুর দুই শাহযাদাকে ফেরত পাঠানো হয়। লোকটি বেশ নীতিবান ছিলো। তার মাঝে অঙ্গীকার রক্ষা করে চলার মানসিকতা ছিলো। শত্রুদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের প্রতিও সে সম্মান দেখাতো। তার পূর্ণ মনোযোগ ছিলো উত্তর ভারতের ওপর। বিশেষত অযোধ্যার ওপর। টিপুর প্রতি তার মনোযোগ ছিলো কম। তার এই নীরব মূলনীতির কারণে তাকেও বদলি করা হয়।

তার স্থানে ১৭৯৮ সালে আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা রিচার্ড কুলি উইলিসলি-কে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব দিয়ে হিন্দুস্তান প্রেরণ করা হয়। তার অন্য নাম, লর্ড উইসেলসলি বা মার্কস উইলেসলি। লোকটি ছিলো অত্যন্ত চতূর ও ধূর্ত। তার মাঝে গণতান্ত্রিক মানসিকতা ছিলো না। বলতে গেলে, স্বৈরাচারী মনোভাবসম্পন্ন ছিলো। সে হিন্দুস্তানে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পূর্বেই এখানকার রাজনৈতিক চালচিত্র পাখির চোখে অধ্যয়ন করে নিয়েছিলো। তার কূটকৌশলের কারণেই মাত্র এক বছরের মাথায় ১৭৯৯ সালে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা অর্থাৎ শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতন ঘটে। গোটা পৃথিবী তৎকালীন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট-কে এজন্যে অভিনন্দন জানিয়েছিলো যে, তিনি ভারতবর্ষের জন্যে সবচেয়ে যোগ্য লোকটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। ইউলেসলির ধূর্ততা ও চতূরতার কথা তার শত্রুরাও স্বীকার করেছে। তার একটি মন্তব্য ওই যুগে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো—

www.boimate.com

'মুসলমানরা ব্যক্তিস্বার্থের কারণে যতোই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হক না কেন; ধর্মের প্রয়োজনে তারা সবধরনের মতবিরোধ ভুলে তৎক্ষণাৎ একতাবদ্ধ হয়ে যায়। কাজেই মুসলমানদের ওপর নিযুক্ত শাসকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, কখনই তাদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করা যাবে না।'

ইউরোপে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নেপোলিয়নের উত্থান

ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট ভারতবর্ষের জেনারেল পদে এতোগুলো রদবদল এনেছিলো টিপুর সঙ্গে এমন এক যুদ্ধ আয়োজনের নাপাক বাসনা পূরণ করার উদ্দেশ্যে, যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নতুন মোড় সৃষ্টি করবে। এই বাসনা পূরণ করতেই সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত স্যার জন শিওরকে অল্প কয়েক বছরের মাথায় হটিয়ে তদস্থলে চতুর গভর্নর জেনারেল উইসলিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। এটাই সেই যুগ যখন আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সে গড়া-ভাঙ্গার খেলা চলছিলো। সেখানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। নেপোলিয়ন বোনাপোর্টের সর্বত্র জয়-জয়কার বাজছে। তার নেতৃত্বে ফ্রান্স বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও ইটালি দখল করে নিয়েছে। ইতোমধ্যে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার রাজাকেও পরাজিত করেছে। তার নেতৃত্বে ফ্রান্সের একের পর এক বিজয় ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য নিঃশেষ করে ফেলে। ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান শক্তির কারণে ইংরেজরা হিন্দুস্তানে তার অধিকৃত এলাকাগুলো হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে। ওদিকে টিপুর সঙ্গে ফরাসিদের সখ্যতা তাদের সেই আতঙ্কের পালে বাতাস যোগাতে থাকে। এই বিষয়গুলো সামাল দেওয়ার জন্যেই তারা একটি সুদূরপ্রসারী ভাবনা থেকে উইলিসলিকে ভারতবর্ষের জন্যে চয়ন করে। ওদিকে যদিও ইতোপূর্বে টিপুর পক্ষ থেকে ফ্রান্সে একের পর এক প্রেরীত দূতেরা কোনো সুসংবাদ বয়ে আনতে পারেনি; কিন্তু টিপু সুলতান এতে এতোটুকুও হতাশ হননি। তৃতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হতেই তিনি ফ্রান্সের উদ্দেশে আরেকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ওই সময় নেপোলিয়ান বিশেষ প্রয়োজনে মিসর গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তিনি টিপু সুলতানকে চিঠি লেখে জানান—

'আমি আপনাকে ইংরেজদের বজ্রথাবা থেকে বের করতে আগ্রহী। তবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সামরিক সহায়তার

www.boimate.com

প্রদানের পূর্বে আমি আপনার মহিসুরের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক চালচিত্র এবং খোদ আপনার রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে চাই। কাজেই আপনি আপনার কোনো আস্থাভাজন ব্যক্তিকে এখনই মিসর প্রেরণ করুন। ঈশ্বর আপনার শক্তি বৃদ্ধি করুন।'

আফসোসের বিষয় হলো, সেই চিঠি পথিমধ্যে মক্কা নগরীর গভর্নরের হাতে ধরা পড়ে। কূটনৈতিক পর্যায়ের সেই সময়টিতেই আগস্ট ১৭৪৮ সালে ইংরেজরা ফরাসি নৌবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে তাদের নৌবহর রোম সাগরে ডুবিয়ে দেয়। আর নেপোলিয়ন সেখান থেকে শামদেশে চলে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এভাবেই ইংরেজদেরকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ফরাসি সহায়তা লাভের সম্ভাবনা অংকুরেই মারা যায়।

বিদেশের মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নরের পদে এভাবে একের পর এক রদবদল হতে দেখে টিপু সুলতান নিশ্চিত হন যে, ইংরেজরা তার বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেই যুদ্ধে উভয়পক্ষের ভাগ্য পরীক্ষা হবে। খোদা না খাস্তা, ওই যুদ্ধে পরাজিত হলে গোটা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের অবস্থান মজবুত হয়ে যাবে। ডুবে যাবে সালতানাতে খোদাদাদের স্বাধীনতার সূর্য। এজন্যে তিনি মারাঠা ও নিযামের কাছ থেকে হতাশাব্যঞ্জক আচরণ পাওয়ার পর শেষবারের মতো উসমানি খলীফার সঙ্গে পত্রযোগে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর বাইরে কাবুলের গভর্নর যামান শাহ ও ইরানের শাসক করীম খানের সঙ্গে কূটনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগ শুরু করেন।

উসমানি সুলতানের কাছ থেকে পুনরায় নৈরাশ্য

উসমানি খলীফার সঙ্গে টিপু সুলতান ইতোপূর্বেও কয়েকবার চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন। যার ফলে উভয়পক্ষের মাঝে একধরনের সম্পর্কও গড়ে ওঠেছে। যদিও অদ্যাবধি তাদের পক্ষ থেকে মৌখিক সহমর্মিতার বাইরে কোনো ধরনের সামরিক সহায়তা পাননি; তারপরও টিপু সুলতান হতাশ হননি। তিনি পুনরায় নিজ থেকে উদ্যোগী হয়ে চিঠি লেখেন। তার উত্তরে সুলতান সলীম যেই চিঠি লেখেন, তা ছিলো

www.boimate.com

সম্পূর্ণরূপে হতাশাব্যঞ্জক। চিঠির ভাষ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ওই চিঠি থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, যেই উসমানি খলীফাকে সারা বিশ্বের মুসলমান নিজেদের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল মনে করতো, তারাও ইংরেজদের ভয়ে সাংঘাতিক রকম ভীত ছিলো। টিপু সুলতান কর্তৃক বারবার বোঝানো সত্ত্বেও সে টিপুর মনোভাব ও শত্রুপক্ষের বিপদজনক পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে সতর্ক হচ্ছিলো না। যেহেতু টিপু সুলতান আরবি ভাষা জানতেন আর ওই যুগে তুর্কিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা-ও আরবি ছিলো; এজন্যে সুলতান সলীম ওই চিঠির উত্তর আরবিতে লিখেছিলেন। চিঠির এক কোণে ৮ রবিউল আউয়াল ১২১৩ হিজরি লেখা আছে। আমাদের হিসাবমতে তা হবে ১৭৯৮ ঈসাব্দ।

পত্রটি যেহেতু দীর্ঘ, সেখানে অনেকগুলো কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে; এজন্যে আমরা সেখান থেকে চয়িত কিছু প্যারা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তবে চয়ন করার সময় আমরা সর্বান্তকরণে লক্ষ্য করেছি যেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ না পড়ে। তিনি লেখেন—

> 'আমার শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের এ কথা জানা দরকার যে, আমরা ইংরেজ ও ফরাসিদের যুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের নৈকট্যের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ থেকে দু' পক্ষের মাঝে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেছি; কিন্তু ফরাসিরা আমাদের এই নিরপেক্ষ অবস্থানের প্রতি সম্মান দেখায়নি। বরং নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নেতৃত্বে তাদের ফৌজ ১৭ মুহাররম ১২১৩ হিজরীতে মিসরের সমুদ্রবন্দর ইসকান্দারিয়া দখল করার পাশাপাশি গোটা নগরীও দখল করে নিয়েছে। সেখানে তারা এ গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, এক্ষেত্রে তারা না-কি খোদ আমাদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছে। আমাদের গোয়েন্দাদের হাতে তাদের যেসব চিঠি ধরা পড়েছে, সেখানে তাদের এ চক্রান্ত ধরা পড়েছে যে, তারা আরব বদ্বীপ দখল করে খণ্ডবিখণ্ড করতে চাচ্ছে। এ কারণেই আমরা শক্ত হাতে তাদের প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে চলেছি।
>
> যেহেতু আপনার সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের সম্পর্ক রয়েছে, এজন্যে আপনার কাছে আমরা আশা করবো, এই কল্যাণধর্মী

www.boimate.com

কাজে আমরা ফরাসিদের বিরুদ্ধে আপনার সহায়তা পাবো। আমরা জানতে পেরেছি যে, খোদ হিন্দুস্তানের ইংরেজ অধিকৃত এলাকাগুলোতেও ফরাসিরা তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছে। তারা মিসর রুট ব্যবহার করে আপনাকে সামরিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাসও দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এগুলো তাদের ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। ইংরেজরা একদিকে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি। কাজেই আপনার জন্যে অত্যাবশ্যক হলো, আপনি এক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করবেন। ফরাসি জাতি পৃথিবীর সকল ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠী ধ্বংস করার মিশনে নেমেছে। ইংরেজদের চোখে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র হলেন রোমের জনক। তিনিও হাত তুলেছেন। যেভাবে ফরাসিরা আমাদের কিছু এলাকা দখল করেছে, তদ্রূপ তারা পুরো ভারতবর্ষও দখল করতে চাচ্ছে।

আমার সব কথার সারাংশ হলো, ফরাসিরা অত্যন্ত প্রতারক জাতি। কাজেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ হলো, আপনি তাদেরকে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়ন করার ক্ষেত্রে খোদ আমাদের সহায়তা করবেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ইচ্ছে ত্যাগ করবেন। যদি তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে আমাদের লিখে অবহিত করুন। আমরা তার যথাযথ বিহিত করার চেষ্টা করবো।'

ওয়াস সালাম। —*সুলতান সলীম*

এই চিঠি পড়ে টিপু বুঝে ফেলেন যে, উসমানি খলীফার কাছ থেকে এখন কোনো ধরনের সহায়তার আশা করা নিরর্থক। তিনি তখন আরবিতেই চিঠির উত্তর লেখেন। সেখান থেকে চয়িত কিছু অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। টিপু লেখেন—

'আপনার চিঠি— যেখানে ফরাসিদের অবমাননা-লাঞ্ছনা ও ইংরেজদের প্রশংসা-গুণগান এবং আমাদের ও ইংরেজদের মধ্যকার তিক্ততার অবসানের প্রস্তাবনা ছিলো, তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমরা তো কেবল দ্বীনে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু

www.boimate.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুনরুজ্জীবন ও আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি। ফরাসিদের ধোঁকা ও প্রতারণার প্রবণতা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফহাল। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, ফরাসিরা নয়; ইংরেজরাই ভারতবর্ষের ইসলামি সালতানাত ধ্বংস করার পায়তারা করছে। যার কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা শুধু আমাদেরই নয়; বরং বিশ্বের সকল মুসলমানের ওপর ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন আপনি শুধু আমাদের জন্যে আল্লাহর বিশেষ সহায়তা ও তাওফীকের ঐকান্তিক প্রার্থনা করুন।'

ওয়াস সালাম। —*টিপু সুলতান*

কাবুল-শাসকের প্রেরণাদায়ী উত্তর

উসমানি খলীফার পাশাপাশি কাবুলের শাসক, আহমদ শাহ আবদালির পৌপুত্র যামান শাহের সকাশেও টিপু সুলতান চিঠি লেখেন। ওই সময় তার সামরিক শক্তিমত্তা খোদ ইংরেজরাও সমীহ করে চলতো। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে অত্র অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মনে করা হতো। তার উদ্দেশে টিপু সুলতান যেই চিঠি লেখেন তা মীর মুহাম্মদ রেযা ও মীর হাবীবুল্লাহ পৌঁছে দেন। ওই চিঠিতে টিপুর বক্তব্যের সারাংশ ছিলো—

'সালতানাতে খোদাদাদে প্রতি শুক্রবার জুমু'আর নামাযের পর আপনার সালতানাতের বিস্তৃতি ও স্থিতির দুআ করা হয়। আমরা সবসময়ই মুসলিম শাসকবর্গের পরস্পরে দ্বীনি বুনিয়াদের ওপর ঐক্য রচনায় আগ্রহী। এসময় বিভিন্ন ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি আমাদের ওপর হামলে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যার কারণে এক্ষেত্রে আমরা আপনার কাছে সহায়তা প্রার্থনা করছি। আশা করি, আপনি আমাদেরকে সহায়তা করে এই কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকবেন।'

উত্তরে টিপু সুলতান যামান শাহের পক্ষ থেকে উদ্দীপনাভরা প্রেরণাদায়ী ভাষ্য সম্বলিত জবাব পান। তিনি লেখেন—

www.boimate.com

'আপনার পত্র ও মূল্যবান উপহার আমাদের হাতে এসেছে। যা আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। যেহেতু ইসলামের শত্রুরা একটি ইসলামি সালতানাত ধূলিস্যাত করার পায়তারা করছে; এজন্যে আমরা আল্লাহর মদদে একটি বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমাদেরও উদ্দেশ্য, কুফর ও বিদ'আতের জঞ্জাল থেকে দেশটিকে উদ্ধার করা। আপনার প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে আপনার খেদমতে কিছু উপহার প্রেরণ করা হচ্ছে।'

যামান শাহকে ফেরাতে ইংরেজদের সফল কূটচাল

কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে যামান শাহ ৩৩ হাজার সিপাহির একটি বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে টিপুকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কাবুল থেকে রওয়ানা হন। ইংরেজরা যখন এ সংবাদ শুনতে পায় যে, টিপুকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে যামান শাহ সদলবলে বেরিয়ে পড়েছে, তখন তাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ রেখে এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যে, যামান শাহ আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজ মুসলমান ভাইকে সহায়তা করতে ব্যর্থ হয়। ইংরেজরা খুব ভালোভাবে বুঝে ফেলেছিলো যে, টিপুর সঙ্গে যামান শাহর সামরিক ঐক্য দাঁড়িয়ে গেলে ভারতবর্ষের বুকে তাদের বিদায়ঘণ্টা বেজে ওঠবে। এজন্যে তারা চাতূর্যের আশ্রয় নেয়। হিন্দুস্তানের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে ইরানের 'বুশহর' নগরীতে মুরাদাবাদের 'মাহদী আলী খান' নামের এক শিয়া মুসলমানকে 'রেজিডেন্ট'-এর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। ইংরেজরা তাকে এ দায়িত্ব দেয় যে, সে যেন ইরানের শিয়া ও কাবুলের সুন্নিদের মাঝে বিদ্বেষের বীজ বপন করে দু'দেশের জনগণের মাঝে ধর্মীয় চেতনায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এভাবে এ দু'দেশকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রাখা গেলে যামান শাহ হিন্দুস্তানের টিপুকে সহায়তা করার সুযোগ পাবে না। ইংরেজদের কাছে নিজ ধর্ম ও দেশ বিক্রিকারী দালাল নরাধম মাহদী আলী খান নিজ প্রভুর শিখিয়ে দেওয়া পথ অনুসরণ করে শিয়া-সুন্নির মাঝে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। সে ইরানে গিয়ে এই গুজব রটিয়ে দেয় যে, আফগানিস্তানে শিয়াদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন হচ্ছে। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। যামান শাহ প্রতিদিন হাজার হাজার শিয়া হত্যা করছে। যারা বেঁচে আছে তারা যেকোনো মুহূর্তে জীবন খোয়াতে পারে।

www.boimate.com

তার মুখ থেকে এমন মিথ্যা গুজব শুনে ইরানীদের আবেগ-উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। মাহদী আলী খান সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইরানের সম্রাটকে এই আশ্বাস প্রদান করে যে, ইংরেজ আফগানদের কবল থেকে তার হৃত এলাকা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সামরিক সহায়তা প্রদান করতে পূর্ণ প্রস্তুত। ইরান সম্রাট তার কথার ফাঁদে আটকা পড়ে। উত্তেজিত হয়ে আফগানিস্তানের খোরাসান অঞ্চলে আক্রমণ করে বসে। হেরাতের গভর্নরকে যামান শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কুমন্ত্রণা দেয়। যার ফলে যামান শাহ নিরূপায় হয়ে তার মনোযোগ হিন্দুস্তানের পরিবর্তে স্বরাজ্য আফগানিস্তানের ওপর নিবদ্ধ করতে বাধ্য হন। টিপুকে সহায়তার উদ্দেশ্যে তার যেই বাহিনী হিন্দুস্তানের সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলো তাদেরকে কাবুল ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে ইংরেজরা যামান শাহকে টিপু থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চক্রান্তে সফল হয়। ঈমান বিক্রি করা এই চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হওয়ায় ইংরেজরা মাহদী আলী খানকে নগদ ২ লক্ষ ৮০ হাজার রুপি প্রদান করে।

ইরান-সম্রাটের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান

ওই যুগে ইরান মুসলিম জাহানের একটি বৃহৎ শক্তিশালী সাম্রাজ্য বিবেচিত হতো। টিপু সুলতান ইরানের সম্রাট করীম খানের কাছে ২০ মার্চ ১৭৯৮ সালে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। দলটিতে ছিলেন মীর আবদুর রহমান, মীর আইনুল্লাহ আলী প্রমুখ। তাদের মাধ্যমে ইরান-সম্রাটের খেদমতে চারটি মূল্যবান হাতি ও প্রচুর হীরা-জওহরাত উপহার প্রেরণ করা হয়। তার সমীপে লেখা পত্রে টিপু এ আবেদন পেশ করেন যে, 'সালতানাতে খোদাদাদের যেকোনো নৌবন্দরের বিনিময়ে ইরানের যেকোনো সামরিক নৌবন্দর তাকে ভাড়া দেওয়া হোক।' টিপুর এই আবেদনে করীম শাহ সাড়া দেন। এ বিষয়ে যাবতীয় খুঁটি-নাটি চূড়ান্ত করার জন্যে বাবা খান ও ফতেহ আলী বেগ নামে দু'জন প্রতিনিধি শ্রীরঙ্গাপত্তনাম প্রেরণ করেন। সম্রাটের এই সিদ্ধান্তে আপ্লুত হয়ে টিপু সুলতান একটি শুকরিয়াজ্ঞাপক জবাবী পত্র লেখেন। সেখানে তিনি লেখেন—

> 'আপনার পত্র পেয়েছি। পত্রের প্রতিটি ছত্রে আপনার ঐকান্তিকতা ফুটে ওঠেছে। যা পাঠ করে আমি সীমাহীন

www.boimate.com

আপ্লুত। আল্লাহ তা'আলা আপনার রাজত্ব দৃঢ় করুন। আলহামদুলিল্লাহ, যেমনটি আশা করেছিলাম– আপনিও দু' পক্ষের ঐক্য ও যূথবদ্ধতার গুরুত্ব অনুভব করেছেন। ইসলামি সৌহার্দ্যের চেতনায় আমি যেভাবে আপনার অধীনস্থ সকল এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলকে আমার নিজের এলাকা মনে করি, আশাকরি অনুরূপ আপনিও আমার অধীনস্থ সকল এলাকাকে আপনার নিজের এলাকা মনে করবেন। কোন নৌবন্দরটি আপনার প্রয়োজন, তা জানালে বাধিত হবো।

সিলমহর ও স্বাক্ষর —*টিপু সুলতান*

কিন্তু যতোক্ষণে টিপুর এই চিঠি ইরান পৌঁছে, মাহদী আলী খানের চক্রান্তে আফগানিস্তান ও ইরানের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে গেছে। যার কারণে মহিসুর সালতানাত ও ইরানের মাঝে অঙ্গীকার মুতাবেক নৌবন্দর বিনিময়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। শিয়া ও সুন্নিদের মাঝে বিভেদের বীজ বপন করে ইংরেজরা একসঙ্গে ইরান ও আফগানিস্তান-উভয় রাষ্ট্রকেই টিপু সুলতান থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়।

রাষ্ট্রের হিন্দু রাজাদের উদ্দেশে ঐক্যের আহ্বান

টিপু সুলতান ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের অস্তিত্ব সমূলে উৎপাটিত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে দেশ-বিদেশের শুধু বড় বড় শক্তিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যথেষ্ট মনে করেননি। বরং দেশের ভেতরের ছোট ছোট সার্বভৌম রাজ্যগুলোকেও ইংরেজদের চক্রান্ত ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের ভয়ানক অপবিত্র ইচ্ছা সম্পর্কে সতর্ক করেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি কাশ্মীর, যোধপুর, জয়পুর, নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের হিন্দু রাজাদের সকাশে নিজের পক্ষ থেকে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে পত্র সমেত প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। যদিও বাহ্যত মারাঠা ও নিযামের তুলনায় সেগুলো ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; কিন্তু তারপরও তিনি সেগুলোকে ক্ষুদ্র জ্ঞান না করে, দেশের স্বাধীনতার দিকে তাকিয়ে, দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, স্বদেশীদের পক্ষে শ্লোগান তুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, দীর্ঘ দূরত্বের কারণে এবং তারা নিজেরাই নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার কারণে ইংরেজবিরোধী এই যুদ্ধে টিপুর স্বপক্ষে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি।

www.boimate.com

মীর সাদিকের প্রতারণার জাল বিস্তার

মহিসুর সাম্রাজ্যে টিপু সুলতানের পর সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলো মীর সাদিক। যদিও টিপু সুলতান তাকে একবার টিপুর বিরুদ্ধে কিছু সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে মন্ত্রীর পদ থেকে পদচ্যুত করেছিলেন। কিন্তু শেষতক তোষামদি করে পুনরায় নিজের পূর্বের পদে বহাল হতে সক্ষম হয়। তৃতীয় যুদ্ধের পর টিপু সুলতান যখন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মজলিসে শুরা তথা সংসদ গঠন করেন তখন তাকে এ সংসদের প্রধান মনোনীত করেন। লোকটি কথায় কথায় টিপু সুলতানের সামনে কসম করে নিজ বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতো। কিন্তু টিপু কর্তৃক তাকে পদচ্যুত করার অপমান সে কখনই অন্তর থেকে ভুলতে পারেনি। যার কারণে সে মন থেকে সবসময় টিপুর ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজতো।

সংসদের প্রধানের পদে আরোহণের পর সে প্রথমে টিপু সুলতানের প্রকৃত কল্যাণকামীদের একটি তালিকা তৈরি করে। এরপর সময় বুঝে তাদের একেকজনের বিরুদ্ধে একেকটি মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাদেরকে টিপুর চোখে অপরাধী সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এভাবে সে টিপুর অনেক একনিষ্ঠ সঙ্গীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ তুলে দিয়ে তাদেরকে তাদের পদ থেকে অপসারিত করতে সক্ষম হয়। কারণ সে আশঙ্কা করতো যে, এ লোকগুলোকে দূরে সরানো না গেলে তারা সুলতানের ঘনিষ্টভাজন হয়ে তার গৃহিত চক্রান্ত ও কূটচাল সুলতানের কাছে ফাঁস করে দিতে পারে।

প্রজাতন্ত্রের ধুঁয়ো তুলে সে যাবতীয় ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে ফেলে। তাকে এড়িয়ে কোনো চিঠি বা বার্তা তার অজান্তে সুলতানের হাতে পৌঁছুতে পারতো না। ওদিকে সে গোপনে জনগণের ওপর এমন কিছু শক্ত আইন প্রয়োগ করতে শুরু করে, যা তাদেরকে তৎক্ষণাৎ টিপু সুলতানের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে।

সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের এই চতুর্থ চক্রান্তের কথা সে শুধু জানতো-ই না; বরং সে নিজেও ওই চক্রান্তে সম্পৃক্ত ছিলো। কিন্তু পূর্ণ চাতুর্য ও সচেতনতার সঙ্গে সে ওই চক্রান্তের সংবাদ টিপুর কাছে

www.boimate.com

পৌঁছতে দেয়নি। সুলতানের ব্রাহ্মণ উযির পুর্নিয়ার অবিশ্বস্তা ও চক্রান্ত সম্পর্কে যখন মারাঠি নওমুসলিম মালিক জাহাঁ খান টিপু সুলতানকে সতর্ক করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন এই মীর সাদিক-ই তার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু এতোটুকুই নয়; সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে, সুলতানের কান ভারী করে তাকে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতন পর্যন্ত নজরবন্দি রাখার বন্দোবস্ত করে। মীর সাদেকের এই চক্রান্তের সঙ্গে পুর্নিয়া ও মীর মুঈনুদ্দীন খান-সহ আরও বেশ কিছু আমলা ও সামরিক কর্মকর্তা সম্পৃক্ত ছিলো।

www.boimate.com

চতুর্দশ অধ্যায়

চতুর্থ যুদ্ধের সূচনা থেকে টিপুর শাহাদত পর্যন্ত

www.boimate.com

চতুর্থ যুদ্ধ বাঁধাতে ইংরেজদের পরিকল্পনা

১৭৯৮ সালে ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিট লর্ড ওয়েলেসলি (Wellesly)-কে হিন্দুস্তানের গভর্নর জেনারেল বানিয়ে প্রেরণ করেছিলো এদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের অপবিত্র পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে। ইউলেসলি হিন্দুস্তানে পৌঁছে সর্বপ্রথম এখানকার রাজনৈতিক চিত্র গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে। সে প্রথমে একটি তালিকা তৈরি করে যে, তার সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পথে কারা কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে?

ওয়েলেসলিকে তা চূড়ান্ত করতে খুব বেশি বেগ পোহাতে হয়নি। কারণ, ওই সময় দিল্লির দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুত রাজ্যগুলো পারস্পরিক ঐক্য না থাকার কারণে দৃঢ় হতে পারছিলো না। অযোধ্যা তদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। সেখানে এখন নামকাওয়াস্তে সার্বভৌমত্ব চলছে। আরকাটের নবাব অনেক দিন আগেই তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। ট্রাভাংকুরের রাজা নিয়মিত তাদেরকে কর দিয়ে শাসন-ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে। মারাঠাদের ঐক্যে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে। যার ফলে পুনা নগরীর নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর প্রভাব আক্ষরিক পরিণত হয়েছে। ক'দিন আগে মারাঠাদের সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে হায়দারাবাদের নিযামের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। হায়দারাবাদে খোদ তাদের রেজিড্যান্ট জেমস কর্গ প্যাট্রিক নিরংকুশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

কাজেই সামষ্টিকভাবে মহিসুর সাম্রাজ্য ব্যতিরেকে হিন্দুস্তানের অন্য সকল ছোট-বড় রাজ্য পতনোন্মুখ হয়ে পড়েছে। কাজেই এ মুহূর্তে তারা যদি এদেশে তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নাপাক অভিলাস বাস্তবায়ন শুরু করে, তাহলে পারস্পরিক ঐক্য, অভ্যন্তরীণ জটিলতা ও অন্তর্গত বিশৃঙ্খলার কারণে হিন্দুস্তানের কোনো স্থানীয় ক্ষমতা তাদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না। আশঙ্কার কেন্দ্রবিন্দুতে স্রেফ টিপু সুলতানই

www.boimate.com

রয়েছে। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পথে সেই জটিলতা সৃষ্টি করবে। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম চুক্তির কারণে যদিও টিপু সুলতান তার অর্ধেক রাজত্ব খুইয়ে ফেলেছেন; কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি তার রাজত্বে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করে যুদ্ধের ক্ষতস্থান সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাকে তিনি সাজিয়ে তুলে অত্যন্ত সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছেন। সেনাবাহিনীর অদ্যোন্ত পুনর্বিন্যাস করেছেন। নৌশক্তি পূর্বাপেক্ষা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছেন। যুদ্ধের জরিমানা আদায় করা সত্ত্বেও বুদ্ধিদীপ্ত দেশপরিচালনার সুবাদে মহিসুরের অর্থনৈতিক অবস্থার অভাবনীয় উন্নতি উপহার দিতে পেরেছেন।

উপরিউক্ত কারণসমূহ সামনে রেখে লর্ড উইলিসলি (Wellesly) এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ভারতবর্ষের বুকে এক টিপু সুলতানই তার সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে। উপর্যপুরি টিপু তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার আলোকে বিদেশী মুসলিম শক্তি তথা ইরান, আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তান ছাড়াও ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপোর্টের সঙ্গেও গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এজনে উইলিসলি সর্বপ্রথম এ প্রচেষ্টা শুরু করে যে, টিপুর জন্যে বৈদেশিক সহায়তা আগমনের সবগুলো পথ বন্ধ করে ফেলতে হবে। সেই ভাবনা থেকেই নেপোলিয়ানের নৌবহর রোম সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়। তুর্কিরা শামদেশে তার ওপর আক্রমণ করে বসে। যার ফলে এখন আর নেপোলিয়ানের পক্ষে অঙ্গীকার অনুসারে টিপু সুলতানকে সহায়তা করার জন্যে মিসরের পথ ব্যবহার করে হিন্দুস্তানে আসা ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা সম্ভব নয়। আফগানিস্তানের যামান শাহ টিপু সুলতানকে সহায়তা করার জন্যে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত-সীমান্তে চলে এসেছিলো। ইংরেজরা দাবার চাল ফেলে ইরানকে তার ওপর আক্রমণ করার জন্যে এমনভাবে লেলিয়ে দেয় যে, এখন তাকে টিপুর সহায়তার ইচ্ছে ত্যাগ করে, বাধ্য হয়ে, খোদ নিজ রাজত্ব বাঁচাতে আফগানিস্তানে ফিরে আসতে হন। তুর্কিস্তানের সম্রাট সলীম তো পূর্বেই হতাশাব্যঞ্জক উত্তর জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি উল্টো তাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করার পরামর্শ দিয়ে নিজের মনোভাব জানিয়ে দেন। অযোধ্যা ও কর্নাটকের রাজারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছেন; তাদের পক্ষে টিপুকে সামরিক সহায়তা

www.boimate.com

করার কল্পনাও দুস্কর। ওই সময় নেপাল, কাশ্মীর, জয়পুর ও যোধপুরে কয়েকটি ছোট ছোট হিন্দু রাজ্য ছিলো। কিন্তু তাদের এ শক্তি ছিলো না যে, তারা এতো দূর থেকে টিপুকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসবে। পুরো ভারতবর্ষে টিপুকে সামরিক সহায়তা করার মতো ক্ষমতা স্রেফ মারাঠা ও নিযামেরই ছিলো। এজন্যে এ দু'টি রাজ্য যেন টিপুকে কোনো ধরনের সহায়তা করতে না পারে, এ উদ্দেশ্যে সহায়তার সম্ভাব্য সকল পথ বন্ধ করাই লর্ড উইসলির চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

সাবসিডিয়ারি সিস্টেম

উইলেসলি(Wellesly)-এর মনে এ আশঙ্কা ছিলো যে, নিযাম ও মারাঠি টিপুর স্বদেশী হওয়ার কারণে যেকোনো মুহূর্তে তার সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। এজন্যে এ দু'টি দেশকে টিপু থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখার উদ্দেশ্যে সাবসিডিয়ারি সিস্টেম নামে একটি স্কিম তৈরি করে। এই স্কিম অনুসারে এ দু'টি রাজ্য নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার জন্যে বিদেশী ফৌজি সরিয়ে ইংরেজ রেজিডেন্ট নিয়োগ দেবে। সরাসরি বললে কোনো রাজ্যই রাজি হবে না। এর ওপর তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এ কথা বলে তাদেরকে ধোঁকা দেয় যে, এই স্কিমের আসল উদ্দেশ্য হলো শত্রুপক্ষের যেকোনো আক্রমণ থেকে তাদের রাজ্যগুলো নিরাপদ রাখা। অথচ ভেতরে ভেতরে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিলো, কার্যত এই দু'টি রাষ্ট্রকে বিকলাঙ্গ করে ফেলা। যার ফলে একসময় এ দু'টি রাষ্ট্রের শাসনের ছড়ি ইংরেজদের হাতে চলে আসবে।

নিযামের নির্বুদ্ধিতা ও স্কিমে সম্মতি প্রদান

এই স্কিমটির সর্বপ্রথম কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় হায়দারাবাদের ওপর। এ রাজ্যটির সামরিক অবস্থা আগ থেকেই শোচনীয় ছিলো। এরা সবসময় অন্যের ওপর ভর করে চলতে অভ্যস্ত ছিলো। যার কারণে তারা স্কিমটিকে লুফে নেয়। ইংরেজরা হায়দারাবাদের নিযামকে সর্বপ্রথম এ পরামর্শ দেয় যে, সে যেন তাদের সেনাবাহিনীতে কর্মরত হাজার ফরাসি সৈন্যকে চাকুরিচ্যুত করে। প্রথম দিকে নিযাম তাদের সেই পরামর্শে রাজি হয়নি। কিন্তু তার উযির ও ইংরেজদের কেনা গোলাম মীর আলেমের উপর্যপুরি পীড়াপীড়ির কারণে সে সম্মত হয়। ২২ অক্টোবর ১৭৯৮ সালে

www.boimate.com

এ বিষয়ে দু'পক্ষের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ধারাগুলো নিম্নরূপ ছিলো–

১. নিযাম তার রাজ্যে ৬ হাজার ইংরেজ ফৌজ নিয়োগ দেবে।
২. এই ফৌজিদের জন্যে হায়দারাবাদে একটি বিশাল তোপখানা স্থাপন করা হবে।
৩. নিযাম ইংরেজ সিপাহিদের বেতন বাবদ বার্ষিক ৪ লক্ষ রুপি আদায় করবে।
৪. আগামীতে নিযাম তার সেনাবাহিনীতে কোনো বিদেশী নিয়োগ দেবে না।
৫. এ চুক্তির পর নিযাম ইংরেজদের করদ রাজা বিবেচিত হবে।

এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অর্থ হলো, এখন থেকে নিযাম টিপুর বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেগ গ্রহণের সময় ইংরেজদের কাছ থেকে সামরিক সহায়তা নিতে বাধ্য। যার অর্থ হলো, নিযামের ব্যাপারে এখন আর ইংরেজদেরকে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা করতে হবে না। তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

স্কিমের ওপর স্বাক্ষর করতে মারাঠিদের ওপর চাপ প্রয়োগ

স্কিমের ওপর নিযামের স্বাক্ষর সম্পন্ন হওয়ার পর এখন মারাঠিদের পালা। টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধে নামার আগে অবশ্যই মারাঠিদের সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে। ন্যূনতম তাদেরকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় রাখতে হবে। কোম্পানি নিযামের মতো মারাঠিদেরকেও ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পীড়াপীড়ি শুরু করে।

যখন তাদের উপর্যপুরি অনুরোধ সত্ত্বেও মারাঠিরা তাদের স্কিমে স্বাক্ষর করতে রাজি হচ্ছিলো না তখন তারা মারাঠিদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পুনার নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-কে গোয়ালিয়রের দৌলত রাও সিন্ধিয়া পুনাতেই নজরবন্দি করে ফেলে। ইংরেজরা নানা ফার্নাভেজ কে বলে, আপনি যদি আমাদের এ শর্তে সম্মত হন তাহলে আমরা আপনাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবো। তাহলো, টিপুর বিরুদ্ধে আমরা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো তখন আমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। দৌলত রাও সিন্ধিয়া যখন এই সংবাদ পায় তখন সে বুদ্ধি

www.boimate.com

করে সে ধরনের পরিস্থিতি চলে আসার আগেই তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়। যার ফলে মারাঠিদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করে দুর্বল করে ফেলার ফিরিঙ্গি চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। তারপরও ইংরেজরা দৌলত রাও সিন্ধিয়াকে পুনা থেকে গোয়ালিয়রে পাঠাতে সক্ষম হয়। রাজধানী থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে সিন্ধিয়ার ব্যাপারে ইংরেজদের আশঙ্কা হ্রাস পায়। অন্যদিকে নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিলো না। সে যখন নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে তখন কীকরে সে টিপু সুলতানকে সামরিক সহায়তা প্রদান করার দুঃসাহস দেখাবে! যদিও সে বিগত চুক্তির আলোকে প্রয়োজনের সময় ইংরেজদেরকে সহায়তা করার অঙ্গীকার করেছিলো; কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সাবসিডিয়ারি সিস্টেমের ওপর স্বাক্ষর করতে সে-ও পরিষ্কার অসম্মতি জানিয়ে দেয়। যার ফলে ইংরেজরা অত্যন্ত আশাহত হয়।

টিপুকে অসতর্ক রাখার অপচেষ্টা

যখন জেনারেল ওয়েলেসলি (Wellesly) চতুর্দিক থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, টিপুর সঙ্গে তার যুদ্ধ সংঘটিত হলে টিপুর জন্যে কেউ সামরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবে না, তখন সে তার আসল মতলব চরিতার্থ করার মিশনে আত্মনিয়োগ করে। সে এখন যুদ্ধ শুরু করার অজুহাত খোঁজা শুরু করে। সে জানতো, বিনা কারণে বা বিনা উস্কানিতে টিপুর ওপর আক্রমণ করতে গেলে কোনো মিত্র রাজ্য সঙ্গ দেবে না।

জেনারেল ওয়েলেসলি-এর এরচেয়েও বেশি প্রচেষ্টা এ নিয়ে ছিলো যে, যেভাবেই হোক টিপুকে সর্বধরনের যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও সমর-প্রস্তুতি সম্পর্কে অনবহিত রাখতে হবে। এজন্যে সে তার সবধরনের কথা-বার্তা ও চিঠি-পত্রের মাঝে টিপু সুলতানকে এ আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করে যে, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বহাল রাখতে আগ্রহী। যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো ইচ্ছে তাদের নেই।

ওদিকে মীর সাদিক-সহ অন্যান্য গাদ্দার উযির টিপু সুলতানকে ইংরেজ যুদ্ধ-প্রস্তুতির লেশমাত্র জানার সুযোগ দেয়নি। জেনারেল ওয়েলেসলি হিন্দুস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর টিপু সুলতান তাকে অভিনন্দন

www.boimate.com

জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, আশা করি আপনি আপনার আমলে পূর্বের চুক্তিগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করবেন। তখন ওয়েলেসলি-ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে টিপু সুলতানকে পত্র লেখে। সেই পত্রে সে এ মনোভাব ব্যক্ত করে যে, আমি উভয়পক্ষের মাঝে মৈত্রী গড়ে তুলতে আগ্রহী। এমনকি সে তার সদিচ্ছার প্রমাণ দেওয়ার জন্যে বিতর্কিত এলাকাগুলোর ব্যাপারে দু'পক্ষের ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্যে একটি কমিশন গঠন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। কিন্তু আদতে এ ছিলো তার মনের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে টিপু সুলতানকে অসতর্ক রাখার কূটকৌশল। যেই কৌশল সে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধের জন্যে অজুহাত সন্ধান

যুদ্ধ শুরু করার জন্যে ওয়েলেসলি অজুহাত খুঁজছিলো। যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন। কাজেই বিনা প্রয়োজনে বিলম্ব করা হলে তা নতুন কোনো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তারই ধারাবাহিকতায় সে টিপু সুলতানকে উত্তেজিত করার জন্যে সর্বপ্রথম একটি কঠোর শর্ত সম্বলিত পত্র লেখে। ওই পত্রে সে এ অপবাদ আরোপ করে যে, টিপু সুলতান ফরাসিদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজদের বিনাশ করতে চাচ্ছে। (সম্ভবতঃ সে মরিশাস থেকে ফরাসিদের আগমনের দিকে ইঙ্গিত করছিলো) অনুসন্ধানের জন্যে আমাদের পক্ষ থেকে মেজর ডোটান-কে প্রেরণ করা হচ্ছে। কোম্পানির নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যে সে যেকোনো এলাকায় যাতায়াতের দাবী তুলতে পারে। যা পূরণ করা আপনার ওপর আবশ্যক।

ওই সময় ওয়েলেসলি কলকাতায় অবস্থান করছিলো। চিঠি প্রেরণ করেই সে তার সকল সিপাহিকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে নিজেও মাদ্রাজ পৌঁছে যায়। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম থেকে টিপু সুলতান তাকে তার চিঠির যেই উত্তর লেখেন তা সে মাদ্রাজে বসেই পেয়ে যায়। উত্তরে টিপু লিখেছিলেন—

> 'মরিশাসে ফরাসিদের সঙ্গে আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো চুক্তি করিনি। ঘটনা হলো, ব্যবসায়ীদের একটি জাহাজ বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে মরিশাস গিয়েছিলো। ফেরার পথে কিছু

www.boimate.com

ফরাসি মরিশাস থেকে সেই জাহাজে আরোহণ করে। তারা চাকুরির সন্ধানে আমাদের এলাকায় এসেছে। তাদের কেউই যুদ্ধবাজ সিপাহি নয়। তাদের ব্যাপারে আপনার কোনো ধরনের ভুল বোঝার প্রয়োজন নেই।

আপনাদের নির্দেশনা অনুসারে বর্তমান সময়ে আমি কোনো ধরনের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে সময় ব্যয় করছি না। বরং আমি আমার সিংহভাগ সময় নির্জন ইবাদতে ব্যয় করছি। আপনার পক্ষ থেকে কোম্পানির নিরাপত্তার নামে যুদ্ধের উস্কানি আমাকে বিস্মিত করেছে। আমি আশা করবো, আপনি এমন কোনো কথা তুলবেন না যা আমাদের দু' পক্ষের মাঝে চির ধরাবে।'

ওয়েলেসলি কল্পনা করেনি যে, টিপু এমন কোমলতাপূর্ণ উত্তর দেবেন। সে মূলত কোনোভাবে টিপু সুলতানকে উত্তেজিত করে যুদ্ধের অজুহাত খুঁজছিলো। তার সেই ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায় সে এবার আরও কঠোর ভাষায় পত্র লেখে। যেখানে সে এ ধমকি দিয়েছিলো—

'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিরাপত্তার জন্যে টিপু সুলতান যেন তাৎক্ষণিকভাবে মঙ্গলোর-সহ পুরো পশ্চিম উপকূলীয় নৌবন্দর তার হাতে তুলে দেয়। দ্বিতীয়তঃ সামরিক বাহিনী থেকে সকল ফরাসিকে অনতিবিলম্বে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে ইংরেজ সিপাহিদেরকে নিয়োগ দিতে হবে। কোম্পানি এই চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্যে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছে। এর ব্যত্যয় হলে কোম্পানি আপনার ওপর আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করতে পারে'।

একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন শাসক হিসেবে এ ধরনের অন্যায় আব্দার পূরণ করা টিপু সুলতানের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। যদিও টিপু সুলতান তাদের কিছু শর্ত মেনে নেওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন; কিন্তু মীর সাদিক এ কথা বলে তাকে এথেকে নিবৃত রাখে যে, 'আপনি ইংরেজদের প্রতি সমীহ দেখাতে যাবেন না। প্রয়োজন দেখা দিলে আমাদের সেনাবাহিনী তাদের রুখে দিতে প্রস্তুত।' টিপু সুলতানের অসম্মতি প্রকাশের মাধ্যমে ওয়েলেসলির মনোবাসনা পূরণ হয়ে যায়। সে পরিষ্কার যুদ্ধের ডামাঢোল পেটাতে শুরু করে।

www.boimate.com

পদচ্যুত রাজার রানীর চক্রান্ত

নবাব হায়দার আলী মহিসুরের সিংহাসনে আরোহণ করার পর মহানুভবতা প্রদর্শন করে অপসৃত রাজার জন্যে একটি এলাকার জমিদারি বরাদ্দ করেন। ওই এলাকাটির বার্ষিক আয় ছিলো ৩ লক্ষ রুপি। উদ্দেশ্য ছিলো, যেন এই আয় দিয়ে ওই রাজা সপরিবারে সম্মানজনক জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু এই পরিবার একসময় রাজসিংহাসনের অধিকারী ছিলো; এজন্যে পরবর্তীকালে সবধরনের সুযোগ-সুবিধা ও প্রাচূর্য্য ভোগ করা সত্ত্বেও হিন্দু এই পরিবারের সদস্যদের চোখে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণের খোয়াব ছিলো। এই খোয়াব পূরণের জন্যে তারা মাঝে-মধ্যে এদিক-ওদিক দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতো। তাদের সেই গোপন প্রচেষ্টার সংবাদ হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের কাছে যদিও ঠিকঠাক পৌঁছে যেতো; কিন্তু তারা দু'জনই তাদের অতীতের মহানুভবতা স্মরণ করে তাদের প্রতিটি ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করতেন।

ইংরেজরা যখন মহিসুরের বিরুদ্ধে চতুর্থ ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে তখন এই পরিবারটির চোখে হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার খোয়াব নতুন করে জেগে ওঠে। অপসৃত রাজা কৃষ্ণরাওয়ের বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মী উমানী এ বিষয়ে একটি চিঠি লেখে তুরমুক রাওয়ের মাধ্যমে একজন প্রতিনিধি ইংরেজ জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কাছে প্রেরণ করে। সেখানে সে তাদের হারানো ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তার কাছে সহায়তার আবেদন পেশ করে। এর বিনিময়ে সে নগদ ৩ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব পেশ করে। বাকি কথাবার্তা চূড়ান্ত করার জন্যে সে নিজের পক্ষ থেকে তুরমুক রাওকে পূর্ণ এক্তিয়ার প্রদান করে। বিষয়টি নিয়ে তুরমুক রাও ইংরেজদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কথাবার্তা চালিয়ে যায়। ওয়েলেসলি লক্ষ্মী উমানী-কে আশ্বস্ত করে যে, সে মহিসুরের রাজসিংহাসন তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে সবধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত। শর্ত হলো, চতুর্থ যুদ্ধে সে টিপু সুলতানকে সমর্থন জানাবে না। এভাবেই স্বার্থের বেড়াজালে পরিবারটি আরেকবার ভুলে বসে যে, তাদের ওপর হায়দার আলী ও টিপু সুলতান কী পরিমাণ মহানুভবতা ও উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। তারা সুলতানের দেওয়া ঐশ্বর্য্য খোদ সুলতানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চক্রান্ত শুরু করে।

www.boimate.com

মাদ্রাজ প্রশাসনের নীতিবান সেক্রেটারির প্রতিবাদ

যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর ওয়েলেসলি (Wellesly) সিদ্ধান্ত নেয়, সে তার অপবিত্র চক্রান্তের বিবরণ সহকর্মী ও ফৌজি জেনারেলদের সামনে তুলে ধরবে। সর্বপ্রথম সে মাদ্রাজ প্রশাসনের সেক্রেটারি মিস্টার যোসেফের কাছে নিজ ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তাকে পত্র মারফত অবহিত করে যে, মরিশাসে ফরাসি সেনাবাহিনীর সঙ্গে টিপু আমাদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক চুক্তি সম্পন্ন করেছে। যার কারণে যুদ্ধ দেখা দিতে পারে। কাজেই বিষয়টি নিয়ে আর অবহেলা করা যাবে না। সতর্কতাবশতঃ এখনই মহিসুরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আমাদের সৈন্য নিযুক্ত করুন।

মাদ্রাজ প্রশাসনের সেক্রেটারি মিস্টার যোসেফ ছিলেন নীতিবান মানুষ। তিনি টিপু সুলতানের অতীতের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি খুব ভালো ভাবে জানতেন, আর যাই হোক, টিপু সুলতান কখনই আগ বাড়িয়ে চুক্তি লংঘন করার মতো মানুষ নন। সেমতে তিনি ওয়েলেসলিকে ফিরতি চিঠিতে এ কথা লেখে পাঠান যে, ফরাসিদের বর্তমান অবস্থা ও ঘটনাপ্রবাহর আলোকে এ কথা অসম্ভব যে, তারা নিকট আগামীতে টিপুর সঙ্গে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক ঐক্য গড়ে তুলবে। কাজেই আমাদের জন্যে এমন কোনো কাজ করা সমীচিন হবে না— যা আমাদের কপালে দুর্নামের দাঁগ ফেলবে এবং যুদ্ধ সূচনার দোষ আমাদের ওপর বর্তাবে।

ওয়েলেসলিকে তার ভাই-ও চিঠি লেখে জানায় যে, আমার অনুসন্ধানমতে টিপুর ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের সংবাদ মিথ্যা।

বাস্তবতা হলো, খোদ ওয়েলেসলি-ও এ কথা নিশ্চিত জানতো যে, টিপু সুলতান আগ বাড়িয়ে আক্রমণের পদক্ষেপ নেবেন না। ৪ নভেম্বর ১৭৯৮ ঈসাব্দে সে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি চিঠি লেখে। সেখানে সে এ কথা লিখেছিলো, আমি নিশ্চিত— 'টিপু সুলতান ফরাসিদের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো কাজ করতে পারবে না। কিন্তু তারপরও কালবিলম্ব না করে আমাদের এখনই যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।' তার এ কথা প্রমাণিত করে যে, আসলে ওয়েলেসলি যুদ্ধ বাঁধাতেই এই অজুহাতগুলো দাঁড় করিয়েছিলো। সে যেকোনো মূল্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাচ্ছিলো। তার মাথায় যুদ্ধের ভূত চেপেছিলো।

www.boimate.com

দেশ বিক্রির কুমতলববাজদের সীমাহীন দৌড়-ঝাঁপ

একদিকে ইংরেজরা টিপু নামের এই পথের কাঁটা দূর করতে উদগ্রীব ছিলো; যার পূর্ণ প্রস্তুতি তারা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। অন্যদিকে সেই ইংরেজদের প্ররোচনায় টিপুর দয়াভোগী কিছু উযির ও সামরিক কর্মকর্তা খোদ নিজেদের মহান নেতাকে মৃত্যুর ঘুম পাড়াতে ইংরেজদের সামনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে দেওয়ার ফন্দি আঁটছিলো। এই বিশ্বাসঘাতক শ্রেণির মূল হোতা ছিলো প্রধান উযির মীর সাদিক। জাতিসত্তা বিকিয়ে দেওয়ার এই অপকর্মে তাকে সহায়তা করেছে, মীর মুঈনুদ্দীন, মীর কমরুদ্দীন, গোলাম আলী লেংড়া ও পুর্নিয়া প্রমুখ। এদের অধিকাংশ-ই শিয়া মতাবলম্বী। এদের প্রত্যেকেরই অতীতে কোনো না কোনো অপকর্ম ছিলো। টিপুর বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে এদের প্রত্যেকেই ইতোপূর্বে নিজ পদ থেকে অপসৃত হয়েছিলো। কেউ কেউ রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের অভিযোগে কিছুদিন নজরবন্দিও ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে টিপু সুলতান দয়া মহানুভবতা ও উদারতা প্রদর্শন করে তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং পূর্বের পদে বহাল করেন। এ কারণেই টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে অপমানের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের ভেতর গোপন বৈঠকও করেছে। পারস্পরিক শলা-পরামর্শ সেরে তারা ইংরেজদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়, মহিসুরের ওপর আক্রমণের জন্যে তাদেরকে কোন কোন পথ অবলম্বন করতে হবে এবং কোন কোন কেল্লারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে ক্রয় করতে হবে?

ঈমান ও কুফরির রণাঙ্গনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন

১৭৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ চলছে। শীতকাল কেটে গেছে। গ্রীষ্মের সূচনা হতে চলেছে। এমনিতেই সামষ্টিকভাবে মহিসুর রাজ্য ছিলো নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার চমৎকার দেশ। পরিবেশ সবসময় ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। জেনারেল হ্যারিসের নেতৃত্বে ২১ হাজার স্বশস্ত্র সৈন্য– যারা ভিল্লোরে জমায়েত ছিলো– মহিসুরের উদ্দেশে কোচ শুরু করে। আম্বুর নামক স্থানে হায়দারাবাদের নিযামের ১৬ হাজার সিপাহি মীর আলমের নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। মুম্বাই থেকে জেনারেল

www.boimate.com

স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ৭ হাজার অভিজ্ঞ সিপাহি কন্যানুর নগরীতে পৌঁছে যায়। কর্নেল ব্রাউন ও কর্নেল রেড-এর নেতৃত্বে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আরেকটি দল শ্রীরঙ্গাপত্তনামের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে ত্রিচিনোপলী (Trichinopoly) জড়ো হয়। এভাবে ইংরেজদের যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু হয়। পরিকল্পনা অনুসারে এ যুদ্ধে জেনারেল হ্যারিসের ওপর সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বভার অর্পিত হয়।

দায়মুক্তির কৌশল হিসেবে সর্বশেষ পদক্ষেপ

এমন বিশাল রণপ্রস্তুতির কারণে জেনারেল ওয়েলেসলি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এবারের যুদ্ধে টিপুর ওপর তার বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু আগামীর ইতিহাসে যেন তার ওপর যুদ্ধ শুরু করার অভিযোগ আরোপিত না হয়, বিরুদ্ধপক্ষ যেন সমালোচনার সুযোগ খুঁজে না পায়; এ উদ্দেশ্যে সে জেনারেল হ্যারিসের সঙ্গে পরামর্শ করে টিপুর সামনে সন্ধির এমন একটি প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেই চুক্তির ওপর টিপু সুলতান কখনই সম্মত হবে না, আবার তার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগও ওঠবে না। সেই ভাবনা থেকেই জেনারেল ওয়েলেসলি জেনারেল হ্যারিসের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে সন্ধির একটি খসড়া প্রস্তাবনা শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অবরোধের পূর্বেই টিপুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। খসড়া প্রস্তাবনার মাঝে এমন কিছু ধারা ছিলো, যা গ্রহণ করা টিপুর পক্ষে কোনোমতেই সম্ভবপর ছিলো না। সেখানে লেখা ছিলো–

১. যুদ্ধ এড়িয়ে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করতে হলে টিপু সুলতানকে তার বিদ্যমান রাজ্যসীমা থেকে অর্ধেক অংশ কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হবে। (স্মর্তব্য যে, অর্ধেক রাজ্য তৃতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ইংরেজদের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনী বোগলদাবা করে নিয়েছিলো)।
২. মহিসুরের সেনাবাহিনী থেকে ফরাসি কর্মচারীদেরকে তাৎক্ষণিক অব্যাহতি দিতে হবে।
৩. আগামীতে কখনই ফরাসিদের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ করা যাবে না।
৪. যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২ কোটি রুপি পরিশোধ করতে হবে। ১ কোটি নগদ পরিশোধ করতে হবে। বাকি অংশ ৬ মাসের ভেতর পরিশোধ করতে হবে।

www.boimate.com

৫. জামানতের জন্যে টিপুকে তার চার শাহযাদা ও চার বড় সামরিক কর্নেল জামানত হিসেবে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হবে। জেনারেল হ্যারিস নিজ বিবেচনায় জামানতের তালিকা তৈরি করবেন।
৬. ২৪ ঘণ্টার ভেতর এই খসড়া প্রস্তাবনার উত্তর জানাতে হবে।
৭. আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জামানত হিসেবে নির্বাচিত শাহযাদা ও অফিসারবর্গকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হবে।
৮. সকল ইংরেজ কয়েদিকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দিতে হবে।[৬০]

এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, এধরনের অবমাননাকর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া টিপু সুলতানের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিলো না। এমন দাসত্বের চেয়ে তার কাছে মৃত্যুই শ্রেয়। সেমতে তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের সেই প্রস্তাব ঠুকরে দেন। বিশ্বাসঘাতক উযির ও চক্রান্তকারী কর্মকর্তাও টিপু সুলতানকে সন্ধিচুক্তিতে সম্মত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো। কারণ, সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হলে তাদের সকল পরিকল্পনা ভেস্তে যেতো।

যথারীতি যুদ্ধের সূচনা

১৭৯৯ সালের মার্চ মাস শুরু হয়েছে। পূর্ব থেকেই ইংরেজদের পরিকল্পনা ছিলো, টিপু সন্ধির প্রস্তাবনা ফিরিয়ে দিলে জেনারেল হ্যারিসের সৈন্যরা রাজধানী শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অভিমুখে রওয়ানা হবে। যথারীতি তারা যাত্রা শুরু করে। অন্যদিকে মুম্বাইয়ে অবস্থানরত ইংরেজ সেনাবাহিনীর একটি দল স্টুয়ার্টের অধীনে কোর্গ (Coorg) ও কেরালা হয়ে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অভিমুখে বেরিয়ে পড়ে। ইংরেজদের যুদ্ধাভিযানের এই সংবাদ বিশ্বাসঘাতকেরা টিপু সুলতান থেকে লুকিয়ে রাখার সর্বাত্তকরণে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু কীভাবে যেন টিপু তা জানতে সক্ষম হয়। কালবিলম্ব না করে টিপু সুলতান সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার নিজের হাতে নিয়ে রাজধানীর বাইরে চলে আসে। সর্বপ্রথম রাজধানীর পশ্চিম প্রান্তের 'সদাশ্বর' নগরীর একটি রণাঙ্গনে মহিসুর বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ ফৌজের একটি দল মুখোমুখি হয়। দু' পক্ষের মাঝে ঘোরতর সংঘর্ষ বেধে যায়। এক পর্যায়ে জেনারেল স্টুয়ার্টের সৈন্যরা পেছন দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়। এখানে টিপু সুলতান মামাতো ভাই মীর কমরুদ্দীনের হাতে একদল সৈন্য রেখে

---

৬০. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম। খণ্ড : ৬

www.boimate.com

নিজেই পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে জেনারেল হ্যারিসের নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। ওই সময় জেনারেল হ্যারিস তার সৈন্যদেরকে নিয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

বিশ্বাসঘাতক মীর কমরুদ্দীন কাঁধ থেকে অস্ত্র নামিয়ে ইংরেজ সৈন্যদেরকে কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যতিরেকে রাজধানী প্রবেশের পথ করে দেয়। এভাবেই সে ইংরেজদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করার জন্যে টিপু সুলতানের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। মীর কমরুদ্দীনের এই গাদ্দারির কারণে জেনারেল স্টুয়ার্টের পরাজিত সৈন্যরা বিনা বাঁধায়, অতি সহজে রাজধানী পৌঁছতে সক্ষম হয়।

মীর মুঈনুদ্দীন ও পুর্নিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা

টিপু সুলতান যখন জেনারেল হ্যারিসকে বাঁধা দেওয়ার জন্যে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তিনি মীর মুঈনুদ্দীন ওরফে সাইয়্যেদ সাহেব ও পুর্নিয়া-কে একদল সৈন্য দিয়ে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তারা জেনারেল হ্যারিসকে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে দেবে না। পথিমধ্যে তাদেরকে এমনভাবে ব্যস্ত করে রাখবে যে, তারা যেন টিপু সুলতানের প্রস্তুত হওয়ার আগেই রাজধানীতে প্রবেশ করতে না পারে। টিপু সুলতান জানতেন না যে, এ দুই গাদ্দারও অনেক আগে ইংরেজদের হাতে বিক্রি হয়ে গেছে। তারা জেনারেল হ্যারিসের সামনে কোনো ধরনের প্রতিরোধ সৃষ্টি করেনি। যার ফলে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। অথচ ওই সময় সে প্রচুর যুদ্ধ-রসদ ও যুদ্ধপোকরণ বহনকারী পশু নিয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। মহিসুরের সৈন্যরা ইচ্ছে করলে খুব সহজেই তাদেরকে কিছু দিন পথিমধ্যে পেরেশান করে রাখতে পারতো।

অন্য স্থানে সংঘাত

যুদ্ধের এমন বিপর্যস্ত পরিস্থিতির ভেতরেই টিপু সুলতান সংবাদ পান যে, জেনারেল হ্যারিসের সৈন্যরা নিযামের সিপাহিদেরকে সঙ্গে নিয়ে রায়কোটা ও আনীকেল দখল করে 'চিনপটন'-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে টিপু সুলতান সৈন্যদেরকে নিয়ে 'মালুলী' পৌঁছেন। সেখানে সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে তাদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। চোখের পলকেই বিভীষিকা সৃষ্টি করে মহিসুরের সৈন্যরা শত্রুপক্ষের ওপর

www.boimate.com

বিজয় লাভ করে। হাজার হাজার ইংরেজ সিপাহি নিহত হয়। শত্রুরা যখন মোর্চা ছেড়ে পলায়নোদ্যত, ঠিক তখনই মীর মুঈনুদ্দীন মহিসুরের সৈন্যদেরকে শত্রুপক্ষের তোপখানার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এবং সে নিজে আড়ালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। যার দুঃখজনক পরিণতিতে নিজেদের কিছু গাদ্দারের চক্রান্তে বিজয়ী বাহিনী চোখের পলকে মৃত লাশের স্তূপে পরিণত হয়। এরপরও যারা বেঁচে গিয়েছিলো, তারা দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুদের মুকাবিলা অব্যাহত রাখে। কিন্তু তুমুল রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন মহিসুর বাহিনীর বীর অফিসার, ন্যায়নিষ্ঠ যোদ্ধা নবাব মুহাম্মদ রেযা খান শত্রুপক্ষের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন তখন তাদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। নবাব মুহাম্মদ রেযা খানের নিস্তেজ দেহ পরবর্তী সময় পাল্কিতে তুলে রাজধানী প্রেরণ করা হয়।

রাজধানী অবরোধ

মালুলি নগরীতে জেনারেল হ্যারিসের সৈন্যদের সঙ্গে একটি সফল যুদ্ধ শেষে টিপু সুলতান রাজধানী প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ, তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন— সম্মিলিত বাহিনী রাজধানীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। জেনারেল স্টুয়ার্ডের সৈন্যদের সঙ্গে জেনারেল ফ্লয়েডের সৈন্যরা যূথবদ্ধ হয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে রাজধানীর পূবপ্রান্ত লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছে।

টিপু মীর কমরুদ্দীনকে আরেকদল সৈন্য দিয়ে কোর্গ রওয়ানা করেন। যেন তিনি সেখানে জেনারেল স্টুয়ার্ট ও জেনারেল ফ্লয়েডের সৈন্যদেরকে অগ্রসর হতে বাঁধা দেন। কিন্তু মীর কমরুদ্দীন যেহেতু অনেক আগেই তার ঈমান ও দেশপ্রেম ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো; এজন্যে গাদ্দারির পরিচয় রেখে সে তাদেরকে বিনা বাধায় অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেয়। যার কারণে এ দু'টি দল অনায়াসে রাজধানী পৌঁছুতে সক্ষম হয়। কেল্লার সামনে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যে যেসকল মোর্চা নির্মাণ করা হয়েছিলো, ইংরেজ বাহিনী তা দখল করে। সেখানে তারা কেল্লার প্রাচীর বিধ্বংসী তোপ স্থাপন করে গোলা বর্ষণ শুরু করে দেয় এবং শক্ত হাতে রাজধানী অবরোধ করে।

৪ মে শত্রুবাহিনী পশ্চিম দিকের প্রাচীরে বড় ধরনের ফাটল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। মীর সাদিকের সঙ্গে পরামর্শ করে ওয়েলেসলি ৪ মে দুপুরে

www.boimate.com

কেল্লার ওপর ব্যাপক আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। টিপু সুলতান যখন শুনতে পান যে, শত্রুবাহিনী কেল্লার অমুক স্থানে ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তখন তিনি ওই স্থানটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে একটি বিশেষ সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং জরুরী ভিত্তিতে কেল্লার প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

চরম বিপদের মুহূর্তে ফরাসিদের কৃতজ্ঞতা

শত্রুবাহিনীর এভাবে রাজধানী অবরোধ করতে দেখে টিপু সুলতান বুঝতে পারেন যে, তার মন্ত্রী পরিষদ ও সামরিক কর্মকর্তাদের একটি বিশাল অংশ ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাদের যৌথ শলা-পরামর্শের কারণেই ইংরেজরা রাজধানী অবরোধ করতে সক্ষম হয়েছে। তখন যেসকল ফরাসি অফিসার মহিসুর বাহিনীতে চাকুরি করতো, তিনি তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করেন। এবং তাদের সামনে যুদ্ধের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেন। ফরাসি বাহিনীর কমান্ডাররা টিপু সুলতানকে এ পরামর্শ দেয় যে, 'এ ধরনের পরিস্থিতিতে এখানে অবস্থান করা আপনার জন্যে সমীচিন নয়। আমাদের পরামর্শ হলো, আপনি নগদ অর্থ, হীরা-জওহরাত সহকারে আপনার পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতের অন্ধকারে এখান থেকে বেরিয়ে চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog) চলে যান। কেল্লার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আমরা আপনার হয়ে ইংরেজদের প্রতিহত করবো। আমাদের ওপর যদি আপনার আস্থা না থাকে তাহলে আপনি আমাদেরকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিন। কারণ, আমাদের সঙ্গে আপনার সামরিক মৈত্রী থাকার কারণেই তারা আপনার শত্রু হয়েছে। আমরা যদি তাদের হাতে ধরা পড়ি তাহলে তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হবে। তখন তারা আপনার সঙ্গে সন্ধি করতে সম্মত হবে।'

চরম বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে ফরাসিদের এই ত্যাগ, প্রতিকূল পরিবেশে তাদের এমন বিশ্বস্ততা দেখে টিপু সুলতান অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, তোমাদের মতো বিশ্বস্ত বন্ধুদেরকে শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আমি রাজত্ব বিসর্জন মেনে নিতে পারবো; কিন্তু তোমাদেরকে শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়ার কল্পনাও করতে পারবো না।

www.boimate.com

দেশ বিক্রির কুমতলববাজদের আরেকটি প্রতারণা

রাতের অন্ধকারে শহর ছেড়ে রাইচপুর অভিমুখে বেরিয়ে পড়ার যেই পরামর্শ ফরাসিরা দিয়েছিলো তা নিয়ে টিপু সুলতান উযিরদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সুলতান এভাবে সহজে বেঁচে যাবেন আর নিজের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে, তা মীর সাদিকের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। এজন্যে সে তার কণ্ঠে সহমর্মিতার ঢং ফুটিয়ে বলে, ফরাসিরা কখনই বিশ্বস্ত হতে পারে না। ইংরেজদের মতো ওরাও গাদ্দার। আপনি যদি কেল্লার নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেন তাহলে বিনা প্রতিরোধে তারা কেল্লাটি ইংরেজদের হাতে তুলে দেবে। যেহেতু ততোক্ষণে মীর সাদিকের গাদ্দারির বিষয়টি টিপু সুলতানের কানে চলে এসেছে, এজন্যে তিনি তার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ফরাসিদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান। সেমতে তিনি ঘরের সদস্যদেরকে চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog) প্রেরণের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিছু দ্রুতগামী ঘোড়া উপস্থিত করা হয়। তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে একটি বিশেষ সৈন্যদলকে তিনি প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

বদরুজ্জামান খানের রহস্যজনক প্রস্তাব

যখন পুরো কাফেলা চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog) অভিমুখে বেরিয়ে পড়তে পূর্ণ প্রস্তুত, ঠিক সেই মুহূর্তে বদরুজ্জামান খান টিপুর সামনে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, যদি আপনি নিজেই কেল্লার বাইরে চলে যান তাহলে আমাদের ঐক্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়বে। রণাঙ্গনে আপনাকে অনুপস্থিত দেখলে সিপাহিদের মনোবল চুপসে যাবে। যার ফলে শত্রুপক্ষ অনায়াসে এই কেল্লা ও নগরী দখল করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ মালুম, বদরুজ্জামান কী নিয়তে এহেন পরামর্শ দিয়েছিলেন! কিন্তু তার কথাটি সুলতানের মনে দাঁগ ফেলতে সক্ষম হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তার পলায়ন মহিসুর বাহিনীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সবাই ভাববে যে, সুলতান তার সৈন্যদেরকে মৃত্যুর মুখে ফেলে নিজের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে গেছে; অথচ টিপু সুলতান চিরকালই তার সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে এসেছেন। তাদের মনে কখনই টিপু সুলতানের ব্যাপারে কাপুরুষতার কোনো প্রশ্ন ওঠবে না।

www.boimate.com

যেহেতু বদরুজ্জামানের এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার কোনো কারণ ছিলো না; এজন্যে তিনি তার প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। ওই সময় তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বলেন,

رضائے مولی بر ہمہ اولی

'আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্য সবকিছুর ওপর অগ্রগণ্য।'

এরপর টিপু সুলতান কাফেলার যাত্রা স্থগিত করেন। অবশ্য শাহযাদা ফতেহ হায়দার একদল সৈন্য নিয়ে শহরের বাইরে কারিঘাটের পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যান। রাজপরিবারের নারী সদস্যদেরকে প্রাসাদের অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিয়ে তার চারপাশে তৎক্ষণাৎ পরিখা খনন করা হয়। সেই পরীখার ভেতর বারুদ ঢেলে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য হলো, যদি ফিরিঙ্গিরা রাজপরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছে তাদের ইজ্জত লুণ্ঠনের চেষ্টা করে তাহলে তাদের ইজ্জত রক্ষার্থে সর্বাগ্রে বারুদের সাহায্যে অন্দরমহল উড়িয়ে দেওয়া হবে।

যে দিনটি যুদ্ধের গতিপথ নিশ্চিত করেছে

১৭৯৯ সালের মে মাসের ৪ তারিখ। সুলতান যথারীতি মসজিদে আ'লায় ফজরের নামায আদায় করলেন। নামাযের পর সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব মীর হাবীবুল্লাহ নিবেদন করলেন যে, এই চরম সংকটাপন্ন সময়ে আপনি আপনার মূল্যবান জীবনের ওপর দয়া করুন। একটু কল্পনা করুন যে, আপনার কিছু হলে ইয়াতীম শাহযাদাদের জীবনে কী বিভীষিকা নেমে আসবে! তাদেরকে বন্দী জীবনে কী চরম দুঃসহ পরিস্থিতির শিকার হতে হবে! অর্থাৎ তিনি আকার-ইঙ্গিতে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সেরে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

উত্তরে সুলতান বলেন, 'এই সালতানাতে খোদাদাদ আমাদের জনগণ, বিশেষত মুসলমানদের সম্পদ। আমরা বছরের পর বছর সেই সম্পদ সুরক্ষিত রাখার সংগ্রাম করছি।[৬১] অথচ পর্দার আড়ালে এই সালতানাতেরই কিছু উযির ও অফিসার তা ধ্বংস করার উন্মাদনায় মেতে

---

[৬১]. هفت خوان حيدري [হাফতে খাওয়ানে হায়দারী] গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সহীফায়ে টিপু সুলতান।

www.boimate.com

ওঠেছে। যে কোনো মানুষের জীবনে স্রেফ একবারই মৃত্যু আসে। ওই মৃত্যুকে ভয় করা অর্থহীন। মৃত্যু কখন এলো, কীভাবে এলো– এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি আমার জীবন, আমার সন্তান ও পরিবারের সকল সদস্যের জীবন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের জন্যে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এ উত্তর শুনে মীর হাবীবুল্লাহ নিশ্চুপ হয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পর প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সূর্য উদিত হলো। একদিকে পৃথিবীর সূর্য ওঠছে অন্যদিকে সুলতানের ভাগ্যাকাশের সূর্য ডুবছে। মানবেতিহাসের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটছে, শুরু হচ্ছে গোলামি ও দাসত্বের নতুন অধ্যায়। শ্রীরঙ্গাপত্তনামের আকাশে-বাতাসে আজ বেদনার হাহাকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একদল পুণ্যবান মানুষের পদচারণায় যে ভূমি এতোদিন গর্বিত ছিলো, আজ তাদেরকে দূরে ঠেলে কিছু অপবিত্র মানুষ, কিছু রক্তখেকো হায়েনা শাসনের ছড়ি ঘোরাতে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের ফটকের ওপর হামলে পড়েছে।

ইংরেজদের এতোদিনের পরিকল্পনা এখন বাস্তবায়নের পদপ্রান্তে। আজ ইবলিসের রাজপ্রাসাদে উল্লাসের অন্ত নেই। তার অনুগত সদস্যরা তার অনেক দিনের খোয়াব পূরণ করতে চলেছে। কেল্লার ভেতরে-বাইরে সর্বত্র চক্রান্তের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। চারপাশে বিবেক ও ঈমানের বেচাকিনি চলছে। বিশ্বাস ও স্বাধীনতার মাড়োয়ারীদের মাধ্যমে টিপু সুলতানের প্রতিটি পদক্ষেপের আদ্যোপান্ত পূর্ণ বিবরণ সহকারে জেনারেল ওয়েলেসলির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মীর সাদিক তার তাগুতি ভাইদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে— কোন পথ বেয়ে তারা কেল্লার ওপর আক্রমণ করবে। ইংরেজদের কাছে মীর সাদিকের গাদ্দারির রেকর্ড অত্যন্ত পুরনো। কাজেই তার দেখানো নির্দেশনার ওপর তাদের শতভাগ আস্থা ছিলো। ইংরেজরা জানতো যে, ঈমান ও দেশ বিক্রি করা এই নিমক হারাম গাদ্দার আর যাই হোক, তাদের সঙ্গে এক বিন্দু গাদ্দারিও করবে না। যুদ্ধজয়ের জন্যে ইংরেজরা তাদের সিপাহিদের ওপর যতোখানি আস্থা রেখেছিলো; তার কয়েক গুণ বেশি আস্থা রেখেছিলো মহিসুর বাহিনীর এই গাদ্দার নিমকহারাম অফিসারদের ওপর।

www.boimate.com

ব্যক্তিস্বার্থের কাছে পরাজিত এই গাদ্দাররা টিপু সুলতানের পিঠের ওপর ছোরা বসাতে সর্বক্ষণ ওঁৎ পেতে বসে থাকতো।

হতাশা ও নৈরাশ্যের এমন ঘন অন্ধকারের মাঝেও আশার দীপ জ্বেলে মিটিমিটি আলো ছড়িয়েছে টিপু সুলতানের জানবায, অকুতোভয়, দেশপ্রেমিক সিপাহিদের একটি দল। যারা নিজ রবের সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তারা স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। যতোক্ষণ শরীরে শক্তি ছিলো, এই মহান সংগ্রামীদের পা দৃঢ়তার মোর্চা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও নড়বড়ে হয়নি। একদিকে যুদ্ধ গড়াচ্ছিলো চূড়ান্ত পরিণতির দিকে; অন্যদিকে এই জানবায সাহসীদের মনে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত ও জান্নাত লাভের স্পৃহা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিলো। এ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফার। এ দলটির অনেকের নাম টিপু সুলতান নিজেই ইতোপূর্বে জানতেন না; কিন্তু তাদের চেহারার অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য ও অকৃত্রিম দীপ্তি এ সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, তারা শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে দেশ ও জাতির জন্যে সোনালি ইতিহাস লেখার পণ করেই যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন।

শুধু ইসলামের ইতিহাস নয়; মানবতার দীর্ঘ ইতিহাসে এ দিনটি ছিলো একটি নির্মম দুর্ঘটনার দিন। যাদের চোখে-মুখে ছিলো স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার সোনালি স্বপ্ন— ভাগ্যবিধাতা এ দিনটিকে চয়ন করেছিলেন জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবনের অন্তিম দিন হিসেবে।

জনৈক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী

সুলতান যথারীতি ফজর নামায আদায় করলেন। নামাযের পর কিছুক্ষণ কুরআন কারীম তিলাওয়াত করলেন। এরপর যুদ্ধের বিভিন্ন প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করলেন। টিপু সুলতান যখন হক-বাতিলের এই অসম যুদ্ধের ছোটখাট প্রস্তুতিগুলো তদারক করছিলেন তখন সেখানে কয়েকজন জ্যোতিষী উপস্থিত হন। তারা নিবেদন করলেন, 'আজকের দিনটি হুজুরের জন্যে শুভ মনে হচ্ছে না'।[৬২]

---

[৬২]. মুহিব্বুল হাসান বিরচিত 'তারীখে টিপু সুলতান'।

www.boimate.com

টিপু সুলতান বিশ্বাস করতেন যে, দিন-রাতের সত্তার মাঝে নিজস্ব কোনো অকল্যাণ নেই। ভালো-মন্দ যাই ঘটে, স্রেফ আল্লাহ তা'আলার মর্জিতেই ঘটে। তারপরও যেহেতু হাদীস শরীফে এ কথা এসেছে যে, 'দান-খয়রাত আগতব্য বিপদ-মুসিবত দূর করে।' এজন্যে তৎক্ষণাৎ তিনি মূল্যবান হীরা-জওহরাতে সুসজ্জিত একটি দৃষ্টিনন্দন হাতি ও নগদ দু'শ' রুপি দান করলেন। এর বাইরে গরিব-মিসকিনদের মাঝে কিছু গরু, মহিষ, বকরি ও জামা-কাপড় বিতরণ করলেন।

কেল্লার ওপর আক্রমণ

ইংরেজ বাহিনী ৪ মে সকালে জেনারেল বের্ড-এর নেতৃত্বে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমপ্রান্তের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেল্লার দক্ষিণপার্শ্বের সেই অংশটির ওপর আক্রমণ করলো, যেখানে গতকাল ফাটল দেখা দিয়েছিলো। ওদিকে তারা সুলতানকে ব্যস্ত রাখার জন্যে উত্তরপার্শ্বেও আক্রমণ করলো। যেখানে পূর্ব থেকেই মহিসুর বাহিনী বিদ্যমান ছিলো।

সুলতানের পক্ষ থেকে যেই বাহিনীটি প্রাচীরের ফাটলের স্থানটি পাহারা দিচ্ছিলো, পূর্বপরিকল্পনা ও চক্রান্ত অনুসারে মীর সাদিক পুর্নিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ওই সিপাহিদের নির্দেশ করলেন যে, মসজিদে আ'লার কাছে তোমাদের বেতন বিতরণ করা হচ্ছে। এ কথা বলে সে তাদেরকে পাঠিয়ে দিলো। এর পরপরই মীর মুঈনুদ্দীন যোগসাজশ অনুসারে সাদা রুমাল উড়িয়ে ইংরেজ শিবিরে এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলো যে, প্রাচীরের ভগ্নাংশে এখন কোনো প্রহরী নেই। সংকেত পেয়ে ওদিকে নিয়োজিত পাঁচ হাজার সিপাহিদের মধ্য হতে প্রথমে ১৩ জনের একটি দল, এরপর আরও ১৩ জনের আরেকটি দল বিনা বাঁধায় প্রাচীর টপকে কেল্লার ভেতর চলে এলো। তাদের অনুসরণ করে কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা বাহিনী অনায়াসে কেল্লার ভেতর প্রবেশ করলো।

কিছু ইংরেজ এ কথা স্বীকার করেছে যে, কেল্লার ওপর উঠার সময় 'মীর কাসেম আলী' নামের একজন মহিসুর সৈন্য আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

সাইয়্যেদ আবদুল গাফফারের সৌভাগ্য

ফাটল দেখা দিয়েছিলো কেল্লার দক্ষিণপ্রান্তের প্রাচীরে। প্রাচীরের এ অংশটি ছিলো গুনজামবাগ লাগোয়া। যখন ইংরেজদের পক্ষ থেকে

www.boimate.com

সেখানে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হচ্ছিলো আর বেতন বিতরণের অজুহাত দেখিয়ে গাদ্দাররা সেখানে নিযুক্ত প্রহরীদেরকে তাড়িয়ে দেয় তখন সুলতানের আস্থাভাজন অফিসার সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফার প্রাচীরের ভগ্নাংশের ওপর প্রহরীদের অনুপস্থিতি দেখে দুশমনদের চাতুর্য্য বুঝে ফেলেন। প্রথমে মীর সাদিক তাকে এ কথা বলে সেখান থেকে সরানোর চেষ্টা করে যে, 'তুমি এখনই সুলতানের কাছে গিয়ে তাকে শত্রুদের আক্রমণের সংবাদ দাও'। কিন্তু কিছুক্ষণের মধেই তিনি কিছু বিশ্বস্ত সৈনিক সঙ্গে নিয়ে ইংরেজদেরকে প্রতিহত করার জন্যে পুনরায় সেখানে ফিরে আসেন। নরাধম গাদ্দার মীর মুঈনুদ্দীন তখন তাকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, 'এখন আর তাদেরকে প্রতিরোধ করে লাভ হবে না। আমরা সরে গেলে হয়তো কেল্লা রক্ষা পাবে না; কিন্তু আমাদের জীবন তো রক্ষা পাবে'।

এ কথা শুনতেই সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফারের আত্মসম্মানবোধ ফেটে পড়লো। তিনি আল্লাহর কাছে এ মর্মে শপথ করেছেন যে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বদেশের একেক ইঞ্চি ভূমি সুরক্ষিত রাখবো, তারপক্ষে এমন নীরব আত্মসমর্পণ কীভাবে সম্ভব! সেমতে তিনি সেখানেই অবিচল দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওদিকে গাদ্দাররা পূর্বেই ইংরেজদের সঙ্গে এ পরিকল্পনা বানিয়ে রেখেছিলো যে, কোথাও সবুজ ছাতা পরিলক্ষিত হলে এর অর্থ হলো, ইংরেজ বাহিনী সেদিকে গোলা নিক্ষেপ করে। মীর মুঈনুদ্দীন রোদের বাহানা দেখিয়ে সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফারের ওপর সবুজ ছাতা মেলে ধরলো। ইঙ্গিত চলে গেলো ইংরেজ শিবিরে। তারা তৎক্ষণাৎ তোপখানার মুখ কেল্লা থেকে সরিয়ে সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফারের ওপর তাক করলো। তার চারপাশে একের ওপর এক গোলা পড়তে শুরু করলো। নিক্ষিপ্ত গোলার একটি ভূপাতিত হলো সাইয়্যেদ সাহেবের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ-পিঞ্জির ছেড়ে প্রাণ পাখি উড়ে গেলো। তার মৃত্যুর মাধ্যমে প্রতিরোধের শেষ স্তম্ভটিও ভেঙ্গে পড়লো। এখন আর ইংরেজদের পথে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। অনায়াসে ইংরেজ সৈন্যরা কেল্লার ভেতর প্রবেশ করতে লাগলো।

www.boimate.com

টিপু সুলতানের শাহাদাত-স্পৃহা ও চরম অস্থিরতা

দুপুর । মাথার ওপর গনগনে সূর্যের প্রখর রৌদ্দুর । টিপু সুলতান কেল্লার প্রাচীরগুলো পর্যবেক্ষণ করে একটি ছায়াদার গাছের নিচে এসে বসে পড়লেন । সুলতানের সামনে খাবার পাতা হয়েছে । বিসমিল্লাহ বলে প্রথম লোকমাটি মাত্র মুখে দিয়েছেন, ইতোমধ্যে একজন সিপাহি এসে সংবাদ দিলো যে, 'সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফার শহীদ হয়েছেন । ইংরেজ সৈন্যরা কেল্লার ভেতর ঢুকে পড়েছে ।'

সুলতান ওই সময় কেল্লার ভেতর শত্রুবাহিনীর প্রবেশের অপেক্ষা করছিলেন । সকাল থেকেই তিনি শাহাদাতের পেয়ালায় চুমু খাওয়ার প্রহর গুনছিলেন । এক পর্যায়ে তিনি সঙ্গীদের এ কথা বলেছিলেন যে, 'এখন আমরা খুব অল্প সময়ের অতিথি মাত্র' ।[৬৩]

ইংরেজ ফৌজের অনুপ্রবেশের সংবাদ শুনে তিনি হাত না ধুয়েই নির্দেশ করলেন, 'এখুনি আমার 'তাউস' ঘোড়াটিকে নিয়ে এসো' । তলোয়ার সামলে নিলেন । হাতে তুলে নিলেন একটি দু' নালা বিশিষ্ট বন্দুক । শরীরের ওপর লম্বা আলখেল্লা ছিলো । কালবিলম্ব না করেই ঘোড়ার ওপর চড়ে শত্রুবাহিনী অভিমুখে ছুটে গেলেন । পথিমধ্যে বিবেকহীন, ঈমানবেচা উযিরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো । সেখানে মীর সাদিকও ছিলো । মুখ ফুটে সে কোনো কথা বলার আগেই টিপু সুলতান বলে ওঠলেন, 'এমন নয় যে, তোমাদের গাদ্দারির ব্যাপারটি জানি না । শিগগিরি তোমরা তোমাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার তেতো স্বাদ আস্বাদন করবে । তোমাদের এই কালো কর্মের কারণে তোমাদের অনাগত প্রজন্ম দানা-পানির তীব্র অভাবের সম্মুখীন হবে ।'

মীর সাদিক তৎক্ষণাৎ শত্রুশিবিরে এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলো যে, সুলতান রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে অমুক ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে । এক বর্ণনায় এসেছে যে, ওই দিন প্রত্যুষে সুলতান গাদ্দারদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন । সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পরদিন তাদের ফাঁসী কার্যকর করবেন । ওই তালিকার শীর্ষে মীর সাদিকের নাম ছিলো । এই সংবাদ মীর সাদিকের কানে পৌঁছে গিয়েছিলো ।

---

৬৩. আমজাদ আলী আশহারী বিরচিত 'সাওয়ানেহ টিপু সুলতান' ।

www.boimate.com

নরাধম মীর সাদেক অপমৃত্যুর গহ্বরে

টিপু সুলতান অত্যন্ত দ্রুতবেগে ডোডি ফটকের বাইরে বেরিয়ে এলেন। দিল্লি ফটকের কাছে পৌঁছে গেলেন। এখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইংরেজ সিপাহিদের সঙ্গে সংঘাত চললো। যখন শত্রুবাহিনীর ভীড় বেড়ে গেলো তখন সুলতান ডোটি ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন।

মীর সাদিক টিপু সুলতানকে ওই দিক দিয়ে ফিরে আসতে দেখে ফটকের দুয়ার বন্ধ করে নিজে রসদ যোগানের বাহানা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সুলতানের পাশেই ছিলো কাডাপ্পার একজন বিশ্বস্ত সিপাহি। নাম, আহমদ খান। মীর সাদিকের ফটক বন্ধ করার দৃশ্য তার চোখে এড়ালো না। সঙ্গে সঙ্গে সে এ কথা বলে মীর সাদিকের ওপর তরবারি চালিয়ে দিলো যে, 'সুলতানকে শত্রুদের মুখে ফেলে তুমি কীভাবে বাঁচবে?' এক আঘাতেই তার মুণ্ডু কাঁধ থেকে খসে পড়লো। চার দিন পর্যন্ত তার লাশ সেখানেই পড়ে ছিলো। পুরো চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। লাশের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু লোক তার লাশ মাটির নিচে পুতে দেয়। এখনও কেউ তার কবরের পাশ দিয়ে গেলে অবশ্যই থুথু ফেলে আসে। অপর গাদ্দার মুঈনুদ্দীনও ওই দিন পরিখায় পড়ে অপমৃত্যুর শিকার হয়।

অন্তিম মুহূর্তের কিছু চিত্র

শহরে প্রবেশ হওয়ার জন্যে টিপু সুলতান ডোডি ফটকের কাছে এলেন। দেখলেন, দরোজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তখন উত্তরপাশের দরোজার দিকে অগ্রসর হলেন। জানতে পারলেন, মীর মুঈনুদ্দীনের গাদ্দারির কারণে শত্রুবাহিনী এই দরোজা ছাড়া পূব ও দক্ষিণ প্রান্তের প্রাচীর দখল করে নিয়েছে। টিপু সুলতান তখন কেল্লাদারের কাছে দরোজা খোলার অনুরোধ করলেন; কিন্তু ওই হতভাগা টিপুর অনুরোধ শুনেও না-শোনার মতো এড়িয়ে গেলো। যার ফলে এখন সুলতান তিন দিক থেকে শত্রু বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এমন মুহূর্তেও তিনি শত্রুদের ওপর ফায়ারিং শুরু করেন। টিপুর ছোড়া গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই পাঁচজন সিপাহি নিহত হলো। চারদিক থেকে তার ওপরও মুহুর্মুহু গুলি আসতে লাগলো। সুলতানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে। এমন গুলি জর্জরিত শরীর নিয়েও তিনি শত্রুদের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

www.boimate.com

বাঘের মতো একদিন বেঁচে থাকা শিয়ালের মতো হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম

মাগরিবের ওয়াক্ত ঘনিয়ে এসেছে। ওদিকে দু'পক্ষের মাঝে তুমুল সংঘর্ষ চলছে। শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পুরুষরা বীর পুরুষের মতোই ইংরেজ ফৌজকে ইটের বদলে ইট জবাব দিয়ে যাচ্ছিলো। শুধু পুরুষরাই নয়; হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মহিলারাও সেদিন আগ বাড়িয়ে শত্রুদের ওপর হামলে পড়েছিলো। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিলো শহীদদের মিছিল। টিপুর বিশ্বস্ত সঙ্গীরা রক্তের আকরে লিখছিলেন আস্থার প্রতিদানের ইতিহাস। তাদের লাশগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওই সময় সুলতানকে তাঁর নওমুসলিম সেবক 'রাজা খান' সম্বোধন করে বললো,

- 'হুজুর! আপনি যদি আত্মরক্ষার্থে নিজেকে শত্রুদের হাতে তুলে দেন তাহলে ওরা আপনার পদমর্যাদার প্রতি সম্মান রেখে প্রাণভিক্ষা দেবে।'

তার এ মন্তব্য সুলতানের আত্মসম্মানবোধে কুঠারাঘাত হেনেছিলো। তিনি ক্রোধের আতিশয্যে কম্পমান স্বরে উচ্চ নিনাদে বলে ওঠলেন,

- 'আমার নিকট বাঘের মতো একদিনের জীবন শেয়ালের হাজার বছরের জীবনের চেয়ে উত্তম'।

এর কয়েক মুহূর্ত পরেই একটি গুলি উড়ে এসে সুলতানের ঘোড়া 'তাউস'-এর পায়ে বিঁধলো। ঘোড়াটি তৎক্ষণাৎ সুলতানকে নিয়ে পড়ে গেলো। মাথার ওপর থেকে ছুটে সুলতানে শাহী পাগড়িখানা জমিনে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। চট করে সুলতান উঠে দাঁড়ালেন। এবার তিনি পায়ের ওপর দাঁড়িয়েই লড়াই করতে লাগলেন। চোখের পলকে তাঁর তরবারির আঘাতে কয়েকজন বৃটিশ ফৌজ জাহান্নামে পৌঁছে গেলো। ওদিকে দু'টি গুলি শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিলো। অনবরত রক্তপাতের কারণে শরীরের শক্তি নিঃশেষ হতে চলেছে। এতোক্ষণের ঋজু শরীর এখন দুর্বলতার কারণে স্থির থাকতে পারছে না। তারপরও সিংহহৃদয়ের টিপু ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসলেন না। দুর্বল পায়েই লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। ওদিকে মীর সাদিকের চক্রান্তে মহিসুর বাহিনীর ব্যবহৃত গুলির ভেতর থেকে বারুদ ফেলে দিয়ে সেখানে মাটি

www.boimate.com

ভরে দেয়া হয়েছিলো।[৬৪] যার ফলে তাদের ছোড়া গুলির কারণে শত্রুপক্ষের তেমন একটা ক্ষতি হচ্ছিলো না। কেল্লার যে দিকটায় টিপু সুলতান লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, গাদ্দারদের কাছে সংবাদ পেয়ে ইংরেজদের পুরো ফৌজ সেখানে চলে এলো।

আরেকটি কারবালা, আরেকটি শাহাদাত আরেক হুসাইন

৪ মে। গ্রীষ্মের তীব্র উষ্ণতায় আবহাওয়া ভীষণ রুক্ষ। তার ওপর গণগণে সূর্যের প্রখর রৌদ্র, শত্রুদের সঙ্গে গায়ে গায়ে যুদ্ধ আর রণাঙ্গনের সীমাহীন ব্যস্ততার ভেতর কেটে গেছে যোহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দীর্ঘ প্রহর। প্রচণ্ড তৃষ্ণার কারণে সুলতানের ছাতি ভীষণ পোড়াচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে স্রেফ পানিজলের তৃষ্ণা মেটানোর মতো অবসরটুকুও সুলতান পাননি। কারো কাছে থেমে পানি চাইবেন, এক অঞ্জলী পানি নিয়ে বুকের দহন শীতল করবেন— এতোটুকু সুযোগও শত্রুরা সুলতানকে দেয়নি। সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফারের শাহাদাতের পর যখন সুলতান যোহরের সময় রণাঙ্গনে ছুটে আসেন তখন তার সঙ্গে তার নওমুসলিম সেবক 'রাজা খান' ছিলো। সুলতানের নির্দেশে সেই সেবক একটি ছোট্ট মশকে পানি ভরে রেখেছিলো।

সুলতান জানতেন না যে, তার এই সেবকও তার জীবন-বাতি নিভিয়ে দেওয়ার চক্রান্তে ইংরেজদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। যুদ্ধ চলাকালে টিপু সুলতান প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বারবার ওই গোলামের কাছে পানি চেয়েছিলেন; কিন্তু ওই হতভাগা নরাধম গোলাম পান করার জন্যে সুলতানকে এক ফোঁটা পানিও দিলো না। ধীরে ধীরে সুলতানের শরীর ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো। চরম অবনতি দেখা দিলো। তিনি একটু পরপর কাঁধ বাঁকিয়ে ভীষণ অক্ষমতার সঙ্গে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন যে, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এক চুমুক পানি দাও'।

আল্লাহ জানেন, এই নরাধমের মন ছিলো কেমন রুক্ষ! সুলতানের বারবার এমন সকাতর অনুরোধ দেখেও তার মনে এক ফোঁটা পানি দেওয়ার ইচ্ছে হলো না। ইতিহাস সাক্ষী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

[৬৪]. নিশানে হায়দারী

www.boimate.com

আদরের দৌহিত্র হযরত হুসাইন রাদি. কুফার ময়দানে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় ছটফট করে যেভাবে শহীদ হয়েছিলেন, টিপু সুলতানকেও আল্লাহ তা'আলা শ্রীরঙ্গাপত্তনামের এই রুক্ষ গ্রীষ্মে সেই সুন্নতের ওপর আমল করার সুবর্ণ তাওফীক দান করলেন। ব্যক্তিজীবনে টিপু সুলতান হযরত হুসাইন রাদি.-এর গভীর অনুরক্ত ছিলেন। যখন টিপু সুলতান কনস্টান্টিনোপলে উসমানি খলীফার দরবারে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন, তখন তাদের নির্দেশ করেছিলেন যে, তারা যেন অবশ্যই হযরত হুসাইন রাদি.-এর মাযার যিয়ারত করে আসে।

কী অবাক সৌভাগ্য! টিপু সুলতানের বাবা-মা'র নামও হযরত হুসাইন রাদি.-এর বাবা-মার নামের অনুরূপ ছিলো। তাদের দু'জনের শাহাদাতের মাঝেও কী অপূর্ব মিল। দু'জনই মুসলিম নামধারী গাদ্দারদের চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন। ভাগ্যলিপির সাজুয্যের সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আজ টিপু সুলতানও শাহাদাতের অন্তিম মুহূর্তে ছাতিফাটা তৃষ্ণায় হাহাকার করেও এক ফোঁটা পানি পাচ্ছেন না।

স্বাধীনতার সূর্য অস্ত হলো

দিবসে শুরু থেকে চলমান এই যুদ্ধ বেলা গড়িয়ে এখন আসরের পরও অব্যাহত রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন তরবারি পরিচালনার কারণে শরীর এমনিতেই ক্লান্ত। তার ওপর কয়েকটি গুলি ত্বক ভেদ করে চলে গেছে শরীরের গভীরে। দেহের নানা স্থানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। ওদিকে মাগরিবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সারাদিনের ক্লান্ত সফর শেষে আকাশের বুকের জ্বলজ্বলে সূর্যটিও এখন অস্তাচলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। চারদিক ছাপিয়ে অন্ধকার নেমে আসার খুব একটা দেরি নেই। কী আশ্চর্য! স্বাধীনতার এই সূর্য-ও পঞ্চাশ বছর দৈর্ঘ্যের জীবনে চেষ্টা-সাধনা, সংগ্রাম, ত্যাগের নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা শেষে এখন অস্তাচলের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। একদিকে পৃথিবী তার পিঠে বসবাসরত দু'পেয়ে প্রাণীদের ওমন গাদ্দারি দেখে লজ্জায় অন্ধকারে মুখ লুকাতে চাচ্ছে। অন্যদিকে ক্ষুৎ-পিপাসা ও মুহুর্মুহু গুলিবৃষ্টির কারণে টিপু সুলতানের ক্লান্ত দেহ অসাড় হতে চলেছে। টিপু সুলতান আল্লাহর কাছে শপথ করেছিলেন– জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামবৈরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন। আজ সেই শপথ পূরণ করে চলেছেন।

www.boimate.com

আত্মসম্মান ও জাত্যাভিমানের এই সূর্য এখন মহান রবের সঙ্গে মিলিত হতে অস্থির হয়ে ওঠেছে। সহস্র ফেরেশতা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে চোখের পলক জমিনে বিছিয়ে দিয়েছে। ওদিকে জমিনের বুকে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড হাহাকার। ফেরেশতাসদৃশ্য এই মহামানবের পদভারে জমিন নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতো। আজ তার বিচ্ছেদের ফলে সেই সৌভাগ্যের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। ওদিকে অপার্থিব প্রকৃতির মাঝে তখন সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীরকে অভ্যর্থনা জানাতে পুরো অপার্থিব প্রকৃতি এখন অপেক্ষার প্রহর গুনছে। পৃথিবী থেকে একটি পবিত্র আত্মা এখন থেকে আসমানে ঠাঁই নেবে, সেই খুশিতে আসমান এখন জমিনের ওপর বড়াই করছে।

সুলতানের বুকের পিঞ্জিরায় বসত করে যেই পবিত্র আত্মা– তাকে বরণ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মৃত্যুদূত রওয়ানা হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি পৌঁছে যাবেন মহাবীরের একান্তে। ঠিক তখুনই মীর সাদিক ইংরেজদেরকে ইঙ্গিতে বললো যে, আমি যার সামনে দাঁড়িয়ে আছি তিনিই তো সুলতান অর্থাৎ তিনিই তোমাদের প্রকৃত টার্গেট। ইঙ্গিত পেতেই প্রাচীরের ওপর থেকে শুরু হয়ে গেলো গুলি-বৃষ্টি। ইংরেজ সৈন্যদের ছোড়া একটি গুলি সুলতানের ঠিক বুকের ওপর বিদ্ধ হলো। দুর্বল দেহখানা মুহূর্তে জমিনের ওপর ভেঙ্গে পড়লো। ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করলো। একজন ফিরিঙ্গি সৈনিক কাছেই দাঁড়িয়েছিলো। সে বুঝতে পারলো যে, এতোক্ষণে সুলতানের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। সেহেতু লোভাতুর ইংরেজ সৈন্যটি দৌড়ে সুলতানের কোমর থেকে হীরা জড়ানো মূল্যবান তরবারি-বন্ধনী খুলে ফেলার কসরত শুরু করে দিলো।

ওই সময় সুলতানের অক্ষিকোটর খোলা ছিলো। নিঃশ্বাস আসা-যাওয়া করছে। শত্রুর নাপাক হাত তাঁর জীবন্ত শরীর ছোঁবে– এটা কখনই সুলতানের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন। তরবারি মেলে ধরলেন। প্রচণ্ড আক্রোশে ইংরেজ সিপাহিটির ওপর তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। সিপাহি তখন কোনোমতে ব্যবহৃত বন্দুক ঢাল হিসেবে বাড়িয়ে দিলো। যার ফলে সে এ যাত্রায় বেঁচে গেলো। সুলতান শরীর সামলে তরবারি দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত করলেন। যার ফলে খুব কাছাকাছি অবস্থানরত আরেক

www.boimate.com

ফিরিঙ্গি সিপাহি সুলতানের তরবারির আঘাতে দু' টুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

হুসাইন আলী কিরমানী লেখেন, 'সুলতান যে স্থানে পড়ে গিয়েছিলেন সেটি ছিলো অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু এমন দুর্বল শরীর নিয়েও তিনি সেখানে লড়াই করে কয়েকজন ফিরিঙ্গি সৈনিককে মৃত্যুর ওপারে পাঠিয়ে দিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে দূর থেকে একজন সিপাহি সুলতানের জুলফি বরাবর ফায়ারিং করলো। তার নিক্ষিপ্ত গুলি সুলতানের ডান কানের লতার উপর বিদ্ধ হলো। চোখের পলকে সুলতান জমিনে ধসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের পিঞ্জির ভেঙ্গে জীবনপাখি উড়ে বেরিয়ে গেলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

প্রাণ নিস্তেজ; দেহ উষ্ণ

কিছু ইংরেজের তখন পর্যন্তও এ কথা বিশ্বাস হয়নি যে, সুলতান শহীদ হয়েছেন। তারা মনে করেছিলো, সুলতান ফরাসিদের কথামতো চিত্রাদুর্গ চলে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি পুনরায় লড়াই শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। টিপু সুলতানের সন্ধানে কেল্লা ও রাজপ্রাসাদের প্রতিটি স্থান তন্নতন্ন করে তল্লাশি করা হলো। কিন্তু কোথায় সুলতানের লাশ পাওয়া গেলো না। মেজর বাটার্ড নিজেই অন্ধকারের ভেতর মশাল নিয়ে একেকটি লাশ চিহ্নিত করতে লাগলেন। অবশেষে সুলতানের গাদ্দার গোলাম রাজা খানের সহায়তায় সুলতানের লাশ পাওয়া গেলো। তখনও সুলতানের দু'চোখ খোলা ছিলো। শরীরের উষ্ণতা দেখে তিনি খানিকটা দ্বিধায় পড়লেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নার্ভের ওপর হাত রাখলেন। বুঝতে পারলেন, জীবনের স্পন্দন পুরোপুরি থেমে গেছে।

সুলতানের নিথর চেহারায় তখন প্রচণ্ড প্রতাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। নিষ্প্রাণ দু'চোখ থেকেও দাপটের আগুন বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছিলো, এখনও তিনি পূর্বের মতো শত্রুশিবিরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন। ডান হাতের ওপর একটি তাবীজ বাঁধা ছিলো। কোমরে ছিলো লাল রেশমের তৈরি তরবারি-বন্ধনী। ঢিলা পাজামা ও সাদা কামিস রক্তে লাল হয়ে ওঠেছে। তখনও ডান হাতের মুষ্ঠিতে তরবারির ভগ্ন হাতল শক্ত করে ধরা ছিলো।

কর্নেল ওয়েলেসলি যখন ইংরেজ সিপাহিদের কাছ থেকে এ কথা শুনলেন যে, মৃত্যুর পরও সুলতানের শরীর অস্বাভাবিক উষ্ণ অনুভব হচ্ছে। তখন

www.boimate.com

সে এ কথা বলে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলো যে, অন্যরা মরেছে অনেক আগে। সুলতানের মৃত্যু হয়েছে একটু আগে। যার কারণে তার শরীর এখনও উষ্ণ অনুভব হচ্ছে। এই কাফের কীকরে জানবে, ঈমানের উষ্ণতা কাকে বলে! বিশ্বাসী ব্যক্তির ঈমান এতোটাই উষ্ণ হয়ে থাকে যে, তা শুধু আত্মায়-ই নয়: শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রেও অনুপ্রবেশ করে থাকে। পুরো ঘটনার চিত্রায়ণ এবার আমরা এমন একজন ব্যক্তি থেকে জানবো, যিনি ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার চাক্ষুষ দর্শক, ইংরেজ অফিসার 'মেজর এলিন' পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এভাবে তুলে ধরেন—

> 'টিপুকে ফটকের বাইরে নিয়ে আসা হলো। ওই সময়ও তার দু'চোখ খোলা ছিলো। শরীর উষ্ণ ছিলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কর্নেল ওয়েলেসলি ও আমার সন্দেহ হলো যে, সম্ভবত তিনি জীবিত আছেন। কিন্তু নাড়ি ও হৃদয়স্পন্দন পরীক্ষা করে দেখার পর আমার সন্দেহ কেটে গেলো। টিপুর শরীরে চারটি ক্ষত ছিলো। যার তিনটি ছিলো শরীরে। চতুর্থ ক্ষতটি হয়েছিলো কানপট্টির ওপর।
>
> সুলতানের শরীরে মূল্যবান কাপড়ের আস্তিনওয়ালা কোট ও ফুলদার ঢিলেঢালা পাজামা ছিলো। কোমরের আশপাশে বেগুনী রংশের রেশমি ও সুতি কাপড়ের বন্ধনী ছিলো। মাথা তখন উন্মুক্ত ছিলো। হয়তো সংঘর্ষের সময় মাথার ওপর থেকে পাগড়ি পড়ে গেছে। একটি দৃষ্টিনন্দন থলে ওই সময় তার শরীরের সঙ্গে ঝুলে ছিলো। থলের ওপর লাল ও সবুজ রংয়ের পট্টি সেলাই করা ছিলো। তার বাহুতে একটি তাবীজ বাঁধা ছিলো। এর বাইরে কোনো অলংকার তার শরীরে ছিলো না। তার চেহারা থেকে পরিষ্কার প্রতাপ ঝরছিলো। এই দাপুটে চেহারা বলে দিচ্ছিলো যে, তিনি অন্যদের মতো নন।

আরেক ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শী এ কথা লেখেন—

> 'টিপু সুলতানের চেহারার ওপর অস্বাভাবিক সততা ও দাপট প্রকাশ পাচ্ছিলো। চেহারার সর্বত্র জুড়ে বিরাজ করছিলো শান্তি ও স্বস্তির এক অপার্থিব আবহ– যা তাকে পার্থিব জীবনেও অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিলো।'

এই চতুর্থ যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর স্রেফ দেড় হাজার সিপাহি নিহত হয়। মহিসুর বাহিনীর শহীদদের তুলনায় তাদের হতাহতের সংখ্যা অনেক কম

www.boimate.com

ছিলো । মহিসুরের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যেই চারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তার মধ্যে এ যুদ্ধেই সবচেয়ে কম ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিলো । যার কারণ স্পষ্ট । তাহলো, এই যুদ্ধে ইংরেজরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় গাদ্দারি ও ষড়যন্ত্রের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলো ।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এই নির্মম দুর্ঘটনা ২৮ যিলকদ ১২১৩ হিজরী, মুতাবেক ৪ মে ১৭৯৯ ঈসাব্দে সংঘটিত হয় । ওই সময় সুলতানের বয়স সৌরবর্ষ হিসেবে ৪৯ বছর হয়েছিলো । যেহেতু সুলতান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০ নভেম্বর ১৭৫০ ঈসাব্দে । কাজেই সে হিসেবে শাহাদাতের সময় তার বয়স হয়েছিলো, ৪৮ বছর, ৫ মাস, ১৪ দিন ।

ঐতিহাসিকগণ আরবী বর্ণমালার 'আবজাদ' ধারাক্রম অনুসারে ১২১৩ হিজরীর মৃত্যু-তারিখ এ বাক্যে বের করেছেন–

ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد .

আরবী বর্ণমালার সংখ্যা-মান হিসেবে যার গাণিতিক অর্থ দাঁড়ায়, '১২১৩ হিজরী' ।

মাওলানা যাফর আলী খান মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে সুলতানের শাহাদাতের ওপর শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেছেন—

کہیں سوتے میں نہ کروٹ یہ مجاہد بدلے
اب بھی اس خوف سے ہیں لرزہ بر اندام حسود

اس کے اٹھتے ہی مسلمانوں کا گھر بیٹھ گیا
تھا قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود

قوت بازوئے اسلام تھی اس کی صولت
اس کی دولت کے دعاگوؤں میں شامل تھے ہنود.

এই মহাবীর ঘুমের ঘোরে পার্শ্ব বদল করে কি-না,
সেই আতঙ্কে এখনও ভীষণ সন্ত্রস্থ হয়ে আছে হিংসুক-শিবির ।

তাঁর প্রস্থানমাত্রই ধসে পড়েছে মুসলমানদের বসত ।
একেই বলে প্রলয়ের উত্থান ও প্রলয়ের প্রস্থান ।

তাঁর দাপট ছিলো ইসলামের বাহুবল,
তাঁর রাজত্বের অমরত্ব প্রার্থীদের কাতারে হিন্দুরাও ছিলো ।

www.boimate.com

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতন

সুলতানের শাহাদাত ও ১২ হাজার বিশ্বস্ত সঙ্গীর আস্থার প্রমাণ-দানের মাধ্যমে মহিসুরের এই চতুর্থ ও ভাগ্যনিয়ন্ত্রক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ওই ১২ হাজার বিশ্বস্ত সঙ্গীর তালিকায় সহস্র হিন্দু-মুসলিম নারী ও রাজপরিবারের কয়েকজন মহিলা সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফরাসি সৈন্যরা— যারা এতোক্ষণ সুলতানের পক্ষে লড়াই করছিলো, এখন তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারাও অস্ত্র ফেলে পরাজয় মেনে নিলো। যার ফলে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের ওপর শত্রুবাহিনীর বিজয়ের ষোলকোলা পূরণ হলো। খুশির আতিশয্যে জেনারেল হ্যারিস টিপু সুলতানের লাশের কাছে এসে চিৎকার করে বলে ওঠে—

'আজ থেকে হিন্দুস্তান আমাদের'।

টিপু সুলতানের শাহাদাতের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার একটি সোনালি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় ইতিহাসের নতুন পর্ব। হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতার পতাকা। এই মহান শহীদের নিথর শরীরের নিচে হারিয়ে যায় মাতৃভূমির উজ্জ্বল অতীত, আলোকিত বর্তমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত।

মানবতাও সেদিন ডুকরে কেঁদেছিলো

শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতনের পরপরই মীর আলমের নেতৃত্বে হায়দারাবাদের ফৌজ শহরে প্রবেশ করে। বিজয়ের আতিশয্যে ফিরিঙ্গি সিপাহিরা সেদিন বর্বরতা ও হিংস্রতার সকল সীমা অতিক্রম করেছিলো। মদ্যপ সিপাহিরা নেশায় উন্মত্ত হয়ে সাধারণ জনগণের ঘরের দুয়ার ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে। অন্দরমহলের নিভৃত কক্ষে লুকিয়ে থাকা নারীদের গণধর্ষণ শুরু করে দেয়। তাদের সেদিনের বর্বরতা দেখে খোদ মানবতাও ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো। ইংরেজ সিপাহিরা নির্বিচারে লুটতরাজ চালিয়ে যায়। এমনকি মীর সাদিক, মীর কমরুদ্দীন ও পুর্নিয়ার মতো জাতীয় গাদ্দার— যাদের নিকৃষ্ট ভূমিকার কারণে ইংরেজদের পক্ষে মহিসুর বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিলো, ইংরেজ সিপাহিরা তাদের বাড়ি–ঘরেও হামলে পড়ে। তাদের অন্দরমহলের নারীরাও গোরা সিপাহিদের নারকীয় তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায়নি। এভাবেই কুদরত তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলো।

www.boimate.com

ইংরেজদের হাতে রাজধানীর পতন হওয়ার কারণে যে-সব লোক মনঃক্ষুন্ন হয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলো, তাদের সবাইকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। কেল্লার ফটকগুলোতে আগুন লাগানো হয়। মসজিদে আ'লায় আশ্রয় গ্রহণকারী সাধারণ মানুষদেরকেও নির্বিচারে হত্যা করা হয়। যার কারণে পুরো মসজিদ রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। বর্বরতা ও হিংস্রতার এই নগ্ন নৃত্যের শিকার হয়ে সেদিন কমপক্ষে ১০ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়ে। যাদের মাঝে হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবশ্রেণির হতভাগ্য ছিলো। মহিসুরের রাতের আকাশ বিদীর্ণ করে আহতদের আর্তচিৎকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। গোটা নগরী ভুতুড়ে আস্তাকুড়ে পরিণত হয়েছিলো। ইংরেজ সিপাহিরা লুটতরাজ ও ধর্ষণে এতোটাই উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলো যে, শেষমেষ জেনারেল ওয়েলেসলি-কে বাধ্য হয়ে এ কথা ঘোষণা করতে হয়— 'কয়েকজন লুটেরা সৈনিককে ফাঁসি না দেওয়া পর্যন্ত এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।'

জানাযা ও দাফন

দ্বিতীয় দিন ৫ মে জেনারেল হ্যারিস ইসলামি রেওয়ায়েজ অনুসারে সুলতানের দাফন-কাফনের অনুমতি প্রদান করে। সকাল বেলা সর্বসাধারণের দর্শনের জন্যে সুলতানের লাশ প্রাসাদের একটি খোলা চত্বরে রাখা হয়। সুলতানকে শেষবারের মতো এক পলক দেখার জন্যে সেদিন সবধর্মের মানুষ জড়ো হয়েছিলো। একে একে প্রত্যেকেই একনজর সুলতানকে দর্শন করেন। যোহরের পূর্বে গোসল-কার্য সম্পন্ন হয়। মক্কায় বোনা একটি বিশেষ কাফনে তাকে আবৃত করা হয়। সূর্যাস্তের পর জানাযা রাজপ্রাসাদ থেকে রওয়ানা হয়। জীবদ্দশায় সুলতানের সবিশেষ খাদেম ছিলেন, এমন চারজন একান্ত সেবক জানাযা কাঁধে বহন করে নিয়ে যায়। শাহযাদা আবদুল খালেক ছাড়াও রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ জানাযার সঙ্গে কবরস্থান অভিমুখে যাত্রা করেন। মাইয়্যেতের পেছনে ইংরেজ ফৌজের চারটি কোম্পানি ছিলো। জানাযায় এতো বিপুল পরিমাণ লোক অংশগ্রহণ করেছিলো যে, ভীড় সামলে কবরস্থান অভিমুখে অত্যন্ত ধীরে যেতে হচ্ছিলো। রাজপ্রাসাদ, শহরের অলি-গলি, দোকান-পাট সব শূন্য

www.boimate.com

হয়ে যায়। জানাযায় সবার আগে ছিলেন শহরের কাযী সাহেব। তিনি উচ্চ স্বরে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করছিলেন। পেছনের মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে আয়াত দোহরাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির লোকজনও জানাযাগামী কাফেলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। হিন্দু নারীরা মাথার ওপর মাটি ঢেলে মাতম করছিলো। জানাযায় ঘুমন্ত টিপুর লাশ দেখে মুসলিম নারীগণ নিজেদের অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলেন না। অনেক নারীকে সেদিন মাথার চুল ছিড়ে, চিৎকার করে কাঁদতে দেখা গিয়েছিলো। প্রখর রৌদ্র ও অগ্নিতপ্ত বাতাসের কারণে এমনিতেই সবার নাভিশ্বাস উঠছিলো। দমবন্ধ গুমোট আবহাওয়ার কারণে উপস্থিত লোকজনের নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।

সেদিন পুরো প্রকৃতি থমকে পড়েছিলো। বাতাস নেই, পাখিদের কোলাহল নেই। প্রকৃতির সব কিছু আপন স্থানে নীরব-নিশ্চল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, সুলতানের সম্মানে কুদরত আজ তাদেরকে মৌন থাকার নির্দেশ করেছে। জানাযা লালবাগে পৌঁছানোর পূর্বেই আকাশ জুড়ে ঘন মেঘমালা জমতে শুরু করে। আসরের সময় যখন সুলতানের জানাযা লালবাগে এসে পৌঁছে তখন সুলতানের প্রতি শোক প্রকাশ করে কেল্লা থেকে কয়েকবার তোপধ্বনি করা হয়েছিলো। কিন্তু কবরস্থানে এ পরিমাণ লোক উপস্থিত হয়েছিলো যে, তাদের বুকফাঁটা কান্নার কারণে তোপের সেই বিকট ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পর্যন্ত শোনা যায়নি।

সেদিন আকাশের চোখেও অশ্রু ছিলো

এক বর্ণনা অনুসারে শহরের কাযী সাহেব সুলতানের জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। সুলতানের লাশ যখন কবরে রাখার জন্যে নিচে নামানো হচ্ছিলো তখন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি তাঁর কারামত ও আল্লাহর কাছে অসামান্য মকবুলিয়তের প্রমাণ বহন করে। প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও আকাশের বুকে প্রচুর পরিমাণ বিজলি চমকাচ্ছিলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। বিদ্যুৎ চমক ও কানফাটা গর্জনের পরপরই অকস্মাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে ইংরেজ সিপাহিরা সুলতানকে বিদায়ী সালাম জানাতে বন্দুক থেকে শূন্যের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়তে শুরু করে; কিন্তু আকাশের গর্জনের কাছে তাদের সেই ফায়ারিং আওয়াজ এতোটাই ঢাকা পড়েছিলো যে, শোনাই যাচ্ছিলো

www.boimate.com

না । হয়তো কুদরত তার নিজ ভাষায় বলছিলেন যে, আজ আমি আমার বান্দাকে আকাশের বুকে তোমাদের চেয়ে হাজার গুণ বিশাল তোপধ্বনি সহকারে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি ।

মহিসুরের মৌসুম অনুসারে ওই সময়টি বর্ষাকাল ছিলো না । তারপরও আকাশের এমন প্রবল বর্ষণের কারণে মনে হচ্ছিলো, সুলতানের প্রতি আজকের আকাশও ভালোবাসার জানান দিচ্ছে । ওই রাতেই আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত বজ্রপাতে মুম্বাইয়ের ইংরেজ ক্যাম্পের দু'জন সিপাহি তৎক্ষণাৎ পুড়ে ভস্মিভূত হয় । একাধিক সিপাহি মারাত্মকভাবে আহত হয় । ওই সময় এ পরিমাণ বিকট বজ্রপাত হয়েছিলো যে, ঘরের ভেতর দুয়ার বন্ধ করে বসে থাকা লোকজনও আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করেছিলো । বজ্রের বিকট শব্দের কারণে কানের পর্দা ফেঁটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো ।

ওই রাতে কাবেরি নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিলো । খোদ শ্রীরঙ্গাপত্তনমের বয়স্ক লোকদের বক্তব্য হলো— তারা তাদের জীবনে কাবেরি নদীতে এমন দৈত্যাকৃতির ঢেউ উঠতে কখনই দেখেননি ।

দেশমাতৃকার এই মহান সন্তান সূর্যাস্তে পূর্বেই মাটির নিচে সমাহিত হন । তাঁর আত্মা পৌঁছে যায় অপার্থিব সৌন্দর্যের জান্নাতে । সংগ্রাম, সাধনা ও দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত এই ক্লান্ত কর্মবীর আশ্রয় নেন চিরদিনের বিশ্রামালয়ে । পেছনে স্বদেশের জনগণ ভারাক্রান্ত মনে তার উদ্দেশে হাত নেড়ে বিদায়ী সালাম জানাচ্ছেন । 'সীমাব আকবারাবাদী'-এর ভাষায় তাদের সালামের শব্দগুলো ছিলো এমন—

اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام
تجھ پہ لاکھوں رحمتیں لاانتہا تجھ پر سلام

ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا
ورنہ تو ہی عہد آزادی کا اک عنوان تھا

اپنے ہاتھوں خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا
آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا

بت پرستوں پر کیا ثابت یہ تو نے جنگ میں
مسلم ہندی قیامت ہے حجازی رنگ میں

www.boimate.com

عین بیداری ہے یہ خواب گراں تیرے لئے
ہے شہادت اک حیات جاوداں تیرے لئے

تو بدستور اب بھی زندہ ہے حجاب گور میں
جذب ہو کر رہ گیا ہستی پر شور میں۔

'হে বিশ্বস্ততার রণাঙ্গনের শহীদ পুরুষ! তোমাকে সালাম!
তোমার ওপর লক্ষ রহমত ও নিসীম সালাম বর্ষিত হোক!

ভাগ্যবিধাতা ভারতভূমির ললাটে দুর্ভাগ্য লিখে রেখেছিলেন,
নয়তো তোমার শাসনামল ছিলো স্বাধীনতার এক সোনালী
অধ্যায়।

এদেশবাসী তোমাকে স্বহস্তে খুইয়েছে।
আহ! বাগানের মালি তার বাগানের শ্রেষ্ঠ ফুল খোয়ালো।

তুমি যুদ্ধের ময়দানে মূর্তিপূজারীদের ওপর প্রমাণিত করেছিলে
যে, ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত হলে ভারতীয় মুসলমানরাও
তাগুতের জন্যে কেয়ামতসদৃশ্য।

তোমার জন্যে এই অমূল্য স্বপ্ন জাগরণের চেয়ে কম নয়।
শাহাদাত তোমার জীবনে নিয়ে এসেছিলো অনন্ত জীবন।

কবরের আড়ালে রীতিমত তুমি আজও অমর হয়ে আছো,
যদিও তোমার অস্থিমজ্জা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।'

www.boimate.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীরঙ্গপত্তনম পতনের পর সংঘটিত কিছু ঘটনা

www.boimate.com

সুলতানের ঐশ্বর্য এখন লুটেরাদের হাতে

ইংরেজদের পূর্ব থেকেই অনুমান ছিলো যে, সুলতানের রাজপ্রাসাদে প্রচুর সম্পদ, হীরা-জওহরাত ও নগদ অর্থ রয়েছে। এজন্যে তারা সুলতানের শাহাদাতের পরপরই রাজপ্রাসাদে প্রহরা বসিয়ে দেয়। কিন্তু এরপরও বিজয়োল্লাস ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে ইংরেজ বাহিনীর প্রতিটি সিপাহি অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। শক্ত প্রহরার সত্ত্বেও গোপন পথে কয়েকজন লুটেরা সৈন্য ভেতরে প্রবেশ করে সম্পদ লুটতরাজ করতে সক্ষম হয়। কর্নেল ওয়েলেসলি তার সৈন্যদের লোভাতুর অস্থিরতা দেখে রাজপ্রাসাদ খুলে সুলতানের ঐশ্বর্য গণনা করেন। বিপুল সম্পদ দেখে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

যুদ্ধের পূর্বেই সমস্ত জওহরাত ও স্বর্ণালংকার ইত্যাদি সিন্দুকে ভরে তালাবদ্ধ করে তার ওপর সরকারি মোহর লাগিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে লুকানো হয়। ওই সময় নগদ পঞ্চাশ লক্ষ রুপি, মূল্যবান গ্রন্থাগার, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন-কোসন, রাজসিংহাসন, রৌপ্য নির্মিত হাওদা, হাতির মূল্যবান দাঁত, হীরাখচিত তরবারি, রেশম ও মলমলের কাপড়ের স্তুপ ছাড়াও প্রচুর উৎকৃষ্ট মানের গালিচা ছিলো। এ সময় রেশম ও মলমলের এতো প্রচুর কাপড় হস্তগত হয়েছিলো যে, 'মডার্ন মহিসুর' গ্রন্থের লেখকের দেয়া তথ্যানুসারে সেগুলো বহন করার জন্যে ৫০০ উট ব্যবহার করতে হয়েছিলো। সরকারি গুদামে এতো প্রচুর শষ্য ছিলো যে, যদি সুলতান জীবিত থাকতেন তাহলে অনায়াসে তা দিয়ে গোটা মহলের ১১ বছরের খাবারের জোগান হয়ে যেতো। যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে অত্যাধুনিক ৬০ হাজার বন্দুক, ১২ হাজার গোলা, ৫ লক্ষ গুলি ও ৯২০ টি গোলাভরা অস্ত্র ছাড়াও প্রচুর গোলা-বারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ছিলো।

সুলতানের পাগড়ি ও একটি ব্যবহৃত তরবারি সাবেক গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালস-কে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।

www.boimate.com

মূল্যবান হীরা-জওহরাত দিয়ে খচিত একটি শূন্য সিন্দুক নিলামে ৫০ লক্ষ রুপি দর ওঠে। জনৈক ইংরেজ সিপাহি সুলতানের একটি বাহু-বন্ধনী পেয়ে যায়। যা সে জনৈক ডক্টরের কাছে বিক্রি করে দেয়। ওই ডক্টরের বক্তব্য হলো, আমি তার মাধ্যমে প্রতিবছর ১ লক্ষ রুপি আয় করে থাকি।

এক ইংরেজ সিপাহি শাহী মহল থেকে কয়েকটি সাধারণ পোশাক চুরি করেছিলো। ওই পোশাকের ওপর যেই হীরা-জওহরাত ছিলো, তা তখনকার ইংল্যান্ডে ৪০ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করে।

এই যুদ্ধের সমরনায়ক ছিলো লর্ড ওয়েলেসলি। বণ্টনের সময় তার অংশে টিপুর একটি তরবারি, একটি হীরার শাহী প্রতীক ও কিছু অলংকার বরাদ্দ হয়। এগুলোর তৎকালীন মূল্যমান কয়েক কোটি রুপি ছিলো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মাঝে কোম্পানির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যেই সম্পদ বণ্টন করা হয়, ধারণা করা হয়, সেগুলোর মূল্যমান ছিলো ৯ কোটি রুপি। শুধু জেনারেল হ্যারিস-কেই ৬৪ লক্ষ টাকা মূল্যের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রদান করা হয়। তার অংশের একটি হার ওই যুগেই ৬ লক্ষ রুপিতে বিক্রি হয়েছিলো।

হায়দারাবাদের সিপাহিদের মাঝে বণ্টন করার জন্যে তাদের সেনাপতি মীর আলমকে শুধু এক লক্ষ প্যাগোডা দেওয়া হয়। যা ইংরেজ সৈন্যদের মাঝে বণ্টিত সম্পদের তুলনায় নেহায়েতই তুচ্ছ। যখন মীর আলম এ ব্যাপারে ওয়েলেসলির কাছে অভিযোগ করে তখন সে উত্তরে বলে, তার কাছে এর অতিরিক্ত কিছুই নেই। সে ইচ্ছে করলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে রাজপ্রাসাদে বিদ্যমান বাঘগুলো নিয়ে যেতে পারে। যখন মীর আলম সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তখন ইংরেজ সিপাহিরা সেই হিংস্র বাঘ, সিংহ ও চিতাবাঘগুলো গুলি করে মেরে ফেলে। অবশ্য সেখান থেকে তিনটি চিতাবাঘ ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে উপহার হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

শাহাদাতের সময় টিপু সুলতানের গলায় মুক্তাজড়ানো অতিমূল্যবান হার ছিলো। যা ইংরেজরা প্রচুর অনুসন্ধান করেও খুঁজে পায়নি। শাহাদাতের পরপরই সুলতানের অবিশ্বস্ত গোলাম রাজা খান ওই হার খুলে রেখে দেয়।

www.boimate.com

উপরে বর্ণিত বিবরণটি হলো যুদ্ধের কয়েকদিন পর কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদের সিপাহিদের মাঝে বণ্টিত সম্পদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা। এর আগে যুদ্ধের সময় তাদের সৈন্যরা ব্যক্তিগতভাবে যেই সম্পদ লুটে নিয়েছিলো, তা পরিসংখ্যানে উঠে আসেনি।

রাজসিংহাসন

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের তালিকায় সবচেয়ে মূল্যবান ও দৃষ্টিনন্দন জিনিসটি হলো রাজসিংহাসন। উসমানি খলীফার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সুলতান' হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর অভিজ্ঞ স্বর্ণকারদের নিয়োগ দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সুলতান সিংহাসনটি তৈরি করেন। সিংহাসনটি ছিলো বাঘের আদলে। সিংহাসনটির দৈর্ঘ্য ছিলো ৮ ফিট। প্রস্থ ৫ ফিট। রাজসিংহাসনটি মূল্যবান কাঠ দিয়ে নির্মিত চারটি ঘোড়ার পিঠে বসানো ছিলো। যার ওপর স্বর্ণের পাত ছিলো। এর দু' দিকে রৌপ্য নির্মিত সিঁড়ি ছিলো। সিংহাসনের ছাতায় ছিলো স্বর্ণনির্মিত তারের মাঝে খাঁটি মুক্তার ঘুন্টি। সবার উপরে ছিলো কাল্পনিক পাখি 'হুমা'-এর আদলের একটি দৃষ্টিনন্দন পাখিমূর্তি।

সিংহাসনের চতুর্দিকে মূল্যবান হীরা-জওহরাত খচিত দশটি খর্বাকৃতির বাঘ। দূর থেকে সিংহাসনটিকে একটি সিংহের মতো মনে হতো। সুলতান যখন সিংহাসনের ওপর আরোহণ করতেন তখন মনে হতো, কবুতরের সমান দৈর্ঘ্যের এই ছোট্ট হুমা পাখিটি তার মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছে। টিপু সুলতান শহীদ হওয়ার পর যখন এই রাজসিংহাসন ইংরেজদের হস্তগত হয় তখন তারা সর্বপ্রথম সেখানে স্থাপিত স্বর্ণের বাঘদুটি আলাদা করে তা লন্ডনে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এরপর সিংহাসনটি টুকরো টুকরো করে কোম্পানির উর্ধ্বতন অফিসারদের মাঝে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেকের অংশে তৎকালীন ১ হাজার ৮ শ পাউন্ড মূল্যমানের সম্পদ বণ্টিত হয়েছিলো।

সুলতানের পরিবার-পরিজন নজরবন্দি

টিপু সুলতান শহীদ হওয়ার সময় বড় শাহযাদা 'ফতেহ্ হায়দার' একদল সৈন্য সহকারে শহরের বাইরে 'কারীঘাট'-এ অবস্থান করছিলেন। ওই

www.boimate.com

দলে ১২০ জন ফরাসি সৈন্য ছিলো। সুলতানের শাহাদাতের সংবাদ শুনে সেখান থেকে 'রায়ীপটন' পালিয়ে যান। তখন পর্যন্ত ইংরেজরা কেবল রাজধানী ও কয়েকটি ছোট ছোট কেল্লা দখল করতে পেরেছিলো। চিত্রাদুর্গ, সিরা সহ সালতানাতের অন্যান্য এলাকা মহিসুরের অধীনেই ছিলো। কিন্তু সুলতানের শাহাদাতের সংবাদ শুনে নিরাশ হয়ে মহিসুরের জনগণ আত্মসমর্পণ করে। কারণ তখন তাদের মাঝে লড়াই করার মতো শক্তি ছিলো না।

শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতনের পরপরই ইংরেজরা সুলতানের গোটা পরিবারকে নজরবন্দি করে। ফতেহ হায়দার ছাড়া অন্য ১১ জন শাহযাদা, এক শাহযাদী, জামাতা হায়দার হুসাইন খান, স্ত্রী সুলতান বেগম, হায়দার আলীর স্ত্রী বখশী বেগম, ছোট ভাই করীম শাহ, তার দু' ছেলে সফদার শেকওয়াহ ওরফে গোলাম আলী ও নবাব হায়দার ওরফে ইমাম বখশ-সহ রাজপ্রাসাদের অন্যান্য নারীসদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুসন্ধানে এতোটুকু তথ্য পাওয়া যায় যে, সুলতানের শাহাদাতের সময় তাঁর আপন মা জীবিত ছিলেন। তবে তিনি নগরীর বাইরে ছিলেন। আদরের সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন। তবে কোথায় গিয়েছিলেন, তার কী অবস্থা হয়েছিলো, এ ব্যাপারে ইতিহাস নিশ্চুপ। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সুলতানের প্রথম স্ত্রী রুকাইয়া বেগম ১৭৯০ সালেই ইনতিকাল করেছিলেন।

ওদিকে সুলতানের বড় শাহযাদা 'ফতেহ হায়দার' যখন 'রাইপটন' অবস্থান করছিলেন তখন তাকে সুলতানের কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী এ পরামর্শ প্রদান করেন যে, তিনি যেন কালবিলম্ব না করে চিত্রাদুর্গ চলে যান এবং সেখান থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কারণ, এখনও সালতানাতের বিশাল এলাকা যথারীতি তার হাতে রয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে এগুলো রক্ষা করা সম্ভব।

ইংরেজরা এ সংবাদ শোনামাত্রই পুর্নিয়া ও মীর কমরুদ্দীনকে শাহযাদা ফতেহ হায়দারের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তার সঙ্গে এ অঙ্গীকার করে যে, সে যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাকে তার পিতার স্থানে

www.boimate.com

রাজসিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও শাহযাদার কাছে মালিক জাহান খানের পরামর্শ মনোঃপূত হয়েছিলো; কিন্তু তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, আত্মসমর্পণ না করলে ইংরেজরা নজরবন্দি করে রাখা পরিবারটির ওপর সীমাহীন অত্যাচার করতে পারে। এজন্যে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যার পরপরই ইংরেজরা চিত্রাদুর্গ ও সিরা সহ সালতানাতের পূর্ণ এলাকার ওপর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

রাজপরিবারের নির্বাসন

শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতন হয়েছে, একমাসও হয়নি। কিন্তু ইংরেজদের মনে প্রবল আতঙ্ক ছিলো যে, শাহী পরিবার যেকোনো মুহূর্তে তাদের প্রশাসনের সামনে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এ উদ্বেগের কারণে তারা ১৮ জুন ১৭৯৯ সালে সুলতানের পুরো পরিবারটিকে 'ভিল্লোর' দেশান্তর করে। পরিবারের সদস্যদের তালিকা পূর্বের শিরোনামে আলোচিত হয়েছে। পরিবারটি ব্যয়ভার হিসেবে সদস্য প্রতি ১০ হাজার প্যাগোডা হারে সামষ্টিকভাবে বার্ষিক ২ লক্ষ ২৪ হাজার প্যাগোডা ভাতা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ রুপি। তাদের দেখাশোনার জন্যে একজন ইংরেজ রেজিড্যান্ট নিযুক্ত করে। ১২১৯ হিজরী, মুতাবেক ১৮০৫ সালে সেখানে হায়দার আলীর স্ত্রী বখশী বেগম ইনতিকাল করেন। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।[৬৫]

আট বছর পর ১৮০৭ সালে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক বিদ্রোহ শুরু হয় তখন ইংরেজদের সন্দেহ হয় যে, এতে টিপুর দেশান্তরিত শাহযাদাদের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। সেই সন্দেহে তাদেরকে সেখান থেকে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে তাদেরকে কলকাতা শহরের ডায়মন্ড হারবার রোডে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিলো। এরপর সেখান থেকে টালিগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই সময় স্থানটির নাম ছিলো, 'রিশা পাগলা'। কলকাতার নজরবন্দির জীবনে তারা কয়েক টুকরো জমিন

---

৬৫. মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরী রচিত 'টিপু সুলতান' পুস্তিকা

www.boimate.com

ক্রয় করেন এবং তার ওপর দু'টি আলীশান মসজিদ তৈরি করেন। প্রথম মসজিদটি ১২৫১ হিজরী, মুতাবেক ১৮৩৫ সালে টালিগঞ্জে ও দ্বিতীয় মসজিদটি ১২৫৮ হিজরী, মুতাবেক ১৮৪২ সালে ধর্মতলা স্ট্রিটে নির্মিত হয়। এছাড়াও তারা ইমামবাড়া মসজিদ ও কালিঘাটে মুসলমানদের জন্যে একটি কবরস্থান ওয়াকফ করেন। যা 'মহিসুর খান্দান কবরস্থান' নামে পরিচিত। প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোডে অবস্থিত মসজিদের চার দেয়ালের ভেতর একটি উঁচু চত্বরে টিপুর স্ত্রী সুলতান বেগম ও শাহযাদা গোলাম মুহাম্মদ এবং তার স্ত্রীর কবরগুলো এখনও বিদ্যমান রয়েছে।[৬৬]

জাত্যাভিমানী সুলতানের সন্তানদের অসহায় জীবন

মহিসুরের এই রাজবংশ এখনও কলকাতায় আছে। সেখানে তারা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। পুরনো কলকাতার সংকীর্ণ গলির ভগ্নপ্রায় ভবনগুলোতে তারা কোনোমতে বেঁচে-বর্তে আছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে এই পরিবারের সদস্যদেরকে এখন জীবিকার তাগিদে রিক্সা, ঠেলাগাড়ি চালাতে হচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বে এই পরিবারের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের সংবাদ শুনে এবং পত্রিকার পাতায় তাদের বেদনাবিধুর জীবনসংগ্রামের চিত্র দেখে পশ্চিমবঙ্গের হাইকোর্টের বিচারপতি খাজা ইউসুফ ও বিচারপতি অজিত কুমার সেন গুপ্ত তাদের জন্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মাসিক ১ হাজার রুপি ভাতা জারি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এর কিছু দিন পর ওই সময়কার কর্নাটক সরকার তাদেরকে রাষ্ট্রীয় খরচে মহিসুর, ব্যাঙ্গালুরু ও শ্রীরঙ্গাপত্তনামে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ মালুম, যাদের পিতৃপুরুষদের রক্তে এই অঞ্চলটি এক যুগে সিঞ্চিত হয়েছিলো, যাদেরকে এখানে ফিরিয়ে আনতে মহিসুরের জনগণ মনে-প্রাণে কামনা করছে, কোনো এক অশুভ শক্তির কারণে প্রাদেশিক সরকারের সেই পরিকল্পনা সফলতার মুখ দেখেনি। অথচ এখনও শ্রীরঙ্গাপত্তনাম, মহিসুর, ব্যাঙ্গালুরু প্রভৃতি এলাকায় এই শাহী

---

[৬৬]. সুভনিয়র ১৯৯৪ ঈ.। প্রকাশনায়, আনজুমানে ফালাহে মাসাজিদে মাগরিবি বাঙ্গাল [পশ্চিমবঙ্গ মসজিদ কল্যাণ পরিষদ]

www.boimate.com

পরিবারের হাজার হাজার একর জমিন ও বিভিন্ন স্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

নতুন সরকার গঠন ও শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

টিপু সুলতানের শাহাদাত, সাম্রাজ্য দখল ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের পর এখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এ রাজ্যটির সরকার-ব্যাবস্থা ও প্রশাসন কেমন হবে? সুলতানের সাবেক অর্থমন্ত্রী, ধিকৃষ্ট গাদ্দার পুর্নিয়া খুব ভালোভাবেই জানতো যে, মহিসুরের জনগণের কাছে সুলতান ও তার পরিবার অত্যন্ত জনপ্রিয়। সে এ কথাও জানতো যে, যদিও সুলতান শহীদ হয়েছেন এবং তার ক্ষমতার পতন ঘটেছে; কিন্তু এখানকার সর্বস্তরের জনগণ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে রাজসিংহাসনে এই পরিবারের বাইরের কোনো সদস্যকে মেনে নেবে না। খোদ হিন্দুরা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা এখানকার সাবেক হিন্দু রাজার পরিবারকে পুনর্বহালের পক্ষে সম্মত হবে না। এজন্যে পুর্নিয়া প্রস্তাব পেশ করেছিলো যে, মহিসুরের সিংহাসনের সুলতানের পরিবারেরই কোনো সদস্যকে অধিষ্ঠিত করা হোক। প্রয়োজনে দেশের অতিগুরুত্বপূর্ণ কেল্লাগুলোতে ইংরেজ নিজ বাহিনী নিয়োজিত রাখতে পারে।

কিন্তু সতর্ক ইংরেজরা তার এ প্রস্তাব মেনে নেয়নি। কারণ, তারা এদেশের সিংহাসনে এমন কাউকে বসিয়ে অনাগত দিনগুলোতে কোনো আশঙ্কা তৈরি করতে চাচ্ছিলো না; অথচ এই ইংরেজরাই ফতেহ হায়দারকে অস্ত্র সমর্পণ করার সময় রাজসিংহাসনে পুনর্বহালের অঙ্গীকার করেছিলো। যা ছিলো তাদের চরম শঠতা ও প্রতারণা। ওয়েলেসলি পুর্নিয়ার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, জেনারেল হ্যারিসের নেতৃত্বে একটি চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। যেখানে কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক, স্যার ব্যারিব্রুজ ও কর্নেল ওয়েলেসলি (লর্ড ওয়েলেসলির ভাই) অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাদেরকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তারা দ্রুত সময়ের ভেতর চিন্তা-ভাবনা ও মতবিনিময় করে মহিসুর সাম্রাজ্যের সরকার-ব্যাবস্থা ও প্রশাসন-পরিচালনার জন্যে উপুক্ত প্রস্তাবনা উত্থাপন করবে।

www.boimate.com

এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইংরেজদের মিত্র হায়দারাবাদের নিযামও টিপু সুলতানের পরিবারের কোনো সদস্যকে মহিসুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পক্ষে ছিলো না। মহিসুরের গাদ্দার উযির ও অফিসাররাও কোম্পানির ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলো যে, তারা যেন টিপুর পরিবারের কোনো সদস্যকে মহিসুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না করে। কারণ, যারা তাদের পিতার সঙ্গে গাদ্দারি করেছে, যাদের কারণে মহিসুর রাজ্য আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই স্থলাভিষিক্ত শাহযাদা ক্ষমা করবে না এবং যেকোনো উপায়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেবে। ওই সময় মীর গোলাম আলী তো এ কথা বলেই ফেলেছিলো–

افعی کشتن و بچہ را نگہداشتن کار خردمنداں نیست.

'সাপ মেরে, তার ছা বাঁচিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।'

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি মনে করতো যে, এখন যদি মহিসুর রাজ্যকে নিযাম বা মারাঠাদের মধ্য হতে কারো হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে এ নিয়ে তাদের দু'দেশের মাঝে সংঘাত বেঁধে যাওয়ার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে। এর বাইরে আরও কিছু কারণ ছিলো, যার প্রেক্ষিতে টিপু সুলতানের পরিবারের কোনো সদস্যকে মহিসুরের সিংহাসনে পুনর্বহালের সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

হিন্দু রাজপরিবারের পুনর্বহাল

অবশেষে কয়েকদিন অব্যাহত চিন্তা-ভাবনার পর কমিশন লর্ড ওয়েলেসলির কাছে এ সুপারিশ পেশ করে যে, অনেকগুলো কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে মহিসুরের ক্ষমতা টিপু সুলতানের পরিবারের হাতে অর্পণ না করে মহিসুরের প্রাচীন হিন্দু পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্যে শুভ হবে। এর মাধ্যমে মহিসুরের হিন্দু-মুসলিম জনগণের মাঝখানে ঘৃণার বীজ রোপন করা যাবে। তাদের মাঝে সংঘাত বাঁধানো গেলে ভবিষ্যতে তাদের একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকবে না।

www.boimate.com

কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়েলেসলি ২০ জুন ১৭৯৯ সালে সাবেক রাজার পাঁচ বছর বয়সী ছেলে কৃষ্ণরাজ তৃতীয়কে মহিসুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। যার রাজত্ব মহিসুরের আশপাশের গুটিকয়েক জেলার ভেতর সীমিত ছিলো। রাজ্যের মূল কর্তৃত্ব ছিলো ইংরেজদের হাতে। সে ছিলো তাদের পুতুল সরকার। রাজা ও তার মন্ত্রীবর্গের হাতে নামমাত্র কর্তৃত্ব ছিলো।

গাদ্দারির প্রতিদান

পুর্নিয়া— যে ছিলো সালতানাতে খোদাদাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী। গাদ্দারির প্রতিদান হিসেবে তাকে মহিসুরের পাঁচ বছর বয়সী ব্রাহ্মণ রাজা 'কৃষ্ণরাজ তৃতীয়'-এর দিওয়ান তথা প্রধান উযির মনোনীত করা হয়। রাজ্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে খোদ রাজারই কোনো এক্তিয়ার নেই, সেখানে পুর্নিয়ার হাতে কোনো এক্তিয়ার থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

মীর কমরুদ্দীনকে তার প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতার বিনিময় হিসেবে গরমকোটা অঞ্চলের জমিদার মনোনীত করা হয়।

মীর মুঈনুদ্দীন ও মীর সাদিকের যুদ্ধের ময়দানেই নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে অপমৃত্যু হয়েছিলো। তাদের স্থানে তাদের সন্তানদেরকে পূর্বের পদ বিবেচনা করে পুনরায় রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে জমিদার করা হয়। এর বাইরে অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তা —যারা টিপু সুলতানের সঙ্গে গাদ্দারি করে ইংরেজদেরকে সঙ্গ দিয়েছিলো— তাদেরকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হয়।

সাম্রাজ্য বণ্টনের সময় ইংরেজদের বানরসুলভ বটোয়ারা

সুলতানের পুরো পরিবারকে ভিলোর নগরীতে দেশান্তর ও সাবেক হিন্দু রাজার পরিবারকে নামকাওয়াস্তে মহিসুরের রাজসিংহাসনে পুনর্বহালের পর ইংরেজরা অধিকৃত এলাকাগুলোর বণ্টনপ্রক্রিয়া শুরু করে।

মারাঠারা যেহেতু এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলো এবং টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদেরকে সঙ্গ দেয়নি, এজন্যে তারা কিছুই পায়নি। অবশ্য এ শর্তে তাদেরকে তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা দেওয়ার প্রস্তাব

www.boimate.com

দেয় যে, তারা সাবসিডিয়ারি অর্থাৎ তাদের এলাকায় ইংরেজ ফৌজ নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব মেনে নেবে। এবারও তারা ইংরেজদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। যার ফলে এলাকাটি ইংরেজ ও নিযামের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ইংরেজরা নিযামকে অধিকৃত অঞ্চল নিজেদের মাঝে সমান হারে বণ্টনের ওয়াদা দিয়েছিলো; কিন্তু মহিসুর জয়ের পর তারা তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য— শঠতার কাছে হেরে যায়। ওয়াদা বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা নিযামকে এ কথা বলে যে, এ যুদ্ধ আমরা স্রেফ আমাদের শক্তি দিয়ে জিতেছি। তারপরও আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রশস্ততা থেকে কিছু এলাকা আপনাকে দিচ্ছি। সেমতে তারা চিতলদ্রুগের কিছু এলাকা— বিলারি (Bellary), গুট্টি (Gutti), কাডাপ্পা (Kadapa), গরমকুন্ডাহ, করনোল ও অনন্তপুর প্রভৃতি নিযামের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এক বছর না ঘুরতেই ইংরেজরা ১৮০০ সালে সেই এলাকাগুলো ফিরিয়ে নেয়।

বার্ষিক ১৩ লক্ষ রুপি আয় করে, এমন কিছু জেলা হিন্দু রাজপরিবারের হাতে তুলে দেয়; কিন্তু সেখানেও তাদের বাণিজ্যিক ও সামরিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্যে একজন ইংরেজ রেজিড্যান্ট নিয়োগ দেয়। তাদেরকে শর্ত দেয়া হয়েছিলো যে, তারা প্রতিবছর ৭ লক্ষ প্যাগোডা কর আদায় করতে বাধ্য থাকবে। ক্ষমতার লোভে হিন্দু রাজপরিবারটি ইংরেজদের দেয়া সবগুলো শর্ত বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছিলো। রাজা ও নিযামকে দেওয়া উল্লিখিত এলাকার বাইরে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সালতানাতে খোদাদাদের অবশিষ্ট এলাকা— পাইনঘাট, কোয়েম্বাটুর (Coimbatore), পুরি, পশ্চিমপ্রান্তের উপকূলীয় এলাকা ও শ্রীরঙ্গাপত্তনাম নিজেদের হাতে রেখে দেয়।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়োল্লাস

অধিকৃত এলাকাগুলো বণ্টন, নতুন সরকার গঠন ও প্রশাসনের পুনর্বিন্যাসের পর যখন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি পরবর্তী বছর কলকাতা ফিরে আসেন তখন সেখানে বিজয়োল্লাসের আয়োজন করা

www.boimate.com

হয়। একটি রাজকীয় শোভাযাত্রা বের করা হয়। ভারতবর্ষে কোম্পানির আগমনের পর এটাই ছিলো তাদের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক আনন্দ শোভাযাত্রা। ওই সময় ইংরেজ বাহিনীর ছোট-বড় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রদর্শনের ওপর বিভিন্ন পদবি প্রদান করা হয়। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান রাখায় লর্ড ওয়েলেসলি-কে 'মারকুইস' ও জেনারেল হ্যারিস-কে 'লর্ড হ্যারিস অফ শ্রীরঙ্গাপত্তনাম' উপাধীতে ভূষিত করা হয়।

www.boimate.com

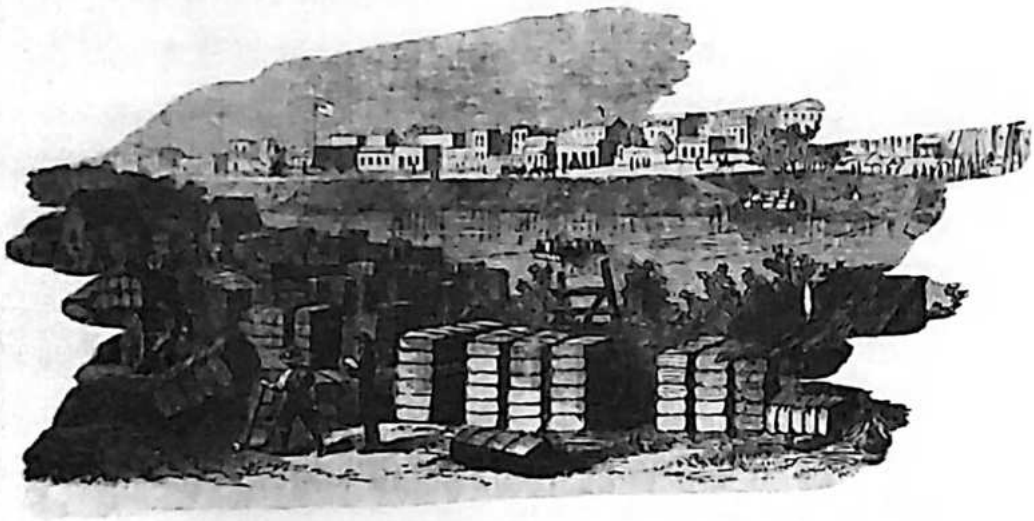

ষোড়শ অধ্যায়

টিপু সুলতানের শারীরিক গড়-গঠন ও সন্তান-সন্ততি

www.boimate.com

শারীরিক গঠন

সুলতানের সমবয়সীগণ সাধারণত সুলতানের যেই শারীরিক আকার-অবয়বের বিবরণ দিয়েছেন, সে অনুযায়ী তিনি ছিলেন মাঝারি উচ্চতার পুরুষ। কিছু কিছু ঐতিহাসিক তাঁকে খানিকটা লম্বা অভিহিত করেছেন। ইংরেজ লেখক মেজর অলিন মহিসুরের বিরুদ্ধে চতুর্থ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি লেখেন, 'সুলতানের উচ্চতা ছিলো ৫ ফিট ৮ ইঞ্চি।'

টিপুর জীবনীকার মীর হুসাইন আলী কিরমানী ছিলেন তাঁরই সমবয়সী। তিনি লেখেন, 'তাঁর কাঁধ স্ফীত ছিলো। গ্রীবা ছোট; কিন্তু মাংসবহুল ছিলো। চোখগুলো বড় বড় ছিলো। সবসময় জ্বলজ্বল করতো। গায়ের রং ছিলো বাদামী। হাত-পা যদিও খানিকটা ছোট ছিলো; কিন্তু দৃষ্টিনন্দন ছিলো। নাক ছিলো ঈগলের মতো বাঁকা। কাঁধ স্ফীত ছিলো। গ্রীবাদেশে ভাঁজ পড়তো। চেহারায় প্রচণ্ড প্রতাপ ছিলো। চেহারার এই ব্যক্তিত্বসুলভ প্রতাপ তাকে অন্য সাধারণ মানুষদের থেকে পৃথক স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিলো। চেহারার অবয়ব-আকৃতি অত্যন্ত সুশ্রী ছিলো। যার কারণে তাঁকে বেশ দৃষ্টিনন্দন মনে হতো। অন্য যেকোনো মানুষের তুলনায় তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো ছিলো।

আমজাদ আলী আশহারী— তিনি যদিও সুলতানকে দেখেননি; কিন্তু কয়েকজন শাহযাদার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি স্বরচিত জীবনালেখ্য 'সাওয়ানেহে সুলতান টিপু'-এর মাঝে লেখেন, তাঁর শরীর মেদহীন ছিলো।[৬৭]

মীর হুসাইন কিরমানী 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থে লেখেন, জন্মগতভাবে টিপু সুলতানের চেহারার দাঁড়ি ছিলো না। এজন্যে তিনি চেহারার ওপর ক্ষুর ঘষতেন এ আশায় যে, হয়তো পুনরায় সেখানে দাড়ি গজাবে। তিনি তাঁর পিতার মতো দাড়ি মুণ্ডাতেন না। টিপুর মুখে মোঁচ ছিলো।[৬৮]

---

৬৭. আমজাদ আলী আশহারী রচিত 'সাওয়ানেহে টিপু সুলতান'।

৬৮. কিরমানী রচিত 'নিশানে হায়দারী'।

www.boimate.com

সবসময় শরীয়তসম্মত পোশাক পরতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণত সাদা ও ঢিলা পোশাক পরতেন। উন্নত রুচিবোধের অধিকারী ছিলেন। অধিকাংশ সময় শরীরের ঊর্ধ্বাংশের ওপর ধবধবে সদরিয়া (কোট) অবশ্যই চেপে থাকতো। তাঁর পরিধেয় কামিসের মাঝে হীরার বোতাম হতো। সাধারণত তিনি কামিসের ওপর সাদা আবা (আলখেল্লা) পরিধান করতেন। পাজামার পকেটে ঘড়ি থাকতো। তিনি চামড়ার পাদুকা বেশি পসন্দ করতেন। মাথার ওপর সবসময় লাল অথবা হলুদাভ পাগড়ি/মুকুট পরিধান করতেন। মুকুটের মাঝে সোনার তার বাঁধানো ছিলো। উপরে ছিলো হীরার শীর্ষ পালক। দু' পার্শ্বের রেশমি গুচ্ছ মুকুটটিকে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছিলো।

শাহাদাতের কিছু দিন পূর্বে উলামায়ে কেরামের পরামর্শে তিনি লাল মুকুট ত্যাগ করে তদস্থলে সবুজ মুকুট পরা শুরু করেন। যুদ্ধাভিযানে সবসময় এমন সোনালি তারবিশিষ্ট কোট পরিধান করতেন। যার ওপর বাঘের চামড়ার মতো ডোরাকাটা রেখা শোভা পেতো।[৬৯]

অত্যন্ত লাজুক ও শালীন প্রকৃতির ছিলেন। রাজমহলের ভেতর তার কোনো শিশু সন্তানও কোনো দিন তার বক্ষ উন্মোচিত অবস্থায় দেখতে পায়নি। সাধারণ জনগণ সুলতানের হাত, পা ও চেহারার বাইরে শরীরের অন্য কোনো অংশ উন্মুক্ত দেখেনি। খোদ তার স্ত্রীর ভাষ্য হলো, গোসলখানার ভেতরেও তিনি তার গোটা শরীর কাপড়াবৃত রাখতেন। ডান হাতের বাহুতে সবসময় একটি তাবীজ বাঁধা থাকতো। তাবীজটিতে কয়েকটি আয়াত লেখা ছিলো। সুলতানের কোমরে একটি তরবারী-কোষ ছিলো। সবসময় সেখানে তাঁর বিশেষ তরবারি কোষবদ্ধ থাকতো। এর বাইরে কোমরদেশে সবুজ রংয়ের একটি কোমর-বন্ধনী ছিলো।

মেজর অলিন তার নোটবুকে সুলতানের লাশের যেই বিবরণ দিয়েছিলেন, সেখানেও সুলতানের উপরিউক্ত শারীরিক গড়-গঠন ও পোশাক-পরিচ্ছদের সত্যায়ন পাওয়া যায়। তিনি লেখেন—

> 'সুলতানের লাশ জমিনে পড়ে আছে। পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আমি এগিয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম, তার শরীরে সফেদ

---

৬৯. মুহিব্বুল হাসান বিরচিত 'তারীখে টিপু সুলতান'।

www.boimate.com

কামিস ও ফুলওয়ালা ঢিলা পাজামা শোভা পাচ্ছে। কোমরদেশে সবুজ রংয়ের এক টুকরো কাপড় বাঁধা রয়েছে। ডান বাহুতে একটি তাবীজ শোভা পাচ্ছে। তাবীজটি খুলে দেখলাম, তার ভেতর একটি রূপার পাত রয়েছে। সেই পাতে আরবি ও ফারসি ভাষায় কিছু বাক্য লেখা রয়েছে।'

সুলতানের ব্যবহৃত এক জোড়া পোশাক অর্থাৎ একটি কোর্তা ও পাজামা এখনও শ্রীরঙ্গাপত্তনামের দরিয়া দৌলত বাগের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। পোশাকটি দেখে যে কেউ সুলতানের উচ্চতা, পোশাক সংক্রান্ত অভিরুচি, শারীরিক গঠন ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রাত্যহিক কর্মসূচি

সুলতান সবসময় প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন। এটা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। যুদ্ধের ঘনঘটা বা নিরূপদ্রব শান্তিময় জীবন– কখনই তার এ অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটতো না। গোসল সেরে তিনি রাজমহল লাগোয়া মসজিদে আ'লায় জামাতের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করতেন। এরপর পূর্ণ এক ঘণ্টা নিবিষ্ট মনে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন।

এরপর কিছুক্ষণ ব্যায়াম করতেন। ব্যায়ামের পর হালকা নাস্তা গ্রহণ করতেন। সাধারণত নাস্তার মেন্যুতে বিভিন্ন পাখির গোশত ইত্যাদি পরিবেশিত হতো। কিছুক্ষণ পর তিনি শাহী দরবারে আগমন করতেন। সেখানে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ হতো। এ সময় তার হাতে নিয়মিত তাসবীহ শোভা পেতো। তিনি এই তাসবীহ দিয়ে তাঁর প্রাত্যহিক দরুদ-ওযীফা পূর্ণ পাঠ করতেন।

দরবার থেকে সোজা প্রাসাদের নির্দিষ্ট কিছু কামরায় চলে যেতেন। সেখানে অতিমূল্যবান হীরা-জওহরাত ইত্যাদি সংরক্ষিত ছিলো। সেগুলোর প্রহরায় নিযুক্ত দায়িত্বশীলদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে আশ্বস্ত হয়ে নিতেন। এরপর কোনো প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকলে তাও জানাতেন।

এরপর তিনি পায়চারী করার উদ্দেশ্যে বেরোতেন। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে দরবারে ফিরে আসতেন। সেখানে তিনি কয়েকজন উর্ধ্বতন

www.boimate.com

অফিসার ও ২/৩ শাহযাদাকে সঙ্গে নিয়ে নাশতা করতেন। এ নাস্তায় সাধারণত ফল, দুধ, আখরোট বাদাম ইত্যাদি হতো। নাস্তা চলাকালে অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্যে সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেন। এসময় শাহী লেখককে দিয়ে বিভিন্ন অধিদপ্তরের সচিব বরাবর নির্দেশনামূলক চিঠি-পত্র লেখাতেন।

এরপর টিপু সুলতান সেনা পরিদর্শন সম্পন্ন করে পুনরায় শাহী দরবারে ফিরে আসতেন। ওই সময় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারগণ উপস্থিত হতেন। ততোক্ষণে পোস্ট মাস্টার উপস্থিত হয়ে চিঠি-পত্তর ও দরখাস্ত ভরা একটি থলে পেশ করতেন। সবার সামনে সেই থলে খোলা হতো। প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীল সেখানে উপস্থিত হয়ে বিগত দিনের কার্যবিবরণী উপস্থাপন করতেন। সুলতান নিজেই তাদের আর্থিক হিসাব-নিকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। সাধারণত চিঠিগুলো ফারসি, উরদূ, কানাড়ি ও তেলোগু ভাষায় লেখা হতো। এ জন্যে শাহী দরবারে সেই ভাষার ওপর দক্ষ দোভাষী উপস্থিত থাকতেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশের চিঠিগুলো বের করে পালাক্রমে সুলতানকে পাঠ করিয়ে শোনাতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভাষাতেই জবাব লিখিয়ে দিতেন। চিঠি পাঠ ও জবাবদানের এই কার্যক্রম দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। সাধারণ জনগণ নিজ নিজ আর্জি লিখে দরবারে স্থাপিত একটি আবেদন-বাক্সে ফেলে এর মাধ্যমে সুলতানের খেদমতে পেশ করতো।

দরবারের কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর সুলতান নিজ কক্ষে ফিরে এসে যোহরের নামায আদায় করতেন। দুপুরে খাবার গ্রহণের অভ্যাস ছিলো না। তিনি দিনে দু' বেলা খাবার গ্রহণ করতেন। সকালের নাশতা ও সন্ধ্যার খাবার। যোহরের নামাযের পর কোনো ধরনের বিশ্রাম না করেই শহরের যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানায় উপস্থিত হয়ে নিজেই তা পরিদর্শন করতেন। এসময় সৈনিকদের কার্যক্রম নিরীক্ষণ করতেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ তার নিরসনমূলক নির্দেশনা জানিয়ে দিতেন।

ওই দিন যদি রাজধানীর কেল্লার কোনো অংশের মেরামত বা সংস্কারের কাজ চলতো তাহলে তা পরিদর্শন করে আসরের নামায আদায় করতেন। অতপর বাজারে যেতেন। সেখান থেকে সাধারণত মাগরিবের পরপরই

www.boimate.com

রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতেন। মাগরিব নামাযের আদায়ের পর রাজপ্রাসাদে দ্বিতীয়বারের মতো দরবার অনুষ্ঠিত হতো। ওই সময় রয়ে যাওয়া চিঠি-পত্তর পেশ করা হতো। তিনি উত্তর লেখাতেন। ততোক্ষণে রাতের খাবার গ্রহণের সময় হয়ে যেতো। রাতের খাবারেও কয়েকজন সামরিক অফিসার, উযির ও এক-দু'জন শাহযাদা সুলতানের সঙ্গে দস্তরখানে শরিক হতেন। খাবার চলাকালে প্রায়সময় বিভিন্ন দ্বীনি ও জ্ঞানবৃত্তিক আলোচনা হতো। মাঝে-মধ্যে কবিতা আবৃত্তি হতো। কখনও কখনও দ্বীনি কিতাব পঠিত হতো।

রাতের খাবারের পর একাকী পায়চারী করতে বের হতেন। ঈশার নামাযের পর নিজ কামরায় ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়তেন। ঘুম না আসা পর্যন্ত কোনো কিতাব অধ্যয়ন করতেন। প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর থেকে রাতে শোয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে তিনি একটি বারের জন্যেও বিছানামুখী হতেন না। প্রতিদিন একাধারে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতেন।

১৭৮৬ সালে একবার তরবিয়ত আলী খান নায়েতা সুলতানের কাছে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লেখেন যে, 'রাজ দরবার থেকে চিঠির উত্তর বেশ বিলম্বে আসে।' সুলতান তখন এর উত্তরে লেখেন, 'ঘুম, খাওয়া ও খোশালাপ ব্যতীত আপনাদের তো কোনো কাজ নেই। আমি সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সালতানাতের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকি। যখনই ফুরসত পাই চিঠির উত্তর লিখে দেই।'

কোনো দিন সুলতান ভীষণ ক্লান্তি বোধ করলে বিশ্রাম নিতেন না; বরং তদস্থলে মানসিক উজ্জীবতার জন্যে লোকদের কাছ থেকে ঘটনা বা মজার চুটকি শুনতেন। সুলতান কখনই কোনো বিনোদনমূলক কাজে সময় দিতেন না। কেউ এ ধরনের কাজ করুক, তিনি সেটাও পসন্দ করতেন না। তিনি কখনই নাচ, গান, সংগীতের আসর আয়োজন বা অংশগ্রহণ করেননি। সময় পেলে তিনি নিজ হাতে দিনলিপি লেখতেন। ওই দিনলিপিতে সাধারণত তিনি রাতে কী স্বপ্ন দেখেছেন, তার বিশদ বিবরণ লেখতেন। সেগুলোর ব্যাখ্যাও লিখে রাখতেন। সুলতান তার এই ব্যক্তিগত ডায়েরি অন্যদের কাছ থেকে, এমনকি ঘরের সদস্যদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখতেন।

www.boimate.com

সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্য

ইতোপূর্বে আমরা 'সুলতানের বিয়ে' সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এ কথা জেনেছি যে, ১৭৭৪ সালে ২৪ বছর বয়সে সুলতানের একই রাতে স্রেফ এক ঘণ্টার ব্যবধানে দু'টি বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিলো। প্রথমটি ইমাম বখশী নায়েতা সাহেবের কন্যা সুলতান বেগমের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন হয় লালা মিয়ার কন্যা অর্থাৎ শায়খ বুরহানুদ্দীনের সহদোরা রুকাইয়া বেগমের সঙ্গে। কোন প্রেক্ষাপটে একই সঙ্গে সুলতান দু'টি বিয়ে করতে সক্ষম হন, তার বিবরণ আমরা আলোচনা করেছি।

১৭৯০ সালে রুকাইয়া বেগম রোগাক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন।

সুলতান সাইয়্যেদ মাঈনুদ্দীনের কন্যা খাদীজা বেগমের সঙ্গে তৃতীয়বারের মতো বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু দু' বছর পর এই স্ত্রী ১৭৯৭ সালে সন্তান প্রসবকালে শিশুসন্তান-সহ ইনতিকাল করেন। কাজেই ১৭৯৯ সালে যখন সুলতান শহীদ হন তখন তার একজন স্ত্রী-ই জীবিত ছিলো। সুলতানা বেগম।

সুলতানের রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন ঘরোয়া কাজ-কর্ম সম্পন্ন করার জন্যে ১৯৩ জন সেবিকা ছিলো। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকরা শঠতার আশ্রয় নিয়ে তাদের বই-পুস্তকে লেখেছেন যে, তারা সবাই সুলতানের হেরেমের যৌনদাসী ছিলো। এটি সম্পূর্ণ ভুল। সুলতান ছিলেন অসামান্য খোদাভীরু ও নিস্কলুষ প্রকৃতির বুযুর্গ। তাঁর এ দু'টি গুণ তাঁকে পৃথিবীর অন্য সকল সম্রাট থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিলো। কাজেই এমন পবিত্র স্বভাবের মানুষের ক্ষেত্রে কখনই এ কল্পনা করা যায় না যে, তিনি কোনো নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন।

শাহাদাতের সময় সুলতানের জননী, এক স্ত্রী সুলতানা বেগম, ভাই করীম শাহ, একমাত্র কন্যা, দু' স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়া ১২ জন সাহেবযাদা জীবিত ছিলেন। এঁদের অধিকাংশজনই কলকাতার নির্বাসনের জীবনে ইনতিকাল করেন। অবশ্য এক সাহেবযাদা 'জামিউদ্দীন' ফ্রান্সের প্যারিস শহরে ইনতিকাল করেন। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

www.boimate.com

১. করীম শাহ। সম্পর্কে তিনি টিপু সুলতানের ছোট ভাই। ৮০ বছর বয়সে জুমাদাস সানী ১২৪৬ হিজরী, মুতাবেক ১৮৩০ ঈসাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন। দু মেয়ে এবং ইমাম বখশ ও গোলাম আলী নামে দু' ছেলে ছিলো।

২. ফতেহ হায়দার সুলতান। তিনি হচ্ছেন টিপু সুলতানের সর্বজ্যেষ্ঠ সাহেবযাদা। পিতার মৃত্যুর সময় শাহযাদাদের মধ্য হতে তিনি একাই রাজধানীতে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে ২১ শাবান ১২৩০ হিজরী, মুতাবেক ১৮৫১ ঈসাব্দে কলকাতায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ১৪ মেয়ে ও ৭ ছেলের জনক ছিলেন। যাদের কয়েকজনের নাম হলো, মুহাম্মদ বাকের, গোলাম মুহিউদ্দীন, শিহাবুদ্দীন, মুহাম্মদ সুলতান, সুলতান হুসাইন, মুহাম্মদ আলী ও জা'ফরুদ্দীন।

৩. আবদুল খালেক। শ্রীরঙ্গাপত্তনামের চুক্তির জামানত হিসেবে ১৭৯২ সালে ইংরেজরা টিপু সুলতানের যেই দু' ছেলেকে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিলো, তাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্শ্বরোগে আক্রান্ত হয়ে শাওয়াল ১২২২ হিজরী, মুতাবেক ১৮০৮ ঈসাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি 'মুনঈমুদ্দীন ও মুকীমুদ্দীন' নামে দু' ছেলের জনক ছিলেন।

৪. মুহিউদ্দীন সুলতান। ৪ রবিউল আউয়াল ১২২৬ হিজরী, মুতাবেক ১৮১২ সালে এই শাহযাদা কোনো কারণে মনঃক্ষুন্ন হয়ে নিজের ওপর নিজেই গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ৫ ছেলে ও ২ কন্যার জনক ছিলেন। তাদের নাম হলো, সাঈদুদ্দীন, বুরহানুদ্দীন, কুতুবুদ্দীন, মুহাম্মদ টিপু ও গোলাম দস্তগীর।

৫. মুঈযুদ্দীন। শাহযাদা আবদুল খালেকের সঙ্গে এই শাহযাদাকেও ইংরেজদের কাছে ১৭৯২ সালের চুক্তির জামানত হিসেবে রাখা হয়। তিনি নিযামুদ্দীন নামের এক ছেলে ও তিন কন্যাকে রেখে ২২ জুমাদাল উলা ১২৩২ হিজরী, মুতাবেক ১৮১৮ সালে ইনতিকাল করেন।

৬. আহমদ সুলতান। ৩ কন্যা রেখে তিনি ১০ শা'বান ১২৩৯ হিজরী, মুতাবেক ১৮২৪ সালে ইনতিকাল করেন।

www.boimate.com

৭. **সারওয়ারুদ্দীন**। ১২ জুমাদাস সানী ১২৪৯ হিজরী, মুতাবেক ১৮৩৩ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। এসময় তার শুধুমাত্র ২ কন্যা ছিলো।

৮. **শুকরুল্লাহ**। ২৪ জুমাদাস সানী ১২৫৩ হিজরী, মুতাবেক ১৮৩৭ ঈসাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন। ৪ কন্যা ছাড়াও তিনি নিম্নের ৬ ছেলে রেখে যান– বশীরুদ্দীন, জালালুদ্দীন, আ'যমুদ্দীন, মুহাম্মদ মাহদী, ওয়ারিসুদ্দীন ও মুহাম্মদ শাহ।

৯. **মুনীরুদ্দীন**। ২ রমাযান ১২৫৩ হিজরী, মুতাবেক ১৮৩৭ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। এ সময় তিনি ২ মেয়ে ও আনওয়ার শাহ নামে ১ ছেলে রেখে যান।

১০. **জামিউদ্দীন**। টিপু সুলতানের সন্তানদের মধ্য হতে এ শাহযাদাই দেশের বাইরে ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতে ১৭ শাওয়াল ১২৫৮ হিজরী, মুতাবেক ১৮৪২ ঈসাব্দে ইনতিকাল করেন। তিনি বদরুদ্দীন নামে এক ছেলে রেখে যান।

১১. **সুলতান মুহাম্মদ সুবহান**। ২৪ রমাযান ১২৬১ হিজরী, মুতাবেক ১৮৪৫ ঈসাব্দে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইনতিকাল করেন। এসময় তার উত্তরসূরিদের তালিকায় ৬ মেয়ে ও ৪ ছেলে ছিলো– শওকতুদ্দীন, পাক আখতার, আল্লাহ নাওয়ায ও গোলাম মাহমুদ।

১২. **ইয়াসীন সুলতান**। ১২৬৫ হিজরী, মুতাবেক ১৮৪৯ ঈসাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন। এ সময় তাঁর ৬ মেয়ে ও ৮ ছেলে ছিল। তন্মধ্য হতে আমরা ৫ জনের নাম উদ্ধার করতে পেরেছি। তারা হলেন, আলী গাওহার, ফিরোয শাহ, কায়কোবাদ, মুযাফ্ফার শাহ ও বাহরাম শাহ।

১৩. **গোলাম মুহাম্মদ সুলতান**। সুলতানের শাহযাদাদের মধ্যে তিনিই সবার শেষে ইনতিকাল করেন, ১৮৭৭ সালে। এ সময় তিনি ৩ মেয়ে ও ফিরোয শাহ ও হালীমুয যামান' নামে ২ ছেলে রেখে যান।[৭০]

সুলতানের পরিবারের সদস্যদের মধ্য হতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নির্বাসনের পর প্রথমবার ১৮৩৫ সালে কলকাতা থেকে শ্রীরঙ্গাপত্তনামে

[৭০]. আমজাদ আলী আশহারী রচিত 'সাওয়ানেহে টিপু সুলতান'।

www.boimate.com

সম্মানিত পিতার উরসে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন।[৭১]

আমিরুল মুমিনীন ফিল হিন্দ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. ১৮২২ সালে যখন স্বদেশ রায়রবরেলি থেকে হজের উদ্দেশে মককা গমনকালে কলকাতায় যাত্রা বিরতি করেন তখন এই শাহযাদাদের অনেকেই জীবিত ছিলেন। তাঁদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সাইয়্যেদ সাহেব নিজেই তাদের বাংলো বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। ওই সময় শাহযাদাগণ সাইয়্যেদ সাহেবের মাশায়েখের সঙ্গে তাদের পারিবারিক সম্পর্কের উদ্ধৃতি দিয়ে বাই'আতাবদ্ধ হন। ওই বাই'আতের মাঝে খোদ টিপু সুলতানের স্ত্রী ও একক কন্যাও উপস্থিত ছিলেন।[৭২]

---

[৭১]. দৈনিক সালার ৩১ মে ১৯৯২ ঈ. সংখ্যার উদ্ধৃতিতে, ইকরাম কাভেশ মহিসুরের শুকরিয়া সমেত।

[৭২]. মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী বিরচিত 'সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ'।

www.boimate.com

সপ্তদশ অধ্যায়

গাদ্দারদের অপকীর্তি ও প্রকৃতির প্রতিশোধ

www.boimate.com

ঘরের শত্রু বিভীষণ

সালতানাতে খোদাদাদের পতন ও ইংরেজ কর্তৃক টিপু সুলতানের ওপর জয়লাভের পুরো ঘটনাপ্রবাহ কেউ যদি নিরীক্ষণ করে তাহলে সে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, এক্ষেত্রে অন্যান্য কারণের পাশাপাশি সুলতানের উযির ও সামরিক অফিসারদের গাদ্দারি, বিশ্বাসঘাতকতা ও ধূর্ত ইংরেজ শিবির কর্তৃক বিস্তৃত সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। যদি সুলতানের উযিরগণ তাঁকে ধোঁকা না দিতেন এবং তারা কোনো রূপ সহায়তা না করেও স্রেফ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতো, কেল্লা ও প্রাসাদের ভেতরের যাবতীয় তথ্য শত্রুপক্ষের কাছে না পৌঁছাতো তাহলে এ যুদ্ধের ফলাফল ভিন্ন রকম হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিলো। ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজদের শাসনের ছড়ি ঘোরানোর স্বপ্নপূরণে আরও বিলম্ব হতো।

নবাব হায়দার আলীর তুলনায় টিপু সুলতান অপেক্ষাকৃত দয়াপ্রবণ ও নরম মেজায সম্পন্ন ছিলেন। হায়দার আলী যেকোনো বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা এক মুহূর্তের জন্যে বরদাশত করতেন না। যখনই তিনি কারো বিদ্রোহের তথ্য পেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করেছেন। কিন্তু টিপু সুলতান পিতার বিপরীতে শিক্ষিত, অত্যাধিক ধার্মিক, নীতিবান ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। এজন্যে কারো ব্যাপারে তিনি অবিশ্বস্ততা ও গাদ্দারির সংবাদ পেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড প্রয়োগ করতেন না; বরং তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। এর আগ পর্যন্ত তিনি যেকোনো পদক্ষেপ বা প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত রাখতেন। এজন্যে দেখা যায়, তিনি অনেক মুনাফিক ও গাদ্দারকে ক্ষমাপ্রার্থনার কারণে ক্ষমা করে স্বপদে বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু দেশ ও ঈমান বিক্রিকারী ওই সামরিক অফিসাররা টিপু সুলতানের সেই উদারতা সত্ত্বেও মনে মনে তার প্রতি যথারীতি ক্রোধ ও বৈরীতার আগুন পুষে রাখতো। এরপরও সুলতান কবির এ কবিতার অনুসরণ করতেন—

www.boimate.com

جب تم نے جفا کی ہے، تب ہم نے وفا کی ہے
وہ ظرف تمہارا ہے، یہ ظرف ہمارا ہے.

যখন তুমি বিশ্বাস ভেঙ্গেছো; তখনও আমি বিশ্বাসের লাজ রেখেছি।
আমরা দু'জনই আমাদের লালিত মানসিকতার ছাপ রেখেছি।

সুলতানের এই সীমাতিরিক্ত কোমলতা ও দয়াপ্রবণতাই তার রাজত্বের পতনের কারণ হয়েছিলো। নবাব হায়দার আলী ইনতিকালের সময় টিপু সুলতানকে অসিয়ত করেছিলেন যে, 'আমি মীর সাদিক, মীর গোলাম আলী লেংড়া ও পুর্নিয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত নই। আমার ইনতিকালের পর তুমি তাদেরকে হত্যা করবে।' কিন্তু টিপু সুলতানের কোমল মনোবৃত্তি ও নীতিগত নৈতিকতা ওই উপদেশ পূরণের পথে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কোনো ধরনের প্রমাণ না থাকার কারণে তিনি শুধু সেই উপদেশ কার্যকরই করেননি; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে পূর্বের পদে পুনর্বহাল করেছিলেন। যার কারণে শেষতক বিবেক খোয়ানো সেই গাদ্দারদের হাতেই এই উদীয়মান ইসলামি সালতানাতের পতন ঘটে।

টিপু সুলতান ক্ষমা করলে কী হবে, কুদরত কিন্তু সেই গাদ্দারদের ক্ষমা করেনি। তাদের থেকে নিকৃষ্ট প্রতিশোধ নিয়েছে। তাদের কেউ শ্বেত রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে মরেছে। কেউ পাগলে পরিণত হয়েছে। কাউকে এমন হালতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে যে, তার পাশে কেউ ছিলো না। পঁচে-গলে তার লাশের অবস্থা এতোটাই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, কুকুর পর্যন্ত সেই লাশে মুখ ছোঁয়নি।

এই গাদ্দারদের একটি বড় অংশ সেই গাদ্দারির কারণে ইংরেজদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার অবকাশ পর্যন্ত পায়নি। তার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

এই গাদ্দারদের তালিকায় এমন কিছু লোকের নাম রয়েছে, যারা নিজ ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, ব্যক্তিগত নিচু মানসিকতা, বা বংশীয় বিভাজনের কারণে শুরু থেকেই সালতানাতে খোদাদাদ ও তার প্রতিষ্ঠাদের বৈরী ছিলো।

এর বাইরে গাদ্দারদের তালিকায় এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা ১৭৯২ সালের শ্রীরঙ্গাপত্তনাম চুক্তির কারণে যখন দেখলো যে, সাম্রাজ্যের অর্ধেকটাই সুলতানের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন তারা সুলতানের আশু

www.boimate.com

পতনের কথা চিন্তা করে সম্পূর্ণরূপে নিজ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত মুনাফা চরিতার্থ করার মানসিকতা থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে শুরু করে। এই তালিকার শীর্ষে মীর মুঈনুদ্দীন ও মীর কমরুদ্দীন প্রমুখের নাম রয়েছে।

আর কিছু গাদ্দার ছিলো এমন যাদের অবিশ্বস্ততা ও অকৃতজ্ঞতা দিবালোকের মতো পষ্ট ছিলো। তাদের গাদ্দারির বিষয়টি প্রমাণের পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। হয়তো সুলতান তাদের গাদ্দারির ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না; কিন্তু সুলতানের মন্ত্রীপরিষদ ও সামরিক কর্মকর্তাদের মাঝে এমন কিছু লোক ছিলো, যাদের কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম থেকে দূরের লোকরাও বুঝে ফেলেছিলো যে, এ লোক অমুক কাজটি সুলতানকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করেছিলো। অথবা তার অমুক অভিমতের নেপথ্যে কুমতলব ছিলো। উদাহরণস্বরূপ, বদরুজ্জামান খান নায়েতা সহ আরও কিছু লোক চতুর্থ যুদ্ধ চলাকালে সুলতানকে চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog) না যাওয়ার পরামর্শ দেয়। যা খোদ সুলতানও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তার সেই পরামর্শ ছিলো সম্পূর্ণরূপে কুমতলব প্রসূত। সুলতান যদি সেদিন চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog) চলে যেতেন তাহলে নিদেনপক্ষে তিনি নিজ জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি সালতানাতের আরও কিছু অংশের ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হতেন।

নিম্নে আমরা এমন কিছু নিকৃষ্ট গাদ্দারদের পরিচিতি তুলে ধরছি, যারা তাদের ওপর টিপু সুলতান ও তার সালতানাতের দয়া-বদান্যতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে একটি উদীয়মান ইসলামি সালতানাতের পতন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ঘৃণ্য ভূমিকা রেখেছিলো। আমরা আলোচনাটি সালতানাতে খোদাদাদের অকৃতজ্ঞ মন্ত্রী খণ্ডেরাওয়ের মাধ্যমে শুরু করছি। সে-ই গাদ্দারি ও বিশ্বস্ততার পথ তৈরি করেছিলো। তার দেখানো পথ ধরে আরও কিছু জাতীয় গাদ্দার অনুসরণ করেছিলো। তবে আমরা সেই করদ রাজা, নবাব ও জমিদারদের ফিরিস্তি প্রকাশ করে বইয়ের কলেবর বড় করবো না, যারা সুযোগ পেয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছিলো আর তা দমন করার কারণে সুলতান তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিলেন। কারণ, এমন বৈরীতা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। আমরা শুধু সেই গাদ্দারদের সম্পর্কেই আলোচনা করবো, যাদেরকে হায়দার আলী ও

www.boimate.com

টিপু সুলতান দয়া করে প্রশাসনের উচ্চ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এরপরও তারা তাদের উপকারী মনিবের পিঠে ছুরি বসাতে দ্বিধা করেনি।

১. খন্ডে রাও

নবাব হায়দার আলী যখন কর্মজীবনের সূচনালগ্নে মহিসূরের হিন্দু রাজার সেনাবাহিনীতে একদল সৈন্যের কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তখন এই খণ্ডেরাও ছিলো তার ব্যক্তিগত সচিব। পরবর্তীকালে মহিসুরের রাজা তাকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। যখন মহিসুরের প্রশাসনে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ক্ষমতার বাগডোর কার্যত তার উযির নন্দরাজের হাতে চলে যায় তখন রাজার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেখিয়ে হায়দার আলী তার উযির নন্দরাজকে নিজ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্মানজনকভাবে প্রশাসন থেকে পৃথক হতে রাজি করাতে সক্ষম হন। হায়দার আলীর সুপারিশের ভিত্তিতেই রাজা এই খণ্ডেরাও-কে নন্দরাজের স্থলে প্রধান উযির মনোনীত করে। যার ফলে এই খন্ডেরাও পুরো সালতানাতে রাজার পর সবচেয়ে বেশি এক্তিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হয়।

তার মুনিব হায়দার আলী তার ওপর যেই অসীম দয়া করেছিলো, তার প্রতিদান সে এভাবে দিয়েছে যে, ১৭৬১ সালে রানীদের সঙ্গে মিলে খোদ হায়দার আলীকে খতম করার অপচেষ্টা করে। সে রাজাকে এ কথা বলে যে, 'হায়দার আলী স্রেফ আপনার বদৌলতে এদ্দূর আসতে পেরেছে। কিন্তু এখন সে আপনারই সমকক্ষ হতে চাচ্ছে।' ওদিকে মারাঠা সর্দার মাধবরাওয়ের কাছে হায়দার আলীর বিরুদ্ধে ফৌজি সহায়তা চেয়ে তাকে এ কথা লেখে যে, একজন মুসলমান মহিসুর দখল করতে চাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে তার বিরুদ্ধে সহায়তা করলে আমরা আপনাকে নগদ ৫ লক্ষ রুপি এবং প্রতিবছর ২ লক্ষ রুপি দিতে প্রস্তুত আছি।

তখন মারাঠা সর্দার তাকে সহায়তা করার জন্যে তার ৪০ হাজার পদাতিক বাহিনী ও ২০ হাজার পদাতিক বাহিনী সিপাহসালার কৃষ্ণা পণ্ডিতের নেতৃত্বে প্রেরণ করে। এই বিশাল চক্রান্তের মাঝে খন্ডে রাওয়ের সঙ্গে মন্ত্রী পরিষদের আরও কিছু সদস্য তথা, ভেঙ্কট টাপিয়া, বীরনাচটি প্রমুখ সম্পৃক্ত ছিলো। চক্রান্ত অনুসারে অকস্মাৎ একদিন তারা হায়দার আলীকে

www.boimate.com

গ্রেফতার করার জন্যে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অবরোধ করে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে অগ্রিম সংবাদ পেয়ে হায়দার আলী রাতের অন্ধকারে সেখান থেকে পালিয়ে ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছতে সক্ষম হন। সেখানে বসে তিনি তার বিক্ষিপ্ত সৈনিকদেরকে সমবেত করে রাজধানী আক্রমণ করেন। রাজা ও খন্ডে রাও দু'জনই ধৃত হন। ইতোপূর্বে হায়দার আলীর ওপর রাজার বিভিন্ন দয়া-অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে তিনি শুধু তাকে ক্ষমাই করেননি; বরং এক লক্ষ রুপি বার্ষিক আয়সমৃদ্ধ একটি এলাকার জমিদারি তার হাতে তুলে তাকে স্বাধীনতার সঙ্গে জীবন যাপনের সুযোগ করে দেন। ওদিকে কৃতঘ্ন খণ্ডে রাও-কে তিনি একটি বিশাল লৌহগারদের ভেতর বন্দি করেন। তার ভেতরেই তার খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেন। তার ওপর যখনই হায়দার আলীর চোখ পড়তো তিনি উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলতেন, 'ও আমার তোতা পাখি। আমি ওকে পুষছি।' একবছর পর সেই লৌহগারদের ভেতরই সে ধুকে ধুকে মারা যায়।

২. হায়দার বখশ

১৭৮৬ সালে নিযাম ও মারাঠিদের সম্মিলিত বাহিনী বাদামি (Baddami) নগরী জয় করার পর যখন ধারওয়াড়ের মজবুত কেল্লা জয় করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় তখন টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ধারওয়াড়ের সেই কেল্লারক্ষী হায়দার বখশ মারাঠিদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই প্রথম প্রহরেই কেল্লাটি শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেয়। আর নিজের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে পুনায় নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis)-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে সে সুলতানের ক্রোধ থেকে নিজেকে সাময়িকভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

৩. কৃষ্ণা রাও

প্রথম জীবনে সে টিপু সুলতানের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন অফিসার ছিলো। ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধ চলাকালে সে ব্যাঙ্গালুরু কেল্লার হিফাযতের দায়িত্ব পেয়েছিলো। ইংরেজরা যখন তাকে লোভ দেখিয়ে কিনে নেয় তখন সে কৌশলে কেল্লার ভেতর বিদ্যমান মহিসুর সৈন্য কমিয়ে ফেলে। যার সুযোগে শত্রুরা খুব সহজেই কেল্লা দখল করতে

www.boimate.com

সমর্থ হয়। তারই চক্রান্তে কেল্লার ওপর ইংরেজরা আক্রমণ করে ১ হাজার মহিসুরি সৈন্য নিহত ও প্রায় ৩ শ সৈন্যকে আহত করে। শহীদদের মাঝে ছিলেন সুলতানের সবিশেষ আস্থাভাজন অফিসার সাইয়্যেদ হামেদ ও শায়খ আনসার।

সুলতানের জননীয় যখন তার ষড়যন্ত্রের কথা ধরে ফেলেন তখন তৎক্ষণাৎ তাকে পত্র লেখে সতর্ক করেন। এর পরপরই টিপু সুলতান মীর মুঈনুদ্দীনের মাধ্যমে তাকে ও তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে সম্পৃক্ত অপর ভাইদেরকে গ্রেফতার করেন। রাজবিরোধী চক্রান্তের অভিযোগে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে কৃষ্ণরাও নিজ অপরাধ স্বীকার করে দম্ভোক্তি করে বলেছিলো, 'আমার তৈরি করা এই বিপর্যয় ও চক্রান্তের আগুন টিপু সুলতান কখনই নেভাতে পারবে না'।

তার সেই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। ফাঁসির পর তার লাশ রাস্তায় নিক্ষেপ করা হয়। যেন এ দৃশ্য দেখে অন্যরা শিক্ষা নেয়। ইংরেজরা তাকে মহিসুরের সিংহাসন থেকে টিপু সুলতানকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে সাবেক হিন্দু রাজার পরিবারকে তদস্থলে অভিষিক্ত করার দায়িত্ব দিয়েছিলো। লোকটি ছিলো গোড়া হিন্দু। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট এ অঞ্চলের মাঝখানে একটি ইসলামি হুকুমতের অস্তিত্ব মেনে নিতে সে কখনই প্রস্তুত ছিলো না। এজন্যে তার সকল চক্রান্তের টার্গেট টিপু সুলতান নয়; বরং খোদাদাদ সালতানাতে মহিসুর ছিলো।

যদিও সেই ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন সে নিজ চোখে দেখে যেতে পারেনি; কিন্তু পরবর্তীকালে তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা তার দীর্ঘ দিনের লালিত সেই খোয়াব বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলো। তারই ফলশ্রুতিতে ১৭৯৯ সালে সুলতানের শাহাদাত ও শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতন ঘটে।

৪. মীর সাদিক

এই দুর্ভাগা লোকটির সঙ্গে 'মীর' শব্দটি কীভাবে যুক্ত হয়েছে, তার চূড়ান্ত বিশ্লেষণ মুশকিল। কিছু লোকের অভিমত হলো, 'মীর' একটি ফারসি শব্দ। যা আরবি 'আমির' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

কিছু ঐতিহাসিকের ধারণা হলো, ভারতীয় উপমহাদেশে শিয়াদেরকে সুন্নীদের থেকে পৃথক করতেই তাদের নামের সঙ্গে এ পদবি যুক্ত হতো।

www.boimate.com

আরেকটি অভিমত হলো, লোকটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিলো না। ওই যুগে 'মীর' শব্দটি সাইয়্যেদ লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। কাজেই সে আরব বংশোদ্ভূত ছিলো।

যাই হোক, তার পরিবার, জন্মভূমি ও বংশ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিতর্ক থাকতে পারে; কিন্তু তার শঠতা, দুর্ভাগ্য ও অকৃতজ্ঞতার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিন্দু পরিমাণ বিতর্ক নেই। তার নাম ভারতীয় উপমহাদেশে নিমক হারাম লোকদের পদবি হিসেবে প্রবাদবাক্য হয়ে গেছে।

প্রাচ্য-কবি আল্লামা ইকবাল তার কবিতার মাঝে উম্মাহর মুখপাত্র হয়ে সেটাই বলেছেন—

جعفر از بنگال، صادق از دکن
ننگ آدم ننگ دیں، ننگ وطن
ناقبول و ناامید و نامراد
ملتے از کار شاں اندر فساد

'বাঙ্গালের মীর জাফর, দাকানের মীর সাদিক
ওদের মনুষত্ব নেই, ওরা বকধার্মিক, ওরা দেশপ্রেমশূন্য।
ওরা ব্যর্থ হয়েছে, নিষ্ফল হয়েছে, আশাহত হয়েছে,
ওদের জঘন্য কর্ম স্রেফ ফ্যাসাদ ছড়িয়েছে।'

আরেকটু পরিবর্তন করে এভাবে বলেছেন—

الاماں از روح صادق الاماں
الاماں از صادقان ایں زماں

'মীর সাদিকদের প্রেতাত্মা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো,
এই যুগের মীর সাদিকদের থেকে দূরে থাকো।'

কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, লোকটি হায়দারাবাদের নিযামের শিয়া উযির মীর আলমের ভাই ছিলো। এদের দু'জনের মাঝে রক্তের সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। কারণ, হায়দারাবাদের নিযামকে টিপু সুলতান থেকে দূরে রেখে, ইংরেজদের কাছাকাছি করার ক্ষেত্রে মীর আলম-ই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলো। কাজেই সালতানাতে খোদাদাদের পতনের

www.boimate.com

ক্ষেত্রে মীর সাদেকের পাশাপাশি মীর আলমেরও হাত ছিলো। কারণ, নিযাম সহায়তা না করলে ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ সুদূর পরাহত ছিলো।

সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লোকটি সিরা (Sira) প্রদেশে বসবাস করতো। সেখান থেকে প্রথম আরকাটে নবাব মুহাম্মদ আলীর কাছে চাকুরি নেয়। যখন আরকাট নগরী বিজিত হয়ে মহিসূরে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন অন্য লোকদের মতো মীর সাদিকও বন্দী হয়। এক পর্যায়ে সে হায়দার আলীর মন জয় করতে সমর্থ হয়। তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে নিজের চাকর হিসেবে রেখে দেন। সেখান থেকে উন্নতি করে সে প্রথমে শুল্ক অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করে। এক পর্যায়ে পুরো আরকাটের গভর্নর নিযুক্ত হয়।

হায়দার আলীর মৃত্যুর পর প্রথমে টিপু সুলতানের মুখ্যসচিব ও পরে প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মনোনীত হয়। অথচ হায়দার আলী মৃত্যুর আগমুহূর্তে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে টিপু সুলতানকে এ অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, মীর গোলাম আলী লেংড়া ও পুর্নিয়ার মতো এ লোকটিও গোপনে গোপনে সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। কাজেই অনতিবিলম্বে এ তিনজনকে ফাঁসি দেবে।

কিন্তু সুলতানের জন্মগত কোমল মনোবৃত্তি ও নরম মানসিকতার সুবাদে এরা পার পেয়ে যায়। উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় সুলতান তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ তো নেননি; উপরন্তু পদোন্নতি দান করেন। তখন মীর সাদেক গোটা সালতানাতে টিপুর 'নায়েব' মনোনীত হয়।

১৭৮৭ সালে মারাঠিদের সঙ্গে সন্ধির পর যখন টিপু সুলতান রাজধানীতে ফিরে আসেন তখন জনগণ টিপুর অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের ওপর মীর জাফরের অকথ্য নির্যাতন, নিপীড়ন, ঘুষ গ্রহণ ও সরকারি খাজানা তসরুপের অভিযোগ দায়ের করে। সুলতান অনুসন্ধান করে তার ঘর থেকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, ১০ লক্ষ নগদ রুপি ও অসংখ্য মূল্যবান হীরা-জওহরাত উদ্ধার করেন। এই সম্পদ সে সরকারি খাজানা থেকে চুরি করে ও জনগণ থেকে ঘুষ নিয়ে তৈরি করেছিলো। সুলতান তৎক্ষণাৎ তাকে পদচ্যুত করে বন্দী করেন এবং তদস্থলে মাহদী আলী খান নায়েতাকে প্রশাসনের 'দিওয়ান' হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

www.boimate.com

কিন্তু মীর সাদেক অত্যন্ত ধূর্ত ছিলো। মীর হুসাইন আলী কিরমানীর ভাষ্যমতে সে সুলতানের মন বশীভূত করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার জন্যে 'তাবীজ ও আমলিয়্যাত'-এর আশ্রয় গ্রহণ করে। জঘন্য তাবীজ ব্যবসায়ী 'আমিল'দের পরামর্শে সে প্রতিদিন আধা মণ কালো মরিচ আগুনে পোড়াতো।

এভাবে সে খুব দ্রুত সুলতানকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যার ফলে শুধু ক্ষমাই নয়; বরং আগের সরকারি পদখানাও বাগিয়ে নেয়। এমনকি ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম চুক্তি অনুসারে ইংরেজদেরকে অর্ধেক রাজত্ব সঁপে দেওয়ার পর টিপু সুলতান যখন তার সালতানাতের পুনর্বিন্যাসের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার অংশ হিসেবে পার্লামেন্ট গঠন করেন আর এর মাধ্যমে মহিসূরে প্রথমবারের মতো প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠে তখন এই নিমকহারামকেই সেই পার্লামেন্টের প্রধান মনোনীত করেন। ওই পদটির নাম ছিলো, زمزمة غم نباشد। এর ফলে মীর সাদিক আরেকবার এই সালতানাতের দ্বিতীয় সর্বাধিক এক্তিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

সুলতানের এতোটা আস্থা ও নির্ভরতা সত্ত্বেও লোকটি তার নীচু কর্মকাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বরং তার শত্রুতা, বৈরীতা ও বিদ্বেষের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। সে পূর্বাপেক্ষা অধিক শঠতা ও ধূর্ততা নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। নিয়মিত সুলতানের সামরিক বাহিনীর সার্বিক প্রস্তুতির তথ্য নিযাম ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পাঠাতে থাকে। যেহেতু লোকটি অনেক বড় চাটুকর ছিলো। কথায় কথায় কুরআনের ওপর কসম করতে পারতো; এজন্যে সুলতান কখনও তার কথার ওপর সন্দেহ করতেন না।

শেষ দিকে সে সুলতানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি-পত্তর পৌঁছতে দিতো না। তার এই গাদ্দারির বিষয়টি সুলতান শাহাদাতের দিন ধরতে সক্ষম হন; কিন্তু ততোক্ষণে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেছে। সকাল থেকে শত্রুদের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যস্ত থাকার কারণে এই মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ সুলতানের ছিলো না। তিনি তখন মীর সাদেককে সম্বোধন করে শুধু এতোটুকুন বলেছিলেন, 'এমন নয় যে, আমি তোমার গাদ্দারির কথা জানি না। তুমি তোমার এই গাদ্দারির মজা খুব

www.boimate.com

শিগগিরি আস্বাদন করবে। কুদরতের প্রতিশোধ তোমার আগামী প্রজন্মের ওপরও পড়বে। তোমার এই অপকর্মের পরিনামে একদিন তারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবে'।

শাহাদাতের কয়েক ঘণ্টা আগে টিপু সুলতান যখন ইংরেজ সিপাহিদের সঙ্গে লড়াই করে ডোডি ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলেন তখন এই হতভাগা নরাধম পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সেই ফটক বন্ধ করে দেয়। এরপর রসদ যোগানের বাহানা দিয়ে কেল্লার বাইরে বেরিয়ে আসে। সুলতানের পাশেই ছিলো কাডাপা (Kadapa)-এর একজন বিশ্বস্ত সিপাহি। নাম, আহমদ খান। মীর সাদিকের ফটক বন্ধ করার দৃশ্য তার চোখে এড়ায়নি। সঙ্গে সঙ্গে সে এ কথা বলে মীর সাদিকের ওপর তরবারি চালিয়ে দিলো যে, 'সুলতানকে শত্রুদের মুখে ফেলে তুমি কীভাবে বাঁচবে?'

এক আঘাতেই তার মুণ্ডু কাঁধ থেকে খসে পড়ে। চার দিন পর্যন্ত তার লাশ সেখানেই পড়ে ছিলো। পুরো চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। প্রচণ্ড দুর্গন্ধের কারণে কেউ সেই লাশের কাছে ঘেঁষতো না। কুকুর পর্যন্ত তার লাশে মুখ দেয়নি। দু'-তিন দিন পর এক ফিরিঙ্গি সিপাহি বিনা কাফনে তার লাশ একটি গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়। এভাবেই এই জাতীয় গাদ্দারের বিনা কাফনে, বিনা জানাযায়, বিনা গোসলে, বিনা নামাযে ইহলীলা সাঙ্গ হয়।

পরবর্তীকালে যে পথিকই তার কবরের পাশ দিয়ে যেতো, একবারের জন্যে হলেও থুথু নিক্ষেপ করতো। ইংরেজ সিপাহিরা বিজয়ের রাতে যখন রাজধানীর ওপর বর্বরতা, হিংস্রতা ও উন্মত্ততার নগ্ন নৃত্য শুরু করে তখন তাদের হিংস্রতা থেকে জাতীয় গাদ্দার মীর সাদিকের বাসভবনও রক্ষা পায়নি। তারা খোদ তার স্ত্রী-মেয়েদের ইজ্জতও লুণ্ঠন করে।

মোটকথা, দেশবেচা এই গাদ্দার তার অপকর্মের প্রলুব্ধ ফলাফল দুনিয়াতেও ভোগ করার সুযোগ পায়নি। আল্লাহ তা'আলা খোদ সুলতানের শাহাদাতের পূর্বেই দ্বীনত্যাগী, দেশদ্রোহী এই নরাধমের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

www.boimate.com

৫. ত্রিমূল রাও

লোকটি ছিলো সালতানাতে খোদাদাদের পক্ষ থেকে মহিসুরের অপসৃত রাজার রানীদের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। ব্যক্তিগতভাবে সে গোড়া হিন্দু ও ইসলামবিরোধী ছিলো। সবসময় সে মহিসুরের রাজসিংহাসনে সাবেক রাজার পরিবারকে পুনর্বহাল করা, হিন্দুরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উদীয়মান ইসলামি সালতানাতকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা আঁটতো। এ খোয়াব বাস্তবায়নের জন্যে তলে তলে ইংরেজ গভর্নর ও মারাঠি সর্দারদের সঙ্গে চিঠি চালাচালি ও গোপন শলা-পরামর্শ করতো।

তার গাদ্দারির বিষয়টি একবার নবাব হায়দার আলীর গোচরীভূত হয়। তখন তিনি তাকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু পরবর্তীতে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করায় তার কৃত অপরাধ ক্ষমা করেন এবং শাহনূরের নবাব আবদুল হাকীমের দরবারে তাকে মহিসুরের প্রতিনিধির পদে নিয়োগ দান করেন।

মাথার ওপর হায়দার আলীর পরিবারের এতো দয়া-দাক্ষিণ্য লোকটি পরবর্তীকালে মনে রাখেনি। মৃত্যু পর্যন্ত সে সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছিলো। হিন্দুরাজ পরিবারের সঙ্গে তার চুক্তি ছিলো— মহিসুরের মাটিতে তারা পুনর্বহাল হলে তাকে 'দিওয়ান' মনোনীত করা হবে। কিন্তু ইংরেজরা তার স্থলে পুর্নিয়াকে এ পদে নিয়োগ দেয়। তাকে ভাতা সহকারে মাদ্রাজ পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই ১৮১৫ সালে তার ইনতিকাল হয়।

৬. পুর্নিয়া

লোকটি মূলত ত্রিচিনোপলী (Trichinopoly)-এর অধিবাসী ছিলো। ১৭৪৬ সালে হিন্দু ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। বয়সে সে সুলতান থেকে তিন-চার বছরের বড় হবে। ১৭৫৭ সালে যখন তার পিতা কৃষ্ণ আচারি মারা যায় তখন পুর্নিয়া বেশ ছোট ছিলো। যার কারণে তার মা 'লক্ষ্মী আম্মাঁ' মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে দিন গুজরান করতো। মানুষের ঘরের গৃহস্থালী কাজকর্ম যেমন, থালা-বাসন ধুয়ে দেওয়ার কাজ করতো।

১৭৬০ সালে একজন বণিকের সুপারিশে সে শ্রীরঙ্গাপত্তনামে চাকুরি লাভ করে। কিছু দিন পর হায়দার আলীর হিন্দু উযির কৃষ্ণরাওয়ের সুপারিশে

www.boimate.com

হায়দার আলী তাকে সালতানাতে খোদাদাদের সরকারি কর্মচারী হিসেবে নিয়োগদান করেন। প্রথমে তাকে প্রশাসনের পণ্যপরিবহণ ও স্থানান্তর শাখার সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এখান থেকে সে উন্নতি করতে করতে এক পর্যায়ে টিপু সুলতানের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। এক সময় অর্থমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হয়।

তার ব্যাপারে নবাব হায়দার আলী আশ্বস্ত ছিলেন না। এজন্যে তিনি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করেছিলেন যে, মীর সাদেক ও গোলাম আলী লেংড়ার মতো একেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় দয়াপ্রবণ কোমলমনা সুলতান তার বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। বরং ১৭৯২ সালে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার পর তাকে মীর সাদিকের 'নায়েব' মনোনীত করেন। যার ফলে সে মহিসুর প্রশাসনের তৃতীয় সর্বোচ্চ এক্তিয়ারধারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

টিপু সুলতানের এমন ধর্মীয় সৌহার্দ্য ও উদারতা সত্ত্বেও তার হিন্দুয়ানি গোড়ামি এতোটুকুও হ্রাস পায়নি। সে নিয়মিত রাঙ্গাস্বামীর মন্দিরে নিজ দেবতাদের সামনে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথ নবায়ণ করতো। তার মনের ভেতর সবসময় সাবেক হিন্দুরাজার পুনর্বহাল ও হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভূত চেপে থাকতো। এজন্যে সে অপসৃত রাজার রানীদের সঙ্গে গোপনে গোপনে শলা-পরামর্শ করতো। ফরাসিদের সঙ্গে টিপু সুলতানের সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ এ লোকটিই মহিসুরের রানী লক্ষ্মী উমানীর কাছে পৌঁছিয়েছিলো। যার ফলে এ সংবাদ বেশ দ্রুত ইংরেজ জেনারেল হ্যারিসের কাছে পৌঁছে যার। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শীর্ষস্তরের জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালস ওয়েলেসলির সঙ্গেও তার নিবীড় যোগাযোগ ছিলো। ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের অভ্যন্তরীণ চালচিত্র ও রণপ্রস্তুতির গোপন সংবাদ পৌঁছানোর অপকর্মে এ গাদ্দারও মীর সাদেকের সঙ্গে সমান অংশগ্রহণ করেছিলো। এই নরাধমই কেল্লার ফাটলের স্থানে প্রহরারত সৈন্যদেরকে বেতন বিতরণের বাহানায় মসজিদে আ'লার কাছে নিয়ে যায়। যার পরপরই ইংরেজরা বিনা বাঁধায় কেল্লার প্রাচীরের ওপর চড়ে বসতে সক্ষম হয়।

www.boimate.com

সুলতান শহীদ হওয়ার পর যখন ইংরেজরা মহিসুরের রাজসিংহাসনে সাবেক পদচ্যুত রাজার পাঁচ বছর বয়সী সন্তান কৃষ্ণরাজ তৃতীয়কে অধিষ্ঠিত করে তখন গাদ্দারির প্রতিদান হিসেবে তাকে এই নতুন প্রশাসনের 'দিওয়ান' মনোনীত করা হয়। বার্ষিক ৩ লক্ষ রুপি আয় সমৃদ্ধ একটি অঞ্চলের জমিদারিও তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু মহিসুরের এই একান্ত সীমিত রাজ্য কার্যত ইংরেজদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছে, এই হিন্দু রাজা ও তার প্রশাসন আক্ষরিক অর্থেই ইংরেজদের পুতুল সরকারের স্থানে নেমে এসেছে কাজেই পুর্নিয়ার হাতে এখন সেই সীমাহীন এক্তিয়ারের ছিটেফোটাও নেই, যা সে আগে টিপু সুলতানের শাসনামলে ভোগ করতো। সে নিজেও বিষয়টি অনুভব করতে পেরেছিলো। যার কারণে সে জীবনভর মীর সাদিককে গালমন্দ করতো যে, তার প্রলোভনের কারণেই আমি আমার মনিবের সঙ্গে গাদ্দারি করেছি।

আসলে মীর সাদিকের ওপর তার পুরো দায়ভার চাপানোও ঠিক নয়। কারণ কৃষ্ণারাজ— যার সুপারিশে সে সালতানাতে খোদাদাদে চাকরি পেয়েছিলো, ওই কৃষ্ণরাজ তাকে মানসিক ও চৈন্তিক— দু'ভাবেই উদীয়মান এই ইসলামি সালতানাত ধ্বংস করার মিশনের জন্যে তৈরি করেছিলো। কাজেই এই অপকর্মের পূর্ণ দায়ভার মীর সাদিকের ওপর উগড়ে দেওয়াটাও তার এক ধরনের প্রতারণা। ১৮১১ সালে শ্রীরঙ্গাপত্তনামে লোকটি মারা যায়।

৭. লক্ষ্মী উমানী

সম্পর্কে সে মহিসুরের অপসৃত রাজা কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার (Krishnaraja Wodeyac) এর স্ত্রী। প্রথম থেকেই সে মহিসুরে একটি ইসলামি রাজ্য গড়ে ওঠার শক্ত বিরোধী ছিলো। মহিসুরের সিংহাসনে তার স্বামীকে পুনর্বহাল করতে সে সবসময় চক্রান্তের জাল বুনতো। সে তার প্রতিনিধি ত্রিমূল রাওয়ের মাধ্যমে মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্নরের সঙ্গে এ অঙ্গীকার করেছিলো যে, যদি সুলতানের বিরুদ্ধে কোম্পানি তাকে সমর্থন দেয় তাহলে এর বিনিময়ে সে তাদেরকে নগদ ১ কোটি রুপি ও প্রতিবছর ৩০ লক্ষ রুপি দিতে প্রস্তুত।

www.boimate.com

১৭৯৬ সালে সে ইংরেজদেরকে এ কথা বলে উস্কানি দেয় যে, টিপু সুলতান তাদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। যদি তারা টিপুর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে সে নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে যুদ্ধের যাবতীয় রসদ এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার হিসেবে ১ কোটি রুপি প্রদান করবে। বিষয়টি নিয়ে সে নিয়মিত গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে। এভাবে এক পর্যায়ে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়।

লক্ষ্মী উমানী টিপু সুলতানের শাহাদাতের পরও জীবিত ছিলো। মহিসুরের সিংহাসনে তার পরিবার পুনর্বহাল হওয়ার পর সে ইংরেজ গভর্নর জেনারেলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পত্র লেখে। ওই পত্রে সে এ কথা লিখেছিলো যে, 'চল্লিশ বছরের দীর্ঘ বিরতির পর তার পরিবারের হাতে মহিসুরের শাসন ক্ষমতা ফিরে আসার পথ করে দেওয়ায় সে ইংরেজদের কাছে সীমাহীন কৃতজ্ঞ। এহেন দয়ার ওপর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার গোটা পরিবার চিরদিন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুগত হয়ে থাকবে।'

৮. মীর আলম

যদিও তার সম্পর্ক সরাসরি সালতানাতে খোদাদাদের গাদ্দারদের সঙ্গে ছিলো না; কিন্তু যেহেতু ১৭৯৯ সালে ইংরেজদের সঙ্গে হায়দারাবাদের নিযামের সামরিক সহায়তা ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণেই শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতন সম্ভব হয়েছে, এবং নিযামকে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে জোট করার ওপর উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার উর্বর মস্তিষ্কই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। কাজেই শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতনের ক্ষেত্রে সরাসরি না হোক, পরোক্ষভাবে মীর আলমের সম্পৃক্ততা ছিলো।

তার পুরো নাম আবুল কাসেম মৌলভী শাস্ত্রী। কিন্তু সাধারণত সে 'মীর আলম' নামেই প্রসিদ্ধ ছিলো। শিয়া ছিলো। এক বর্ণনায় অনুযায়ী লোকটি মীর সাদেকের ভাই ছিলো। যেহেতু সে হায়দারাবাদে নিযামের ফৌজের সিপাহসালার এবং প্রশাসনের প্রধান উযির ছিলো, কাজেই কার্যক্ষমতার বিচারে সে ছিলো নিযামের পর সর্বাধিক এক্তিয়ারপ্রাপ্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি।

টিপু সুলতান নিযামের সঙ্গে ঐক্য গড়ার যতোগুলো উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার সবগুলো এই এক ব্যক্তির কারণেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো।

www.boimate.com

মহিসুর রাজদরবারের পক্ষ থেকে হায়দারাবাদের রাজদরবারে একাধিকবার কূটনৈতিক দল পাঠানো হয়েছিলো। তাদের সফল আলাপচারিতার মাধ্যমে বারবার এমন সুযোগ এসেছে যে, নিযাম সুলতানের কথায় প্রভাবিত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পূর্ণ রাজি হয়েছেন: কিন্তু প্রতিবারই এই হতভাগা মীর আলম কোনো না কোনা অজুহাত বানিয়ে তাকে এথেকে নিবৃত্ত রাখতো।

ইংরেজরা তাকে অর্থের বিনিমিয়ে কিনে নিয়েছিলো। এই মীর আলমই ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে হায়দারাবাদি ফৌজের সেনাপতি ছিলো। কিন্তু বিজয়ের পর ইংরেজরা তার সঙ্গে যেই অবমাননাকর আচরণ করেছিলো, আত্মসম্মানবোধ থাকলে তার তখনই আত্মহত্যা করা দরকার ছিলো। যেখানে ইংরেজরা যুদ্ধের আগে তাদের সঙ্গে এ অঙ্গীকার করেছিলো যে, যুদ্ধ জেতার পর বিজিত অঞ্চল দু' পক্ষের মাঝে সমান হারে বণ্টিত করা হবে; কিন্তু জেতার পর ইংরেজরা তাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ রেখে সেই অঙ্গীকার বেমালুম ভুলে বসে। তারা নিযামকে গরমকুন্ডা, বিলারি ও তৎসংলগ্ন গুটিকয়েক অঞ্চল দিয়ে বাকি পুরো সালতানাত নিজেরা নিয়ে নেয়। যেখানে যুদ্ধের পর ৯ কোটি মূল্যমানের মালে গনীমত হস্তগত হয়, সেখান থেকে হায়দাবারাবাদের অংশে মাত্র ২/৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মালে গনীমত দিয়ে বাকি পুরো সম্পদ ইংরেজরা মেরে দেয়। মীর আলম যখন আরও সম্পদের জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে তখন ইংরেজরা সুলতানের প্রাসাদে খাঁচাবদ্ধ হিংস্র বাঘের দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে, মীর আলম চাইলে এই বাঘগুলোকে মালে গনীমত হিসেবে হায়দারাবাদ নিয়ে যেতে পারে। মীর আলম যখন সেগুলো নিতে অস্বীকার করে তখন তার চোখের সামনেই সেই হিংস্র প্রাণীগুলোকে তারা গুলি মেরে হত্যা করে।

কুদরত এই জাতীয় গাদ্দার থেকে তার জীবদ্দশাতেই প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। দূরারোগ্য গোদ রোগে আক্রান্ত হয়ে তার গোটা শরীর দূষিত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছিলো যে, তাকে বিষাক্ত সাপ দংশন করানো গেলে তার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তার শরীর এতোটাই নষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো বিষাক্ত সাপ তাকে দংশন করলে তার শরীরের বিষক্রিয়ার প্রভাবে সাপ নিজেই মরে যেতো। ওই

www.boimate.com

দংশনের কারণে তার শরীরের বিষ-বেদনা আরও বেড়ে যেতো। এ অবস্থাতেই ছটফট করতে করতে একসময় তার মৃত্যু ঘটে।

শেষ জীবনে সে তখন বুঝতে পেরেছিলো যে, তার জাতীয় স্বার্থপরিপন্থী কীর্তি-কলাপের কারণেই আজ তার জীবনে এমন বিপর্যয় নেমে এসেছে। কুদরত তার থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু ততোক্ষণে পানি গড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে। একটি উদীয়মান ইসলামি সালতানাতের সূর্য চিরদিনের জন্যে মহাকালের গর্ভে ডুবে গেছে। শঠ ইংরেজরা যখন দেখে যে, মীর আলমের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেছে, এরপর তারা আর কোনোদিন এই শকুনের দিকে মুখ ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

৯. মীর গোলাম আলী লেংড়া

লোকটি ছিলো অত্যন্ত দক্ষ কূটনীতিবিদ। প্রত্যুৎপন্নমতি। খুব সহজেই নিজের বক্তব্যের ওপর আলোচনার অপর পক্ষকে মানিয়ে নিতে পারতো। এ কারণেই যখন টিপু সুলতান ১০ মার্চ ১৭৮৬ সালে কনস্ট্যান্টিনোপলে উসমানি খলীফার সকাশে মহিসুরের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এই মীর গোলাম আলী লেংড়াকেই দলটির প্রধান মনোনীত করেন। ১৭৯২ সালে ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধের পর চুক্তিনামার শর্তাবলি চূড়ান্ত করার জন্যে সুলতানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে তাকেই ইংরেজদের কাছে পাঠানো হয়।

শিয়া মতাবলম্বী ছিল। জন্মসূত্রে 'আরকাট'-এর অধিবাসী ছিলো। যখন হায়দার আলী 'আরকাট' নগরী জয় করে মহিসুর সালতানাতে যুক্ত করেন তখন মীর সাদিকের মতো সেও মহিসুর বাহিনীতে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে। এরপর সে ক্রমশ উন্নতি করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে টিপু সুলতানের শাসনামলে মহিসুরের সমস্ত কেল্লা ও ব্যাটালিয়নের সর্বোচ্চ অফিসার মনোনীত হয়।

মারাত্মক অহংকারী ছিলো। কারো সামনে মাথা নত করতে পসন্দ করতো না। এক বর্ণনায় এসেছে, লোকটি বিশেষ ধরনের টোটকা ব্যবহার করে নিজেই নিজের দু' পা শুকিয়ে পঙ্গু বানিয়ে ফেলে। উদ্দেশ্য হলো, এর

www.boimate.com

ফলে তাকে সুলতানের সামনে বাধ্য হয়ে শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্যে মাথা নত করতে হবে না।

পঙ্গু হওয়ার কারণে সে সবসময় সুলতানের দরবারে চৌকিতে বসে থাকতো। এ কারণেই ইংরেজরা তার নাম দিয়েছিলো– Gulam Of Silver Chair। অর্থাৎ রূপালি চেয়ারের গোলাম। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম চুক্তির পর ১৭৯২ সালে টিপু সুলতান যখন তার নৌবাহিনী নতুন করে ঢেলে সাজান, নৌবাহিনীতে ২২ টি রণতরী ও ২০ টি বাণিজ্যিক জাহাজ যুক্ত করেন তখন এই মীর গোলাম আলী লেংড়াকেই সালতানানাতে মহিসুরের প্রথম নৌবাহিনী বিষয়ক মন্ত্রী পদে নিয়োগ দান করেন।

ইতোপূর্বে তাকে তার বিভিন্ন দূরভসিন্ধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে এই পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। কিছু দিন নজরবন্দি করেও রাখা হয়েছিলো। ১৭৮৮ সালে যখন মহিসুরের প্রতিনিধি দলটি কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে ফিরে আসে তখন উসমানি খলীফার পক্ষ থেকে টিপু সুলতানকে প্রদত্ত উপহারমালা থেকে অনেকগুলো মূল্যবান উপহার সে আত্মসাৎ করেছিলো। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে যখন তদন্ত করা হয় তখন ওই জিনিসগুলো তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়। তার এই আত্মসাৎমূলক অপকর্মের কারণে টিপু সুলতান তার ওপর ক্ষুব্ধ হন। তাকে পদচ্যুত করে কিছু দিন নজরবন্দি করে রাখেন। নজরবন্দি করে রাখার আরেকটি কারণ হলো, সুলতান জানতে পেরেছিলেন— সে কনস্ট্যান্টিনোপলে নিযুক্ত বৃটিশ কূটনীতিবিদের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছে। যেখানে সে ফরাসি সম্রাটের সঙ্গে টিপু সুলতানের পত্রালাপের বিশদ বিবরণ ও সুলতানের রণপ্রস্তুতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে দেয়।

লোকটি যেহেতু ধূর্ত প্রকৃতির ছিলো; এজন্যে তৎক্ষণাৎ সুলতানের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত করে ফেলে। এভাবে সে তার পূর্বের পদে পুনর্বহাল হতে সক্ষম হয়। সালতানাতের নৌবাহিনী বিষয়ক মন্ত্রী হওয়ার কারণে তাকে সুলতান একান্ত আস্থাভাজনদের তালিকায় ঠাঁই দিয়েছিলেন। এ কারণেই সে প্রশাসনের ছোট-বড় সকল রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলো। তার ওপর সুলতানের এমন সীমাহীন দয়া-দাক্ষিণ্য থাকা সত্ত্বেও লোকটি সুলতান কর্তৃক ইতোপূর্বের পদ থেকে

www.boimate.com

অপাসরণ ও নজরবন্দি করে রাখার অপমান ভুলতে পারেনি। যার কারণে সে সবসময় সুলতান থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ফোকর খুঁজতো। রাজপ্রাসাদের যাবতীয় গোপন তথ্য শত্রু-শিবিরে সরবরাহ করতো।

১৭৯৯ সালে ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর যখন ইংরেজরা সুলতানের শাহযাদাদের মধ্য হতে কাউকে পুতুল সম্রাট হিসেবে বসানোর চিন্তা-ভাবনা করছিলো তখন এই মীর গোলাম আলী লেংড়াই বলেছিলো—

افعی کشتن وبچہ را نگہداشتن کار خردمنداں نیست.

'সাপ মেরে, তার ছা বাঁচিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।'

অর্থাৎ সুলতানকে তো শেষ করে দিয়েছেন। এখন যদি এ কথা ভেবে তার কোনো শাহযাদাকে মসনদে বসান যে, সে তার পিতার প্রতিশোধ নেবে না এটা কখনই সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হবে না।' আসল কথা হলো, এই শাহযাদাদেরকে ইংরেজরা যতো বেশি ভয় করতো, তারচেয়ে কয়েক গুণী বেশি ভয় গোলাম আলী নিজেই করতো।

টিপুর শাহাদাতের পর যখন ইংরেজরা নির্বিচারে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম লুট করছিলো তখন তাদের হাত থেকে এই মীর গোলার আলী লেংড়া নিজেও নিস্তার পায়নি। তারা তার বাড়ি-ঘর এমনভাবে লুট করে নিয়ে যায় যে, সে চিরদিনের জন্যে কাঙাল হয়ে পড়ে। সুলতানের সঙ্গে এমন জঘন্য গাদ্দারির বিনিময় হিসেবে সে ইংরেজ কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতি বছর মাত্র ৩ হাজার প্যাগোডা অর্থাৎ ৭/৮ হাজার রুপি ভাতা পেতো। নতুন প্রশাসনে তাকে কোনো অতি সাধারণ পদের জন্যেও বিবেচনা করা হয়নি।

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর এই জাতীয় গাদ্দার প্রায় ১০-১২ বছর জীবিত ছিলো। সাধারণ মানুষ তাকে এ পরিমাণ ঘৃণা করতো যে, পথে-ঘাটে লোকজন তার ওপর থুথু ফেলতো। তার মৃত্যুর পর ইংরেজদের আশঙ্কা হয়েছিলো যে, জনগণ তার লাশ কবর থেকে বের করে অবমাননা করতে পারে, এজন্যে তার কবরে দাফনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নারীদের রীতিতে সম্পন্ন করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, লোকটি ভেলোর বা হায়দারাবাদে মারা যায়। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

www.boimate.com

১০. মীর মুঈনুদ্দীন

লোকটি সুলতানের শ্বশুর ছিলো। ১৭৯৫ সালে প্রথম স্ত্রী অর্থাৎ লালা মিয়ার বোন 'রুকাইয়া বানু' ইনতিকাল করার পর টিপু সুলতান এই মীর মুঈনুদ্দীনের কন্যা 'খাদীজা বেগম'-কে বিয়ে করেন। সেই সূত্রে তিনি সুলতানের তৃতীয় স্ত্রী। কিন্তু প্রসব-পরবর্তী জটিলতার কারণে তিনি ও সন্তান— দু'জনই ইনতিকাল করেন।

লোকটি সম্পর্কে টিপু সুলতানের মামা হন। ইংরেজরা সাধারণত তাকে 'সাইয়্যেদ সাহেব' বলে সম্বোধন করতো। গোটা মহিসুরে তিনি এ নামে পরিচিত ছিলেন। সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লোকটি কর্নাটকের নবাব মুহাম্মদ আলীর অধীনে চাকরি করতো। ১৭৬৭ সালের ইঙ্গ-মহিসুর প্রথম যুদ্ধে হায়দার আলীর বিজয়ের ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে সে ওই চাকরি ছেড়ে সালতানাতে খোদাদাদে যোগদান করে। মারাঠাদের বিরুদ্ধে হায়দার আলীর যুদ্ধের সময় তাকে শত্রুরা 'গরমকুণ্ডা'-এর জামিদারির লোভ দেখিয়ে কিনে নিয়েছিলো। পরবর্তীকালে সে তার এই অপকর্ম থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। হায়দার আলী তার ক্ষমা মঞ্জুর করে তাকে পূর্বের পদে পুনর্বহাল করে। উন্নতির এক পর্যায়ে সে টিপু সুলতানের শাসনামলে মহিসুর সেনাবাহিনীর প্রধান মনোনীত হয়। ১৭৯৯ সালের সর্বশেষ যুদ্ধে রাজধানীর কেল্লার হিফাযতের দায়িত্ব তার কাছে ন্যস্ত ছিলো। এ যুদ্ধেও ইংরেজরা তাকে গরমকুণ্ডার জমিদারির লোভ দেখিয়ে কিনে নেয়।

চতুর্থ যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার কিছু দিন আগে টিপু সুলতান সদাশ্বর স্থানে মুম্বাই থেকে আগত জেনারেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ সৈন্যদেরকে পরাজিত করে জেনারেল হ্যারিসের নেতৃত্বাধীন অপর একটি বাহিনীকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে রাজধানী প্রত্যাবর্তন করেন। ওই সময় তিনি সেখানে এই মীর মুঈনুদ্দীন ও পুর্নিয়াকে নিজ স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করে তাদেরকে এ দায়িত্ব দেন যে, তারা যেন ইংরেজ বাহিনীকে কিছু দিন পথিমধ্যে ব্যতিব্যস্ত করে রাজধানীর দিকে এগোতে না দেয়।

কিন্তু পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত অনুসারে মীর মুঈনুদ্দীন ইংরেজদেরকে কোনো ধরনের প্রতিরোধ করেনি। বিনা বাঁধায় তারা অতি সহজে রাজধানীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। যার ফলে সুলতান রণপ্রস্তুতির সুযোগ পাননি।

www.boimate.com

এই নিমক হারাম গাদ্দারদের পরামর্শে ইংরেজরা তাৎক্ষণিক রাজধানী অবরোধ করে।

অবরোধের এক পর্যায়ে যখন ইংরেজ তোপখানার অনবরত গোলা বর্ষণের কারণে কেল্লার প্রাচীরে বিরাট ফাটল দেখা দেয় তখন সুলতান তা পাহারা দেওয়ার জন্যে একদল চৌকস সৈন্যকে নিয়োগ দেয়। এই মীর মুঈনুদ্দীন-ই পুর্নিয়ার সঙ্গে জোট বেধে ওই প্রহরীদেরকে মাসিক বেতন বিতরণের বাহানায় সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। আর ইঙ্গিতে ইংরেজ সৈন্যদেরকে এদিক দিয়ে প্রবেশের সিগন্যাল জানিয়ে দেয়।

সুলতানের এক জীবনোৎসর্গী সৈন্য তার এই অপকর্ম দেখে ফেলেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় রক্ত উঠে যায়। এক আঘাতেই এই নরাধমের ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। চিৎপটাং হয়ে পাশের একটি পরীখায় পরে মরে যায়।

ইংরেজ মেজর ডালস সেখান থেকে তার লাশ তুলে একটি পালকিতে চড়িয়ে তার বাসভবনে পাঠিয়ে দেয়। যতোক্ষণে তার লাশ সেখানে এসে পৌঁছে তার আগেই লুটেরা ইংরেজ সৈন্যরা তার বাড়ি লুটতরাজ করে পুরা বাড়ি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে ফেলে। তখন তার লাশ পাশের বাড়িতে রাখা হয়। এটাও কুদরতের এক প্রকাশ প্রতিশোধ ছিলো। জাতীয় গাদ্দারের নিস্প্রাণ শরীর তার নিজ বাড়িতেও প্রবেশ করতে পারেনি। ইংরেজ সেনাকর্মকর্তা মেজর এলিন বলেন, 'এদিন ইংরেজ সিপাহিরা মীর কমরুদ্দীনের মতো মীর মুঈনুদ্দীনের ঘরের সকল নারীকেও গণধর্ষণ করেছিলো।'

১১. মীর কমরুদ্দীন

লোকটি সম্পর্কে টিপু সুলতানের মামাতো ভাই। তার পিতা মীর রেযা আলীর আপন বোনকে নবাব হায়দার আলী বিয়ে করেছিলেন। টিপু সুলতানের সমবয়সী লেখক মীর হুসাইন আলী কিরমানী স্বরচিত 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থে একটি ঐতিহাসিক সূত্রের বরাতে এ কথা লেখেছেন যে, 'মীর কমরুদ্দীন সুলতানের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলো; কিন্তু সুলতান তাকে সায় দেননি। তার প্রতিশোধ নিতেই সে গাদ্দারির পথ বেছে নিয়েছিলো'।

www.boimate.com

আসলে এটি ছিলো তার বাহানা মাত্র। নয়তো তার গাদ্দারির বিভিন্ন প্রকাশ এর আগেও ঘটেছে। ১৭৮৪ সালে সে সুলতানের বিরুদ্ধে হায়দারবাদের নিযামের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করেছিলো। হায়দারাবাদে সে নিজের জন্যে একটি দৃষ্টিনন্দন ভবন তৈরি করেছিলো। সুলতান যখন তার ভগ্নিপতি বুরহানুদ্দীনের মাধ্যমে মীর কমরুদ্দীনের অপতৎপরতার কথা জানতে পারেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে নজরবন্দি করেন।

কিছু দিন যেতে না যেতেই সুলতান তার স্বভাবসুলভ কোমল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে তাকে ক্ষমা করেন। এবং পুনরায় তাকে মহিসুর সেনাবাহিনীর সিপাহসালারের পদে পুনর্বহাল করেন। ১৭৯৮ সালে সে নিযামের প্রধান উযিরকে এ মর্মে চিঠি লেখে যে, যদি তারা একটি বড় অংকের টাকা সমেত কাডাপ্পা (Kadapa) এলাকাটি চিরদিনের জন্যে তাকে দিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে তাহলে সে টিপু সুলতানকে হায়দারাবাদের নিযামের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু যখন এর বিনিময়ে হায়দারাবাদের প্রধান উযিরের পক্ষ থেকে তাকে মাত্র ১০ লক্ষ রুপি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন সে আর সামনে অগ্রসর হয়নি।

ইঙ্গ-মহিসুর সর্বশেষ যুদ্ধে সুলতান তাকে ইংরেজদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্যে একদল সেনা সহকারে কোর্গ নগরীর উদ্দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সে ইংরেজদের কোনো ধরনের প্রতিরোধ না করে তাদের রাজধানী অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পথ নিষ্কন্টক করে দেয়।

এরও অনেক আগের কথা। টিপু সুলতান যখন আদোনী (Adoni) নগরীর ওপর আক্রমণ করেন তখন ওই সময় আরকাটের মুফতি সিরাজ মুহাম্মদ খানের ইনতিকাল ঘটে। ওই সময় তার জানাযা মহাসমারোহে, স্বাড়ম্বরে শ্রীরঙ্গাপত্তনামে নিয়ে আসা হয়েছিলো। যার ফলে লোকমুখে এ কথা ছড়িয়ে যায় যে, এটি টিপু সুলতানের জানাযা। মীর কমরুদ্দীন তখন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তৎক্ষণাৎ রাজধানীর ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে। সুলতান যখন তার এই অপকর্মের কথা শোনেন তখন তাকে স্রেফ দু' বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করেন। অথচ এমন অপরাধের শাস্তি কখনই মৃত্যুদণ্ড থেকে কম হতে পারে না।

সুলতানের শাহাদাতের পর ইংরেজরা অঙ্গীকার অনুসারে তাকে গরমকুণ্ডার জমিদারি প্রদান করে। কিন্তু কাডাপ্পা (Kadapa)-এর এর তীব্র বিরোধিতা

www.boimate.com

করে এবং তার রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করে তার হাতে স্রেফ শূন্য রাজপ্রাসাদ তুলে দেয়। ক্ষোভে-দুঃখে-বেদনায় শেষপর্যন্ত সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিছু দিন পর তার গোদ রোগ দেখা দেয়। তার অবস্থা এতোটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, নিকটাত্মীয়রা পর্যন্ত তার কাছে যেতে কুণ্ঠিত হতো। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের মাত্র কয়েক বছরের মাথায় এই জাতীয় গাদ্দার অভিশপ্ত জীবন কাটিয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মারা যায়।

১২. মীর কাসেম আলী

সে ছিলো শ্রীরঙ্গাপত্তনাম কেল্লার মুহাফিয, তথা রক্ষী। প্রথম জীবনে সে সুলতানের বিশ্বস্ত ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু ঘটনা তাকে সুলতানের শত্রু বানিয়ে দেয়। শিয়া মতাবলম্বী ছিলো। হায়দারাবাদের অধিবাসী ছিলো। সময়ে-অসময়ে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যেতো। সুলতান তাকে মন থেকে সম্মান করতেন। যার কারণে মীর সাদিক ও পুর্নিয়া— দু'জনেই তাকে হিংসা করতো। একবার তার অনুপস্থিতিতে এ দু'জন তার বিরুদ্ধে সুলতানের কানে এ অভিযোগ তোলে যে, সে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে। ফেরার পর যখন সুলতানের নির্দেশে তার তল্লাশি নেওয়া হয় তখন তাদের অভিযোগ মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। মনঃক্ষুন্ন হয়ে সে হায়দারাবাদ ফিরে যায়। সুলতানের এই পদক্ষেপ তার কাছে অবমাননাকর মনে হয় এবং সে এর জন্যে সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে।

১৭৯৯ সালে যুদ্ধের ঠিক আগ মুহূর্তে সে বিশ্রামের বাহানা তুলে ছুটি নিয়ে হায়দারাবাদ চলে যায়। সুলতান তাকে সম্মানজনক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মূল্যবান উপহার সমেত বিদায় জানান। কিন্তু এই হতভাগা লোকটি হায়দারাবাদ না গিয়ে, সোজা ইংরেজ-শিবিরে ওঠে। কেল্লার যাবতীয় অভ্যন্তরীণ তথ্য ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়।

সুলতানের শাহাদাতের সময় যখন শত্রুবাহিনী কেল্লার প্রাচীরের ওপর ওঠে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তখন ইংরেজরা এ কথা স্বীকার করে যে, তারা মীর কাসেমের দেখানো পথ ধরেই কেল্লা দখল করতে সমর্থ হয়েছে। শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতনের পর ইংরেজরা তাকে নতুন প্রশাসনে কোনো গরুত্বপূর্ণ পদ দেয়নি। জনগণ তার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলো। এ

www.boimate.com

কারণেই টিপু সুলতানের পতনের পরও জনরোষ থেকে বাঁচতে সে সবসময় ঘরের চার দেয়ালের ভেতর বসবাস করতো ।

১৩. আয়ায খান

লোকটি ছিলো নবাব হায়দার আলীর পালকপুত্র । মালাবারের হিন্দু নায়ার গোত্র বংশোদ্ভূত নওমুসলিম ছিলো । ১৭৬৬ সালে যখন হায়দার আলী মালাবার আক্রমণ করে তখন সে গ্রেফতার হয় । ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হায়দার আলী তাকে ১৭৭৭ সালে চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog)-এর এবং ১৭৭৯ সালে বেদনুর (Bednore) -এর গভর্নর পদে নিয়োগ দেন ।

টিপু সুলতান ক্ষমতার মসনদে আরোহণের পর যখন জানতে পারেন, লোকটি সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তখন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার স্থানে 'লতীফ বেগ'-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন । লতীফ বেগ তার হাত থেকে ক্ষমতা বুঝে নেওয়ার আগেই মুম্বাই থেকে জেনারেল ম্যাথুজের নেতৃত্বে ইংরেজ ফৌজ চলে আসে । আয়ায খান তখন কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই বেদনুর ও কোড়িয়াল বন্দর (মাঙ্গালুর) এ শর্তে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয় যে, তারা তাকে এখানকার গভর্নর পদে বহাল রাখবে। ওদিকে টিপু সুলতানের আক্রোশ থেকে বাঁচতে সে তল্পি-তল্পা গুছিয়ে পালিয়ে সূরাটে আশ্রয় গ্রহণ করে । এরপর আর সেখান থেকে ফিরে আসতে পারেনি । বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করে ।

১৪. মুহাম্মদ কাসেম খান

আয়ায খানের সঙ্গে এ লোকটিও বেদনুরে অবস্থান করছিলো । লম্বা সময় ধরে সে মহিসুর বাহিনীতে চাকুরি করেছিলো । শেষ দিকে টিপু সুলতান তাকে বেদনুর (Bednore) কেল্লার মুহাফিয তথা প্রধান রক্ষী পদে নিয়োগ দেয় । আয়ায খানের সঙ্গে যোগসাজশ করে সে কোনো ধরনের প্রতিরোধ যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেল্লাটি ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছিলো ।

কেল্লা দখলের সংবাদ শুনে টিপু সুলতান এগিয়ে আসেন । রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে টিপু সুলতান কেল্লাটি পুনরায় দখল করতে সমর্থ হন । ওই সময় অন্যদের সঙ্গে এই জাতীয় গাদ্দার মহিসুর বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয় । বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় ।

www.boimate.com

মুহাম্মদ আলী কামিদান নামে টিপু সুলতানের একজন আস্থাভাজন অফিসার ছিলেন। ন্যায়নিষ্ঠার কারণে সুলতান তাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন। ঘটনাক্রমে কাসেম খানের সঙ্গে তার অনেক দিনের বন্ধুত্ব ছিলো। সে সুলতানের কাছে তার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার আবেদন পেশ করে। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে সুলতান তার একান্ত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করেননি। কাসেম খানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। ওদিকে নিজের পুরনো বন্ধুকে বাঁচাতে না পারার অক্ষমতা মুহাম্মদ আলীর আত্মসম্মানবোধে আঘাত করে। সে অবমাননাবোধ থেকে আবেগতাড়িত হয়ে সে আত্মহত্যা করে। অথচ মুহাম্মদ আলী বিরুদ্ধে সুলতানের মনে কোনো অভিযোগ ছিলো না। স্রেফ আবেগের বশবর্তী হয়ে সে নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ ঘটিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো।

১৫. উসমান খান কাশ্মিরী

নবাব হায়দার আলী যুগে সে ছিলো মহিসুর সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্য। টিপু সুলতানের যুগে সে উন্নতি করে এক পর্যায়ে পাইনঘাট অঞ্চলের 'কারোর' কেল্লার মুহাফিয তথা প্রধান রক্ষী পদে নিয়োগ লাভ করে। ১৭৮৩ সালে যখন ইংরেজ সেনাবাহিনী ত্রিচ্চন্নাপল্লি (Tiruchchirappalli) থেকে কর্নেল লঙ্গের নেতৃত্বে 'কারোর' কেল্লা দখল করার অভিযানে বের হয় তখন ওই কেল্লার ভেতর শত্রুকে প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট চৌকস সেনা ছিলো, প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ-রসদ ছিলো। কিন্তু যখন তাকে ইংরেজরা এই প্রস্তাব দেয়, সে তাদের সঙ্গ দিলে তারা তাকে পদোন্নতি দিয়ে এ এলাকার গভর্নর পদে নিয়োগ দেবে, তখন সে কোনো ধরনের প্রতিরোধ যুদ্ধ ছাড়াই কেল্লাটি ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ইংরেজ জেনারেল লঙ্গের সঙ্গে তার এই স্বার্থের মৈত্রী বেশি দিন টেকেনি। কিছু দিন যেতে না যেতেই সে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে একদিন সে হঠাৎ মহিসুর সেনাবাহিনীর অফিসার মীর মুঈনুদ্দীনের হাতে ধরা পড়ে। সে তৎক্ষণাৎ সুলতানের সঙ্গে গাদ্দারির দণ্ড হিসেবে তার ফাঁসি কার্যকর করে।

১৬. মাহদী আলী খান

লোকটি ছিলো ভারতের মুরাদাবাদ জেলার বাসিন্দা। শিয়া ধর্মাবলম্বী ছিলো। ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধের আগপর্যন্ত সে সুলতানের উযির ছিলো।

www.boimate.com

কিন্তু যখন সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে তার গোপন যোগসাজশের কথা শুনতে পান সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করেন। তখন ইংরেজরা তাকে কোম্পানির পক্ষ থেকে ইরানের 'বুশহরে' রেজিড্যান্ট পদে নিয়োগ দেয়। যখন টিপু সুলতানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কাবুলের তৎকালীন সম্রাট যামান শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহায়তার উদ্দেশ্যে একটি বিশাল সেনাবহর নিয়ে হিন্দুস্তান সীমান্তে চলে আসেন তখন ইংরেজরা এই নিমক হারামের মাধ্যমে কাবুলে শিয়া-সুন্নীদের মাঝে ধর্মীয় দাঙ্গা বাঁধিয়ে ইরান ও আফগানিস্তানকে পারস্পরিক যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। যার কারণে বাধ্য হয়ে তৎক্ষণাৎ যামান শাহকে হিন্দুস্তান সীমান্ত থেকেই কাবুল ফিরে যেতে হয়।

১৭. রাজা খান

মারাঠা বংশোদ্ভূত এ লোকটি একসময় ইসলাম গ্রহণ করে টিপু সুলতানের ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিলো 'রাজা রাও'। ইংরেজরা তাকে অনেক দিন আগেই কিনে নিয়েছিলো। কিন্তু চতুর রাজা খানের শঠতা টিপু সুলতান ধরতে পারেননি। ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধের শেষ দিনে যখন সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফারের শাহাদাতের সংবাদ শুনে টিপু সুলতান লাফিয়ে ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে কেল্লার প্রাচীরের কাছাকাছি ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হন তখন এ লোকটিও সুলতানের সঙ্গে ছিলো। সুলতানের নির্দেশে সে তার সঙ্গে ছোট্ট একটি মশকে পানি বহন করছিলো। অন্তিম মুহূর্তে যখন সুলতান শত্রুদের গুলি খেয়ে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, তখন মাথার ওপর গণগণে সূর্যের প্রখর রৌদ্র, শত্রুদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষের কারণে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় সুলতানের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। এমন করুণ মুহূর্তে এই পাথুরে হৃদয়ের রাজা খান সুলতানকে এক ফোঁটা পানি দেয়নি। এভাবে সে সুলতানকে শাহাদাতের পথে ঠেলে দেয়।

এই হতভাগা শেষ মুহূর্তে সুলতানকে এ পরামর্শ দেয় যে, 'এখন তো আপনার পরাজয় নিশ্চিত। কাজেই আমি মনে করি, আপনি নিজেকে শত্রুদের হাতে তুলে প্রাণে বাঁচার সুযোগ পাবেন'।

www.boimate.com

সুলতান তখন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে সম্বোধন করে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে যেই মন্তব্যটি করেছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খচিত আছে। সুলতান বলেছিলেন,

کیا تم پاگل ہو گئے ہو! خاموش رہو! میرے لئے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے.

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো। চুপ থাকো। আমার কাছে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা শিয়ালের মতো হাজার বছরের জীবন থেকে ঢের উত্তম'।

শহীদ হওয়ার সময় সুলতানের গলায় মুক্তার তৈরি একটি মূল্যবান হার ছিলো। নরাধম রাজা খান তা হাতিয়ে নেয়। পরবর্তীকালে ইংরেজদের আক্রমণে সে নিজেও আহত হয়েছিলো। তাকে বিক্ষত অবস্থায় সুলতানের পালকির ভেতর পাওয়া যায়। সুলতান যেই স্থানে আহত হয়ে শহীদ হয়েছিলেন, এই রাজা খানই ইংরেজ অফিসারকে সেই স্থানটি দেখিয়ে দেয়।

সুলতানের শাহাদাতের পর এ লোকটি অনেক দিন বেঁচে ছিলো। ইংরেজরা তাকে তার গাদ্দারির প্রতিদান হিসেবে মহিসুরের নাবালেগ হিন্দু রাজার প্রশাসনে 'বখশী' পদে নিয়োগ দেয়। এর বাইরে তাকে 'কাড়কোলা' এলাকার জমিদারিও দেওয়া হয়েছিলো। লম্বা জীবন শেষে মহিসুরেই তার মৃত্যু ঘটে।

১৮. শায়খ শিহাবুদ্দীন

সাধারণের মাঝে লোকটি 'সাধা বুহাইরী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। মালাবারের অধিবাসী ছিলো। মঙ্গলোর বিজয়ের পর টিপু সুলতান তাকে সেখানকার অর্থনীতি শাখার অফিসার পদে নিয়োগ দেন। ১৭৯২ সালে যখন ইংরেজদেরকে মহিসুরের অর্ধেক রাজত্ব তুলে দেওয়ার চুক্তি দেওয়ার কথা ওঠে তখন এ লোকটিই সেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সুলতানের প্রতিনিধিত্ব করে। আজীবন লোকটি পশ্চিম উপকূলে ইংরেজদেরকে অনৈতিক সুবিধা প্রদানের পক্ষে কাজ করেছে এবং কোম্পানির সঙ্গে যোগসাজশ করে সালতানাতে খোদাদাদকে ক্ষতিগ্রস্থ করার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করেছে।

www.boimate.com

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর কোম্পানি তাকে মহিসুর রাজার প্রশাসনে 'বখশী' পদে নিয়োগ দেয়। গাদ্দারির বিনিময় হিসেবে তাকে কিছু জমিন দিয়েছিলো। কিন্তু লোকটি খুব দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে। মহিসুর থেকে আরকাট যাত্রাকালে পথিমধ্যে মরে যায়। তখন তাকে মহিসুরে ফিরিয়ে এনে দাফন দেওয়া হয়।

www.boimate.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

টিপুর জন্যে প্রাণোৎসর্গী ক'জন সঙ্গী
ইতিহাসের পাতায় যারা চিরকাল অম্লান

www.boimate.com

টিপুর জন্যে প্রাণোৎসর্গী ক'জন সঙ্গী : ইতিহাসের পাতায় যারা চিরকাল অম্লান

সালতানাতে খোদাদাদের পতনের ক্ষেত্রে যেভাবে কিছু জাতীয় গাদ্দার চরম ধিকৃত ভূমিকা পালন করেছিলো, তাদের বিপরীতে মহিসুরের মাটি এমন কিছু মরণজয়ী অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সন্তানও জন্ম দিয়েছে, যারা সালতানাতকে বাঁচাতে, চরম হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতেও টিপুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আশার দীপ জ্বেলে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রত্যয়ের হিমালয় হয়ে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলো। গাদ্দারদের প্রাচূর্যের সেই সময়টিতে জীবনোৎসর্গীদের সংখ্যাও খুব একটা কম ছিলো না।

মহিসুরের ইতিহাস ও টিপু সুলতানের জীবনীতে হয়তো তাদের অবদানের যৎকিঞ্চিত ফুটিয়ে তোলা যাবে। নয়তো তাঁদের প্রত্যেকের অবদান এতোটাই বিশাল ও ব্যাপক যে, তাদের ওপর পৃথকাকারে গ্রন্থ রচনা না করা পর্যন্ত সেই সোনালি অবদানের যথাযথ হক আদায় হবে না। মহিসুরের কৃতিসন্তান শ্রদ্ধেয় ডক্টর শফী আহমদ শরীফ সাহেব স্বাধীনতা আন্দোলনে টিপু সুলতানের বিশ্বস্ত সঙ্গী 'মালিক জাহাঁ খান'-এর জীবনালেখ্যের ওপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে তাঁর উজ্জ্বল অবদান জাতির সামনে মেলে ধরেছেন। সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে অপরাপর মরণজয়ী সঙ্গীদের অনন্য ইতিহাস মানবতার সামনে তুলে ধরা দরকার। আমরা কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে সুচয়িত কয়েকজন জীবনোৎসর্গীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গের সামনে পেশ করছি। সন্দেহ নেই, আলোচিত বীরপুরুষদের প্রত্যেকেই ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন।

১. বুরহানুদ্দীন

লালা মিয়া শহীদ চরকোটির সঙ্গে ১৭৫৪ সালে নবাব হায়দার আলীর ভাই সাইয়্যেদ শাহবাযের মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিলো। পরবর্তীকালে এই লালা মিয়ার কন্যা এবং বুরহানুদ্দীনের বোন রুকাইয়া বানুর সঙ্গে টিপু

www.boimate.com

সুলতান পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কাজেই বুরহানুদ্দীন সম্পর্কে টিপু সুলতানের শ্যালক ছিলেন। টিপুর শাসনামলে তিনি মহিসুর সেনাবাহিনীর সিপাহসালারের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই গুটিকয়েক সদস্যের একজন, যারা টিপু সুলতানের যাবতীয় গোপন কথা জানতেন। অর্থাৎ তিনি টিপুর একান্ত আস্থাভাজনদের একজন ছিলেন। তিনিই ১৭৮৪ সালে সর্বপ্রথম মীর কমরুদ্দীন কর্তৃক টিপুর বিরুদ্ধে হায়দারাবাদের নিযামের সঙ্গে চিঠি চালাচালির বিষয়টি উদ্ঘাটন করেছিলেন। তিনি যে টিপুর জন্যে জীবনোৎসর্গী ছিলেন, সে কথা জাতীয় গাদ্দাররা ভালোভাবেই জানতো। যার কারণে সালতানাতে খোদাদাদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা গোপন ষড়যন্ত্রে তারা তাকে কোনোদিন অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেনি।

টিপু সুলতান চেয়েছিলেন, তার এই শ্যালকের ঘরে সালতানাতের সম্ভ্রান্ত গোত্র আহলে নাওয়ায়েতের কোনো কন্যাকে বউ করে আনবেন। এজন্যে তিনি তার উযির বদরুজ্জামান খান নায়েতার কন্যাকে নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে সেই বিবাহ সম্পন্ন হয়নি। এটিকে বুনিয়াদ বানিয়ে কিছু লোক আহলে নাওয়ায়েতকে সুলতানের চোখে বিরাগভাজন বানানোর চেষ্টা করেছিলো। তারা অভিযোগ তুলেছিলো যে, আহলে নাওয়ায়েত উচ্চবংশীয় হওয়ার দেমাগে এই প্রস্তাব কানে তোলেনি। অথচ খোদ টিপু সুলতানের এক স্ত্রী ছিলেন নাওয়ায়েত-কন্যা। এমনকি টিপুর দাদা ফতেহ মুহাম্মদও নাওয়ায়েত পরিবারে বিয়ে করেছিলেন। কাজেই যখন এই গোত্রের সঙ্গে পূর্ব থেকেই রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে এটিকে বুনিয়াদ বানিয়ে বদরুজ্জামান খান কর্তৃক এই প্রস্তাব ঠুকরে দেওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি বোধগম্য হচ্ছে না।

বুরহানুদ্দীন অত্যন্ত সাহসী ও অমিতচেতা বীর অফিসার ছিলেন। শাহনুরে মহিসুরের বাহিনী জয়লাভ করার পর তারই নেতৃত্বে টিপু সুলতানের সৈন্যদল মিসরিকোটা ও বাঙ্গাপুরা জয় করেছিলো। ১৭৮৯ সালে যখন কলকাতা থেকে আগত ইংরেজ ব্যাটেলিয়ান ওয়াম্বাড়ি নগরী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলো তখন তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে টিপু সুলতান বুরহানুদ্দীনের নেতৃত্বে একদল চৌকস সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যে সাড়ে তিন শ ইংরেজ সৈন্য গ্রেফতার করতে সমর্থ হন।

www.boimate.com

যখন জেনারেল ম্যাথুজ তার পরাজিত বাহিনীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এখানে পৌঁছে তখন বুরহানুদ্দীন তাকেও নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়ে। যার ফলে সে ত্রিচন্নোপল্লি পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই যুদ্ধেই রাতের অন্ধকারে যখন মহিসুর বাহিনী ইংরেজদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলো তখন অকস্মাৎ শত্রুদের ছোড়া একটি গুলি বুরহানুদ্দীনের শরীরে বিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলেই এই জানবায মর্দে মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।

ওই সময় টিপু সুলতান বেদনুরে ছিলেন। তার লাশ যখন পালকিতে চড়িয়ে সুলতানের সামনে রাখা হয় তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুলতানের দু' চোখ বেয়ে তপ্তাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় সুলতান এতোটাই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে, অন্যান্য অফিসার ও পদস্থ কর্মকর্তাদের জোর পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি আর শত্রু পক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করেননি। যার ফলে ইংরেজ ফৌজ অনায়াসে মাদ্রাজ পৌঁছুতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে বুরহানুদ্দীনের শাহাদাতের ফলে সুলতানের ভেঙ্গে পড়ার কারণে মহিসুর বাহিনী বিজয়ে দোড়গোড়ায় পৌঁছেও থমকে গেলো।

২. সাইয়্যেদ আবদুল গাফফার

তিনি প্রথমে মাদ্রাজে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাসদস্য ছিলেন। ১৭৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে গ্রেফতার করে শ্রীরঙ্গাপত্তনামে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু খুব দ্রুত সুলতান তাকে মুক্ত করে দেন। তখন তিনি সুলতানের অধীনে চাকুরিতে যোগদান করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত যোদ্ধা হিসেবে তিনি মহিসুর সেনাবাহিনীর সিপাহসালারের দায়িত্ব পালন করে যান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি 'মীরে মীরাঁ' গোটা সালতানাতে সুলতানের পক্ষ থেকে শুধু তিনিই পেয়েছেন। জীবনভর তিনি এমন অস্বাভাবিক অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন যে, তার প্রতি সুলতানের প্রগাঢ় সম্প্রীতি গড়ে ওঠেছিলো।

ইংরেজ ও মারাঠি সৈন্যদেরকে প্রতিহত করার জন্যে সাধারণত তার নেতৃত্বেই মহিসুর বাহিনী প্রেরিত হতো। শাহাদাতের কয়েক দিন পূর্বে ইংরেজ তোপখানার ক্রমাগত গোলা বর্ষণের ফলে রাজধানীর কেল্লায় যখন বড় আকারের ফোকর দেখা দেয় তখন সর্বপ্রথম তিনিই বিষয়টি সুলতানের নজরে এনেছিলেন। যার ফলে সেই ফোকরের ওপর একদল

www.boimate.com

চৌকস সেনাকে সার্বক্ষণিক প্রহরার দায়িত্ব নিয়ে নিয়োজিত করা হয়। গাদ্দার পুর্নিয়া প্রথমে অন্যান্য সিপাহিদের সঙ্গে তাঁকেও সেখান থেকে সরিয়ে মসজিদে আলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি যখন তার চেষ্টা এড়িয়ে গেলেন তখন মীর সাদেক তাকে অন্য কৌশলে সরানোর চেষ্টা করলো। তাকে বললো, তুমি এখুনি সুলতানের কাছে গিয়ে তাকে শত্রুবাহিনীর আক্রমণের সংবাদ জানাও।

সাইয়্যেদ আবদুল গাফ্ফার সুলতানকে সংবাদ জানিয়ে ফিরে এলে মীর মুঈনুদ্দীন রৌদ্রের বাহানা দিয়ে তার ওপর একটি ছাতা মেলে ধরে। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে যা মূলত ইংরেজদের প্রতি এ ইঙ্গিত ছিলো যে, ছাতার নিচের লোকটির ওপর গোলা বর্ষণ করো। কারণ, এই সেই আবদুল গাফ্ফার, যে আমাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন ইংরেজ বাহিনী তার দিকে তোপ তাক করে। অনবরত গোলাবৃষ্টির একটি সরাসরি তার শরীরের ওপর বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে তিনি কেল্লার সেই দক্ষিণাংশে শাহাদাত বরণ করেন, যেদিক দিয়ে কিছুক্ষণ পরই ইংরেজ সৈন্যরা অনুপ্রবেশ করে। তার শাহাদাতের সংবাদ শুনে টিপু সুলতান নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। অথচ ওই সময় সুলতান খাবার খাচ্ছিলেন। তার হাতে এক লোকমা খাবার ছিলো। তিনি খাবার ওভাবে রেখেই ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর হামলে পড়েন। এই বিশ্বস্ত সঙ্গী ও মরণজয়ী দেশপ্রেমিকের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর সুলতান নিজেও শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন।

৩. মুহাম্মদ রেযা খান

সম্পর্কে তিনি ছিলেন নবাব হায়দার আলীর মামা ইবরাহীম আলী খান সাহেবের ছেলে। মহিসুরের সেনাবাহিনীতে বারুদ ডিপার্টমেন্টের কমান্ডার ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (মীরে মীরাঁর কাচারি)-এর উর্ধ্বতন অফিসার ছিলেন। তাকে 'বাক্কী নবাব'-ও বলা হতো। অকুতোভয় যোদ্ধা ও জানবায সিপাহি ছিলেন। মার্চ ১৭৯৯ সালের শেষ যুদ্ধে কোর্গ (Coorg) রণাঙ্গনে মালোলি (গুলশানাবাদ)-এ ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করাবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। ওই সময় তার ছেলেও রাজধানীতে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো।

www.boimate.com

৪. গোলাম খোদাদাদ

তিনি ছিলেন টিপু সুলতানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার। মূলত পাঞ্জাব নগরীর অধিবাসী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘ দিন মহিসুর সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। জীবনোৎসর্গী, একনিষ্ট সৈনিক ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সুলতানের সঙ্গে ছায়ার মতো জড়িয়ে ছিলেন। তিনি সুলতানকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সুলতানের শাহাদাতের মাত্র আধাঘণ্টা পূর্বে ঠিক সেই স্থানেই শাহাদাত বরণ করেন, যেখানে সুলতান নিজেও শহীদ হয়েছিলেন।[৭৩]

৫. মালিক জাহাঁ খান

এই জানবায যোদ্ধার আলোচনা ইতোপূর্বে 'মারাঠা যাযাবরের ইসলাম গ্রহণ' শিরোনামের অধীনে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি ছিলেন চঙ্গিরি নগরীর অধিবাসী নওমুসলিম মারাঠা সিপাহি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিলো ধোন্ধিয়াবাগ। ১৭৮০ সালেই মহিসুর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৯২ সালে ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে তিনি ক'জন সঙ্গী সমেত কিছু জিনিসপত্র নিয়ে লক্ষীওয়ার পালিয়ে যান। যেখানে পরবর্তীকালে তিনি নিজের সঙ্গে ৪০০ সিপাহিকে জড়ো করেছিলেন।

মারাঠারা ধারওয়ার (Dharwar) নগরী দখল করে ফেললে তিনি সেখানে লুটতরাজ শুরু করে দেন। তাকে প্রতিহত করার জন্যে পুনা থেকে ২ হাজার সিপাহি পাঠানো হয়েছিলো। যার ফলে তাকে সরে আসতে হয়। ১৭৯৫ সালে টিপু সুলতান কর্তৃক স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ক্ষমার ঘোষণা পেয়ে তিনি দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন এবং তার আনুগত্য স্বীকার করেন।

সুলতান যখন তার সাহসিকতার বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ণ করে তাকে মহিসুর বাহিনীর কমান্ডারের পদে নিয়োগ দেন তখন তিনি টিপুর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। টিপু সুলতান তখন তার নাম 'শেখ আহমদ' রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে 'মালিক জাহাঁ খান' নামে সম্বোধিত হতে পসন্দ করতেন। পরবর্তীকালে তার এ নামটাই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

---

৭৩. সহীফায়ে টিপু সুলতান।

www.boimate.com

সুলতান তাকে আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। যার কারণে মীর সাদিক সহ অন্যরা তাকে হিংসা করতো। একবার মীর সাদিক তার বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে রাজদ্রোহের অভিযোগ তোলে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বন্দী করা হয়। সুলতান তাকে মুক্তি দিতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু মীর সাদিক ও পুর্নিয়ার পীড়াপীড়ির কারণে তিনি মুক্তি দিতে পারেননি। সুলতান তার দৈনন্দিন খরচ হিসেবে তিন রুপি করে দেওয়ার নির্দেশও জারি করেন। এমনকি তার হাতে একটি মন্ত্রণালয়ের প্রধানের পদ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও ব্যক্ত করেন। কিন্তু হিংসুকের দল তার বিরুদ্ধে আরও নতুন কিছু অভিযোগ উপস্থাপন করে তাকে যথারীতি কারারুদ্ধ করে রাখে।

মালিক জাহাঁ খান জানতেন, সুলতান অপরাগ হয়েই তাকে এখানে নজরবন্দি করে রেখেছে। এজন্যে শ্রীরঙ্গপত্তনাম পতনের পর তিনি কোনো মতে সেখান থেকে পালিয়ে 'কারীঘাট'-এর পর্বতে অবস্থানরত বড় শাহযাদা ফতেহ হায়দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি শাহযাদাকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ওপর যথাসাধ্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু তার এই উপর্যপুরি অনুরোধ সত্ত্বেও ফতেহ আলী হায়দার বেশ কিছু কারণ ও বাধ্য-বাধকতার কাছে হার মেনে রাজধানীতে ফিরে ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

মালিক জাহাঁ খান ফতেহ আলী হায়দারের মতো আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেননি। তিনি তুঙ্গভদ্রার আশপাশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। খুব দ্রুত তার নেতৃত্বে মহিসুর বাহিনীর বিশ্বস্ত সৈনিকেরা জড়ো হতে থাকে। যাদের সংখ্যা চোখের পলকে ২৫ হাজারে উন্নীত হয়। তিনি মারাঠিদের বিরুদ্ধেও প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান। মিরিচের মারাঠি সর্দার 'পরশুরাম' ও 'ঘোখলে'-কে খতম করেন। যার ফলে সে ইংরেজদের চোখে মূর্তমান আতঙ্ক হয়ে ওঠে। তারা ভয় করে যে, এই অকুতোভয় জানবাযের অভিযান এভাবে চলতে থাকলে শিগগিরি তাদের হাতে মহিসুরের হারানো সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন হতে পারে।

সেমতে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে তার ভাই কর্নেল ওয়েলেসলির নেতৃত্বে তাকে দমন করার জন্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। সে বছরই ওয়েলেসলি মহিসুরের উত্তরাঞ্চলে তার ওপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। তার বাহিনীতে কাডাপ্পা (Kadapa) ও কারনোল (Kurnool)-এর কিছু পাঠান সৈন্য ছিলো। এদের গাদ্দারির

www.boimate.com

কারণে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে 'কোঠাল ভানওয়ার' নামক স্থানে দেশপ্রেমে বলিয়ান এই শেষ মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক অবশেষে শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন।[৭৪] তার সম্পর্কে অধিকতর জানতে ডক্টর শফী' আহমদ শরীফ-এর রচনা 'শহীদে আযাদী' অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

৬. শায়খ ইসমাঈল

তিনি মহিসুর সেনাবাহিনীর এগারো জন সিপাহসালারের একজন ছিলেন। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের দিন অর্থাৎ ৪ মে যখন সুলতানের বিশ্বস্ত ও জীবনোৎসর্গী অফিসার সাইয়্যেদ আবদুল গাফফার দ্বিপ্রহরে কেল্লার ফোকরের কাছে শাহাদাত বরণ করেন তখন কেল্লার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থানরত সৈন্যদের নেতৃত্বভার তার ওপর বর্তায়। পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও তিনি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। সাইয়্যেদ আবদুল গাফফারের দেখানো পথ ধরে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর তিনিও অগণিত ইংরেজ সৈন্যকে খতম করে একপর্যায়ে ক্লান্ত-বিক্ষত শরীরে শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন।

৭. মুহাম্মদ আলী

তিনি প্রথম থেকেই নবাব হায়দার আলীর ফৌজে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে টিপু সুলতান তাকে পদোন্নতি দিয়ে সিপাহসালার মনোনীত করেন। সুলতানের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও তার জন্যে জীবনোৎসর্গী ছিলেন। সাহসিকতা ও বীরত্বের গুণের কারণে সুলতানও তাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। খানিকটা জিদ্দি ধরনের লোক হওয়ার কারণে নবাব হায়দার আলী একবার তাকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সালতানাতের প্রতি তার একনিষ্ঠতা ও শতভাগ বিশ্বস্ততার কারণে খুব দ্রুত তিনি তার পুরনো পদে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। গরিব মানুষের সেবা করতে ভালোবাসতেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তিনি যে অংশ পেতেন তা তৎক্ষণাৎ গরিব-দুখীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।

---

[৭৪]. ডক্টর শফী আহমদ শরীফ রচিত 'শহীদে আযাদী'।

www.boimate.com

হায়দার আলীর মৃত্যুর পর যখন কিছু লোক টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার তোড়জোড় শুরু করেছিলো, তখন তিনিই মেধা ও কৌশল অবলম্বন করে তাদের গ্রেফতার করে জেলাখানায় প্রেরণ করেন। নবাব হায়দার আলীর পালকপুত্র 'আয়ায খান' যখন বেদনুর (হায়দারনগর)-এ ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজশ করে কোনো ধরনের প্রতিরোধ যুদ্ধ ছাড়াই স্থানীয় কেল্লা মুম্বাই থেকে আগত ইংরেজ সৈন্যদের হাতে তুলে দেয় তখন তার নেতৃত্বেই মহিসুর বাহিনী সেই কেল্লাটি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

হায়দারনগরের কেল্লারক্ষী মুহাম্মদ কাসেম খানকে দেশবিরোধী চক্রান্তের অভিযোগে যখন টিপু সুলতান ফাঁসি ঘোষণা করেন তখন পুরনো বন্ধুত্বের জের ধরে তিনি একদিকে সুলতানের কাছে তার জন্যে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন, অন্যদিকে নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যবহার করে জল্লাদদেরকে ফাঁসির কার্যক্রম স্থগিত রাখতে বাধ্য করেন। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টির অপরাধে সুলতান তাকে কিছু দিন নজরবন্দি করে রাখেন। যার কারণে মনঃক্ষুন্ন হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর কারণে টিপু সুলতান আফসোস করেছিলেন। তিনি তার বিধবা স্ত্রী ও ইয়াতিম সন্তানদেরকে রাষ্ট্রীয় খরচে প্রতিপালনের সুবন্দোবস্ত করেন। সুলতান জীবনভর এ আক্ষেপ করতেন যে, লোকটি সবসময় সুলতানের বিশ্বস্ত ছিলেন। স্রেফ তার জিদ-ই তাকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছে।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাদের রচনাবলির মাঝে তাকে সুলতানের সঙ্গে গাদ্দারিকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। যদি বাস্তবেই তাই হতো তাহলে মুহাম্মদ কাসেম খানের সঙ্গে কেন সুলতান তাকেও ফাঁসি দিলেন না? এবং তার মৃত্যুর পর সুলতান কেন তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের যিম্মাদারি বহন করলেন? এথেকে বুঝে আসে যে, বাস্তবে তিনি টিপুর হীতাকাঙ্ক্ষী-ই ছিলেন। এবং সুলতানও তাকে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত মনে করতেন। কাসেম খানকে বাঁচাতে তার এই প্রাণান্ত প্রচেষ্টা স্রেফ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের খাতিরে করেছিলেন। সন্দেহাতীতভাবে এর পেছনে তার মনে সামান্যতম কুমতলবও ছিলো না।

www.boimate.com

৮. সাইয়্যেদ হামেদ

তিনি ছিলেন টিপু সুলতানের সেই বিশেষ সামরিক কর্মকর্তাদের একজন, যাদের প্রতি সুলতান সবচেয়ে বেশি আস্থা রাখতেন। যার কারণে ইংরেজরাও তাকে কেনার চেষ্টা করেনি। তিনি সবসময় যুদ্ধের ময়দানে সুলতানের সঙ্গে ছায়ার মতো সেপ্টে থাকতেন। ১৭৮৩ সালে মানযারাবাদের রাজা যখন বিদ্রোহ করে বসে, তখন তাকে দমন করার ক্ষেত্রে গৃহিত যাবতীয় পদক্ষেপ তাঁর সজ্ঞাতেই নেয়া হয়েছিলো।

১৭৯২ সালে ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে রাজধানীকে শত্রুমুক্ত রাখার সংগ্রামে চার শতাধিক সঙ্গী সহ তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শ্রীরঙ্গাপত্তনামে টিপু সুলতানের মাকবারার চত্বরে তাঁর কবর এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

৯. লালা মাহতাব রায় সাবকাত

তিনি ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত কেরাণী ও একান্ত আস্থাভাজনদের একজন। উরদূ-ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বরাবর টিপু সুলতানের প্রেরীত চিঠি-পত্রের খসড়া লিপি সাধারণত তিনিই প্রস্তুত করতেন। সবসময় যুদ্ধের ময়দানে টিপু সুলতানের সঙ্গে অবস্থান করতেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি সুলতানের প্রতি আস্থাভাজন ছিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী চারণ কবি ছিলেন। টিপু সুলতানের প্রশংসা ও স্তুতি গিয়ে তিনি অনেক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন।

১০. নবাব হুসাইন আলী খান

তার পুরো নাম, হুসাইন আলী খান ইবনে কুতবুদ্দীন খান। সুদর্শন ও দৃষ্টিনন্দন অঙ্গ-সৌষ্ঠবের অধিকারী ছিলেন। তাকে মহিসুর সেনাবাহিনীর অন্যতম বীর-বাহাদুর যোদ্ধা গণ্য করা হতো। যোগ্যতা ও দেশপ্রেমের স্বা ক্ষর রেখে একপর্যায়ে সেনাবাহিনীর সিপাহসালার মনোনীত হন। তাঁর অধীনে পনেরো হাজার সদস্যের একদল সৈন্য জরুরী অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যে সবসময় প্রস্তুত থাকতো।

টিপু সুলতানের আরেক আস্থাভাজন অফিসার শায়খ আমরের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়।

www.boimate.com

বিস্ময়ের বিষয় হলো, শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের মাত্র দু' দিন আগে অর্থাৎ ২ মে ১৭৯৯ সালে যখন শত্রুপক্ষের মিত্র বাহিনী রাজধানী অবরোধ করে আছে, চারপাশে শত্রুপক্ষের একের পর এক গোলা বৃষ্টির ফোঁটার মতো অনবরত বিস্ফোরিত হচ্ছে, এমন ঘণঘটার ভেতর দিয়েও খোদ সুলতানের উপস্থিতিতে রাজপ্রাসাদে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। একদিকে ঘরে সদ্য আগত নববধু ফুলেল শয্যায় অপেক্ষা করছে, অন্যদিকে সুলতানের জীবন ও দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার সংগ্রামে অংশগ্রহণের দায়িত্ববোধ। কোনদিকে যাবেন এই যুবক অফিসার! ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধের এই টানাপোড়েনে অবশেষে নবাব হুসাইন আলী খান নবপরিণীতার ভালোবাসা উৎসর্গ করলেন দায়িত্ববোধের চরণে। হৃদয়ে পাথর বেঁধে নেমে গেলেন সংগ্রামের আলোহীন সুরঙ্গে।

৪ মে ১৭৯৯। ইতিহাসের সেই কালো দিন। যেদিন একদল গাদ্দারের শঠতার কাছে পরাজিত হয়েছিলো শ্রীরঙ্গাপত্তনাম। টিপু সুলতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও সেদিন মরণকামড় দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাতৃভূমি রক্ষার সর্বশেষ সংগ্রামে। যুদ্ধের একপর্যায়ে ইংরেজ-শিবির থেকে ধেয়ে আসা একটি গোলা যুবক নবাব হুসাইন আলী খানের পায়ের কাছে বিস্ফোরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে লুটিয়ে পড়ে। জীবনের অনাঘ্রত সুখের পিপাসা বুকে রেখেই তিনি শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন।

স্বামীর সঙ্গে মাত্র একদিনের দাম্পত্য জীবন তাঁর নবপরিণতা স্ত্রী জীবনভর ভুলতে পারেননি। বাহাদুর স্বামীর গর্বজাগানিয়া স্মৃতি ধারণ করেই তিনি অবশিষ্ট জীবন বৈধব্যের শাড়ি পরে কাটিয়ে দেন। সঙ্গী হারানোর দুঃসহ স্মৃতির অবর্ণনীয় দহন বুকের ভেতর ককিয়ে ওঠতো, বলেই আর কোনো দিন বিয়ের পিড়িতে বসেননি। ৪ মে ১৭৯৯ থেকে তার চোখে সেই যে অশ্রুঝরা শুরু, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই অশ্রুর দাঁগ আর শুকোয়নি।

স্মর্তব্য যে, কাকতালীয়ভাবে টিপু সুলতানের একমাত্র জামাতার নামও 'হুসাইন খান'। যিনি ১৮১০ ঈসাব্দে ইনতিকাল করেন। কিছু লোক ভুলবশত তাদের দু'জনকে একজন মনে করে। বাস্তবে যা সঠিক নয়।

www.boimate.com

১১. শায়খ মিরন

তিনিও মহিসুর সেনাবাহিনীর একজন অকুতোভয় অফিসার ছিলেন। ১৭৯০ সালে সুলতানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় সতীমঙ্গল রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করেন। এখনও শ্রীরঙ্গাপত্তনামে তার কবর বিদ্যমান রয়েছে।

১২. মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন

মহিসুর বাহিনীর সিপাহসালারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সুলতানের প্রতি আস্থার মর্যাদা দিয়ে গেছেন। ১৭৯৯ সালের ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে রাজধানী অবরোধের কিছু দিন পূর্বে ৬ মার্চ 'সদাসীর' নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এক পর্যায়ে মারাত্মক আহত হন। তারপরও তিনি সুলতানের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। ৪ মে সুলতানের পাশে থেকে লড়াই করাবস্থায় কেল্লার ভেতরেই শাহাদাত-সুধা পান করেন।

১৩. খাজা আফতাব খান

তিনি মহিসুর সেনাবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। ইঙ্গ-মহিসুরু তৃতীয় যুদ্ধের পূর্বে একটি অভিযানে ৪ সেপ্টেম্বর ১৭৯০ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাবস্থায় 'সতী মঙ্গল' নামক স্থানে শেখ মিরনের সঙ্গে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। শ্রীরঙ্গাপত্তনামে টিপু সুলতান করবস্থান চত্বরে তাঁর কবর এখনও অতীত গৌরবের স্মারক হয়ে বিদ্যমান আছে।

১৪. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান

সদ্য আলোচিত দুই জানবাযের মতো তিনিও মহিসুর সেনাবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। তাদের দু'জনের পাশাপাশি তিনিও ১৭৯০ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় 'সতীমঙ্গল' রণাঙ্গনে শাহাদাতের গৌরব লাভ করেন। তার মাযারও শ্রীরঙ্গাপত্তনামে অবস্থিত।

www.boimate.com

বদরুজ্জামান খান নায়েতা
ইতিহাসের রহস্য পুরুষ

তিনি ছিলেন মহিসুরের সম্ভ্রান্ত গোত্র 'আহলে নাওয়ায়েত' বংশোদ্ভূত। সালতানাতে খোদাদাদের অধীনে তিনি প্রথম বেদনুর (Bednore) [হায়দারনগর]-এর গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতেন। সুলতান তাঁকে আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। এ কারণে মীর সাদিক তাকে প্রচণ্ড হিংসা করতো। একবার তার ব্যাপারে কিছু মিথ্যা অভিযোগ তোলে তাকে বেশ ক'দিন নজরবন্দি করে রাখে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় তখন সুলতান তাকে শুধু মুক্তিই দেননি; বরং পদোন্নতি দিয়ে প্রশাসনের উর্ধ্বপদে নিয়োগ দান করেন।

তবে তার কিছু পদক্ষেপ, সুলতানকে দেওয়া তার কিছু পরামর্শের প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে কিছু লেখক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তিনি সুলতানের প্রতি কুমতলব পোষণ করতেন। নয়তো তার থেকে প্রকাশ্যে এমন কিছু পদক্ষেপ সংঘটিত হতো না, যা তাকে সুলতানের প্রতি অবিশ্বস্ত প্রমাণিত করে। তবে তার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যেই অভিযোগগুলো তুলেছেন, সেগুলোকে শক্তিশালী করার জন্যে তারা কোনো যুক্তি বা শক্ত উদ্ধৃতি পেশ করতে পারেননি। অধিকাংশ অভিযোগ লোককথা, জনশ্রুতি, বা স্থানীয় বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করিয়েছেন। আর এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, এ ধরনের অগৌণ ও দুর্বল বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত হয় না।

এ ধরনের অসমর্থিত সূত্রের বর্ণনা সর্বপ্রথম 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থের লেখক মীর হুসাইন আলী কিরমানী' উপস্থাপন করেছেন। আমরা তো এ দাবী তুলতে পারি না যে, সুলতানের সমবয়সী লেখক কিরমানী অশুভ ইচ্ছে থেকে, কিংবা ইংরেজদের সঙ্গে গোপন যোজসাজশ করে একটি ইসলামি, আরবি গোত্রের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটানোর চক্রান্ত হিসেবে এ কাজটি করেছেন। তবে এ কথা অবশ্যই সত্য যে, তার লেখা 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থটি টিপু সুলতানের ওপর যেকোনো ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ। তিনি সুলতানের শাহাদাতের পর ইংরেজদের নির্দেশে ও তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কলকাতায় বসে নজরবন্দি থাকাবস্থায় এ গ্রন্থটি সংকলন করেছিলেন। যার ফলে আবশ্যিকভাবে সেখানে ইংরেজদের

www.boimate.com

ইচ্ছে ও অভিপ্রায় অনুসারে সেখানে কিছু অসত্য বর্ণনা ও ঘটনা ঢুকে পড়েছে। সেই অনির্ভরযোগ্য-অসত্য বর্ণনাসমূহকে ভিত্তি বানিয়ে পরবর্তীকালে মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরি তার تاریخ سلطنت خداداد میسور [তারীখে সালতানাতে খোদাদাদ মহিসুর] বইয়ের মাঝে এ কথা প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন যে, গোটা আহলে নাওয়ায়েত ছিলো সুলতান ও সালতানাতে খোদাদাদের চরম শত্রু। এরাই মহিসুরের উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের পতনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে।

যেহেতু 'নিশানে হায়দারী' গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিলো। পরবর্তীকালে সুব্যবস্থার অভাবে সেটির পুনর্মুদ্রণ ও নতুন সংস্করণ বের করা যায়নি, যার কারণে শহীদ টিপু সুলতান সম্পর্কে পরবর্তীকালে যতোজনই কলম ধরেছেন, তাদের প্রত্যেকেই নিজ রচনার তথ্য-উপাত্ত মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরির লেখা تاریخ سلطنت خداداد میسور থেকেই সংগ্রহ করেছেন। যার ফলে অজ্ঞাতসারেই পরবর্তীকালের রচনাবলির মাঝে উক্ত গ্রন্থটির উদ্ধৃতিতে সেই অসত্য বর্ণনাগুলো স্থান পেয়েছে।

মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরি টিপু সুলতানকে কেন্দ্র করে আহলে নাওয়ায়েতকে সমস্ত মুসলমানের সামনে দোষী সাব্যস্থ করে তুলতে যেই ব্যক্তির রচনাবলি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি হলেন বিতর্কিত ইংরেজ লেখক কর্নেল ভিলিক্স। যাঁর দলান্ধতা ও ইসলামবৈরীতা দিবালোকের মতো সত্য।

মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরি নিজেও এ কথা বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি মানুষ নিজের কথা, কাজ ও ভুলের দায় ব্যক্তিগতভাবে নিজেই বহন করবে। ব্যক্তির দোষকে পুঁজি করে তার পরিবার ও গোত্রকে দোষী সাব্যস্ত করা কখনই ঠিক হবে না। যদি আমরা তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্যে এ কথা মেনে নিই যে, আদতেই বদরুজ্জামান খান নায়েতা বা মাহদী আলী খান নায়েতা গাদ্দার ছিলেন, অবিশ্বস্ত ছিলেন, তাহলে এর ওপর ভিত্তি করে মুসলিম উম্মাহর সামনে তাদের গোটা পরিবারকে দোষী ও গাদ্দার সাব্যস্ত করা কতোটুকু সত্যাশ্রিত হবে?

আহলে নাওয়ায়েতকে জড়িয়ে যতোগুলো অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেগুলো স্রেফ স্থানীয় জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হয়েছে। যেমন, মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরি তার গ্রন্থের এক স্থানে লেখেছেন যে, 'যখন ইংরেজরা কেল্লা অবরোধ করে তখন আহলে নাওয়াতের বিভিন্ন ঘর

www.boimate.com

থেকে ইংরেজ অফিসারদের কাছে পোলাও ও মিষ্টান্ন পাঠানো হয়েছিলো।' তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এগুলো স্থানীয় লোককথা মাত্র। এগুলোর পেছনে কোনো উদ্ধৃতি নেই। যদি মানবেতিহাস বা ইসলামের ইতিহাস সংকলন করার সময় শুধু আঞ্চলিক লোককথা ও জনতার মুখে মুখে চর্চিত বর্ণনাগুলোকে উৎস বিবেচনা করা হতো তাহলে ইতিহাসের ওপর পাঠকের একবিন্দু আস্থাও থাকতো না।

তিনি তার تاریخ سلطنت خداداد میسور গ্রন্থে এ ধরনের আরেকটি ঘটনা লেখেছেন যে, টিপু সুলতান তার শ্যালক বুরহানুদ্দীনের স্ত্রী হিসেবে বদরুজ্জামান খান নায়েতার মেয়েকে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বর আহলে নাওয়ায়েত বংশোদ্ভূত না হওয়ার কারণে সেই মেয়ে এই প্রস্তাবনাকে নিজের জন্যে অবমাননাকর মনে করে। এবং সে রাতেই সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। যাদের চোখের সামনে টিপু সুলতানের পূর্ণ জীবনালেখ্য রয়েছে, তাদের কারো পক্ষে এ ঘটনা বিশ্বাস করা অসম্ভব। কারণ, আহলে নাওয়ায়েত 'রাজপরিবারকে' নিজেদেরকে চেয়ে ছোট মনে করবে, বিয়ে-অযোগ্য মনে করবে, এটা কস্মিনকালেও সত্য হতে পারে না। টিপু সুলতান নিজেও আহলে নাওয়ায়েতে বিয়ে করেছেন। তাঁর এক স্ত্রী ছিলো নাওয়ায়েত বংশোদ্ভূত। টিপু সুলতানের দাদা ফতেহ মুহাম্মদ নিজেও নাওয়ায়েত পরিবারে বিয়ে করেছেন। নবাব হায়দার আলী টিপু সুলতানের চাচা সাইয়্যেদ শাহবাযের কন্যাকেও তরবিয়াত আলী খান নায়েতার এক ছেলের কাছে বিয়ে দিয়েছেন। এই বৈবাহিক সম্পর্কগুলো স্থাপিত হয়েছিলো টিপু সুলতান মহিসুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে। কাজেই যখন পূর্ব থেকেই আহলে নাওয়ায়েতের সঙ্গে টিপু সুলতানের বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে এখন সেই রাজ-পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াটা আহলে নাওয়ায়েত নিজেদের জন্যে অবমাননাকর মনে করবে, এ কথা কখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, আহলে নাওয়ায়েতের মতো টিপু সুলতানের পারিবারিক বংশলতিকা আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গোত্র কুরাইশের সঙ্গেই মিলিত হয়। সুলতান যদি সামষ্টিকভাবে আহলে নাওয়ায়েতের প্রতি আস্থা না রাখতেন তাহলে তিনি কখনই তার প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ধর্মীয় ও সামরিক পদে তাদের কাউকে মনোনীত করতেন না।

www.boimate.com

ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে যখন ইংরেজরা রাজধানী অবরোধ করে রেখেছিলো তখন ফরাসিরা টিপু সুলতানকে চিত্রাদুর্গ (Chitaldroog) যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তখন বদরুজ্জামান খান এ কথা বলে সুলতানকে থামিয়ে দেন যে, 'এসময় আপনি চলে গেলে গোটা বাহিনীতে হতাশা ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই সামরিক কর্মকৌশলের বিবেচনায় আপনার এখানে অবস্থান করা অত্যন্ত জরুরী'। বিনা প্রমাণে তার এই পরামর্শকে কেন আমরা তার মনের অশুভ চিন্তাপ্রসূত অভিহিত করবো! তিনি যখন এ পরামর্শ দিয়েছিলেন তখনকার প্রেক্ষাপটে তা কোনো অবাস্তব পরামর্শ ছিলো না। সুলতান নিজেও তার সেই পরামর্শ যৌক্তিক বিবেচনা করে চিত্রাদুর্গ যাওয়ার পূর্বসিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছিলেন। হ্যাঁ, এ জাতীয় কিছু খুঁত থেকে যাওয়ার কারণে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে, বদরুজ্জামান খান নায়েতা বাস্তবেই সুলতানের প্রতি আন্তরিক ও তাঁর সীমাহীন কল্যাণকামী ছিলেন। কিন্তু যতোক্ষণ না তার বিরুদ্ধে গাদ্দারির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে, তার আগে তাকে গাদ্দার অভিহিত করাটা ইসলামি নৈতিকতা ও সাম্যবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচিন নয়।

আর টিপু সুলতান তাকে একবার নজরবন্দি করার যেই ঘটনাটি ঘটেছে, সে সম্পর্কে ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে, ব্যক্তিগত শত্রুতা ও আক্রোশ থেকেই মীর সাদিক এই কূটচাল চালিয়ে ছিলো। এমন কাজ শুধু তার বিরুদ্ধে আরও অনেকের বিরুদ্ধেও করেছে। ইতোপূর্বে 'মালিক জাহাঁ খান'-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে সুলতানকে দিয়ে শাহাদাতের আগপর্যন্ত দীর্ঘ দিন তাকেও বন্দি রেখেছিলো। নিজের ক্ষমতা ও দাপটের অবৈধ ব্যবহার ঘটিয়ে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঝাল মেটাতে এমন অনেকের সঙ্গেই সে অনৈতিক আচরণ করেছে। কাজেই অতীতের কোনো সময় নজরবন্দি করে রাখার ঘটনাকে পুঁজি করে তাকে সুলতানের গাদ্দারদের তালিকায় ফেলা বাস্তবাশ্রিত নয়।

তর্কের খাতিরে যদি তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে মেনেও নিই, কিন্তু স্রেফ এ যুক্তিতে তার গোটা গোত্রকে অপরাধী সাব্যস্ত করাটা কখনই নৈতিকতা ও ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচিন হতে পারে না।

www.boimate.com

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীরঙ্গপত্তনম পতনের নেপথ্য কারণ এবং মুসলিমবিশ্ব ও ভারতবর্ষের ওপর তার প্রভাব

www.boimate.com

সালতানাতে খোদাদাদের পতনের নেপথ্য কারণ

শহীদ টিপু সুলতান রহ. যদিও ১৭৯৯ সালের ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন এবং শেষতক ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকে গিয়েছিলেন; কিন্তু তার সেই পরাজয় ও ব্যর্থতা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকে এতোটুকুনও ক্ষুণ্ন করেনি। সালতানাতে খোদাদাদের পতনকে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ দুর্ঘটনা বিবেচনা করা হয়। কারণ, এর প্রভাব শুধু হিন্দুস্তানের ভৌগলিক রাজনীতিতে সীমিত থাকেনি; আঞ্চলিকতার সীমা ডিঙ্গিয়ে তার প্রভাব তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও পড়েছে। বিশেষত মুসলিম জাহানের ওপর তা বিশাল ক্ষত সৃষ্টি করে। টিপু সুলতানের শাহাদাতের পর ইংরেজ শিবির উল্লাস করে বুক চাপড়ে প্রথমবারের মতো বলে ওঠে— 'আজ থেকে হিন্দুস্তান আমাদের'।

নয়তো এর আগে হিন্দুস্তানের কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড ইংরেজদের দখলে চলে গিয়েছিলো। তখনও তাদের 'হিন্দুস্তান আমাদের' দাবী তোলার দুঃসাহস হয়নি।

কোনো ঐতিহাসিক যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে সংকলন করার ইচ্ছে করেন, বা টিপু সুলতানের ওপর কোনো গবেষক যদি অধিকতর গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাকে অবশ্যই টিপু সুলতানের পরাজয়ের কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে। তাকে অবশ্যই সেই প্রেক্ষাপট ও কার্যোকারণগুলো গবেষণার দর্পণে তুলে আনতে হবে, যার পরিণতিতে এতো বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিম্নে আমরা শ্রীরঙ্গাপত্তনামের প্রেক্ষাপটে গিয়ে সেই কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। আশা করি, এর আলোকে পাঠকবর্গ শহীদ সুলতানের পরাজয় ও ইংরেজদের বিজয়ের রহস্য বুঝতে সক্ষম হবেন। তবে আমরা ইংরেজদের সঙ্গে নিযাম ও মারাঠাদের জোট গঠন বা এ-জাতীয় বাহ্যিক কারণ নিয়ে আলোচনা করবো না; বরং এর অভ্যন্তরীণ কারণ এবং রাষ্ট্র ও সুলতানের অন্তর্গত বিষয়গুলো নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করবো।

www.boimate.com

১. ঘরের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা

সাধারণত ঐতিহাসিকগণ সালতানাতে খোদাদাদের পতনের সবগুলো কারণের মধ্যে এটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কারণটি টিপু সুলতানের শাহাদাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতনের ক্ষেত্রে এ কারণটিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। ইংরেজরা নিজেদের বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্যে সবচেয়ে বেশি এই গাদ্দারদের গাদ্দারির ওপরই নির্ভর করেছিলো।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহিব্বুল হাসান সাহেব তার গবেষণায় এ কথা প্রমাণিত করেছেন যে, গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ওই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে রীতিমত একটি কমিশন গঠন করেছিলো। যার সদস্য ছিলো, ক্যাপ্টেন ম্যালকম, ক্যাপ্টেন ম্যাকিলে, কর্নেল ক্লোজ ও কর্নেল ইগনু প্রমুখ। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিলো, টিপু সুলতানের বিভিন্ন উযির ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাকে ক্রয় করা; সম্পদ, প্রাচুর্য ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাদের পক্ষে নিয়ে আসা এবং সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় উস্কানি ছড়িয়ে সুলতানের প্রতি তাদের মনে ক্ষোভ তৈরি করা। এমনকি কমিশনকে এ দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিলো যে, তারা মহিসুরের সাবেক হিন্দু রাজার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

টিপু সুলতান যেই মাহদুভীদেরকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন, ওই কমিশন তাদেরকে ইংরেজদের অশ্বারোহী বাহিনীতে ভর্তি করিয়ে নেয়। মহিসুরের কিছু পথচ্যুত সন্তানের অবিশ্বস্ততা, গাদ্দারি, চক্রান্ত, অকৃতজ্ঞতা, বিবেকবিলোপ ও ঈমান বিক্রির পূর্ণ বিবরণ আমরা পেছনের অধ্যায়গুলোতে বিশদাকারে আলোচনা করেছি। কাজেই এ মুহূর্তে এ বিষয়ে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

২. কোমল মনোবৃত্তি ও অধীনস্থদের ওপর সীমাতিরিক্ত আস্থা

শহীদ টিপু সুলতান রহ. তাঁর পিতা নবাব হায়দার আলীর তুলনায় কোমল ছিলেন। সেই কোমল হৃদয় এবং নিজ উযির ও দরবারিদের প্রতি সীমাতিরিক্ত নির্ভরতার কারণেই তাকে এমন নিদারুণ দিনের মুখোমুখি

www.boimate.com

হতে হয়েছিলো। শত্রুপক্ষের চক্রান্ত সফল হওয়ার এটি অন্যতম কারণ বটে। তারা তার হৃদয়ের উদারতার অপব্যবহার করেছে। টিপু সুলতান বিভিন্ন সময় মীর সাদিক, পুর্নিয়া, মীর কমরুদ্দীন ও মীর মুঈনুদ্দীনের অশুভ তৎপরতার আভাষ পেয়েছিলেন। এমনকি এদের অনেককে তিনি দণ্ড হিসেবে পদচ্যুতও করেছিলেন। কিন্তু তাদের তোষামুদে কথা, প্রতারণা ও শঠতার কারণে তিনি ঠিকমতো ঠাওরে উঠতে পারেননি। তারা যখন সুলতানের সামনে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নানাভাবে সুলতানকে খুশি করতে সমর্থ হয় তখন সুলতান তাদের অতীতের যাবতীয় অপরাধ মার্জনা করে তাদেরকে পূর্বের পদে পুনর্বহাল করেন। অথচ বাস্তবতা হলো, প্রশাসনের শীর্ষ পদের ২-৪ ব্যতিরেকে অন্য সকল উযির ও সামরিক পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে ইংরেজরা দৌলত ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কিনে নিয়েছিলো। যার কারণে চতুর্থ যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের তৎপরতা ও তাদের নানাবিধ চক্রান্তের তথ্য টিপু সুলতান যথাসময় পাননি। অথচ ইতোপূর্বেকার অন্যান্য যুদ্ধে সুলতান অকল্পনীয় দ্রুততায় তাদের অপতৎপরতার আগাম তথ্য পেয়ে সার্বিক রণপ্রস্তুতি নিয়ে তৈরি হয়ে যেতেন।

নবাব হায়দার আলী ইনতিকালের সময় টিপু সুলতানকে অসিয়ত করেছিলেন যে, মীর সাদিক, পুর্নিয়া প্রমুখ বেশ কিছু ক্ষমা-অযোগ্য অপরাধ করেছে। কাজেই সালতানাতে খোদাদাদ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাদেরকে অবশ্যই খতম করতে হবে। কিন্তু টিপু সুলতানের মূলনীতি ছিলো, স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতে কারো ওপর দণ্ড চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এ কারণেই তিনি পিতার শেষ ইচ্ছে পূরণ থেকে নিবৃত্ত থাকেন। মীর সাদিক, পুর্নিয়া গংদের বিরুদ্ধে পিতার অভিযোগও আমলে নেননি। যদি এই কয়েকজনকে সুলতান দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন তাহলে সম্ভবত সেটা অন্য গাদ্দারদের মনেও আতঙ্ক তৈরি করতো। তখন সম্ভবত এতো দ্রুত সালতানাতে খোদাদাদের পতন ঘটতো না।

এই গাদ্দারদের ভুল তথ্য বিশ্বাস করে, তাদের মিথ্যা অপবাদ ও জাল সাক্ষ্য আমলে নিয়ে সুলতান কয়েকজন আস্থাভাজন ও একনিষ্ঠ অফিসারকে পদচ্যুত করে তদস্থলে কিছু নতুন লোককে ভর্তি করেছিলেন।

www.boimate.com

যেমন, মারাঠা নওমুসলিম মালিক জাহাঁ খান প্রমুখ। সুলতান যদি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গ পেতেন তাহলে সম্ভবত সালতানাতের পতন আরো কিছু দিন ঠেকিয়ে রাখা যেতো।

১৭৯২ সালে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম চুক্তির পর সুলতান জনগণকে প্রাশাসনিক ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করার জন্যে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার ফলে সালতানাতের বিভিন্ন এক্তিয়ার তার মন্ত্রী পরিষদের হাতে চলে যায়। ওই সময় সুলতান অধিকাংশ অবসর মুহূর্ত ইবাদত ও অযিফা আদায়ে অতিবাহিত করতেন। যার ফলে জনসাধারণের অভিযোগ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুব কমই তার কাছে পৌঁছুতো।

৩. মানুষ চিনতে ভুল করা

নবাব হায়দার আলী যদিও শিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু জন্মগতভাবে তাঁর মাঝে মানুষ চেনার অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো। কিন্তু পিতার তুলনায় এ গুণটি সুলতানের মাঝে কম ছিলো। হায়দার আলী যেখানে মীর সাদিক, পুর্নিয়া গংদের মনোভাব ধরতে পেরেছিলেন, এবং ইনতিকালের আগমুহূর্তে তাদের জীবনলীলা সাঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; সেখানে টিপু সুলতান তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি শুধু তাদেরকে ক্ষমাই করেননি; বরং আলখেল্লার আস্তিনের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা অন্য গাদ্দারদেরকেও চিনতে পারেননি। হায়দার আলীর অভ্যাস ছিলো, তিনি কারো চাটুকরিতায় প্রভাবিত হতেন না। কিন্তু সুলতানের মাঝে এ দুর্বলতা ছিলো যে, তিনি অন্যদের মধুমাখা কথা ও মুহুর্মুহু শপথ জড়ানো বাক্যে সহজেই প্রভাবিত হয়ে যেতেন। ওই সময় তিনি শুধু ক্ষমাই করতেন না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে পদোন্নতিও দিয়ে ফেলতেন।

৪. সামরিক কর্মকৌশলের ব্যর্থতা

টিপু সুলতান যদিও তার নিরক্ষর পিতার তুলনায় শিক্ষিত ও রাজনীতির কলা-কৌশল সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন; কিন্তু হায়দার আলী একজন নিরক্ষর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও রণনৈপূণ্য ও সামরিক কর্মকৌশল নিরূপণের ক্ষেত্রে টিপুর তুলনায় যোজন যোজন এগিয়ে ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ,

www.boimate.com

হায়দার আলী তার সেনাবাহিনীর অশ্বারোহী দলটির ওপর অধিক মনোযোগ দিতেন। তাঁর অধীনে ২৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের তুলনায় মাত্র ১৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিলো। এর বিপরীতে টিপু সুলতান যখন মসনদে আরোহণ করেন তখন তিনি পদাতিক সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে তা ৫০ হাজারে উন্নীত করেন। অন্যদিকে অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে মাত্র ২০ হাজারে নিয়ে আসেন। ইংরেজদের জঙ্গী তৎপরতা ও অতীত অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করা টিপু সুলতানের একটি ভুল সামরিক সিদ্ধান্ত ছিলো।

১৭৯৯ সালে যখন ইংরেজরা রাজধানী অবরোধ করে ওই সময় কেল্লার ভেতর ২১৮৩৯ জন সৈন্য ছিলো। যাদের সবাই ছিলো পদাতিক। অথচ কেল্লা ছিলো অত্যন্ত সুরক্ষিত। এতদসত্ত্বেও ইংরেজরা বেশ সহজেই কেল্লা দখল করতে সমর্থ হয়।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। সামরিক কর্মকৌশল বিবেচনায় ওই সময় সুলতানের করণীয় ছিলো, যথাসম্ভব শত্রুপক্ষকে বেশি দিন অবরোধে ব্যস্ত রাখা। ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে তিনি ঠিক এ নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি তা করেননি। অথচ যুদ্ধের পর খোদ ইংরেজরাও এ কথা স্বীকার করেছে যে, যদি তাদের অবরোধ দীর্ঘ হতো তাহলে তাদের সামনে নতুন অনেক জটিলতা দেখা দিতো। তখন এতো দ্রুত রাজধানী দখল করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না। যেহেতু গাদ্দাররা ইংরেজদেরকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছিলো যে, তারা কোনো ধরনের প্রতিরোধ যুদ্ধ করবে না; এজন্যে ইংরেজরা শ্রীরঙ্গাপত্তনামের আশপাশের পথগুলো বন্ধ করার কোনো চেষ্টাই করেনি। যা শেষতক টিপু সুলতান নিজেও জানতে পেরেছিলেন। টিপু সুলতান যদি গোটা সালতানাতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তার পৌনে দু' লক্ষ ফৌজের মাত্র দু' তৃতীয়াংশ ফৌজকেও রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়ার তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিতেন তাহলে উল্টো ইংরেজ ও নিযামের সম্মিলিত বাহিনীই চারদিক থেকে অবরোধের বেষ্টনিতে আটকা পড়তো। তখন শত্রুপক্ষের মনোযোগ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো। ফলে তারা আক্রমণাত্মক কৌশল থেকে সরে এসে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ যুদ্ধে ব্যস্ত হতো। যার ফলে তারা

www.boimate.com

শ্রীরঙ্গাপত্তনামের ওপর আক্রমণ ছেড়ে নিজেদের চারপাশের অবরোধ ভাঙ্গার ওপর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করতো। দুঃখের বিষয়, সুলতান সেই উদ্যোগ নেননি।

৫. শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীর মুখে নিঃসঙ্গ টিপু

নবাব হায়দার আলীকে কখনই সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হতে হয়নি। মহিসুরের প্রথম যুদ্ধে যখন হায়দার আলীর পক্ষ থেকে হায়দারাবাদের নিযামের সামনে ৫০ হাজার রুপির লোভ দেখানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজদের থেকে নিজেকে পৃথক করে নেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে ফরাসিরা তার মিত্র ছিলো। ওই যুদ্ধে নিযাম নিরপেক্ষ ছিলো। খোদ মারাঠারাই তখন ইংরেজদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলো।

এর বিপরীতে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে সবগুলো পক্ষ জোট বেঁধেছিলো। চতুর্থ যুদ্ধে নিযাম ইংরেজদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। মারাঠারা যদিও পার্শ্ববর্তী রাজ্যে একটি সুদৃঢ় ইসলামি সালতানাত গড়ে ওঠার পক্ষে ছিলো না; কিন্তু নিজস্ব কিছু অপরাগতার কারণে তারা এই যুদ্ধে বাহ্যত নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করে। ওদিকে ফরাসিদের পক্ষ থেকেও টিপু সুলতান উল্লেখযোগ্য কোনো সহায়তা পাননি। হায়দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে ইংরেজদের নিজেদের কোনো অশ্বারোহী সৈন্য ছিলো না। তার সঙ্গে নিযাম যোগ দেওয়ার কারণেই তারা কিছু অশ্বারোহী সৈন্য পেয়েছিলো। পরবর্তীকালে তারা নিজেরাও অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি করে।

এর বিপরীতে সর্বশেষ ভাগ্যনিয়ন্ত্রক যুদ্ধে টিপু সুলতানকে সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে একাকী নিঃসঙ্গ লড়াই করতে হয়। যদি টিপুর মুকাবেলায় শুধু ইংরেজরা অবতীর্ণ হতো তাহলে নির্ঘাত যুদ্ধের পরিণতি ভিন্ন হতো।

এটাও একটা কারণ হতে পারে যে, মহিসুরের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে হায়দার আলীর সৈন্যসংখ্যার তুলনায় শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা অনেক কম ছিলো। কিন্তু শ্রীরঙ্গাপত্তনাম চুক্তির কারণে টিপু সুলতান যেহেতু অর্ধেক রাজত্ব খুইয়ে ফেলেছিলেন; যার কারণে চতুর্থ যুদ্ধে টিপুর সামরিক সক্ষমতা অনেকাংশেই কমে এসেছিলো।

www.boimate.com

৬. ইংরেজদের সামরিক সুশৃংখলা

১৭৯২ সালের ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে যেহেতু টিপু সুলতান পরাজিত হয়েছিলেন, চুক্তি অনুসারে সম্মিলিত বাহিনীর হাতে মহিসুরের অর্ধেক অংশ তুলে দিতে হয়েছিলো, এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩ কোটি রুপি পরিশোধ করতে হয়েছিলো, যার ফলে তার প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির উৎসগুলো খুব বেশি সীমিত হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দিনদিন ফুলে ফেঁপে ওঠছিলো। তারা ক্রমশ তাদের ফৌজদেরকে সুশৃঙ্খল ও সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত করে তুলতে পেরেছিলো। তারা তৃতীয় যুদ্ধের পর তাদের সেনাবাহিনী নতুন করে বিন্যস্ত করে। অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে। টিপুর হাত থেকে তারা যেসব এলাকা দখল করেছিলো, সেখানে পূর্ব থেকেই অস্ত্র তৈরির কারখানা থাকায় তারা সেগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা-বারুদের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলে।

সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে তারা আরেকটি সুবিধাও লাভ করে। তাহলো, ইতোপূর্বে ইংরেজ গভর্নর জেনারেলকে যেকোনো সামরিক পদক্ষেপ নিতে হলে লন্ডন থেকে অনুমতি নিতে হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তাদের পলিসি বদলে ফেলে। তারা হিন্দুস্তানে অবস্থানরত গভর্নর জেনারেলকে যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্ণ এক্তিয়ার দিয়ে দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহিসুর যুদ্ধ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ও কমান্ডার ইন চিফ-এর পদে ভিন্ন ভিন্ন লোক অধিষ্ঠিত হতো। যার কারণে তাদের এক্তিয়ার দু' দিকে ভাগ হয়ে যেতো। কিন্তু তৃতীয় ও সর্বশেষ যুদ্ধে একই ব্যক্তিকে এ দু'টি পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

পূর্বে মাদ্রাজ ও মুম্বাইয়ে অবস্থানরত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর সরাসরি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর অনুগত ছিলো। কিন্তু ওই পলিসিতে পরিবর্তন এনে এ দু'টি পদধারী ব্যক্তিকেও গভর্নর জেনারেলের অধীনস্থ করে ফেলা হয়। যার ফলে এখন হিন্দুস্তানে অবস্থানরত গভর্নর জেনারেল তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি পেয়ে যায়। যুদ্ধের প্রয়োজনে যেকোনো সিদ্ধান্ত দ্রুততার সঙ্গে নেয়ার পথ খুলে যাওয়ায় তারা সর্বশেষ যুদ্ধে প্রচুর সহায়তা পেয়েছিলো।

www.boimate.com

৭. ধর্মীয় রুসম রেওয়াজ নিষিদ্ধ করার কারণে জনগণের ক্ষোভ

একজন ঈমানদার মুসলমান হিসেবে টিপু সুলতান তার সালতানাতে প্রচলিত মুহাররত কেন্দ্রিক রুসম-রেওয়াজ ও পীর-মুরিদীর অপবাণিজ্য ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে সেই জাহেলি রুসম-রেওয়াজের ঠিকাদারদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু ওই যুগে সিংহভাগ মুসলমান অশিক্ষিত ছিলেন। আর এই রুসম-রেওয়াজ বহু দিন ধরে এ অঞ্চলে পালিত হয়ে আসছিলো। এমনকি এগুলো জনতার চোখে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ বিবেচিত হতো। যার কারণে অজ্ঞ আবেগের বশীভূত হয়ে কিছু লোক টিপু সুলতানের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের সেই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা তাদেরকে সুলতানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তাদের ধর্মীয় আবেগে উস্কানির আগুন ঢেলে দেয়। এমনকি তারা সুলতানের বিরুদ্ধে মককা মুকাররমার শরীফ [গভর্নর]-এর কাছ থেকে ফতোয়া সংগ্রহ করে তা গোটা সালতানাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। বিষয়টির ওপর আমরা ইতোপূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি।

৮. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফরাসিদের সঙ্গে নিষ্প্রোয়জনীয় সম্পর্ক

ফরাসিদের সঙ্গে টিপু সুলতানের মাত্রাতিরিক্ত সম্পর্কও ইংরেজদেরকে তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। কারণ, ওই যুগে ইংরেজরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফরাসিদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলো। অথচ বারবার প্রচেষ্টা করেও তিনি ফরাসিদের কাছ থেকে ইংরেজদের বিপক্ষে কোনো উল্লেখযোগ্য সামরিক সহায়তা পাননি। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক নিবীড় সম্পর্ক বজায় রেখে গেছেন। এই সংবাদ গোয়েন্দাদের মাধ্যমে নিয়মিত ইংরেজদের কাছে পৌঁছে যেতো। যার কারণে দেখা যায়, একদিকে তিনি ফরাসিদের কাছ থেকে কোনো সামরিক সহায়ত পাননি। অন্যদিকে তার এই অর্থহীন মাত্রাতিরিক্ত সম্পর্ক ইংরেজদের সামনে যুদ্ধের অজুহাত তুলে দেয়। এটা ভিন্ন কথা যে, ওই সময় হিন্দুস্তানে বসবাসকারী কিছু ফরাসি সুলতানের সেনাবাহিনীতে ব্যক্তিগতভাবে চাকরি করতো। কিন্তু টিপু সুলতান সরাসরি

www.boimate.com

ফ্রান্স থেকে অথবা হিন্দুস্তানে অবস্থানরত তাদের কোম্পানি থেকে কোনো ধরনের সামরিক সহায়তা পাননি।

হিন্দুস্তানের রাজনীতির ওপর টিপু পতনের প্রভাব

টিপু সুলতান ছিলেন তৎকালীন হিন্দুস্তানের বুকে ইংরেজদের একমাত্র প্রতিপক্ষ। তার শাহাদাত ও সালতানাতে খোদাদাদের পতনের মাধ্যমে পুরো হিন্দুস্তানের বুকে তাদেরকে মুকাবিলা করার সর্বশেষ শক্তিটিও ধসে পড়ে। তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পথে টিপু সুলতানই ছিলেন সর্বশেষ পথের কাঁটা। এ কারণেই টিপুর শাহাদাতের পর তাদের মুখ থেকে সর্বপ্রথম এই গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি বেরিয়ে আসে যে, 'আজ থেকে হিন্দুস্তান আমাদের'। টিপুর জীবদ্দশায় তাদের মুখ থেকে এমন কোনো বাক্য বেরিয়ে আসেনি।

১৮০০ সালে তারা হায়দারাবাদের নিযাম থেকে নিজেদের যাবতীয় স্বার্থ ষোলআনা উদ্ধারের পর তার কোনোমতে টিকে থাকা সার্বভৌমত্বও ছিনিয়ে নেয়। মহিসুরের অধিকৃত অঞ্চলের যেটুকু অংশ তাকে দিয়েছিলো, তা মাত্র এক বছরের মাথায় ফিরিয়ে নেয়। এখন সে কার্যত তাদের অধীনস্থ হয়ে পড়েছে। প্রথম ধমকিতেই খোদ নিজেই তার নতুন অধিকৃত এলাকাগুলো বড্ড নির্লজ্জতার সঙ্গে তাদের হাতে তুলে দেয়।

ওদিকে মারাঠা সর্দার নানা ফার্নাভেজ যখন টিপুর শাহাদাতের সংবাদ শোনেন তখন তার মুখ থেকে স্বয়ংক্রীয়ভাবে এ কথা বেরিয়ে আসে যে, 'টিপু খতম হওয়ার অর্থ হলো, এখন ইংরেজদের ক্ষমতা নিরংকুশ বেড়ে গেছে। এখন গোটা হিন্দুস্তান তাদের'।

অন্য এক মারাঠা সর্দার এ মন্তব্য করেছিলো যে, 'টিপুর মৃত্যু আমার ডান বাহু কর্তিত হওয়ার সমান'।

নাগপুরের মাধুজী ভোঁসলে, পুনার নানা ফার্নাভেজ (Nana Phadnavis), ইন্দোরের টিকুজী হালকার ও সিন্ধিয়া প্রমুখের সৈন্যসংখ্যা যদিও গাণিতিক হিসেবে সংখ্যায় টিপুর সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বেশি হবে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের পক্ষে কোম্পানিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিলো না। ১৮০৩ সালে ফারখাবাদের রণাঙ্গনে হালকারের সৈন্যদেরকে ইংরেজরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ১৮০৩ সালে দিল্লির আশপাশে অবস্থিত

www.boimate.com

সকল মারাঠি সর্দার সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে প্রমুখের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু ইংরেজরা তাদেরকেও পরাজিত করে আগ্রা ও আলীগড়ে তাদের অধীনস্থ এলাকাগুলো দখল করে নেয়। বারোদা ও গুজরাট দখল করার পর ইংরেজরা পুনায় প্রথমে নিজ রেজিড্যান্ট নিয়োগ দেয়। এরপর ১৮১৮ সালে সেটাও দখল করে নেয়।

ওদিকে মহিসুরের অল্পবয়স্ক হিন্দু রাজাও কয়েকদিনের মধ্যে তার সমস্ত এলাকা কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে নামকাওয়াস্তে পুতুল রাজা হয়ে কোনোমতে রাজসিংহাসনে বসে থাকার পথ বেছে নেয়। দিল্লির শাহ আলমও ইংরেজদের বশ্যতা মেনে নেন। কার্যত এখন তিনি ইংরেজ অনুগত করদ রাজা। ১৮৩৫ সালে এ দেশের মুদ্রা থেকে তার নাম উঠিয়ে ফেলা হয়। ১৮৪৩ সালে ইংরেজরা সিন্ধু জয় করে। ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার নামকাওয়াস্তে টিকে থাকা হুকুমতও খতম করে দেয়। শিখদের বিরুদ্ধে দু'টি যুদ্ধের পর ১৮৪৯ সালে তাদের হুকুমতেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। শাহ আলমের পর আকবর শাহ দ্বিতীয় ও বাহাদুর শাহ যাফরও ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত স্রেফ লালকেল্লার ভেতরেই রাজা ছিলেন। ইংরেজদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ভাতা দিয়েই কোনোমতে তাদের দিন গুজরান হতো।

১৮৫৭ সালে ২২ সেপ্টেম্বর হিন্দুস্তানের হাজার বছরের ইসলামি সালতানাত ও মোঘল হুকুমতের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে। সেদিন ইংরেজরা সর্বশেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফরকে বন্দী করে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠায়। সেখানে ১৮৬২ সালে তার করুণ মৃত্যু ঘটে। মোটকথা এ হলো টিপু সুলতানের শাহাদাতের প্রভাব– যা হিন্দুস্তানের রাজনীতির ওপর তার শাহাদাতের মাত্র ৫৮ বছরের মধ্যেই প্রকাশ পেয়ে যায়। এ সময়ের ভেতর গোটা হিন্দুস্তান ইংরেজদের করতলগত হয়। তাদের রাজত্ব উত্তরে গায়বার গিরিপথ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিলো।[৭৫]

মুসলিম জাহানের ওপর সালতানাতে খোদাদাদের পতনের প্রভাব

১৭৯৯ সালে টিপুর শাহাদাতলাভ ও সালতানাতে খোদাদাদের পতনের যেই প্রভাব মুসলিম জাহানের ওপর পড়েছে তা ইতিহাসের প্রতিটি

---

[৭৫]. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব তারীখে আলম। লেখক, উইলিয়াম এল ল্যাঙ্গার।

www.boimate.com

শিক্ষার্থীর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ১৬২৫ সালে প্রথমবার মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইংরেজ আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক মিশন নিয়ে হিন্দুস্তানে আসে। অথচ ১৬১৫ সালেই থমাস র নিজ দেশের প্রতিনিধি হয়ে হিন্দুস্তানে এসেছিলো। কিন্তু তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানের সঙ্গে ইংরেজদের কোনো আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তখন থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পৌনে দু' শ বছরের মধ্যে তারা এদেশে বাণিজ্য ও রাজনীতির ছদ্মাবরণে হিন্দুস্তানের বেশ কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছিলো। তারা মুম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙ্গাল দখল করে নিয়েছে। কোম্পানির অধিকৃত এই এলাকাগুলো সামরিক ও জিওগ্রাফিক গুরুত্বের বিচারে কোনো অংশে মহিসুরের তুলনায় কম ছিলো না। দিল্লির শাহ আলম, হায়দারাবাদের নিযাম ও কর্নাটকের নবাব মুহাম্মদ আলী ইতোমধ্যে তাদের রাজনৈতিক বশ্যতা মেনে নিয়েছে। কাজেই এটাই বাস্তব যে, তাদের রাজ্যগুলোও কার্যত ইংরেজদের অধীনে চলে গেছে। এতো সব সত্ত্বেও ইংরেজরা প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছিলো না। তারা হিন্দুস্তানকে নিজেদের বলার সাহস পাচ্ছিলো না। কারণ, মহিসুরের টিপু সুলতান তাদের বিপদজনক অভিপ্রায় বুঝে ফেলার শক্তি রাখতো, বিধায় তারা তাকে মূর্তমান আতঙ্ক মনে করতো।

এ কারণেই ঈসায়ি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজরা গোটা হিন্দুস্তান থেকে তাদের পূর্ণ শক্তি তুলে এনে স্রেফ মহিসুরের ওপর নিবদ্ধ করে। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নিজেই হিন্দুস্তানে কোম্পানির রাজনৈতিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতেন। ১৭৯৯ সালে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বশেষ প্রদীপ টিপু সুলতান শাহাদাত বরণ করেন এবং সালতানাতে খোদাদাদের বিশাল ভূখণ্ড থেকে স্রেফ শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতন ঘটে তখনই স্যার জন থ্রুয়ার গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলিকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লেখেন যে, 'শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পতনই আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব'। ওয়েলেসলি নিজেও এ কথা বলেছেন যে, 'এখন টিপুর মৃত্যুর পর কোনো শাসক আমাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার দুঃসাহস করবে না।'

www.boimate.com

এমনটাই হয়েছিলো। মাত্র ৫৮ বছরের ভেতর তারা গোটা দেশ জয় করে নেয়। ১৮৫৭ সালে হিন্দুস্তানের ১১ শ ১৬ বছরের প্রাচীন ইসলামি হুকুমত বাহাদুর শাহ যাফরের রেঙ্গুন নির্বাসনের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়।

টিপুর শাহাদাতের পূর্বে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের হাতে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ১৭% হিসেবে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ড ছিলো। অথচ ওই সময়ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম জাহান দখল করার জাল চতুর্প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ওই সময় মুসলিম জাহানের সবচেয়ে বড় দেশ ছিলো হিন্দুস্তান। আর হিন্দুস্তানে তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিলেন টিপু সুলতান। যার কারণে হাতের মুঠোয় সব কিছু চলে আসা সত্ত্বেও তাদের অপবিত্র অভিলিপ্সা পূরণের ক্ষেত্রে তারা বড় ধরনের কোনো সাফল্য লাভ করেনি।

যখন এই প্রাচীর পথ থেকে সরে যায় তখন তারা একে একে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল টেনে আনতে শুরু করে। যার ফলে এরপর আর তাদের নাপাক খোয়াব পূরণ হতে খুব বেশি দেরি হয়নি। মাত্র অর্ধশতাব্দীর ভেতর তারা প্রথমে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর তারা বিশ্বের ১৬টি দেশ, তন্মধ্যে এশিয়ার ১০টি দেশ, যথাক্রমে মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ইরাক, কাতার, ওমান, মালদ্বীপ, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও জর্দান এবং আফ্রিকার ৬টি দেশ, যথাক্রমে মিসর, সুদান, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া ও মোজাম্বিকের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

আপনি জেনে অবাক হবেন যে, এর ফলে টিপুর শাহাদাতের মাত্র ৫০-৬০ বছরের মধ্যে মুসলিম জাহানের পরিধি বিশ্বের মোট ভূ-খণ্ডের ১৭% থেকে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৫% অর্থাৎ ১ কোটি ৫৭ লক্ষ বর্গমাইলের স্থলে মাত্র ৪৫ লক্ষ বর্গমাইলে নেমে আসে। অন্যভাবে বললে এটি ছিলো ইসলামের ১৩ শ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পতন। যদি টিপু সুলতান আরও কিছু দিন জীবিত থাকতেন তাহলে সম্ভবত এতো দ্রুত ইংরেজরা হিন্দুস্তানের ব্যাপারে নিঃশঙ্ক হওয়ার সুযোগ পেতো না। এবং এরপর তারা মুসলিম জাহানের অন্যান্য অংশের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগটুকুও পেতো না।

www.boimate.com

টিপু সুলতানের শাহাদাতের কারণে মুসলিম জাহান স্রেফ একজন ইসলাম প্রচারককে হারানোর সামান্য ক্ষতির শিকার হয়নি; বরং একজন হিমালয়-কঠিন মুসলিম শাসকের শাহাদাতের কারণে মুসলিম জাহান রাজনৈতিক ও ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে চরম ও অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়।

কাজেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, একমাত্র শহীদ টিপু সুলতান রহ.-এর অস্তিত্বের কারণেই ইংরেজরা মুসলিম জাহানের মানচিত্রের ওপর ফিরে তাকানোর সুযোগ পায়নি।

www.boimate.com

বিংশ অধ্যায়

টিপু সুলতানের মানবিকতা ও ধর্মীয় সৌহার্দ্য

www.boimate.com

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য

পশ্চিমা ঐতিহাসিক, এমনকি খোদ ভারতের কিছু সাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকের পক্ষ থেকে টিপু সুলতানের ওপর সাধারণত এ অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে যে, তিনি চরম গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনামলে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর জুলুম করেছিলেন। মন্দির ধ্বসিয়ে সেগুলোর স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করেছেন। অমুসলিমদেরকে গণখতনা করিয়েছেন। বলপ্রয়োগ করে অনেক বিধর্মীকে মুসলমান বানিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক লিউন বি ব্যুরঙ্গ টিপু সুলতানের ধর্মীয় আবেগ সম্পর্কে লেখেন, 'তিনি উগ্রতার বিচারে নাদির শাহ, মাহমুদ গজনবী ও আলাউদ্দীন খিলজীর সমকক্ষ ছিলেন। শাসক হিসেবে তাদের জনপ্রিয়তার কারণ হলো, তাদের নির্দেশে অসংখ্য বিধর্মী হত্যা করা হয়েছিলো।'[৭৬] কির্ক প্যাট্রিক তাকে অনুদার শাসক প্রতিপন্ন করেছে। মহিসুর হিস্ট্রি গ্রন্থে ভিলিক্স তাকে উগ্র কট্টর অভিহিত করেছে।[৭৭]

প্রশ্ন হলো, এই অভিযোগগুলো কতোটা বাস্তবাশ্রিত? তা জানতে স্রেফ একটি উদাহরণই যথেষ্ট মনে করছি। আশা করি, টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতে তারা কী পরিমাণ মিথ্যা, অতিরঞ্জন ও জ্ঞানগত অসততার আশ্রয় নিয়েছে, তা এই উদাহরণ থেকেই প্রমাণিত হবে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা লেখেছেন, 'টিপু সুলতান স্রেফ কোর্গ (Coorg) নগরীতেই ৭০ হাজার বিধর্মীকে মুসলমান বানিয়েছিলেন।' অথচ মহিসুরের ইতিহাস পাঠ করেছে, এমন শিক্ষানবশীও এ কথা ভালোভাবে জানে যে, টিপু সুলতানের যুগে কোর্গ (Coorg) নগরীর জনসংখ্যা কখনই ২৫-৩০ হাজারের অধিক ছিলো না। সেখানেও কয়েক হাজার মুসলমান ও খ্রিস্টান নাগরিক বসবাস করতো। খোদ হিন্দু ঐতিহাসিক রামচন্দ্র রাও পঙ্গনুরী তার বইয়ে লেখেছেন যে, 'টিপু সুলতান যখন কোর্গ নগরী জয় করেন

---

[৭৬]. সাওয়ানেহে টিপু সুলতান। লেখক, আমজাদ আলী আশহারী।

[৭৭]. তারীখে টিপু সুলতান। লেখক, মুহিব্বুল হাসান।

www.boimate.com

তখন সেখানকার স্রেফ পাঁচ শ নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করে। এদের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস হলো, চরম বর্ণবৈষম্যের কারণে ওরা চরম দুর্বিসহ জীবন যাপন করছিলো। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় তারা প্রথমে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তখন সুলতান তাদের নির্দেশ করেছিলেন যে, তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ছেড়ো না। একান্তই যদি ছাড়তে হয় তাহলে তোমরা তোমাদের সম্রাটের ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করো।'

ঘটনার এ পর্যায়ে এসে সুরেন্দ্রনাথ সেন এ কথা বলে সুলতানকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন যে, টিপু সুলতান উগ্র ছিলেন না। অবশ্য তিনি কিছু লোককে বলপ্রয়োগ করে মুসলমান বানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তার কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিলো না। তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর এ সিদ্ধান্তের নেপথ্যে তার রাজনৈতিক মুনাফা কাজ করেছে।

টিপু সুলতানের ওপর যেসব অপবাদ আরোপ করা হয়, মাহাত্মা গান্ধি সেগুলো মিথ্যা অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে টিপু সুলতানের সম্পর্ক ছিলো বন্ধুত্বপূর্ণ। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন।

এ কথা যদিও সঠিক যে, তিনি কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে কঠোরতা করেছেন। যেমন, কৃষ্ণারাও ও তার ভাইদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। আরও কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন; কিন্তু তিনি এই দণ্ডগুলো তারা হিন্দু হওয়ার কারণে দেননি। বরং নিমক-হারামি ও গাদ্দারির কারণেই তিনি তাদের ওপর এ দণ্ড কার্যকর করেছেন। এ ধরনের প্রতিশোধ তিনি কয়েকজন মুসলমান থেকেও নিয়েছেন। যেমন, ইংরেজ সিপাহিদের সঙ্গে ব্যভিচার করার কারণে তিনি কয়েকজন মুসলমান নারীকে হত্যা করেছিলেন। গাদ্দারির অপরাধে মুহাম্মদ কাসেমকে ফাঁসি দিয়েছেন। উসমান খাঁন কাশ্মিরীকে ফাঁসি দিয়েছেন। তাহলে বলুন, এই মুসলমানদের সঙ্গে কঠোরতার কারণে কেউ কি এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে যে, (আল্লাহ মাফ করুন) তিনি ইসলামের শত্রু ছিলেন!

টিপু সুলতান একদিকে যেমন হিন্দু মারাঠা ও ট্রাভাংকুর (Travancore)-এর রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন; অন্যদিকে মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন। কাজেই তাঁর ওপর গোঁড়ামি ও ধর্মীয় উগ্রতার অভিযোগ

www.boimate.com

তখনই সত্য প্রমাণিত হতো, যদি তিনি গাদ্দারির অপরাধের কারণে শুধু মুসলমানদের মাফ করতেন, আর হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করতেন। নিম্নে আমরা তাঁর ধর্মীয় উদারতার এমন কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি, যেগুলো টিপু সুলতান তাঁর শাসনামলে আঞ্জাম দিয়েছেন। অথচ একজন মুসলিম শাসকের জন্যে এ ধরনের কাজ করা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। টিপু সুলতান সেই উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে অনেক সময় ইসলামের বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেছেন।

প্রশাসনের উচ্চপদে হিন্দু অফিসার

টিপু সুলতানের শাহাদাতলাভ পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ পুর্নিয়া ছিলো রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। এক্তিয়ার ও ক্ষমতার ব্যাপকতার বিচারে সে ছিলো মীর সাদিকের পর সুলতানের দ্বিতীয় 'নায়েব'। অর্থাৎ রাজ্যের তৃতীয় সর্বাধিক এক্তিয়ারধারী ব্যক্তি। হিন্দু ব্রাহ্মণ 'লালা মাহতাব রায়' ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত কেরাণী ও সর্বাধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি। তিনি উরদূ-ফারসি ভাষায় প্রত্যুতপন্নমতি কবি ছিলেন। অষ্টপ্রহর সুলতানের সঙ্গে থাকতেন। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও তার অবস্থান হতো সুলতানের শাহী ক্যাম্পে। বিভিন্ন সম্রাট বরাবর টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে যতোগুলো ফারসি চিঠি প্রেরীত হয়েছে, সেগুলোর সিংহভাগ চিঠির খসড়া লিপি তিনিই তৈরি করেছেন। ইরান-সম্রাট বরাবর প্রেরীত দীর্ঘ ফারসি চিঠির পাণ্ডুলিপি তিনিই তৈরি করেছেন। সুলতানের গুণকীর্তন করে তিনি অনেকগুলো দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। যেসকল জীবনোৎসর্গী আস্থাভাজন সঙ্গী জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সুলতানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।

আরেকজ হিন্দু কর্মকর্তার নাম হলো, হরি সিং। তিনি ছিলেন মহিসুর অশ্বারোহী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার ভাই নরসিঙ্গা রাও-ও প্রশাসনের অন্যতম উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। মহিসুরের পক্ষ থেকে কোর্গে নিযুক্ত ফৌজদারও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

আপনারা জানেন যে, সুলতানের পক্ষ থেকে বিদেশের বিভিন্ন সম্রাটের কাছে কূটনীতিবিদ প্রেরীত হতো। সে কূটনৈতিক মিশনের নিয়মিত সদস্য ছিলেন, শ্রীনওয়াজ রাও ও আপ্পাজি রাম। সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনীর

www.boimate.com

আরেকজন কমান্ডারের নাম হচ্ছে রমা রাও। মালাবারে নায়ারদের বিদ্রোহ দমন করার জন্যে যেই সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন তাদের সেনাপতি বানিয়েছিলেন 'শ্রীপথ রাও'-কে। মহিসুর সৈন্যবাহিনীর তিন হাজার সদস্যের একটি ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিতো মারাঠি সর্দার শিবাজী।

সুলতানের দরবারে রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্র লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত কেরাণীদের একজন হচ্ছেন 'নরসিয়া' নামের হিন্দু মুনশী। যিনি প্রায়সময় গ্রামপঞ্চায়েতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। মহিসুরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস ছিলো সাগওয়ান গাছ। সেই গাছ কাটার ঠিকাদারি প্রথমে একজন মাপলা বংশোদ্ভূত মুসলমানকে দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীকালে তার স্থানে একজন ব্রাহ্মণ হিন্দুকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব 'দসহেরা'-এর সুলতান সবসময় তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি সেই উৎসবের ব্যয়ভারের একটি বৃহৎ অংশ সরকারি কোষাগার থেকে বরাদ্দ দিতেন।

উল্লেখিত উদাহরণগুলো প্রমাণিত করে, ধর্ম-বর্ণ নির্বেশেষে তিনি সব ধর্মের সব অনুসারীদের ভালোবাসতেন। সবার প্রতি তাঁর আস্থা ছিলো বলেই তিনি প্রশাসনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। সব বিধর্মীকে তিনি পূর্ণ উদারতার সঙ্গে নিজস্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। একবার এক ব্যক্তি পুর্নিয়ার কুমতলবকে পুঁজি করে গোটা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে 'গাদ্দার' বলেছিলো, তখন টিপু সুলতান তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— لاَ عُدْوَانَ إلاَّ عَلى الظَّالِمِيْنَ

যার ব্যাখ্যা হলো, কেবল জালিম ব্যক্তিই অপরাধী সাব্যস্ত হবে। ব্যক্তির অপরাধ পুরো গোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া সমীচিন হবে না।

মন্দির ও সেখানকার পুরোহিতদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন

সুলতান আন্তরিকভাবে হিন্দুদের মন্দির ও সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণরত স্বামীদের শ্রদ্ধা করতেন। ১৭৯১ সালে মারাঠি হিংস্ররা যখন রঘুনাথ রাওয়ের নেতৃত্বে সালতানাতে খোদাদাদের ওপর আক্রমণ করে ওই সময় তারা সুরঙ্গিরি মন্দিরের চরম অবমাননা করেছিলো। ব্যাপক লুটতরাজ চালিয়ে মন্দিরের অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যায়। খাঁটির স্বর্ণের তৈরি জীব-

www.boimate.com

জন্তুর প্রতিমা ও পালকি লুণ্ঠন করে। মন্দিরে স্থাপিত 'সারদা' দেবী তুলে বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়। মন্দিরে দায়িত্বরত ব্রাহ্মণদেরকে ধরে ধরে হত্যা করে। প্রাণ বাঁচাতে মন্দিরের স্বামী ও প্রধান পুরোহিত শংকর গুরু আচার্য পালিয়ে পার্শ্ববর্তী নগরী 'কারকুল'-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে মনের ক্ষোভ ও অভিযোগ জানিয়ে টিপুর কাছে চিঠি লেখেন এবং মন্দিরের অবমাননার পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে আর্থিক সহায়তার আবেদন করেন। তার চিঠির উত্তরে টিপু সুলতান যেই জবাবি পত্র লেখেন তা মহিসুরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টর ড. রায় বাহাদুর নরসিমহা আচার্য ১৯১৬ সালে সুরুঙ্গিরি মন্দির থেকে উদ্ধার করেন। সেই চিঠিতে টিপু সুলতান রীতিবিরুদ্ধভাবে প্রথমে গুরুজির নাম ও তার নিচে নিজের নাম লিখেছিলেন। গুরুজি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বোধন করেন। চিঠির ছত্রে ছত্রে হিন্দু পুরোহিতদের সম্পর্কে টিপুর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান ফুটে ওঠেছে। আমরা নিম্নে সেই চিঠি থেকে চয়িতাংশ তুলে ধরছি। টিপু লেখেন—

> 'যেসব লোক ধর্মীয় পুণ্যস্থলগুলোর অবমাননা করে তারা দুনিয়াতেই তাদের অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবে। যেমনটি জনৈক কবি বলেছেন যে, মানুষ মন্দকাজগুলো হাসিমুখে করে বেড়ায়; অথচ তার পরিণাম ভোগ করতে হয় অশ্রুভরা মুখে।'
>
> ধর্মীয় পুরোহিতদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করার অর্থ হল, নিজের উত্তরসূরিদের জন্যে ধ্বংস ডেকে আনা। যে বা যারা আমাদের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে আমাদের জনগণকে কষ্ট দেবে আমরা অবশ্যই তাদেরকে দেখে নেবো।
>
> আপনি আমাদের চোখে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ। আপনি আমাদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা এবং শত্রুপক্ষের ধ্বংস কামনা করে প্রার্থনা করুন। আপনার প্রয়োজন অনুসারে আমার অধীনস্থ গ্রামগুলো থেকে যে কোনো জিনিস গ্রহণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।'

পত্রের পাশাপাশি টিপু সুলতান ওই এলাকার গভর্নরকে এ নির্দেশ করেন, আপনি এখনই শংকর আচার্যের কাছে দু' শ স্বর্ণমুদ্রা ও প্রয়োজনীয় শষ্য নিয়ে হাজির হোন। রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে সারদা দেবীর মূর্তি পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে

www.boimate.com

যথাস্থানে পুনর্নির্মাণ করুন। এবং উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক হাজার অনাথের কাঙ্গালি ভোজ আয়োজন করুন।'[৭৮]

সুলতানের আন্তরিক ভালোবাসা ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গুরুজি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে একটি শাল উপহার দেন। যার জবাবে সুলতান সারদা দেবীকে পরানোর জন্যে একটি মূল্যবান কাপড় ও খোদ গুরুজির জন্যে একজোড়া শাল প্রেরণ করেন।

একবার ওই এলাকার গভর্নর সাইয়্যেদ মুহাম্মদকে পত্র মারফত এ নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, সে যেন তাৎক্ষণিক তার পক্ষ থেকে দেবীর জন্যে একটি পালকি গুরুজির হাতে অর্পণ করে। এবং যেকোনো সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সেখানে অতিরিক্ত আরো সিপাহি নিয়োজিত করে।

কিছু দিন পর গুরুজি মন্দিরের লুণ্ঠিত জিনিসপত্র ফেরত দেওয়ার দাবি নিয়ে পুনার মারাঠি সর্দার পরশুরাম ভাওয়ের কাছে গমন করে। সেখান থেকে তার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন সুলতান তার কাছে চিঠি লেখেন যে, 'আপনি দ্রুত ফিরে আসুন। কারণ, আমাদের সাম্রাজ্যে আপনারা বিদ্যমান থাকলে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। দেশের ফলনও বেড়ে যায়।'

একবার সুলতান তাকে রাজধানীতে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যদিও কোনো কারণবশত তিনি আসতে পারেননি।

এটি হলো মহিসুরের অসংখ্য মন্দির হতে স্রেফ একটি মন্দিরের ওপর সুলতানের বদান্যতার চিত্র। যা ধাড়ওয়ারের মুহাম্মদ গাউস মুজাবের সাহেব কানড়ি ভাষায় তার লেখা 'সুরঙ্গিনি মঠ ও টিপু সুলতান' নামক ৫০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও মুহিব্বুল হাসান, মাহমুদ খান ও আমজাদ আলী আশহারী প্রমুখও নিজ নিজ গ্রন্থে বিশদাকারে আলোচনা করেছেন।

মন্দিরে উপহার

নঞ্জনগড় তালুকের অধীনে 'কালালে' নামে একটি গ্রাম রয়েছে। সেখানকার স্থানীয় লক্ষ্মীকান্ত মন্দিরে এখন রূপার তৈরি চারটি পেয়ালা,

---

[৭৮]. মুহাম্মদ গাওস মুজাভের রচিত 'টিপু সুলতান আওর শ্রীরঙ্গিরি মঠ'। কৃতজ্ঞতায় মিস্টার মালা সাহেব ধাড়ওয়ার।

www.boimate.com

একটি প্লেট ও একটি পুষ্পদানি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যা সুলতানের পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো। সেই নগরীর শ্রী কনেশ্বর মন্দিরে সুলতান একটি একটি স্বর্ণখচিত পানপাত্র উপঢৌকন দিয়েছিলেন, যার নিম্নাংশে পাঁচটি অতিমূল্যবান জওহার যুক্ত করা ছিলো।

মিলকোট-এর নারায়ণস্বামী মন্দিরে মূল্যবান হীরা খচিত কিছু পানপাত্র, একটি বড় ঢোল এবং ১২টি হাতি পাঠিয়েছিলেন। এমনকি খোদ শ্রীরঙ্গাপত্তনামের রঙ্গনাথ মন্দিরে এখনও সুলতানের দেওয়া একটি কর্পূরদানি ও রূপার তৈরি ৭টি পানপাত্র এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

মহিসুর সেনাবাহিনী যখন ডান্ডিগাল কেল্লার ওপর আক্রমণ করে তখন সেখানে কেল্লার সামনের দিকে একটি মন্দির ছিলো। এই মন্দিরের ওপর যেন কোনো আঁচ না পড়ে এজন্যে তিনি কেল্লার পেছন দিক থেকে গোলা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মালাবারের 'গিরভাভীর' দখল করার সময় যখন মুসলিম সিপাহিরা সেখানকারে মন্দিরে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে তখন সুলতান অভিযুক্ত সিপাহিদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মন্দিরের পুনর্নির্মাণও করিয়ে দেন।

১৭৮০ সালে নবাব হায়দার আলী 'কানজীওয়ারাম'-এ একটি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। ১৭৯১ সালে যখন টিপু সুলতান সেখানে গমন করেন তখন মন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্যে নিজের পক্ষ থেকে ১০ হাজার রুপি অর্থ প্রদান করেন। তিনি নিজেই সেখানকার ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করেন। ওই উৎসবে যেই আতশবাজি পোড়ানো হয়েছিলো তার সমুদয় ব্যয় তিনি নিজেই বহন করেন।

১৭৮৯ সালে যখন তিনি ট্রাভাংকুরে ছিলেন তখন ত্রিচপুরে অবস্থানকালে ফৌজিদের খাবার রান্না করার জন্যে কিছু বাসন-কোষণ স্থানীয় 'ওড় রক নাথন মন্দির' থেকে ধার হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই বাসন-কোষণ ফেরত দেওয়ার সময় তিনি সেই মন্দিরে একটি বিশাল প্রদীপদানি উপহার দেন। মেলকোট নামক শহরের স্থানীয় মন্দিরে ধর্মীয় উৎসব পালন নিয়ে যখন খোদ হিন্দুদের দু'টি বৃহৎ গোষ্ঠী 'ওয়াডগোলভী' ও 'টংকালাভী'-দের মাঝে তীব্র ঝগড়া বেঁধে যায় তখন স্থানীয় হিন্দুদের

www.boimate.com

অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি দু' পক্ষের মাঝে সালিশের ভূমিকা পালন করেন। ওই সময় তিনি মন্দিরের পরিচালক বরাবর লেখা পত্রে এ নির্দেশ জারি করেন যে, সে যেন ব্যক্তিগতভাবে এ কাজের তত্ত্বাবধান করে, আগামী থেকে ভজন দু' গোষ্ঠীর রীতিতেই পালন করা হবে এবং দু' পক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সাম্য বজায় রাখা হবে'।

রাজপ্রাসাদের কাছেই মন্দির

শৈশব একজন অচেনা দরবেশ সুলতান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সুলতানের রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে যা বাস্তব হয়। তখন তিনি দরবেশের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে রাজপ্রাসাদের কাছেই একটি মসজিদ নির্মাণ করার উদ্যোগ নেন। যেহেতু রাজপ্রাসাদের কাছেই পূর্ব থেকেই শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির বিদ্যমান ছিলো, এজন্যে তার কাছাকাছি মসজিদ নির্মাণের জন্যে তিনি সর্বপ্রথম হিন্দুধর্মের পুরোহিত ও জনগণের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করেন। সুলতান তাদের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে মসজিদ নির্মাণ সমীচিন মনে করেননি।

তাদের কাছ থেকে অনুমতি লাভের পর তিনি নির্দিষ্ট স্থানে মসজিদে আ'লার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন। সুলতান চাইলে সম্রাট হিসেবে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাদের অনুমতির তোয়াক্কা না করে সেখানে মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করতে পারতেন।

মসজিদে আ'লার পাশেই ছিলো রঘুনাথ মন্দির। রাজপ্রাসাদ থেকে মন্দিরের দূরত্ব মাত্র একশ গজ। কেল্লার ভেতর 'নরসিমহা' ও 'গঙ্গাধরেশ্বা' নামে আরও দু'টি মন্দির ছিলো। মন্দিরগুলো থেকে প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যা ঘন্টির শব্দ সুলতানের রাজপ্রাসাদে পৌঁছুতো। কিন্তু সুলতান কখনই তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সামান্যতম বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি। খোদ ব্যাঙ্গালুরুতে সুলতানের প্রাসাদ লাগোয়া একটি মন্দির এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

মন্দিরের জন্যে স্থাবর সম্পত্তি

ড. সি কে ক্রেম-এর KERALA UNDER TIPU গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ব্যাঙ্গলোরি স্বরচিত গ্রন্থ 'টিপু কে তাযকিরে : মুখতালাফ আদওয়ার মে' লেখেছেন— শুধু কেরালার দক্ষিণ জেলার

www.boimate.com

একটি তালুকের ৬০ টি মন্দিরে টিপু সুলতানের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রতি বছর অনুদান দেওয়া হতো। শুধু 'গুরু ইয়ারিয়া মন্দিরকেই ছয় শ একর চাষযোগ্য ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিলো।'[৭৯]

মালাবারের বিভিন্ন মন্দির ও ব্রাহ্মণদেরকে যেসব জমিন টিপু সুলতান বিনা শুল্কে দিয়েছিলেন তার একটি তালিকা মুহিব্বুল হাসান সাহেব স্বরচিত 'তারীখে টিপু সুলতান' গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। যা নিম্নরূপ–

১. কালিকাটের উপশহর 'উমসুম'-এর 'ত্রিকণ্টেশ্বরুটা কোওয়াম মন্দির'-এর জন্যে ১৯৫ একর জমিন,
২. পুনানীর 'গুরুয়াবর মন্দির'-এর জন্যে ৫০৪ একর জমিন,
৩. চিলম বড় তালুক ইন্দর-এর মানুর মন্দিরের জন্যে ৭৩ একর জমিন,
৪. পুনানীর তিরওয়াঞ্চকসুলাম মন্দিরের জন্যে ২১২ একর জমিন,
৫. পুনানীর নমুদ্রিপদ মন্দিরের জন্যে ১৩৫ একর জমিন,

মহিসুরের অর্থমন্ত্রী পুর্নিয়া নিজেই স্বীকার করেছেন যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতি বছর স্থানীয় মুদ্রায় ১,৯৩,৯৫৯ সমপরিমাণ অর্থ অনুদান দেওয়া হতো। অথচ এর বিপরীতে মসজিদ-মাদ্রাসার জন্যে এর চেয়ে অনেক কম পরিমাণ অনুদান বরাদ্দ হতো।[৮০]

পেশওয়াগিরি মন্দিরের পুরোহিতকে গোলাপালির বিভিন্ন গ্রামের ওপর দিয়ে পণ্য আনা-নেওয়ার চাঁদা তোলার অধিকার দেওয়া হয়েছিলো। গাঞ্জীকোটার আঞ্জানিয়া স্বামী মন্দিরের 'রামচার' নামক ব্যক্তিকে কাডাপ্পা অন্তর্গত একটি বিশাল এলাকার জমিদারি প্রদান করেছিলেন। এ ছাড়াও ১৭৯৪ সালে কেল্লা বিল-এর ব্রাহ্মণ মহারাজা হরি পাকওয়াস-কে টিপু সুলতান পুরস্কার হিসেবে একটি বিশাল ভূখণ্ড প্রদান করেছিলেন।[৮১]

হিন্দুধর্মাবলম্বীদে : সামাজিক শুদ্ধি

সুলতান যদি গোটা রাজ্যের সকল প্রজাকে নিজ নিজ ধর্মানুসারে জীবন যাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি অমানবিক এবং

---

৭৯. 'টিপুকে তাযকিরে : মুখতালাফ আদওয়ার মেঁ। লেখক, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ব্যাঙ্গলোরি

৮০. তারীখে টিপু সুলতান। লেখক, মুহিব্বুল হাসান।

৮১. সহীফায়ে টিপু সুলতান। লেখক, মাহমুদ খান।

www.boimate.com

প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড ও রুসম-রেওয়াজ পালনের অনুমতি দানের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এজন্যে তিনি যেমন মুসলিম সমাজে বিদ্যমান বিদ'আত ও কুসংস্কার নিষিদ্ধ করেছেন, তদ্রূপ হিন্দু সমাজে বিদ্যমান কিছু অমানবিক রেওয়াজের ওপরই কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। যেমন, ওই যুগে মহিসুর রাজ্যের কিছু কিছু এলাকায় কিছু হিন্দু নারীকে একসঙ্গে চার স্বামীর ঘর করতে হতো। তার গর্ভ থেকে প্রসূত সন্তানের বংশধারা মায়ের সঙ্গে যুক্ত হতো। সুলতান এই রীতি নিষিদ্ধ করেন। মালাবারের মহিলাদেরকে বক্ষ উন্মুক্ত রেখে হাট-বাজার অতিক্রম করতে হতো। তিনি কঠোরভাবে এ রেওয়াজ নিষিদ্ধ করেন। কিছু কিছু মন্দিরে, বিশেষত মহিসুরের কালী মন্দিরে দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মানব বলি দেওয়া হতো। সুলতান সেটাও নিষিদ্ধ করেন।

হিন্দুদের মাঝে দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। বড় বড় শহরে হিন্দু নারীদের ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার বসতো। পতিতাবৃত্তি করার জন্যে দাসীদেরকে অন্দরমহলে রাখার প্রচলন ছিলো। টিপু সুলতান একটি রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা জারি করে দাসপ্রথা অসাংবিধানিক ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করেন। অভিজাত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে জারজ সন্তানের বিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেন।

কোর্গের হিন্দু নারীদের মাঝে এ প্রচলন ছিলো— যদি কোনো ঘরের জ্যেষ্ঠ ছেলে কোনো নারীকে বিয়ে করে তাহলে সে সামাজিকভাবে অন্য ভাইদের স্ত্রী বিবেচিত হবে। টিপু সুলতান এই অমানবিক রেওয়াজ নিষিদ্ধ করেন। হিন্দুদের 'লিঙ্গায়ত' নামের একটি গোষ্ঠী মন্দিরের ভেতর পুরুষ লিঙ্গের পূজা করতো। তিনি এই অশ্লীল প্রথা কঠোরভাবে নির্মূল করেন। হিন্দু কিষাণেরা বিয়ে-শাদি ইত্যাদিতে অপ্রয়োজনীয় রেওয়াজ পালন করতে গিয়ে প্রচুর অপচয় করতে অভ্যস্ত ছিলো। টিপু সুলতান সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্দেশনা জারি করেন— কোনো ব্যক্তি বিয়ে-শাদির উৎসবে তার সামষ্টিক সম্পদের একশ ভাগের এক ভাগের অধিক ব্যয় করতে পারবে না।

রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক আলোচিত নির্দেশনাগুলো অমান্য করলে তার জন্যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছিলো। কিন্তু ইংরেজরা বিষয়টিকে ধর্মীয় ব্যাপারে টিপুর অবৈধ হস্তক্ষেপের অজুহাত তুলে হিন্দুদেরকে উস্কানি দেওয়ার সীমাহীন অপচেষ্টা করেছিলো। বিস্ময়ের বিষয় হলো, তারা

www.boimate.com

এক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে যতোটুকু সফল হয়েছিলো, হিন্দুদের ক্ষেত্রে তার সিকি ভাগ সফলতাও পায়নি। হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোক এ কথা বিশ্বাস করতো যে, টিপু সুলতান তাদের উন্নতি ও শুদ্ধাচারের জন্যেই হিন্দু সমাজে এ সব সংস্কার করেছেন।

সুলতানের প্রতি হিন্দু প্রজাদের অপরিসীম ভালোবাসা

সামষ্টিকভাবে টিপু সুলতানকে তার হিন্দুপ্রজারা যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতো, তার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্য কোনো মুসলিম শাসকের জীবনীতে দেখা যায়নি। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সিংহভাগ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিপু সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে গেছে।

৪ মে ১৭৯৯ সালে সুলতান যেই স্থানে শাহাদাত বরণ করেন সেদিন তার লাশের চারপাশে অজস্র হিন্দু মহিলার লাশ পাওয়া গিয়েছিলো। সেখানে অনেক হিন্দু যুবতী নারীর লাশও ছিলো। খোদ ইংরেজ অফিসাররা টিপু সুলতানের প্রতি তার হিন্দু প্রজাদের সীমাহীন ভালোবাসা দেখে নিজেদের চরম বিস্ময় লুকাতে পারেননি। যখন সুলতানের জানাযা কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উত্থিত হয় তখন পথের দু' ধারে শত শত হিন্দু মহিলা মাতম শুরু করে দেয়। তারা দু' হাত দিয়ে মাটি তুলে নিজের মাথার ওপর ফেলছিলো আর করুণ স্বরে আক্ষেপ করছিলো।

ইংরেজরা যেদিন রাজধানী অবরোধ করে সেদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ সুলতানের বিজয় প্রার্থনা করে তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দিনভর উপবাস ছিলো। যদি এই হিন্দু জনগণের ওপর সুলতান সদাচার না করতেন তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে, একজন মুসলমান শাসকের জন্যে শত শত হিন্দু নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করবে! যদি টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজাদের মনে অসন্তোষ থাকতো তাহলে ইংরেজ কিংবা মারাঠারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে হিন্দু ধর্মের দোহাই দিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে তাদেরকে খুব সহজেই উস্কে দিয়ে বিদ্রোহ করাতে পারতো। কিন্তু পুরো সালতানাতে মহিসুরের ইতিহাসে এ ধরনের কোনো ঘটনা কোনো চরম সাম্প্রদায়িক ইংরেজ লেখকও লেখতে পারেননি। এ কারণেই দেখা যায় যে, যেসব গাদ্দার সুলতানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাদের তালিকায় মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু গাদ্দারের নাম অনেক কম; অথচ জনসংখ্যার বিচারে ওই সময় হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো।

www.boimate.com

খ্রিস্টান প্রজাদের সঙ্গে সুলতানের আচরণ

সাধারণত এ দুর্নাম ছড়ানো হয়েছে যে, টিপু সুলতান তার রাষ্ট্রের খ্রিস্টান প্রজাদের ওপর জুলুম করতেন। অথচ বাস্তবতা হলো, হিন্দুদের মতো তাদের সঙ্গেও তিনি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতেন। হ্যাঁ, তিনি কয়েকজন খ্রিস্টানকে শাস্তি দিয়েছেন; কিন্তু তিনি তাদের কাউকে স্রেফ ধর্মের কারণে শাস্তি দেননি। বরং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে তাদের বারবার লিপ্ত হওয়ার কারণেই এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

১৭৮২ সালের ইঙ্গ-মহিসুর দ্বিতীয় যুদ্ধে দক্ষিণ কিনারা (মাঙ্গালুর)-এর খ্রিস্টানরা ইংরেজদেরকে গোপন সমর্থন দেয়। বেদনুর দখল করার জন্যে তারা জেনারেল ম্যাথুজকে সহযোগিতা করে। এমনকি এ অভিযান সফল করার জন্যে তারা আর্থিক সহায়তা করে। বিপুল সংখ্যাক খ্রিস্টান পশ্চিম উপকূল থেকে পালিয়ে ইংরেজ শিবিরে যোগদান করে। জেনারেল ক্যাম্পবেল যখন মঙ্গলোর অবরোধ করে তখন ওই খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ইংরেজদেরকে এক হাজার বস্তা চাউল দেওয়া হয়। এ কারণে টিপু সুলতান তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট লোকদের অধিকাংশকেই কোচি ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে দেশান্তর করেন। গুরুতর অপরাধীদেরকে কয়েদ করে শ্রীরঙ্গাপত্তনাম ও চিত্রাদুর্গে রাখা হয়। ষড়যন্ত্রের হোতাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

কয়েদি খ্রিস্টানদেরকে সুলতান নিজ ধর্মানুসারে উপাসনা করার পূর্ণ অনুমতি প্রদান করেন। শুধু তাই নয়; 'গোয়া' নগরীতে অবস্থানরত ইংরেজ ভাইস রয়ের কাছে চিঠি লেখে জানান যে, বন্দি খ্রিস্টানদের উপাসনার কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে একজন পাদ্রি প্রেরণ করুন।

কিছু খ্রিস্টান সুলতানের এমন উদারতা ও মাহাত্ম্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ওই যুদ্ধে খ্রিস্টানদের যেই গির্জাগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে সেগুলোর পুনর্নির্মাণ করেন। যেসকল কয়েদি অনুতপ্ত হয়ে সুলতানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সুলতান তাদেরকে সসম্মানে মুক্ত করেন।

একজন আলেমে দ্বীন হিসেবে সুলতানের ব্যক্তিগত ধারণা ছিলো যে, ওই সময়কার ইংরেজরা ঈসা আলাইহি সালামের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এজন্যে তিনি তাদেরকে 'বেদ্বীন নাসারা' বলতেন। তাইতো

www.boimate.com

দেখা যায়, যখন ইংরেজ এডমিরাল ব্রিগেড জেনারেল মেকলোড মঙ্গলোর আক্রমণ করে এবং শক্তিপরীক্ষা করার জন্যে টিপু সুলতানকে রণাঙ্গনে নেমে আসার উস্কানি দেয় তখন তার উত্তরে সুলতান যেই চিঠি লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ—

'নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, আপনারা নিজেদেরকে ঈসা মসীহের অনুসারী বলে যে দাবী তুলে থাকেন, তা সঠিক নয়। আপনাদের এ দাবী অবাস্তব। কেননা আসল ইনযিলের কোথাও ত্রিত্ববাদ নেই। এই ত্রিত্ববাদ সম্পূর্ণরূপে মুশরিকদের কাজ। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শুধু এক আল্লাহর উপাসনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তুমি ইনযিলের শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে মদপান, শুকরের মাংস ভক্ষণ ও সুদখুরি শুরু করে দিয়েছো। তোমরা এমন প্রতিটি কাজে অভ্যস্ত যা শুধু ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেই নিষিদ্ধ নয়; মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গর্হিত।

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম এবং সকল সম্মানিত লোক তোমাদেরকে ঘৃণা ও অসন্তোষের চোখে দেখে। এ কারণেই তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমাদের ওপর অপরিহার্য হয়ে ওঠেছে।

আমি যা বলেছি, যদি তা সম্পর্কে তোমার সন্দেহ থাকে তাহলে স্থলভাগে নেমে এসো এবং ইসলামের মুজাহিদদের তলোয়ারবাজির স্বাদ আস্বাদন করে যাও এভাবে যে, সিপাহি সিপাহির বিরুদ্ধে এবং অফিসার অফিসারের বিরুদ্ধে নিজের প্রিয় যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে লড়াই করবে। সেদিনই এ ফয়সালা হবে— কারা আল্লাহর কাছে প্রিয়?' [মাহমুদ খান রচিত 'সহীফায়ে টিপু সুলতান]

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির নানা অপতৎপরতা সত্ত্বেও সুলতান এতোটাই উদার ও সম্প্রীতি ভাবাপন্ন ছিলেন যে, তিনি আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান বণিকদেরকে মহিসুরে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়; তিনি তাদের আর্থিক পৃষ্টপোষকতাও করেছিলেন। এমনকি তিনি তার সেনাবাহিনীর মাঝে ফরাসি খ্রিস্টানদেরকে চাকরি দিয়েছিলেন।

www.boimate.com

১৭৯২ সালে অর্ধমহিসুর হাতছাড়া হওয়ার পর তিনি গোয়া থেকে দেশান্তরিত খ্রিস্টানদেরকে ফিরিয়ে এনে বসবাসের সুযোগ করে দেন।

তবে এ কথা সঠিক যে, টিপু সুলতান তার রাজ্যে খ্রিস্টান মিশনারীদেরকে দ্বীন প্রচার করতে দেননি। তিনি কঠোরভাবে গোটা মহিসুরের হিন্দুদের নামে এ নির্দেশনা জারি করেছিলেন যে, তারা যেন বর্ণবৈষম্যের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে নিজ পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ না করে। যদি একান্তই অপারগ হয়ে ধর্মত্যাগ করতে হয় তাহলে তারা যেন নিজ রাজ্যের সম্রাটের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে। সুলতানের এই নির্দেশনার পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো, খ্রিস্টান মিশনারীরা যেন ধর্মপ্রচারের আড়ালে তাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত না করে এবং অর্থসম্পদের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে বলপ্রয়োগপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত না করে।

মাহদাভী মতাবলম্বীদের ওপর কঠোরতা ও তার কারণ

মহিসুরে 'মাহদাভী' নামে একটি গোষ্ঠী বাস করতো। তারা যদিও নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করতো; কিন্তু সাইয়্যেদ মুহাম্মদ জোনপুরীকে 'প্রতিশ্রুত মাহদী' বিশ্বাস করতো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার সঙ্গে তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিস্তর বুনিয়াদি ফারাক ছিলো। টিপু সুলতান তাদেরকে 'অমুসলিম' মনে করতেন।

এ গোষ্ঠীর অনেকেই মহিসুর প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলো। তাদের সঙ্গে সুলতান বরাবরই উদার নীতি অবলম্বন করতেন। তারপরও তারা সুলতানের সঙ্গে গাদ্দারির কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেনি। চতুর্থ যুদ্ধে টিপু সুলতানের পরাজয়ের ক্ষেত্রেও এ গোষ্ঠীর সদস্যরা বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিলো। তারা টিপুর বিরুদ্ধে গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছিলো।

এ গোষ্ঠীর লোকজন উচ্চশব্দে যিকির করতো। যার কারণে তাদের বিরুদ্ধে সবসময় আশপাশের প্রতিবেশীরা রাজদরবারে অভিযোগ তুলতো।

একবার ১৭৯১ সালে ফৌজি ক্যাম্পে এ গোষ্ঠীর সিপাহিরা সুলতানের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উঁচু স্বরে রাতভর যিকির করে অন্য সবাইকে পেরেশান করে রাখে। সুলতান তার নির্দেশ এভাবে প্রকাশ্যে অমান্য

www.boimate.com

করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। মহিসুরে এ গোষ্ঠীর কয়েক হাজার অনুসারী ছিলো। পরদিন সুলতান তাদের সবাইকে মহিসুর থেকে বের করে দেন। আসলে 'উচ্চস্বরে যিকিরের অভিযোগ' ছিলো তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের বাহানা মাত্র। আসলে তাদের একের পর এক ষড়যন্ত্রের কারণে সুলতান সীমাহীন ক্রুদ্ধ ছিলেন। শাস্তি দেওয়ার জন্যে তিনি উপযুক্ত কারণ খুঁজছিলেন।

কাজেই প্রমাণিত হলো, মাহদাভীদের প্রতি টিপু সুলতানের এই কঠোরতা ধর্মীয় কারণে ছিলো না; রাজনৈতিক বিবেচনায় সুলতান এ পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাদেরকে দেশান্তরিত করার ফলেই দেখা যায়, তারা নিজেদের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে তারা টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে।

www.boimate.com

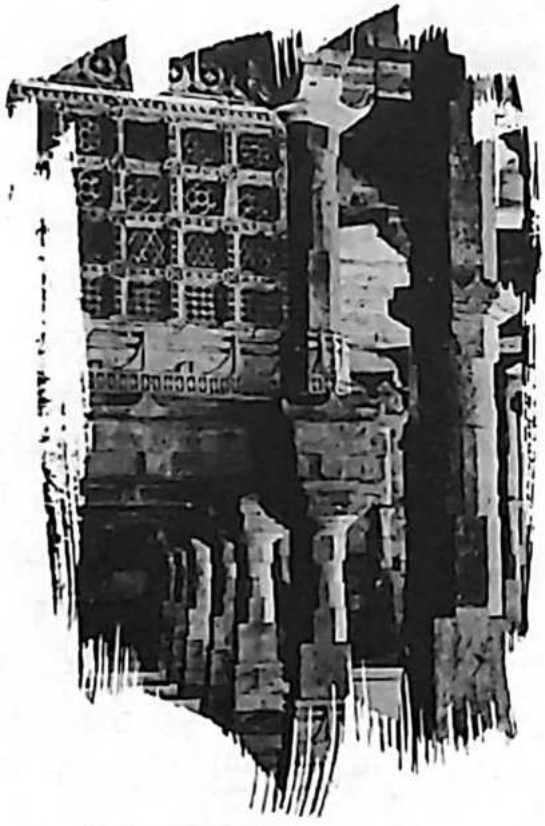

একবিংশ অধ্যায়

একজন মুসলমান ও ধর্মপ্রচারক হিসেবে টিপু সুলতানের অবদান

www.boimate.com

ইসলামি ঐক্য গড়ে তোলার স্পৃহা

টিপু সুলতান শুধু একজন শাসক ও রাজনীতিবিদই ছিলেন না; বরং একজন মানুষ ও একজন সাচ্চা মুসলমান হিসেবে তাঁর মাঝে এমন বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণের সমাহার ঘটেছিলো; যা তাকে অন্য সাধারণ মানুষ বা অন্য মুসলমানদের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিলো। অবশ্যই এর পেছনে তার পারিবারিক শিক্ষার বড় ভূমিকা ছিলো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাঁর ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া ও তাওফীক ছিলো। নয়তো একজন শাসকের মাঝে এতো সব ধর্মীয় ও দ্বীনি গুণাবলির সমাহার যেকোনো যুগেই অকল্পনীয়। নিম্নে আমরা কিছু বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরছি। যা নিঃসন্দেহে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য। টিপু সুলতানের অন্যান্য জীবনীগ্রন্থে যে বিষয়টির ওপর মোটেও আলোকপাত করা হয়নি।

ধর্মের ওপর কঠোর অবস্থান

সন্দেহ নেই, সুলতান একজন সাচ্চা দেশপ্রেমী ছিলেন। কিন্তু এরচেয়েও বড় কথা হলো, তিনি ইসলামের সাচ্চা সিপাহি ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের সেবা– দু'টো তার মাঝে সমান জাগ্রত ছিলো। তিনি একসঙ্গে এ দু' চেতনাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সবসময় এ কথা বলতেন যে, 'ইংরেজরা ইসলাম ও হিন্দুস্তান— দু'টোর জন্যেই ক্ষতিকর। তাদের অস্তিত্ব থেকে এ দেশ মুক্ত করা গেলে ইসলাম ও স্বদেশ— উভয়েরই অনেক বড় উপকার হবে। এ কারণেই তিনি ইংরেজদেরকে শুধু ধর্মেরই নয়; দেশেরও সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করতেন। টিপু সুলতান তাঁর সমগ্র জীবন ও সকল প্রচেষ্টা ইংরেজ-বিতাড়নের কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্যে আমরা একটি পত্র তুলে ধরছি, যা তিনি দিল্লির তৎকালীন মোঘল সম্রাট 'শাহ আলম'-কে লিখেছিলেন। যেখানে তিনি পরিষ্কার বলেন—

> 'হিন্দুস্তানের শাহানশাহ শাহ আলম সমীপেষু
>
> জনাবের পত্রখানি পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করছি। আপনি রাও বাল মুকুন্দদাসের মাধ্যমে যেই

www.boimate.com

উপহারসামগ্রী পাঠিয়েছেন, তা একদিকে আপনার সীমাহীন স্নেহের প্রমাণ বহন করে। অন্যদিকে আমাদের সমকক্ষদের তুলনায় আমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এর বিনিময়ে আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

এই খাদেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের জন্যে খ্রিস্টানদের নির্মূলে ব্যস্ত। তারা নির্মূল অভিযানের দাপট সইতে না পেরে একটি লাঞ্ছনাকর চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছে।[৮২] সেই ঘটনা এতোটাই বিখ্যাত যে, তার বিবরণ লেখার প্রয়োজনীয়তা এ মুহূর্তে অনুভব করছি না।

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ওপর ভরসা করে দ্বীনে মুহাম্মদির এই সেবকের একান্ত ইচ্ছে হলো, আজীবন দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করেই ক্ষ্যান্ত হবে।

আপনার প্রতি এই সেবক যেই একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা লালন করে তার প্রমাণ জানাতে আপনার সকাশে উপঢৌকন হিসেবে এক শ একুশটি স্বর্ণনির্মিত মোহর প্রেরণ করছে। আশা করি, সেগুলো গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করবেন।

মহাত্মনের কাছে অনুরোধ, সময়ে-অসময়ে অবশ্যই আপনার নির্দেশনা জানিয়ে বাধিত করবেন।[৮৩]

ওয়াস সালাম।

—টিপু সুলতান ২৩ জুন ১৭৮৫ ঈ.

একবার সুলতান দিল্লিতে অবস্থানরত বিশেষ এক বন্ধুর কাছে পত্র লেখেন— সে যেন পত্র মারফত দাকানের নিযামকে জানিয়ে দেয়— ইসলামের উন্নতিকল্পে আমাদের মুসলমানদের এক হওয়া দরকার। কাজেই সে যেন মারাঠিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে সে যুদ্ধে আমাদেরকে সঙ্গ দেয়। একজন মুসলিম নেতা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো, এমন পথ অবলম্বন করা যার মাধ্যমে দ্বীনে মুহাম্মদির শক্তিবৃদ্ধি হয়।

মুহাম্মদ বেগ নামে দিল্লির মোঘল দরবারে একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তাকে এক পত্রে টিপু সুলতান লেখেন—

---

৮২. সম্ভবত ১৭৮৪ সালের মঙ্গলোর সন্ধির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮৩. সহীফায়ে টিপু সুলতান

www.boimate.com

'মুহাম্মদ বেগ হামদান সমীপেষু ২ আগস্ট ১৭৮৬ ঈ.

যদিও ইতোপূর্বে আমার ও আপনার মাঝে চিঠিপত্রের মাধ্যমে কোনো যোগাযোগ হয়নি; কিন্তু দিল্লিতে অবস্থানরত আমাদের প্রতিনিধি বাল্মিকি দাসের মাধ্যমে আপনার সদাচরণ, বাহাদুরি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কথা জানতে পেরে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রচনার অভিপ্রায়ে চিঠিটি লেখছি। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে, আপনার এই বন্ধু এই অল্প ক'দিন আগে বেদ্বীন খ্রিস্টানদেরকে চরম লাঞ্ছিত করেছে। আপনি নিশ্চয়ই তার পূর্ণ বিবরণ জেনেছেন।

বর্তমানে আমাকে কিছু মুসলিম রঈসদের দমন করতে হচ্ছে।[৮৪] যারা শরীয়তের বিরুদ্ধে গিয়ে খ্রিস্টানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। যার কারণে আমি এতদসংক্রান্ত আল্লাহর বিধান ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীস[৮৫] একত্র করে দেশে-দেশে বিলি করছি। তার একটি অনুলিপি আপনার খেদমতেও পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পবিত্র ইসলামের দিকে তাকিয়ে আমাদের পরস্পরে ঐক্য গড়ে তোলা দরকার। আসুন, আমরা সব মুসলমান একতাবদ্ধ হই এবং খ্রিস্টানদের প্রতিহত করা আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য নিরূপণ করি। আশা করি, এতে দ্বীনে মুহাম্মদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন-বদিন উন্নতি লাভ করবে। বর্তমানে আমাদের মুসলমানদের যেই দুঃসময় যাচ্ছে তার অন্যতম বড় কারণ দিল্লির সালতানাতে হিন্দের দুর্বলতা। এখনও যদি মুসলমানগণ একতাবদ্ধ হয় তাহলে তাদের পক্ষে অতীতের শান-গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তখন খ্রিস্টানরা কোথাও পা ফেলার সুযোগ পাবে না। কাজেই যারা মুসলমানদের নেতৃত্বের আসনে আছেন, তাদের এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হবে না, যার জন্যে তাদেরকে কাল কিয়ামতের ময়দানে

---

৮৪. এ কথা বলে সম্ভবত দাকানের নিযাম ও কর্নাটকের নবাবের দিকে ইঙ্গিত করছেন।

৮৫. এ কথা বলে সম্ভবত 'তুহফাতুল মুজাহিদীন ও মুআইয়্যিদুল মুজাহিদীন' গ্রন্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

www.boimate.com

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে লজ্জিত বদনে দাঁড়াতে হবে।'[৮৬]

২১ ডিসেম্বর ১৮৮৬ সালে সাইয়্যেদ আহমেদ নামক একজন বুযুর্গকে টিপু সুলতান পত্র লেখেন যে, 'আপনার কাছে অনুরোধ করবো, আপনি ইসলামের উন্নতি ও শত্রুদের ধ্বংস কামনা করে দুআ করবেন।'

ইসলামি ঐক্যের এই ভাবনা থেকেই টিপু সুলতান সবসময় হায়দারাবাদের নিযাম ও কর্নাটকের নবাবের সঙ্গে সন্ধি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অথচ নবাব মুহাম্মদ আলী নিজ স্বার্থ ও মুনাফার দিকে তাকিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলেছিলো। যার কারণে তার ব্যাপারে সুলতান নিরাশ ছিলেন; কিন্তু নিযামের ব্যাপারে তিনি কখনই আশাহত ছিলেন না। তার সঙ্গে যদিও কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে; এতদসত্ত্বেও সুলতান তার শাসনামলের শেষ দিকে এসেও মৈত্রী গড়ে তুলতে মূল্যবান উপঢৌকন সমেত নিজস্ব প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন। নিয়মিত তার সঙ্গে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছেন। একবার সুলতান তাকে লিখেছিলেন, 'ইংরেজরা তাদের মজ্জাগত শঠতার মাধ্যমে আপনাকে আমার সঙ্গে ঐক্য গড়তে দিচ্ছে না। যদি আপনার ও আমার শক্তি জোটবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে মারাঠারা কোনোদিন আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করবে না।'

ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস থেকেই সুলতান দখলকৃত অঞ্চল নিযামকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এমনকি একবার তিনি দু' পরিবারের মাঝে বিয়ে-শাদির মাধ্যমে সম্পর্ক গভীর করার প্রস্তাবনাও পেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমান দু' পরিবারের গভীর বন্ধন গড়ে উঠার নিশ্চয়তা পাবে। এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে তিনি বিশেষ প্রতিনিধি মুহাম্মদ গিয়াসুদ্দীনকে পাঠিয়েছিলেন।

আফসোসের বিষয় হলো, নিযামকে তার পারিষদ কখনই ভালো পরামর্শ দেয়নি। তারা এ কথা বলে আত্মীয়তার প্রস্তাব ঠুকরে দিয়েছিলো যে, টিপু সুলতান নায়েক বংশোদ্ভূত। আর এ বংশ নিযামের বংশের চেয়ে নিম্নবর্গীয়। অথচ নায়েক কোনো গোত্রের নাম নয়। এটি মহিসুর

---

[৮৬]. করাচি থেকে প্রকাশিত 'বাসায়ির' ম্যাগাজিন ১৯৬৪ টিপু সুলতান সংখ্যা

www.boimate.com

সেনাবাহিনীর একটি পদবি মাত্র। কর্মজীবনের সূচনাতেই হায়দার আলী এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

টিপু সুলতান যখন তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন তখন তিনি আন্তর্জাতিক স্তরের মুসলিম সম্রাটদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিলো, মুসলিম জাহানকে ঐক্যের প্লাটফর্মে সমবেত করা। সে উদ্দেশ্যেই তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলে কূটনৈতিক দল প্রেরণ করেন। যেন তার প্রতিনিধিদল সেখানে গিয়ে উসমানি খলীফাকে সাম্রাজ্যবাদীদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে আগাম সতর্ক করে।

সুলতান যখন উসমানি খলীফার কাছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক সহায়তা কামনা করেন তখন তিনি ইসলামের হাওয়ালা দিয়েই অনুরোধ পেশ করেছিলেন।

তিনি সুলতান সলীমকে পত্রে লিখেছিলেন— 'আমরা বর্তমানে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। তাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আপনার সহায়তা কামনা করছি। তাদেরকে নির্মূল করার জন্যে আমাদের কিছু নৌবন্দর প্রয়োজন। আপনি যদি সেই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে বসরা নৌবন্দর ভাড়া দেন তাহলে এর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোর পরস্পরে বাণিজ্য বেগবান হবে। যা দ্বীনে মুহাম্মদিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলবে।'

কিন্তু ওই সময় তুর্কিস্তানের অবস্থা এতোটাই নাজুক ছিলো যে, খলীফার পক্ষে এর ওপর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ তখন তুর্কিস্তান নিজেই অস্তিত্ব-সংকটে ভুগছিলো।

ইসলামি ঐক্যের মিশন নিয়েই টিপু সুলতান ইরান-সম্রাট ও কাবুলের গভর্নরের সঙ্গে পত্রযোগে যোগাযোগ গড়ে তুলেন। তাঁর লেখা পত্রগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, তিনি যতোটা তাঁর নিজ সত্তা ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তারচেয়ে অধিক উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন একটি ইসলামি সালতানের নিরাপত্তা নিয়ে। এ কারণেই তিনি তাঁর প্রতিটি পত্রে এ কথা লিখেছিলেন— তাঁকে সহায়তা করা হলে তা ভারতবর্ষে ইসলামের সেবা এবং দ্বীনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা বহন করবে।

টিপু সুলতানের মনে সবসময় মুসলিম জাহানের প্রতি সহানুভূতি ও হীতাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত থাকতো। সেই ভাবনা থেকেই তিনি ১৭৮৬ সালে এ

www.boimate.com

মর্মে রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেছিলেন— হিন্দুস্তানের যে সব ভূখণ্ড ইংরেজদের হাতে চলে গেছে, সেখানকার মুসলমানদের জন্যে তার সাম্রাজ্যে চলে এসে বসতি গড়ে তোলার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। আমি শুধু এর অনুমতিই নয়; আহ্বান জানাই।'

সেই ফরমানে তিনি এ কথাও লিখেছিলেন— 'মুসলমানরা যেন মুলহিদদের রাজ্য ছেড়ে দেয়। তাহলে সুলতানের পক্ষে ওই লাঞ্ছিত কাফেরদেরকে পরাজিত করা ও কর প্রদানে বাধ্য করার পথ সুগম হবে। কারণ, ইংরেজরা এখন মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে বেড়াচ্ছে।'

টিপু সুলতান চাইতেন— মুসলমানরা যেন সম্মিলিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়। তাহলে মুসলমানগণ বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করে আরও ভালো অবস্থায় উন্নীত হতে পারবে। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে তিনি রাষ্ট্রীয় মুসলমানদের মাঝে জিহাদি উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে জুমু'আ ও দু' ঈদের ওপর ফারসি ভাষায় পঞ্চাশটি খুতবা রচনা করে 'মুআইয়্যিদুল মুজাহিদীন' নামে একটি বই সংকলন করেন। ওই বইটি শুধু মহিসুরেই নয়; বাঙ্গাল, হায়দারাবাদ, দিল্লি প্রমুখ নগরীতে বিতরণ করেছিলেন। বইটিতে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস সংকলন করা হয়। জিহাদের বিভিন্ন মাসআলা, ফাযায়িল ও আদাব ইত্যাদির ওপর তিনি 'ফাতহুল মুজাহিদীন' নামে আরেকটি গ্রন্থ সংকলন করান।

টিপু সুলতান যখন মসজিদে আ'লা নির্মাণ করেন তখন তার দেয়ালের ওপর জিহাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস অঙ্কিত করেন। টিপু সুলতান মহিসুরের সেনাবাহিনীকে 'মহিসুর বাহিনী' বা 'সুলতানি ফৌজ' নামে সম্বোধন করা পসন্দ করতেন না। তিনি তাদেরকে 'লশকরে মুজাহিদীন' নামে সম্বোধন করতেন।

টিপু সুলতান তাঁর রাজ্যে 'ইমামি' নামের একটি মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। ওই মুদ্রার এক পিঠে লেখা থাকতো–

دین احمد در جہاں روشن است فتح حیدر است.

'হায়দার আলীর বিজয় পৃথিবীতে মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মকে আলোকিত করছে।'

মোটকথা, টিপু সুলতান সারা পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উচ্চকিত করার কথা ভাবতেন। তিনি সবসময় কায়মনোবাক্যে এ দুআ করতেন—

www.boimate.com

'আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে ইসলামের পতাকা উচ্চকিত করেন।'

ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে পালন

টিপু সুলতান কঠোরভাবে ইসলামি অনুশাসন অনুসরণ করতেন। এক্ষেত্রেও তিনি ভারতবর্ষের যেকোনো সম্রাটের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন। তাইতো দেখা যায়, তার শাসনামলে মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের জন্যে নিষিদ্ধ ছিলো। এমনকি তার সেনাবাহিনীতে চাকরিরত বিদেশী সৈনিকদের জন্যেও মদপানের অনুমতি ছিলো না। এ কারণেই খেজুর ব্যতিরেকে অন্য যেসব ফল থেকে মদ তৈরি করা হয়; এমন সমস্ত ফলের গাছ টিপু সুলতানের নির্দেশে কেটে ফেলা হয়। যদিও এর কারণে মহিসুরের এক কোটি সমমূল্যের বার্ষিক আয় কমে আসে, তারপরও তিনি বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তা মেনে নিয়েছিলেন।[৮৭]

টিপু সুলতানের রাজদরবারে প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা, এমনকি সাধারণ নাগরিকদের জন্যেও মাথা নত করে কুর্নিশ করা নিষিদ্ধ ছিলো। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করতে পারে না। এমনকি তার আগমনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কারো জায়গা ছেড়ে দাঁড়ানোও তিনি পসন্দ করতেন না। একারণে তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে মসজিদে আ'লায় আসার জন্যে একটি বিশেষ দরোজা তৈরি করেন। যে দরোজা দিয়ে তিনি আগমন করলে অন্য মুসুল্লীগণ দেখতে পাবে না, এবং তাদের দাঁড়িয়ে সালাম জানানোর প্রয়োজন পড়বে না।

টিপু সুলতান চাইতেন, তাঁর সকল মুসলিম প্রজা ভুল বিশ্বাস, জাহেলি রুসম ও বিদআত থেকে পবিত্র থাকুক। হাজার বছর ধরে এদেশের মাটিতে হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাসের কারণে মুসলমানদের ওপর তাদের সংস্কৃতির যেই গভীর প্রভাব পড়েছে এবং এর ফলে তাদের মাঝে যেসব হিন্দুয়ানি প্রথা অজান্তেই অনুপ্রবেশ করেছে, সেগুলোর ব্যাপারে সতর্কতা জারি করে ৩ মে ১৭৮৬ সালে রাজ্যের বিভিন্ন গভর্নর ও কেল্লারক্ষী বরাবর জরুরি নির্দেশনা জারি করেছিলেন। সেখানে তিনি লেখেন—

---

৮৭. সাওয়ানেহে টিপু সুলতান। রচনায়, আমজাদ আলী আশহারী

www.boimate.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলমানদেরকে যেসব বিধান দেওয়া হয়েছিলো, পরবর্তীকালের মুসলমান সম্রাটরা সেগুলো ভুলিয়ে দিয়েছে। যার কারণে মুসলমানদের মাঝে দুর্বলতা চলে এসেছে। এজন্যে আমরা আল্লাহর তাওফীকে সেই বিস্মৃত বিধানাবলি —যা এই নির্দেশনার সঙ্গে খামবদ্ধ আছে— নিজ দস্তখত ও মোহর সহকারে পুনরায় জারি করছি। কাজেই পদাধিকারবলে আপনার দায়িত্ব হলো, আপনি সর্বোত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনার অধীনস্থদের মাঝে সেই বিধানগুলো প্রচার করে সমস্ত মুসলমানকে এ ব্যাপারে সচেতন করবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ কাজের উত্তম বিনিময় দিন। আপনার করণীয় হলো, আপনি এর অসংখ্য অনুলিপি তৈরি করে মুসলমান সমাজে বিতরণ করবেন। এই বিধানাবলি প্রচারের কাজে স্থানীয় কাযী ও গ্রামবিচারকদেরকেও নির্দেশ করবেন।'

ওই বিধান কার্যকর করার পর সুলতান মহিসুর থেকে সব ধরনের বাণিজ্যিক পীর-মুরিদি, দরগাহ-মাযারে মান্নত প্রেরণ ইত্যাদির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর বিনিময়ে তিনি গদ্দীনশীলদের জন্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংকের ভাতা প্রবর্তন করেন। আহমদনগর ও বেজাপুরের শাসনকাল থেকে মহিসুর রাজ্যে মুহাররম উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রুসম ও তাজিয়া মিছিলের প্রচলন ছিলো। সুলতান কঠোর হস্তে সেগুলো নিষিদ্ধ করেন। বিয়ে-শাদী কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন অর্থহীন প্রথা ও অপব্যয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। টিপু সুলতান যা নিষিদ্ধ করেন। এ সম্পর্কে তিনি যেই নির্দেশনা জারি করেছিলেন, সেখানে লেখেন—

'মুসলমানদের বিয়ে-শাদীর আনুষ্ঠানিকতার মাঝে বিধর্মীদের অনেক প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন, গায়ে হলুদ, তেল উৎসব, চুড়ি পরানো ইত্যাদি। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে গায়িকা নিয়ে আসা হয়। তাদের মুখে তখন অনেক অনুচিত নাম ও কথা-বার্তা চলে আসে। আমি এগুলো নিষিদ্ধ করছি। হলুদের পরিবর্তে মেহেদি, তেলের পরিবর্তে আতর ইত্যাদি ব্যবহারের নির্দেশ করছি। আশা করি, এভাবে মুসলমানদের বিয়ে-শাদীর

www.boimate.com

পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা শরীয়তসম্মত আকার ধারণ করবে। এই উদ্যোগগুলো সফল করতে কাযী সাইয়্যেদ হাজী মিসকিনকে বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়াবলির জন্যে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলো'।

সুলতান আরেকটি নির্দেশনা জারি করেন। তাহলো, মহিসুরের কোনো নাগরিক বিয়ের অনুষ্ঠানে তার মোট সম্পত্তির এক শতাংশের অধিক ব্যয় করতে পারবে না। ওই যুগে দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। সুলতানের দৃষ্টিতে যা ছিলো চরম অমানবিক কাজ। এজন্যে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করে, সব ধরনের দাস ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জারজ সন্তানের সঙ্গে কুলীন বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। সুলতান পুরো রাজ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন— কেউ যদি আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিয়ের ব্যয়ভার বহন করতে অসমর্থ হয় তাহলে তার বিয়ের পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে।

নবাব হায়দার আলী মহিসুরের মুদ্রার পিঠে হিন্দুদের বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি বহাল রেখেছিলেন; কিন্তু টিপু সুলতান মহিসুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই মুদ্রাগুলো সরিয়ে তদস্থলে নতুন মুদ্রার প্রচলন শুরু করেন। যার এক পিঠে লেখা ছিলো, أسد الله الغالب [আল্লাহর বিজয়ী সিংহ]। আর অন্য পিঠে লেখা ছিলো—

دین احمد در جہاں روشن است فتح حیدر است.

'হায়দার আলীর বিজয় পৃথিবীতে মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মকে আলোকিত করছে।'

টিপু সুলতানের আমলে রাষ্ট্রের অর্থায়নে প্রচুর অনাথ-আশ্রম নির্মাণ করা হয়েছিলো। যেখানে হিন্দু শিশুদেরকে ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করতে মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো।

কোর্গ (Coorg)-এর হিন্দুদের মাঝে এ প্রচলন ছিলো যে, পরিবারের সকল ভাইয়ের একজন স্ত্রী হতো। ওদিকে নায়ার গোষ্ঠীতে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী হতো। কেরালার হিন্দু নারীদের বক্ষ উন্মোচিত রেখে পথে-ঘাটে বের হওয়ার অভ্যাস ছিলো। দেব-দেবীদের কল্পিত সন্তুষ্টি কামনায় মানব বলির প্রচলন ছিলো। টিপু সুলতান তাদের এই অমানবিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন। আইন অমান্য করা হলে তার ওপর বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ড নির্ধারণ করেন।

www.boimate.com

টিপু সুলতানের এই ধর্মীয় সংস্কারের কারণে খোদ মুসলমানদের একটি মহল তার ওপর তীব্র অসন্তুষ্ট হয়েছিলো। ইংরেজরা তাদের সেই ক্রোধের আগুনে ঘি ঢেলে পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা শুরু করে দেয়। ইংরেজ জেনারেল কর্নওয়ালস ঘোষণা করে— তার সেনাবাহিনীর মুসলিম সিপাহিদের জন্যে মুহাররমের বিদআত ও কুসংস্কারে অংশগ্রহণের অনুমতি রয়েছে। শুধু তাই নয়; তাদের জন্যে কমিশনের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দও রাখা হয়। তারা ১ মুহাররম থেকে ১০ মুহাররম পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখে এবং মুসলমান সিপাহিদের জন্যে বিশেষ ছুটি ঘোষণা করে। এমনকি ওই মাসের জন্যে দ্বিগুণ বেতন ঘোষণা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, এর মাধ্যমে মূর্খ জনগণকে বোকা বানিয়ে তাদেরকে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ করা যাবে। জনগণের একাংশের এমন ক্ষোভ সত্ত্বেও টিপু সুলতান এসব বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ণ বা বিশেষ ছাড় দিতে সম্মত হননি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তগুলোর ওপর অবিচল ছিলেন।

একবার কোনো এক দরগার অভিভাবক ও সাজ্জাদানশনী এই বাণিজ্যিক পীর-মুরিদি ও দরগাহ-মাযারে মান্নত প্রেরণের ওপর সুলতানের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পুনর্মূল্যায়নে আবেদন জানায়। তখন জবাবী পত্রে সুলতান তাকে এ কথা লেখেন—

> 'ব্যাঙ্গালুরুর বনী শাহ সমীপেষু ১৪ ডিসেম্বর ১৭৮৬
>
> তুমি এ মর্মে আবেদন করেছো যে, তোমাকে যেন জাহিলি প্রথা পালন ও নযরানা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।
>
> তোমাকে অবহিত করা হচ্ছে— এ বিষয়ে আমরা যেই বিধান সঙ্গত মনে করেছি, তা পূর্বেই কার্যকর করেছি। এখন এর ওপর পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব নয়।'

ইসলামি সমাজ কায়েমের প্রয়াস

সুলতান মহিসুরের মাটিতে একটি আদর্শ ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল মুসলমানকে ইসলামি শরীয়তের একনিষ্ঠ অনুসারী বানাতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক নাগরিককে কোন অবস্থায় দেখতে উদগ্রীব ছিলেন, তার একটি যৎসামান্য চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা

www.boimate.com

হচ্ছে। যা সুলতান একটি রাষ্ট্রীয় নির্দেশনার অধীনে জারি করেছিলেন। তিনি নির্দেশনাটি তার রাজ্যের সকল কাযীর কাছে পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন। নির্দেশনাটি হলো—

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

'সালতানাতে খোদাদাদের সম্রাট টিপুর পক্ষ থেকে—

এই নির্দেশনাটি ব্যাঙ্গালুরু শহর ও তার অধীনস্থ সমস্ত এলাকার সব বিদ্যমান ও আগতব্য কাযী ও খতীবদের জন্যে।

১. আপনাকে কাযীর পদে, একটি শরয়ি স্থানে নিয়োগ দেওয়া হলো। কাজেই আপনার কর্তব্য হবে, আপনি নিজেও নিয়মিত নামায আদায় করবেন এবং সব ধরনের নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করবেন।

২. কোনো প্রজার প্রতি পক্ষপাত দেখাবেন না।

৩. ঘুষ গ্রহণ করবেন না।

৪. মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর উদ্বুদ্ধ করবেন।

৫. নেশাজাতীয় সকল বস্তু পরিহার করবেন।

৬. মদ্যপ ও অশালীন কাজে জড়িতদের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করবেন।

৭. জুমু'আ ও ঈদের নামাযে সকল মুসলমানকে সমবেত করবেন।

৮. আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা– সবার জন্যে দ্বীনি ও পার্থিব বিদ্যা আহরণের ব্যবস্থা করবেন।

৯. নর ও নারী যেই হোক না কেন, বিয়ের সময় সবার অনুমতি নেবেন।

১০. মসজিদসমূহ আবাদ করবেন। সেখানে নিয়মিত আযান ও নামাযের ব্যবস্থা করবেন।

উল্লেখিত কাজসমূহের সবক'টি ইসলামি শরীয়াহ। আল্লাহ নির্দেশিত এই মহান সংবিধানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উদাসীনতা করা যাবে না। এই নেককাজগুলো পূরণ করাই সর্বোত্তম ইবাদত। দ্বীন-দুনিয়ার সেবায় নিয়োজিত জনগণের জীবনচিত্র ও উপার্জনের সুচারু ব্যবস্থা উপহার দেওয়ার মাঝেই সালতানাতে খোদাদাদের কল্যাণ ও স্থায়ীত্ব নিহিত রয়েছে। আল্লাহর মাখলুকাতের কল্যাণ

www.boimate.com

ও উন্নতিকল্পে নিম্নে কিছু বিধি-বিধান পেশ করা হচ্ছে। যা বিনা অবহেলায় শতভাগ কার্যকর করা আপনার প্রধান দায়িত্ব। আপনার জীবনযাপনের জন্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভাতা নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই আপনি সরকারি নির্দেশনা অনুসারে আপনার পেশায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত ও কর্মব্যস্ত হবেন।

১. মসজিদের শিক্ষকের কর্তব্য হলো, তিনি সমস্ত মুসলমানের শিশু সন্তানদের সমবেত করে প্রতিদিন পাঠ শেখাবেন ও অনুশীলনী করাবেন।

২. সব মুসলিম শিশুর নাম, তাদের পিতা-মাতার নাম এবং তারা যেই কিতাবাদি পড়ছে, সেগুলোর তালিকা রেজিস্ট্রার অফিসে প্রেরণ করবেন।

৩. কোনো শিশু যদি পাঠকক্ষে অনুপস্থিত থাকে তাহলে শিক্ষক সে ব্যাপারে অবহিত করবেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার তালুকদার শিশুদেরকে খুঁজে বের করে শিক্ষকের হাতে অর্পণ করবে।

৪. এ জাতীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল মসজিদ, বা এ জাতীয় স্থানে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৫. শিশুদেরকে সর্বপ্রথম নামতা, এরপর গণিত শেখানো হবে।

৬. কোনো শিক্ষক যদি নিজেই গণিত শাস্ত্রে অজ্ঞ হন তাহলে প্রথমে তিনি কোনো গণিতবিদের কাছ থেকে শিখে নেবেন, এরপর ছাত্রদের শেখাবেন।

৭. এরপর তাদেরকে রচনা এবং বই পড়া ও বই লেখার পদ্ধতি শেখাবেন।

৮. মসজিদের খতীব ও মুয়াযযিন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার পর অবসর সময় শিশুদেরকে শিক্ষা দেবেন।

৯. জুমু'আর দিন পাঁচ জন ব্যক্তিকে কুরআন খতমের দায়িত্বে নিয়োগ দেবেন। যারা পূর্ণ এক দিবসের ভেতর কুরআন খতম দেবেন। খতম শেষে জুমু'আর রাতে তারা সালতানাতের উন্নতি ও তার শত্রুদের পরাজয়ের দুআ করবেন।

১০. কাযীর দায়িত্ব হবে, তিনি জুমু'আর দিন ঘোষণা দিয়ে সকল মুসলমানকে নামাযে উপস্থিত করাবেন। বিনা কারণে কেউ অনুপস্থিত হলে তার ওপর এক রুপি অর্থ জরিমানা করবেন। যদি

www.boimate.com

জরিমানার অর্থ পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকে তাহলে হাদীস অনুসারে তার ওপর যেই শাস্তি প্রজোয্য তা অবশ্যই তার ওপর কার্যকর করবেন।

১১. কাযীর দায়িত্ব হবে, তিনি আলোচিত কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন— কোনো নাগরিক যেন ব্যভিচারের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত না হয়। কেননা ব্যভিচারের কারণে শহর, নগর, গ্রামের ওপর ওপর বিপদাপদ নেমে আসে। অবৈধ সন্তান জন্ম নেয়। জনগণের মাঝে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, যিনা ও মদপান হলো সমস্ত মন্দকাজের উৎস। নিষিদ্ধ কাজের তালিকায় এ দু'টিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ। যদি কোনো কাযী এ কাজগুলো থেকে জনগণকে নিষেধ না করে, এগুলোর যাবতীয় পথ বন্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ না করে তাহলে শরীয়ত অনুসারে সে নিজেই অপরাধী বিবেচিত হবে এবং তার ওপর দণ্ড কার্যকর হবে।

১২. কাযী তার এলাকার আদমশুমারি করবেন। যার মাঝে এলাকার বাড়ি-ঘরের সংখ্যা, নারী-পুরুষ ও শিশুদের নাম, তাদের পেশা ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত সব তথ্য তুলে আনবেন। এরপর তা সরকারি দফতরে জমা দেবেন। একটি অনুলিপি নিজের কাছে রাখবেন।

১৩. যদি কোনো মুসলিম পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহলে কাযীর দায়িত্ব হলো, তিনি শিশুটিকে নিজের কাছে উপস্থিত করবেন এবং তার জন্যে নাম চয়ন করবেন। শিশুটি চার বছর বয়সে উপনীত হলে তার পাঠদান শুরু করার ব্যবস্থা করবেন।

১৪. রমযান মাসে সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে খাবার রান্না করে গরিব, অভাবীদের মাঝে বিতরণ করবেন। এ কাজটি সুস্পষ্টভাবে সম্পন্ন করার জন্যে একজন দায়িত্বশীল নিয়োগ দেবেন। যাবতীয় আয়-ব্যয় টুকে রাখার জন্যে একজন হিসাব-রক্ষক থাকবে। যিনি পূর্ণ তালিকা সংরক্ষণ করবেন। তার অজ্ঞাতে এক আনা পয়সাও ব্যয় করা যাবে না।

১৫. কাযীর করণীয় হবে, তিনি প্রতি মাসে খতীব, ইমাম ও কুরআন ইত্যাদির শিক্ষকদের উপস্থিতির পরিমাণ সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করবেন।

www.boimate.com

১৬. যদি কাযী প্রমাণিত চুরি, ব্যভিচার, ঘুষ ও মদপান ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্দেশিত দণ্ড কার্যকর না করেন তাহলে তাকে কাযীর পদ থেকে অপসারিত করা হবে।

১৭. যদি কাযী নিজেই ঘুষ নেয় বা বৈষম্য করে তাহলে সে নিজেই নিজের জাহান্নাম নিশ্চিত করলো। এমন কাযীকে অতিসত্ত্বর তার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে নতুন কাযী নিয়োগ দেওয়া হবে। তদ্রূপ সে যদি হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল প্রতিপন্ন করে তাহলে সে কাফের সাব্যস্ত হবে।

১৮. কাযীর করণীয় হবে, তিনি তার এলাকার সমস্ত মুসলমানের জীবিকা ও অর্থোপার্জনের উৎস সম্পর্কে পূর্ণ খোঁজখবর নেবেন। যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় যে, তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশল জানা আছে; কিন্তু আর্থিক দৈন্যের কারণে তা করতে পারছে না তাহলে তাকে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন পঞ্চাশ থেকে সর্বোচ্চ এক শ রুপি দেওয়া হবে।

১৯. যদি কোনো কৃষিজীবী নাগরিক অসচ্ছলতার কারণে কৃষি কাজ করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাকে দু'টি হাল, দুটি বলদ এবং জমির উপরিভাগ চাষযোগ্য করে তোলার খরচ হিসেবে ২০ থেকে ৩০ রুপি প্রদান করা হবে। ওই এলাকার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি তাকে চাষযোগ্য জমিন ও প্রয়োজনীয় শষ্যবীজ দেবে। যদি দু' বছরের মধ্যে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় তাহলে সে রাষ্ট্রের দেওয়া ঋণ কিস্তি আকারে শোধ করবে। এ কাজের জন্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির কাছ থেকে যেই অর্থ নেওয়া হবে তার রসিদ কাযী নিজস্ব দস্তখত ও সিলমোহর সহকারে প্রদান করবেন।

২০. কাযীর দায়িত্ব হবে, তিনি মসজিদ ও উপসানালয়গুলো ধুলো-বালি মুক্ত রাখবেন। নিয়মিত চুনকাম করবেন। গালিচা ও মাদুর পরিষ্কার করাবেন। নিয়মিত মসজিদে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ তদারকি করবেন। কোথাও কোনো ময়লা-আবর্জনা জমতে দেবেন না। মসজিদের চত্বরে বিভিন্ন ধরনের ফুলগাছ লাগিয়ে তা সাজিয়ে তুলবেন। যেন প্রতিটি মুসলমান মসজিদে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়। শুধু তাই নয়; বিধর্মীরাও যেন মসজিদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন।

www.boimate.com

কাযী মুসলমানদের ইবাদত-উপাসনা পাখির চোখে পর্যবেক্ষণ করবেন। যেন, তারা গুমরাহি ও বিভ্রান্তির পথ ছেড়ে শরীয়তের পথে উঠে আসেন।

২১. কাযী সবসময় অমুসলিম নর-নারীদের খোঁজ-খবর নেবেন। তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করবেন। উপদেশ, ভালো কথা ও মিষ্টি আলোচনার মাধ্যমে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করবেন। তাদেরকে সংগোপনে এমনভাবে দ্বীনের দিকে আহ্বান করবেন যে, তার গৃহের লোকরা যেন বুঝতে না পারে। কেউ যদি মুসলমান হওয়ার আগ্রহ পেশ করে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করবেন।

কোনো কারণে যদি কোনো নওমুসলিমের অর্থের প্রয়োজন পড়ে তাহলে সরকারিভাবে তার জন্যে অর্থসরবরাহের ব্যবস্থা করবেন। কোনো নওমুসলিম ব্যবসা-বাণিজ্যে পটু হলে তাকে পঞ্চাশ থেকে একশ রুপি ঋণ দেওয়া হবে। কোনো নওমুসলিম যদি কৃষিকাজে আগ্রহী হয় তাহলে তাকে দু'টি লাঙ্গল, বলদ ও চাষাবাদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ২০ থেকে ৩০ রুপি পর্যন্ত দেওয়া হবে। কৃষিকাজের জন্যে শষ্যবীজের পাশাপাশি চাষযোগ্য জমিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

২২. কাযী যদি নিজেকে এই পদের উপযুক্ত বিবেচনা না করে বা আদেশ-নিষেধ প্রয়োজন করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করে তাহলে সরকার তাকে প্রথমবার সতর্ক করবে।

২৩. শিশুশিক্ষার বেতন হিসেবে প্রতিটি ঘর থেকে মাসে সোয়া পয়সা উসুল করা হবে।

২৪. বিয়ে পড়ানো, শিশুর নাম রাখা ও পড়াশুনার হাতেখড়ির জন্যে এক রুপি করে বেতন নেওয়া হবে।

২৫. প্রতিটি মুসলিম পরিবার থেকে কাযীর জন্যে বছরে এক পয়সা উসূল করা হবে।

২৬. গাভী যবেহ করার জন্যে সোয়া পয়সা ও বকরি যবেহ করার জন্যে এক আনা পারিশ্রমিক গৃহিত হবে।

অনুলিখনে– **নবী মালিক**

৭ মাহে হাশেমী ১১৯৯ হি.

www.boimate.com

তাকওয়া ও খোদাভীরুতা

টিপু সুলতান অত্যন্ত খোদাভীরু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ যুদ্ধের পিঠে অতিবাহিত হয়েছে। অথচ এরপরও বালেগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা হয়নি। যুদ্ধ চলুক বা না চলুক, ফজরের নামাযের পর তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের আমলে কখনই ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়নি। সাধারণত তিনি এ সময় এক ঘণ্টা তিলাওয়াত করতেন। তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করার নির্দেশ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সবসময় ওযূ অবস্থায় থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। মাথার ওপর লাল পাগড়ি শোভা পেতো। অবশ্য শেষ বয়সে উলামায়ে কেরামের পরামর্শে তিনি সবুজ পাগড়ি পরিধান করতেন।

প্রশ্ন হলো, টিপু সুলতানের মুখে দাড়ি ছিলো কি? এ সম্পর্কে নিশানে হায়দারী গ্রন্থের লেখক মীর হুসাইন আলী কিরমানীর বক্তব্য হলো, তার মুখে লোম উদ্গত হতো না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আহলে বাইতের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা লালন করতেন। বিশেষত হযরত আলী রাদি.-এর প্রতি নিঃসীম শ্রদ্ধা ছিলো। তিনি তাঁর সবগুলো যুদ্ধাস্ত্রের ওপর তাঁর নাম أسد الله الغالب খোদাই করে নিয়েছিলেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম সা.-এর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিলো। হযরত ইলয়াস ও হযরত খিযির আলাইহিস সালামের নাম অনুসরণ করে দু'টি নৌজাহাজের নাম রাখেন, 'খিযরি' ও 'ইলয়াসি'। এ দু'টি জাহাজ তাঁর নৌবাহিনীর অন্যতম প্রধান রণতরী ছিলো।

তিনি তাঁর প্রশাসনকে 'সালতানাতে হায়দারি' বা 'সুলতানি' নামে অভিহিত করা পসন্দ করতেন না। তদস্থলে তিনি 'সরকারে আহমদি' বা 'সরকারে আসাদুল্লাহি' এবং অধিকাংশ সময় 'সালতানাতে খোদাদাদ' নামে অভিহিত করতেন। টিপু সুলতান বিশ্বাস করতেন— তাঁর এই সাম্রাজ্য কারও ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা নৈপুণ্যের ওপর গড়ে ওঠেনি; বরং এটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই পেয়েছেন। তিনি বিনয় প্রকাশ করে নিজেকে 'সুলতান' না বলে 'নবী মালিক' বলতেন। যার অর্থ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী'। শেষ জীবনে তিনি 'টিপু' ত্যাগ করে 'নবী মালিক' শব্দে স্বাক্ষরও করতেন।

www.boimate.com

যাবতীয় সরকারি চিঠিপত্র, নির্দেশনা ও ফরমানের ওপর নিজ হাতে بسم الله الرحمن الرحيم লিখতেন।

তাসাওউফ শাস্ত্রের প্রতি গভীর মনোযোগ ছিলো। খাবার খাওয়ার সময় অর্থহীন সময় নষ্ট না করে সবসময় কোনো না কোনো ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। তাঁর মুখ থেকে কেউ কোনো দিন কোনো অশ্লীল কথা শোনেনি। তাঁর শত্রুরাও এ কথা স্বীকার করেছে— তিনি অন্যায়ভাবে কারো ওপর আঘাত করেননি, কাউকে রক্তাক্তও করেননি।

অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ১৭৯২ সালে ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর চৌকিতে ঘুমানো পুরোপুরি ছেড়ে দেন। শাহাদাতের আগ পর্যন্ত তিনি জমিনে সাদা পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়তেন।

ওই যুগে গোটা হিন্দুস্তানে এ প্রচলন ছিলো— সম্রাট মসজিদে প্রবেশ করলে সব মুসুল্লি তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এর থেকে রক্ষা পেতে তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে মসজিদে আসার জন্যে একটি পৃথক দরোজা তৈরি করেন। ওই দরোজা দিয়ে তিনি এমনভাবে প্রবেশ করতেন যে, তাঁর আগমনের কথা মসজিদে অবস্থানরত কোনো মুসুল্লি জানতে পারতো না।

প্রতিবছর তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে শত শত ব্যক্তিকে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লায় পাঠাতেন। মহিসুরের নাগরিকরা যেন মক্কা-মদীনায় উমরা করতে পারে, এ জন্যে সারা বছর নৌপথে সেখানে যাওয়ার জন্যে জাহাজ আসা-যাওয়া করতো।

টিপু সুলতান নিজে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পসন্দ করতেন, তদ্রূপ অন্যদেরকেও পবিত্র থাকার উপদেশ করতেন। তিনি ব্যভিচার এতোটাই ঘৃণা করতেন যে, কোনো ব্যক্তি এ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতেন। তাঁর রাজমহলে কখনই কোনো অবিবাহিত মেয়েকে চাকরি দেওয়া হয়নি।

অন্য শাসকদের মতো তিনি অধিক বিয়ে করেননি। একই সময়ে তাঁর অধীনে কখনই দুয়ের অধিক স্ত্রী ছিলো না। মালাবারের ফৌজদার আরশাদ বেগের যখন জনৈক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্টতা গড়ে ওঠে তখন তিনি তাকে শক্ত ভাষায় সতর্ক করেন এবং ওই মহিলাকে কয়েদ করে দেশান্তর করেন। ইংরেজ সিপাহিদের সঙ্গে যখন কয়েকজন মুসলিম মহিলার অবৈধ অপকর্মের প্রমাণ হাতে আসে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই

www.boimate.com

মহিলাদের ফাঁসি কার্যকর করেন। যুদ্ধ চলাকালে মহিসুরের কোনো সিপাহির ব্যাপারে যদি শত্রুপক্ষের মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া যেতো সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন। শাহী মহলের যেই কামরায় তার পরিবারের মহিলা সদস্যরা অবস্থান করতো, ওই কামরার পথের ওপর সবসময় বাঘ বাঁধা থাকতো। উদ্দেশ্য হলো, কেউ যেন অসতোদ্দেশ্য নিয়ে সেদিকে যাওয়ার কথা কল্পনাও না করে।[৮৮]

টিপু সুলতানের দুনিয়াবিমুখতা ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে কিরমানী একটি বিস্ময়কর ঘটনা লেখেছেন। ঘটনাটি হলো, একবার রাজপ্রাসাদের দু'জন সুন্দরী রূপসী পরিচারিকার মনে অপকর্মের শখ জাগে। তারা রাতের অন্ধকারে সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করে তার পা দাবাতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুলতানের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাদের এই স্পর্ধা থেকে তিনি মুহূর্তেই অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে চাকরি থেকে বহিস্কার করে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দেন।

টিপু সুলতান দ্বীন ও ইসলাম সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতীক আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ১৭৮৬ সালে 'মুহাম্মদ খান বাহাদুর' নামের হায়দারাবাদের এক আমির একটি তাসবীহ ও একটি জায়নামায উপহার পাঠান। টিপু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাকে পত্রে লেখেন, 'আপনার উপহার পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। যদিও আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের কাছে বেশুমার পার্থিব উপহার রয়েছে; কিন্তু আপনার দেওয়া এ উপহারের সঙ্গে দ্বীনের নিবীড় সম্পর্ক থাকায় তা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করছি।'

টিপু সুলতানের নির্দেশে মহিসুরের প্রতিটি গ্রামে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে একটি করে মসজিদ ও বড় বড় শহরগুলোতে প্রয়োজন অনুপাতে একাধিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। মুয়াযযিন, ইমাম ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদান করা হতো।

লজ্জা ও শালীনতা

সুলতান লজ্জাশীল ছিলেন। হাত, পা ও চেহারা ছাড়া তার শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ কেউ কোনোদিন দেখতে পায়নি। সুলতানের সহধর্মিনীর ভাষ্য হলো, গোসলখানার ভেতরেও তিনি সর্বাঙ্গ ঢেকে গোসল করতেন।

---

[৮৮]. সালতানাতে খোদাদাদ

www.boimate.com

মালাবার অঞ্চল ছিলো উষ্ণ আবহাওয়ার এলাকা। যার কারণে সেখানকার স্থানীয় মহিলার বক্ষ খোলা রেখে ঘরের বাইরে বেরোতো। সুলতান কঠোরভাবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি এই রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেছিলেন— সবধর্মের সব নারী বাইরে বেরোলে তাকে অবশ্যই চেহারা ও দু' হাত ব্যতীত শরীরে অন্য সব অঙ্গ ঢেকে রাখতে হবে। কেউ এ আইন অমান্য করলে সে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। খোদ টিপুর সমবয়সীদের বক্তব্য হলো, নামায জায়েয হয় না, এমন কোনো পোশাক তিনি গোটা জীবনে পরেননি। অর্থাৎ তিনি কখনই পাতলা ও মিহি কাপড় পরতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

বুযুর্গি

টিপু সুলতান একজন বেলায়েতসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। যা জীবনের পদে পদে সবার সামনে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে স্রেফ এতোটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে, একজন প্রতাপশালী, ধনাঢ্য সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও পুরো জীবনে তাঁর থেকে কোনো অবৈধ বা ভুল বা শরীয়তপরিপন্থী কাজ প্রকাশ পায়নি।

১২০৪ হিজরী, মুতাবেক ১৭৯০ সালে ঈদুর ফিতরের দিন সুলতান শ্রীরঙ্গাপত্তনামে মসজিদে আ'লা উদ্বোধন করেন। সুলতানের দাওয়াতে ওই দিন মহিসুরের সকল উলামা-মাশায়েখ সমবেত হন। টিপুর ইচ্ছে ছিলো, এমন কোনো বুযুর্গ মসজিদটির উদ্বোধন করবেন যিনি সাহিবে তারতীব। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি যার কোনো ফরয নামায কাযা হয়নি। সমকালীন উলামা-মাশায়েখ সহকারে যেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের একজনেরও নিজের ব্যাপারে এ আত্মবিশ্বাস হয়নি যে, সে সাহিবে তারতীব। কাউকে অগ্রসর হতে না দেখে অগত্যা টিপু সুলতান নিজেই অগ্রসর হয়ে, ইমামতির দায়িত্ব পালন করলেন। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি সাহিবে তারতীব।

টিপু সুলতানের এতো দিনের লুকিয়ে রাখা এই বুযুর্গির সংবাদ জানতে পেরে সবাই বিস্মিত হল। কারণ, দিনের পর দিন যিনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তিনি যতো বড় আলেম হোন না কেন, তারপক্ষে নামায কাযা না রাখা নিতান্তই কষ্টকর। তিনি নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করতেন। এটি তাঁর কাছে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে, ইঙ্গ-মহিসুর যুদ্ধের শেষ দিন যখন ইংরেজরা রাজধানী চতুর্পাশ থেকে অবরোধ করে রেখেছিলো।

www.boimate.com

সেদিনও তিনি যথারীতি মসজিদে আ'লাতেই জামাতের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করেন, ক্বারী মোল্লাহ হাসানের পেছনে।

১৭৮৭ সালে যখন ধাড়ওয়ার কেল্লা দখলের উদ্দেশ্যে মহিসুরের সেনাবাহিনী আক্রমণ করে তখন মাঝপথে প্রমত্তা তুঙ্গভদ্রা নদী আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। সুলতানের নির্দেশে নীলনদের ওপর হযরত আমর ইবনুল আস রাদি. কৃত সুন্নত অনুসরণ করে একুশটি গোলা বর্ষণ করা হয়। ওই সময় যদিও তীব্র ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিলো। কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নদীর বুকের তরঙ্গ অকস্মাৎ থেমে যায়। নিস্তরঙ্গ শান্ত নদীর ওপর সুলতান প্রথমে নিজ ঘোড়া নামিয়ে দেন। দেখাদেখি অন্যরাও নদীতে ঘোড়া সমেত নেমে পড়ে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সবাইকে নিয়ে নদী পার হয়ে শত্রুশিবিরে আক্রমণ করে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেন। টিপুর এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে শত্রুরা কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলো। তখন তারাও সুলতানের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়েন। শাহাদাতের দিন সন্ধ্যায় যখন সুলতানের দাফন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছিলো। তখন সুলতানের শোকে অমৌসুমি কান্নায় আকাশের চোখেও জল চলে আসে। ওই দিন সবাই বুঝেছিলো— আদতেই তিনি অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন।

১৭৯৪ সালে টিপু সুলতান এক রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পান— নবীজি তাঁকে শাহাদাতের সুসংবাদ শোনাচ্ছেন। প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি সর্বপ্রথম শোকরানা নামায আদায় করেন। নামাযশেষে মুনাজাতে তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[৮৯]

তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত পাগড়ি পরিধানের সুন্নতের ওপর আমল করেছেন। শুধু তাই নয়; তিনি তাঁর সৈন্যদের ইউনিফর্মেও পাগড়ি যুক্ত করেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর যখন সর্বপ্রথম টিপু রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, সেদিনের শাহীদরবারের আনুষ্ঠানিকতা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত হয়। কারী সাহেব যখন সুরা হাশরের শেষ আয়াত لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون পড়েন তখন উপস্থিত সবার চোখে অনিচ্ছাতেই অশ্রু নেমে আসে। এরপর একজন

---

৮৯. সুলতানে জমহুর। লেখক, মুসলিম ভিলোরি।

www.boimate.com

বড় আলেমের মাধ্যমে সুলতানের মাথায় মুকুট রাখা হয়। এরপর টিপু সুলতানের নির্দেশে গরিব-মিসকিনদের ওপর বৃষ্টির মতো দান-খয়রাত করা হয়।

মোটকথা, টিপু সুলতান তাকওয়া ও খোদাভীরুতার বিচারে শুধু তাঁর সমকালের অন্য শাসকদের চেয়ে নয়; অতীতের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ থেকে অনন্য ও অদ্বিতীয় ছিলেন।

অধরা স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেলো

সুলতানের একটি স্বপ্ন ছিলো। অনেক দিন ধরেই তিনি সেই স্বপ্নটি মনের চোখে দেখে আসছিলেন। বিভিন্ন সময় সাথী-সঙ্গীদের কাছে তিনি তাঁর সেই স্বপ্নটি ব্যক্ত করেছেন। ইচ্ছে ছিলো, হজ আদায় করার পর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযায়ে আতহারে উপস্থিত হবেন। ফেরার পথে কারবালা যিয়ারত করবেন।

দুঃখের বিষয় হলো, সুলতানের সেই স্বপ্ন কোনোদিন পূরণ হয়নি। জীবন তাকে স্বপ্ন পূরণের অবসর দেয়নি। তীব্র ইচ্ছে সত্ত্বেও তিনি এর জন্যে সময় বের করতে পারেননি।

এর অন্যতম কারণ হলো, ওই যুগে নৌপথে হজ সম্পন্ন করতে ন্যূনতম ৭ থেকে ৮ মাস লেগে যেতো। শুধু আসা-যাওয়া করতেই ৪ থেকে ৫ মাস ব্যয় হতো। মাঝখানে হিজাযে এক-দু' মাস অবস্থান করতে হতো। কাজেই মোট ৭-৮ মাস সময় বরাদ্দ করতে হতো।

দ্বিতীয় কারণ হলো, তিনি যদি এতোটা দীর্ঘ সময় রাজ্যের বাইরে অবস্থান করেন তাহলে অবশ্যই সেই সুযোগের অপব্যবহার করে ইংরেজ ও দেশীয় গাদ্দাররা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করবে। এমনিতেই কুদরত তাঁকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হায়াত দিয়েছিলো। সর্বসাকুল্যে তিনি পৃথিবীতে ৪৯ বছর বেঁচে ছিলেন। প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার পর থেকে শাহাদাত লাভ পর্যন্ত জীবনভর মারাঠা, নিযাম ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তিনি তাঁর গোটা জীবনে একাধারে ৩-৪ মাস শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। ইংরেজদের ধকল সামলাতেই মারাঠা এসে হাজির। তাদের মুখ বন্ধ করতে না করতে অভ্যন্তরীণ একের পর এক বিদ্রোহ। যার কারণে তিনি মানসিকভাবে কখনই একদণ্ড বিশ্রাম পাননি। খোদ ইংরেজ ঐতিহাসিক 'ব্যুরাঙ্গ' এ কথা লেখেন— 'সুলতান রাজধানীতে খুব কম সময়ই থাকার সুযোগ পেয়েছেন।'

www.boimate.com

টিপু সুলতান হারামাইন শরীফাইনের প্রতি এতোটাই নিখাদ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লালন করতেন যে, যখন উসমানি খলীফার দরবারে কনস্ট্যানিপোলে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন তখন তাদের নির্দেশ করেছিলেন— তারা যেন ফেরার পথে অবশ্যই মক্কা-মদীনায় উপস্থিত হয়ে সেখানে এই উদীয়মান ইসলামি সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্যে বিশেষভাবে দুআ প্রার্থনা করে। টিপু সুলতান প্রতিবছর শত শত হাজীকে রাষ্ট্রীয় অর্থে হজে প্রেরণ করতেন। যারা উমরা পালন করার আগ্রহ ব্যক্ত করতো তাদের জন্যে সারা বছর বিশেষ ছাড়ে নৌপথে যাতায়াত করার সুবন্দোবস্ত ছিলো।

মোটকথা, গোটা জীবন জাতীয় স্বার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যস্ত থাকার কারণে কুদরত তাঁকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করার অবসর দেয়নি। এ কথা অসম্ভব নয় যে, এই আন্তরিক নিয়তের কারণে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাঁকে হাজীদের সঙ্গে হাশরের ময়দানে উত্থিত করবেন। ইনশা-আল্লাহ, পরলৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হাজীদের কাতারেই শামিল হবেন। আর এটা মহান আল্লাহর জন্যে অত্যন্ত সহজ কাজ।

রায়বেরেলীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের ফলেই টিপু পরিবারের দ্বীনের ওপর অবিচলতা

পৃথিবীর অনেকগুলো জীবন্ত ভাষায় এ পর্যন্ত টিপু সুলতানের ওপর অনেকগুলো গ্রন্থ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে। এ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের যতোজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ওপর লেখালেখি হয়েছে, তাদের মধ্যে টিপু সুলতান অবশ্যই এ দৃষ্টিকোণ থেকে অনন্য যে, তাঁর ওপর তাঁর ধর্মের বাইরের লেখকরাই অপেক্ষাকৃত বেশি লেখেছেন। যেসব লেখক ও ঐতিহাসিক সুলতানের ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণের ওপর গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন তারা সবাই এ কথার ওপর একমত— সুলতান তাঁর অসাধারণ ধর্মীয় উদারতা ও সৌহার্দ্যমূলক মনোভাব সত্ত্বেও নিজ ধর্মের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লালন করতেন। তিনি এতোটাই সাচ্চা ও একনিষ্ঠ ধর্মানুরাগী ছিলেন যে, ইসলামি শিক্ষা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে ও তাঁর রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে বিন্দু পরিমাণ ছাড় বা শিথিলতা প্রদর্শন করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আফসোসের বিষয় হলো, কোনো লেখক বা ঐতিহাসিক এখন পর্যন্ত এ তথ্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেননি যে, টিপু সুলতানের ভেতর এ পরিমাণ

www.boimate.com

দ্বীনদারি, তাকওয়া, ধর্মানুরাগ ও আদর্শের প্রতি অবিচলতা কোত্থেকে এসেছে? তিনি তাঁর জনগণের একটি বিরাট অংশের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও কী কারণে প্রচলিত বিদআত ও কুসংস্কার দমন করার ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেননি? অথচ ধর্মীয় বিষয়াবলির ক্ষেত্রে তাঁর পিতা হায়দার আলী ব্যক্তিগতভাবে এতোটা কঠোর ছিলেন না। যদিও তারা ছিলেন আরবের কুরাইশ বংশোদ্ভূত; কিন্তু বছরের পর বছর এদেশের মাটিতে হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার কারণে তাদের মাঝে ততোটা দ্বীনি স্পৃহা ও ইসলামি চেতনা জাগ্রত ছিলো না।

খোদ টিপু সুলতান যেই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশব-কৈশর অতিবাহিত করেছেন সেই দিভানাহল্লিতে কোনো উল্লেখযোগ্য দ্বীনি পরিবেশ বা ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। তেমনটি থাকলে হয়তো আমরা এ কথা বলার সুযোগ পেতাম যে, সম্ভবত সেই পরিবেশের দীক্ষা পেয়েই তাঁর মাঝে এমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছিলো!

এ বিষয়ে প্রচুর তত্ত্ব-তালাশের পর আমি শ্রদ্ধেয় উসতায মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর নির্দেশনায় লাখনৌর নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানায়ে শিবলী নু'মানীতে উপস্থিত হই। সেখানে রায়বেরেলীর হাসানী পরিবারের ব্যক্তিগত পারিবারিক গ্রন্থাগার রয়েছে। সেখানে তালিকার শীর্ষেই সাইয়্যেদ হায়দার আলী টোংকির وقائع أحمدي নামে একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। ওই পাণ্ডুলিপিতে আমি ঐতিহাসিক একটি তথ্যের খোঁজ পেয়ে যাই। তাহলো, ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ সংগ্রামী আন্দোলন ও খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক ছিলেন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.। তাঁর আপন নানা শাহ আবু সাঈদ সাহেব ও তাঁর ছেলে শাহ আবুল লাইস সাহেবের সঙ্গে টিপু সুলতানের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিলো। টিপুর পরিবারের সদস্যরা এই দুই মহান বুযুর্গকে প্রধান মুরশিদ ও উপদেষ্টা মনে করতেন। টিপুর পরিবারের সবাই নকশবন্দি সিলসিলায় শাহ আবুল লাইস রহ.-এর হাতে বাই'আতাবদ্ধ ছিলেন।

সেই বুযুর্গদের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও চিন্তা-চেতনা টিপু সুলতানের অন্তকরণে, অস্থি-মজ্জার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছিলো। তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত দীক্ষার আলোকেই টিপু সুলতান মুহাররমের বিভিন্ন রুসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির

www.boimate.com

পীর-মুরিদি নিষিদ্ধ করেছিলেন। যুগে যুগে বুযুর্গঋদ্ধ এ পরিবারটি বিদআত বিরোধী ভূমিকার কারণে গোটা দেশে অসামান্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নয়তো ওই যুগে ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিলো। তারা জাহিলী রুসম, রেওয়াজ ও বিদআত, কুসংস্কারের অন্ধ ভক্ত ছিলো। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে এভাবে শক্ত হাতে বিদআত দমন করাটা ছিলো টিপু সুলতানের জন্যে অত্যন্ত কঠিন পদক্ষেপ।

শাহ আবু সাঈদ রহ. আপন ছেলে শাহ আবুল লাইসকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারত থেকে হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নবাব হায়দার আলীর যুগে সালতানাতে খোদাদাদে আগমন করেন। সেখানে তাঁর হাতে হাজার হাজার মুসলমান বাই'আত হয়েছিলেন। শাহ আবুল লাইস রহ. হজ সম্পন্ন করার পর প্রথমে মাতৃভূমি রায়বেরেলী আগমন করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি সালতানাতে খোদাদাদে গমন করে স্থায়ীভাবে নিবাস পাতেন। সেখানে অবস্থান করে তিনি সুলতানের পরিবারের দ্বীনি ও রূহানি পথনির্দেশনা আঞ্জাম দিতেন।[৯০]

তিনি পশ্চিমপ্রান্তের উপকূলীয় নগরী মাঙ্গালোরে নিবাস পাতেন। ওই যুগে এলাকাটির নাম ছিলো কোড়িয়াল বন্দর। সেখানে ১২০৮ হিজরী, মুতাবেক ১৭৯৩ সালে টিপু সুলতানের শাহাদাতের ছয় বছর পূর্বে ইনতিকাল করেন। অবশ্য শাহ আবু সাঈদ ১১৯৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন মাতৃভূমি রায়বেরেলীতে।[৯১]

১৮২২ সালে যখন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. অর্থাৎ শাহ আবুল লাইস রহ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র বিশাল কাফেলা সহকারে হজের নিয়তে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন, তখন পথিমধ্যে কলকাতায় তিন মাস অবস্থান করেন। ওই সময় কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় টিপু সুলতানের নির্বাসিত শাহযাদাগণ ও তাদের জননী বসবাস করতেন। তারা যখন সাইয়্যেদ সাহেবের কলকাতা আগমনের কথা শুনতে পান তখন টিপু সুলতানের সহধর্মিনী যেহেতু পূর্ব থেকেই জানতেন— তার স্বামী টিপু ও তার শ্বশুর

---

৯০. ওয়াক্বায়ে' আহমদী। লেখক, সাইয়্যেদ হায়দার আলী টোংক।

৯১. নুযহাতুল খাওয়াতের। লেখক, হাকীম আবদুল হাই হাসানী।

www.boimate.com

নবাব হায়দার আলীর রায়বেরেলীর হাসানী পরিবারের দু' বুযুর্গ শাহ আবু সাঈদ রহ. ও শাহ আবুল লাইস রহ.-এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিলো। তাঁরা দু'জন তাঁর কাছে নকশবন্দি সিলসিলায় বাইআত হয়েছিলেন। সেহেতু তিনি তার এক কর্মচারী 'মুহাম্মদ কাসেম'-কে সাইয়্যেদ সাহেবের খেদমতে এ কথা জানতে প্রেরণ করেন যে, সাইয়্যেদ আহমদ সাহেব কার সন্তান? যদি তিনি শাহ আবু সাঈদ ও শাহ আবুল লাইস সাহেবের পরিবারের সন্তান হন তাহলে আমরা তার দ্বারস্থ হতে চাই।

তখন সাইয়্যেদ সাহেব বাহকের মাধ্যমে এ তথ্য প্রেরণ করেন যে, হযরত শাহ আবু সাঈদ রহ. আমার আপন নানা। আর শাহ আবুল লায়স সাহেব আমার মামা।

তখন টিপু সুলতানের সহধর্মিনীর অনুরোধে শাহ সাহেব সব শাহযাদাকে বাইআত করেন। খোদ টিপু সুলতানের স্ত্রী ও তার একমাত্র কন্যাও শাহী পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যের সঙ্গে বাইআত হন।

টিপু সুলতানের স্ত্রীও আল্লাহভীরু ছিলেন। তিনি অষ্টপ্রহর যিকিরে মগ্ন থাকতেন। সাইয়্যেদ সাহেবের মনোযোগ ও অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে তিনি অধিকতর রুহানি উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। মৌলভী আবদুর রহীম নামের এক নাস্তিক শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে সুলতানের কয়েকজন ছেলের মন-মানসিকতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সাইয়্যেদ সাহেবের পরামর্শে টিপু সুলতানের সহধর্মিনী আবদুর রহীমকে পরদিন থেকে পড়াতে নিষেধ করে দেন।[৯২]

---

[৯২]. সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ। রচনায়, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী। সুভনিয়র ১৯৯৪ ঈ. পশ্চিমবঙ্গ মসজিদ কল্যাণ পরিষদ

www.boimate.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

একজন আলেম ও বিদ্যানুরাগী হিসেবে টিপু সুলতানের অবদান

www.boimate.com

জ্ঞান-গভীরতা

নবাব হায়দালী আলী নিজে যদিও নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু প্রিয় সন্তান ও মহিসুর সিংহাসনের ভাবী উত্তরসূরীর শিক্ষার পরিপূর্ণ বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলাও করেননি। শৈশব থেকেই তিনি তাঁর জন্যে দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন। ফৌজি অফিসার গাযী খানের তত্ত্বাবধানে তার সামরিক প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা রেখেছিলেন। যার ফলে দেখা যায়, টিপু সুলতান তরুণ বয়সেই যে কোনো জ্ঞানগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রসঙ্গ উঠলে দক্ষতার সঙ্গে তার ওপর ব্যাপক আলোচনা করতে পারতেন। যুবক বয়সেই তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও শিক্ষিতদের একজন হিসেবে পরিগণিত হতেন। মহাকাশ বিজ্ঞান, ভুগোল, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। আরবি লিপি সম্পর্কেও তিনি বেশ প্রাজ্ঞ ছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিপু সুলতান ৪৫টিরও অধিক গ্রন্থ স্বহস্তে লিখেছেন বা প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। খাবারের দস্তরখানে বসে অর্থহীন বাক্যালাপ না করে তিনি কোনো ভালো বই পড়তেন। তাঁর রাজদরবারে সবসময় একদল উলামায়ে কেরাম অবস্থান করতেন। তিনি সাধারণ আলাপচারিতা বা চিঠিপত্র প্রধানত ফারসি ভাষায় বলতেন, লেখতেন। এর বাইরে কানড়া, মারাঠি, তেলেগু ও আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। উরদূ ভাষা অনায়াসে বলতে-লেখতে পারতেন। ফরাসি ভাষাও শিখে নিয়েছিলেন। ইংরেজিটাও খানিকটা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। কাজেই ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা তার মুখে অনায়াসে উচ্চারিত হতো। মাযহার ও তাসাওউফ সংক্রান্ত কিতাবাদি পড়তে ভালোবাসতেন। সুযোগ পেলে মানতিক, দর্শন, ইতিহাস, তাফসীর, হাদীস ও ফেকাহর কিতাবাদিও অধ্যয়ন করতেন। রাতে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেওয়ার পর চোখে ঘুম নেমে না আসা পর্যন্ত কোন না কোন বই অবশ্যই পড়তেন।

টিপু সুলতানের রাজপ্রাসাদে তাঁর একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিলো। বিভিন্ন স্থান থেকে অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখা মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করে

www.boimate.com

তিনি সেই গ্রন্থাগারে একত্র করেছিলেন। সেই গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানের জন্যে তিনি একজন দায়িত্বশীল নিয়োগ দিয়েছিলেন।

বই-পুস্তক বাঁধাই করার জন্যে তিনি রাজধানীতে একটি আলাদা শাখা স্থাপন করেছিলেন। বই বাঁধাই করার পর প্রচ্ছদের উপরাংশে আল্লাহ, মুহাম্মদ, আহলে বাইত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের নাম লেখতেন। কোথাও উপরে سلطنت خداداد [সালতানাতে খোদাদাদ] ও নিচে كافی الله [আল্লাহ কাফী] লেখতেন। কোনো কিতাব পড়া হয়ে গেলে তার ওপর স্বহস্তে অবশ্যই স্বাক্ষর ও সিলমহর এঁটে দিতেন। গ্রন্থাগারের সিংহভাগ কিতাবের ওপর তাঁর স্বাক্ষর আঁটা ছিলো। যা এ কথা প্রমাণিত করে যে, তিনি সেখানকার অধিকাংশ বই পড়েছেন।

তিনি সবসময় স্বাক্ষর করতেন ক্যালিওগ্রাফি শৈলীতে। প্রথম জীবনে 'টিপু সুলতান' লেখতেন। কিন্তু শেষ জীবনে বিনম্রতাবশত নিজেকে 'নবী মালিক' পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। এবং সে অনুযায়ী স্বাক্ষর করতেন।

টিপু সুলতানের হাতের লেখা কেমন ছিলো? এ প্রসঙ্গে আমরা ক্লার্ক প্যাট্রিকের মন্তব্য তুলে ধরছি। তিনি হচ্ছেন শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর কোম্পানির পক্ষ থেকে টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারের ইংরেজ ব্যবস্থাপক। তিনি বলেন, 'টিপুর হাতে লেখা অন্যদের হাতের লেখার চেয়ে সবসময় স্বতন্ত্র হতো। তাঁর সবগুলো লেখা সংক্ষিপ্ত ও সারনির্যাস সম্বলিত হতো।'

ইংরেজ ঐতিহাসিক 'মিল' বলেন, 'একজন পূবদেশীয় শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। টিপু সুলতান কতোটা বিদ্যানুরাগী ছিলেন তা জানতে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, তিনিই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বাদশাহ, বা একমাত্র বাদশাহ যিনি তাঁর ছেলের উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্যে ১৭৯২ সালে হিন্দুস্তানের বাইরে ইউরোপীয় দেশ ফ্রান্স প্রেরণের পরিকল্পনা করেন। বিষয়টি নিয়ে ফ্রান্সে নিযুক্ত মহিসুরের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সেখানকার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন সেখান থেকে উত্তর আসে যে, 'সাহেবযাদাকে প্রথম ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। এরপর বাৎসরিক ৫০ হাজার রুপি ব্যয়ভার বহন করতে হবে।'

টিপু সুলতান তাদের সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু এর ক'দিন পরই ইংরেজদের সঙ্গে মহিসুরের তৃতীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে তিনি আর বিষয়টির ওপর মনোযোগ দিতে পারেননি।

www.boimate.com

১৭৮৫ সালে টিপু সুলতান ফরাসি ভাষায় একটি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত মূল্যবান বই দেখতে পান। জ্ঞানমুগ্ধ টিপু বইটিকে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করান। টিপু সুলতানের বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানচর্চার প্রতি তীব্র আগ্রহের আরেকটি প্রমাণ হলো, ১৭৮৫ সালে তিনি শ্রীরঙ্গাপত্তনামে 'জামিউল উমুর' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে একসঙ্গে দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। এর বাইরে তিনি মহিসুরের সকল কাযী ও স্থানীয় মসজিদসমূহের ইমামদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন— 'তারা যেন অবশ্যই প্রতিটি মসজিদে একটি করে মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে শিশুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত থাকবে। এতোটুকুই নয়; প্রতিটি শিশু কী পড়ছে, তার পড়াশুনার কতোটুকু অগ্রগতি হয়েছে, সে বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ সুলতানের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। যদি কোনো শিশু বিনা কারণে মাদরাসায় না আসে তাহলে স্থানীয় তালুকদার তাকে মাদরাসায় উপস্থিত করার ব্যবস্থা নেবে।'

সুলতানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি

সুলতান শহীদ হওয়ার পর তার রাজপ্রাসাদে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে সুলতানের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ইংরেজদের হস্তগত হয়। সেখানে অসংখ্য হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি বিভিন্ন শাস্ত্রের ১৮৮৯ টি বিরল গ্রন্থ ছিলো। অধিকাংশ বইয়ের ওপর স্বর্ণের পাত ছিলো। কিছু কিছু বইয়ের বাঁধাই ছিলো হীরা-জওহরাত খচিত। এ ধরনের বইগুলো তিনি বিভিন্ন প্রশাসন, জ্ঞানী ও আলেমদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। কিছু বই গোয়ালকান্ডা ও বেজাপুর সম্রাটদের। কিছু পাণ্ডুলিপি কাডাপ্পা প্রভৃতি অঞ্চল জয় করার সময় পেয়েছিলেন। কিছু কিতাব নবাব হায়দার আলী ১৭৮০ সালে কর্নাটকের নবাব মুহাম্মদ আলীর ভাই নাসিরুদ দৌলা আবদুল ওয়াহাব খানের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সেখানে আওরঙ্গজেব আলমগীর রহ.-এর লেখা কুরআনুল কারীমের একটি বিরল অনুলিপি ছিলো। যা আরবি হস্তলিপির বিখ্যাত শৈলী খততে নাসখে লেখা ছিলো। ওই যুগেই ওই অনুলিপিটির দর উঠেছিলো এক লক্ষ রুপি। যা এখন ইংল্যান্ড-সম্রাটের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে বিদ্যমান রয়েছে।

১৮০৯ সালে চার্লস স্টুয়ার্ট ইংল্যান্ড থেকে টিপুর গ্রন্থাগারের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে। বিবরণীটি ছিলো ৩৬৪ পৃষ্ঠার বিশাল কলেবর সম্বলিত। বিবরণীটির নাম ছিলো—

www.boimate.com

DISRIPTIVE CATALOGE OF THE ORIENTAL LIBRARY OF THE LATE TIPU SULTAN OF MYSORE

আমজাদ আলী আশহারী তাঁর 'সাওয়ানেহে টিপু সুলতান' গ্রন্থে সুলতানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে উদ্ধারকৃত কিতাবাদির একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন। তালিকা থেকে বুঝে আসে যে, সুলতানের গ্রন্থাগারের নিম্নের শাস্ত্রগুলোর কিতাবাদি বিদ্যমান ছিলো—

শাস্ত্র	সংখ্যা	ভাষা
১. কুরআন কারীম	৪৪	আরবী
২. ইলমে তাফসীর ও তাজবীদ	৪১	আরবী
৩. হাদীস শাস্ত্র	৪৬	ফারসি-৭, আরবি- ৩৯
৪. তাওহীদ ও রিসালাত [আকাইদ ও ইলমে কালাম]	৪৬	আরবি-৩৫, ফারসি- ১১
৫. তাসাওউফ শাস্ত্র	১১৫	আরবি- ১৮, ফারসি- ৯৭
৬. চিকিৎসা বিজ্ঞান	৬২	আরবি- ১৪, ফারসি- ৪৮
৭. ব্যাকরণ [নাহু-সরফ]	৪৫	আরবি-৩৩, ফারসি- ১২
৮. ভাষা-বিজ্ঞান	২৯	আরবি-১৫, ফারসি-১৪
৯. মাকতুবাত	৫৩	আরবি-২, ফারসি-৫১
১০. ইতিহাস ও জীবনী	১১৮	আরবি-১০, ফারসি- ১০৮
১১. ফিকাহ	৯৫	আরবি- ৬৫, ফারসি- ৩০
১২. নীতি-নৈতিকতা ও শিষ্টাচার	২৪	আরবি-১, ফারসি- ২৩
১৩. দর্শন	৫৪	আরবি
১৪. জ্যোতির্বিজ্ঞান	২০	আরবি-৮ , ফারসি-১২
১৫. গণিত শাস্ত্র	৭	আরবি-৪ , ফারসি-৩
১৬. ওযীফা ও আওরাদ	৩৫	আরবি
১৭. বিজ্ঞান ও শিল্পকলা	১৯	আরবি-১ , ফারসি-১৮
১৮. কবিতা ও সাহিত্য	১৯০	আরবি-১৮ , ফারসি-১৭২
১৯. হিন্দি ও উরদু কবিতা	২৩	হিন্দি ও উরদু
২০. হিন্দি ও উরদু গদ্য	৪	হিন্দি ও উরদু
২১. ঘটনা ও গল্পসমগ্র	১৮	ফারসি
২২. বিবিধ	২	তুর্কি

www.boimate.com

ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিলো যে, এই গ্রন্থাগারের বইগুলো জ্ঞানচর্চা ও মূল্যমান— দু' দিক থেকেই অত্যন্ত দামী; এজন্যে তারা সবগুলো বই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কলকাতা ও এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু ১৮০৩ সালে যখন ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ কলকাতা বন্ধ হয়ে যায় তখন এই বিরল পাণ্ডুলিপি ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৯৩]

টিপুর স্বহস্তে বা নির্দেশনায় সংকলিত বইয়ের তালিকা

এ দৃষ্টিকোণ থেকেও টিপু সুলতান পৃথিবীর অপরাপর সম্রাটদের থেকে আলাদা যে, যদিও তাঁর ১৭ বছরের শাসনামলের প্রায় পুরোটাই জন্মস্থল থেকে দূর-দূরান্তের শহরে, শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অতিবাহিত করতে হয়েছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি এতোটাই জ্ঞানপিপাসু ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ৪৫-এরও অধিক গ্রন্থ বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজে লেখেছেন, বা নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে লিখিয়েছেন। নিম্নে আমরা এ ধরনের কয়েকটি কিতাবের তালিকা তুলে ধরছি—

১. তুহফাতুল মুজাহিদীন [ফাতহুল মুজাহিদীন] (تحفة المجاهدين)

মুসলমান সিপাহিদের জন্যে জিহাদের মূলনীতি ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত এ কিতাব টিপু সুলতান নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ১৭৮৬ সালে ফারসি ভাষায় সংকলন করান। বইটির সংকলন করেন যাইনুল আবিদীন শাস্ত্রি। যিনি হায়দারাবাদের নিযামের উযির মীর আলমের ভাই ছিলেন।

বইটিতে মুসলিম মুজাহিদদের জন্যে আকাইদ, মাসায়িল, ইবাদত, লেনদেন, শত্রুদের ওপর আক্রমণ, গেরিলা আক্রমণের পদ্ধতি ও নীতিমালা, পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে আট অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির শেষভাগে একটি 'সংযুক্তি' (ضميمة) রয়েছে। যেখানে জরুরী পরিস্থিতিতে সৈনিকদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন, আহত হলে বা অত্যধিক রক্ত বেরোলে যুদ্ধের ময়দানে তাৎক্ষণিকভাবে

---

[৯৩]. ত্রিমাসিক বাসায়ির, করাচি ১৯৬৪ ঈ.

www.boimate.com

কী করতে হবে? সাপ দংশন করলে তার বিষ কীভাবে নিঃশেষ করবে? এ জাতীয় কিছু টুকিটাকি ধরনের আলোচনা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। লেখক বইটির ভূমিকায় লেখেন—

> 'এই অনভিজ্ঞ যাইনুল আবিদীনকে পরম শ্রদ্ধেয় সুলতান নির্দেশ করেছেন যে, তোপখানা, সৈন্য পরিচালনা, সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খোদ সুলতান যেই নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করেছেন, আমি যেন তা এক মলাটে সংকলন করি'।

এ বইটির একটি অনুলিপি এখনও শ্রীরঙ্গাপত্তনামের দরিয়া দৌলতবাগের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

২. মুয়াইয়াদুল মুজাহিদীন (مؤيد المجاهدين)

টিপু সুলতানের নির্দেশে এ বইটি সাধারণ মুসলমানকে জিহাদের ওপর উদ্বুদ্ধ করার জন্যে জুমু'আর খুতুবার আলোচনা হিসেবে ফারসি ভাষায় 'নাস্তা'লীন' হস্তলিপিতে সংকলন করা হয়েছিলো। সেখানে প্রতি মাসে চারটি খুতবা হিসেবে পুরো বছরের জন্যে ৪৮ টি খুতবা ছাড়াও দু' ঈদের জন্যে দু' খুতবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক বর্ণনা অনুসারে এ বইটিও যাইনুল আবিদীন শাস্ত্রী সংকলন করেছিলেন।

৩. মিফতাহুল কুলুব [মাফরাহুল কুলুব] (مفتاح القلوب)

এ দু' নামেই বইটি প্রসিদ্ধ। ১৭৮৫ সালে সুলতান নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ফারসিতে সঙ্গীত শাস্ত্রে হাসান আলী ইজ্জত নামের একজন বড় জ্ঞানীকে দিয়ে লেখান। বইটির শুরুতে লেখক নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন যে, 'বইটির বিষয়বস্তু টিপু সুলতান নিজেই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।' বইটি যদিও বুনিয়াদিভাবে ফারসি ভাষায় লেখা; কিন্তু ভেতরের আলোচনার শব্দাবলি দখিনী ভাষায়। মহিসুর রাজ্যের সঙ্গীত ও তার অতীতের ইতিহাস সম্পর্কে বইটিতে আলোচনা করা হযেছে। অধিকাংশ কবিতা দখিনী ভাষা থেকে আহরিত। অবশ্য ফারসি কিছু কবিতাও রয়েছে। বইটিতে একটি ভূমিকা, ছ'টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্ট রয়েছে।

মীর মাহমুদ হুসাইন এমএ তাঁর লেখা 'دربار سلطاني كا ايك شاه كار' [দরবারে সুলতানি কা এক শাহকার] গ্রন্থে এ সম্পর্কে লেখেন যে, এটি

www.boimate.com

টিপু সুলতানের একটি অনবদ্য রচনা। জ্ঞানবৃত্তিক, শাস্ত্রীয় ও সাহিত্যগত বিচারে এটি অবশ্যই একটি রাজকীয় কীর্তি। পাশাপাশি এটি টিপু সুলতানের শাসনামলের একটি অতিমূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি টিপুর সৃজনশীল মেধা ও তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বচ্ছ দর্পণ বটে। বইটিতে তাঁর রাজদরবারের জ্ঞানবৃত্তিক ও সাহিত্যগত পরিবেশের চিত্রায়ণ ফুটে ওঠেছে। সালতানাতে খোদাদাদের সাহিত্যচর্চা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দখিনী ভাষায় সবচেয়ে বেশি এ বইটিতেই ফুটে ওঠেছে। মোটকথা, এটি সঙ্গীত শাস্ত্রের সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন।' [দরবারে সুলতানি কা এক শাহকার, লেখক- মীর মাহমুদ হুসাইন এমএ]

বইটির একটি অনুলিপি মহিসুর ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত রয়েছে।

৪. ওয়াকাইয়ে মানাযিলে রোম (وقائع منازل روم)

এটি মূলত একটি ভ্রমণকাহিনী। আমরা জানি, ১৭৮৬ সালে টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে উসমানি খলীফার খেদমতে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। সেই প্রতিনিধিদলের মূখ্যসচিব খাজা আবদুল কাদের সুলতানের নির্দেশনায় তার ভ্রমণের আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ করেন। প্রতিনিধিদল দীর্ঘ এ সফরে যেসব স্থানে অবস্থান করে সেগুলোর পূর্ণ বিবরণ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া যাত্রাপথে যেই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে, তাদের বিবরণীও বইটিতে উঠে এসেছে।

৫. ফিকহে মুহাম্মাদি [ফাতাওয়ায়ে মুহাম্মাদি] (فقه محمدي)

হানাফী ফেকাহ অনুসারে ইবাদত ও লেনদেনের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে টিপু সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যের তিনজন বড় আলেম– কাযী সাইয়্যেদ আলী, শায়খ আহমদ ও সাইয়্যেদ গোলাম মুসতফার মাধ্যমে সংকলন করেন। এ কিতাবে মোট ৩১৩ টি অধ্যায় ছিলো। কিতাবটির একটি অনুলিপি মহিসুরের ওরিয়েন্টাল রিসার্চ লাইব্রেরিতে এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

'তারীখুন নাওয়ায়েত' গ্রন্থের লেখক নবাব আযীয জঙ্গ বাহাদুর-এর গবেষণামতে টিপু সুলতান শাফেয়ী মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। সম্ভবত তিনি সংখ্যাগুরু জনগণের মাযহাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ কিতাবটি ফিকহে হানাফী অনুসারে সংকলন করিয়েছিলেন।

www.boimate.com

৬. ফতেহনামায়ে টিপু সুলতান [আযরাবে সুলতানী]

১৭৮৭ সালে এ কিতাব হাসান আলী ইয্যত সুলতানের নির্দেশে সংকলন করেন। সেখানে দখিনী ভাষায় মারাঠা ও নিযামের সঙ্গে ১ মে ১৭৮৬ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৭ পর্যন্ত টিপু সুলতানের যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ৩১ টি ফারসি শিরোনামের অধীনে ১৩৮৮ টি পংক্তি রয়েছে। কেমন-যেন এটি একটি মসনভী।

৭. রিসালায়ে দুররে তরযে খত্তে মুহাম্মাদী
(رسالة در طرز خط محمدي)

সুলতান যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে অনেক বড় হস্তলিপি-শিল্পী (خطاط) ছিলেন; এজন্যে তিনি ফারসি ভাষায় এ প্রসঙ্গে তাঁর আবিস্কৃত নিয়মাবলির ওপর বইটি সংকলন করেন। সেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত হস্তলিপি 'খততে মুহাম্মাদী'-এর পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেন। বইটির মাঝে খোদ টিপুর হাতে লেখা বাবরী খত (হস্তলিপি)-তে লেখা بسم الله الرحمن الرحيم রয়েছে।

৮. যাবারজাদ (زبرجد)

জ্যোতির্বিজ্ঞান টিপু সুলতানের কাছে বেশি প্রিয় ছিলো। এজন্যে তিনি এ শাস্ত্রে 'মুনশী গোলাম হুসাইন মুনজিম আসী'-কে দিয়ে বইটি লেখান। বইটির একটি অনুলিপি এখনও হায়দারাবাদের সালারজঙ্গ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

৯. আহকাম (أحكام)

জনগণের জন্যে সহজ ভাষায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি ও নিয়মাবলি সম্পর্কে টিপু সুলতান ফারসি ভাষায় বইটি সংকলন করান। এতে মোট ৮টি অধ্যায় রয়েছে। এ বইয়েরও একটি অনুলিপি সালারজঙ্গ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

১০. তিব্ব দরাজুন (طب دراجن)

টিপু সুলতানের নির্দেশে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে বইটি সংকলন করা হয়। বইটির একটি অনুলিপি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ গ্রন্থাগারে এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। যার কয়েক স্থানে খোদ টিপু সুলতানের স্বাক্ষরও রয়েছে।

www.boimate.com

১১. হুকুমনামা (حكمنامة)

১৭৮৪ সালে টিপু সুলতান উসমানি খলীফার কাছে একটি কূটনৈতিক দল প্রেরণ করেন। তাদেরকে সেখান থেকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড যাওয়ার নির্দেশ করেছিলেন। সেই কূটনৈতিক দলটির উদ্দেশে সুলতানের প্রেরীত নির্দেশনামূলক ৮টি চিঠিই বইটির প্রতিপাদ্য। চিঠিগুলোতে তাদের জন্যে নির্দেশিত কূটনৈতিক শিষ্টাচার ইত্যাদির বিশদ বিবরণ উঠে এসেছে। যেমন, কূটনীতিবিদের কার্যপদ্ধতি, ফরাসিদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির কর্মকৌশল, সুলতানের জন্যে ক্রয়যোগ্য বস্তুর তালিকা ইত্যাদি। [ত্রিমাসিক বাসায়ের, করাচি। ১৯৬৪ ঈ.]

১২. সুলতানুত তাওয়ারীখ (سلطان التواريخ)

মহিসুর সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও টিপু সুলতানের পিতৃপুরুষদের জীবনালেখ্য সম্পর্কে সুলতানের নির্দেশে বইটি সংকলন করা হয়। কারো কারো অভিমত হলো, এ বইটিও যাইনুল আবিদীন শাস্ত্রী সংকলন করেছেন। এর বিপরীতে অন্য কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, বইটি মুনশী মির্যা যাইনুল আবিদনী আবেদ সংকলন করেছেন।

১৩. জলওয়াহনামা (جلوه نامة)

সুলতানের নির্দেশে এ বইটিও সংকলন করা হয়েছিলো। এতে বিয়ে-শাদী, আনন্দ-উৎসবে পরিবেশিত সঙ্গীতগুলো একত্র করা হয়েছে।

১৪. খোলাসায়ে সুলতানী [আহকামুন নিসা]

উরদু ভাষায় রচিত এ বইয়ে মহিলা বিষয়ক মাসআলাসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটি সংকলন করেন কাযী গোলাম আহমদ। ১২২ পৃষ্ঠার কলেবর সমৃদ্ধ এ বইটি সুলতানের শাহাদাতের মাত্র এক বছর আগে ১২১২ হিজরীতে সংকলন করা হয়।

১৫. খোলাসায়ে সুলতানী (خلاصة سلطاني)

এটি উরদূ ভাষায় রচিত আরেকটি বই। এখানে হানাফী মাযহাব অনুসারে মহিলাদের বিভিন্ন মাসআলা সংকলন করা হয়েছে। বইটির সংকলনক সাইয়্যেদ ইমামুদ্দীন ও কাযী উমর ফারুক। বইটির একটি অনুলিপি ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি মহিসুরে সংরক্ষিত রয়েছে।

www.boimate.com

১৬. যাদুল মুজাহিদীন (زاد المجاهدين)

একাধিক অধ্যায় সমৃদ্ধ এ বইয়ে গদ্যাকারে আকাইদ ও ইবাদতের মাসআলা-মাসায়িল আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। বইটির শেষাংশে একটি কবিতা রয়েছে। বইটি লেখেন কাযী গোলাম আহমদ। ইংল্যান্ডের বৃটিশ মিউজিয়ামে বইটির একটি অনুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

১৭. হুকুমনামায়ে উকালায়ে হায়দারাবাদ (حكم نامة وكلاء حيدراباد)

১৭৮৯ সালে টিপু সুলতান ইংরেজদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে হায়দারাবাদের নিযামের দরবারে ব্যক্তিগত মুখপাত্র হিসেবে কুতুবুল মালিক ও আলী রেযা প্রমুখকে প্রেরণ করেন। মিশনের শুরুতে তিনি তাদেরকে যেই নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং সুলতানের পক্ষ থেকে তাকে যেই মূল্যবান উপহার পাঠানো হয়েছিলো, তার বিবরণী বইটিতে উঠে এসেছে।

১৮. হুকুমনামায়ে আতালীক (حكم نامة أتاليق)

শাহযাদাদের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পন্ন করার জন্যে যেসব শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো, তাদের জন্যে টিপু সুলতান একটি স্বতন্ত্র 'নির্দেশিকা' প্রস্তুত করেছিলেন। তারই নাম 'হুকুমনামায়ে আতালীক'।

১৯. হুকুমনামায়ে জাসুসাঁ

সুলতানের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত যেসব গোয়েন্দা গোটা সালতানাতে মাঠপর্যায়ে কাজ করতো, তাদেরকে প্রদত্ত নির্দেশনা এ বইয়ে সংকলন করা হয়েছে।

২০. কিতাবে আখবার (كتاب أخبار)

সুলতান সম্পর্কিত অতিগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ঘটনাবলি এ বইয়ের প্রতিপাদ্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুলতানকে নিয়ে যেসব সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, সেখান থেকে চয়িত সংবাদ নিয়েই এই আয়োজন।

www.boimate.com

২১. মুফরাদাত দর ইলমে তিব্ব (مفردات در علم طب)

বইটি ফারসি ভাষায় লেখা। এতে প্রকৃতি ও উদ্ভিৎজগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ইংরেজি ও ফরাসি প্রবন্ধ থেকে অনুবাদ একত্র করা হয়েছে। বইটিতে বিভিন্ন চারাগাছের ছবিও রয়েছে।

২২. রোযনামচায়ে উকালায়ে হায়দারাবাদ (روزنامچه وكلاء حيدراباد)

সুলতানের পক্ষ থেকে হায়দারাবাদের নিযামের কাছে যেই কূটনৈতিক মিশন পাঠানো হয়েছিলো, সেই মিশনের সদস্য ছিলেন কুতবুল মালিক ও আলী রেযা। বইটি তাদের স্বহস্তে লেখা দিনলিপির সংকলন।

২৩. জাওয়াহিরুল কুরআন (جواهر القرآن)

সুলতানের নির্দেশে বইটি সংকলন করেন কাযী গোলাম আহমদ। এ বইয়ে কুরআনুল কারীমের মুজিযীয় ক্ষমতা তথা প্রতিপক্ষকে বাকরুদ্ধ করার শৈলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির একটি অনুলিপি লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

২৪. বাহরুল মানাফে' (بحر المنافع)

শিশুর জন্ম, প্রতিপালন ইত্যাদি সম্পর্কে ১৭৯৪ সালে সুলতানের নির্দেশে মৌলুদ মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি এ পুস্তিকা সংকলন করেন।

২৫. তুহফায়ে মুহাম্মাদী (تحفه محمدي)

বইটিতে আরবির বর্ণমালার ক্রমবিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ও চিকিৎসা-পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সুলতানের নির্দেশে মুহাম্মদ নাসীর আফশার তুর্ক বইটি সংকলন করেন।

২৬. কানুন দর ইলমে তিব্ব (قانون در علم طب)

মূলত লন্ডনের এক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্থানীয় চিকিৎসকগণ সম্মিলিত প্রয়াসে ইংরেজি ভাষায় এ বই সংকলন করেন। সুলতানের নির্দেশে বইটির ফারসি ভাষায় অনুবাদ হয়।

www.boimate.com

২৭. জামিয়ে' আব্বাসী (جامع عباسی)

জনগণের প্রয়োজনীয়তার দিকে সুলতানের নির্দেশে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে 'ফাতাওয়ায়ে মুহাম্মাদী' নামে ফেকাহর একটি কিতাব লেখা হয়েছিলো। বইটির কলেবর ছিলো বেশ দীর্ঘ। এজন্যে বিষয়টিকে আরও সহজ করতে আবদুর রহমান আব্বাস নামের এক লেখককে দিয়ে ৩১৩ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ এ কিতাবে মাত্র ৯৩ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়।

২৮. রুকু'আতে কুরআন মাজীদ (ركوعات قرآن مجيد)

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময় সাজদা ইত্যাদির বিধি-বিধান এ বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

২৯. বারকী ও তিব্বী তাজরিবাত (برقي وطبي تجربات)

বিজলি ও চিকিৎসা– এ দু'টি শাস্ত্রের ওপর অর্জিত কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি বই সুলতানের নির্দেশে ফারসিতে অনূদিত হয়।

৩০. আরুসুল মাজলিস (عروس المجلس)

সুলতানের নির্দেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের ওপর এ কিতাবটি কাযী গোলাম কাসেম মাহদী সাহেব সংকলন করেন। উরদূ ভাষায় গদ্যাকারে লেখা এ বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৯৮।

৩১. উরুসে ইরফানী (عروس عرفاني)

তাসাওউফ শাস্ত্রে ইসলামের যেই সৌন্দর্য-সৌকর্য্য রয়েছে, সুলতানের নির্দেশে তা এই বইয়ে সংকলন করা হয়।

৩২. রিসালায়ে রঙ্গ ও বূ (رساله رنگ وبو)

সুলতানের নির্দেশে সুগন্ধি তৈরি করা ও কাপড় রঙিণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে বইটি সংকলন করা হয়। যারা এ বিষয়ে কাজ করতে চান তাদের জন্যে বইটিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা রয়েছে।

৩৩. কিস্‌সায়ে দাদবখত (قصه داد بخت)

টিপু সুলতানের গৃহশিক্ষক হাসান আলী ইয্যত ফারসি ভাষায় গদ্যাকারে বইটি সংকলন করেন।

www.boimate.com

৩৪. ওয়াযুল মুজাহিদীন (وعظ المجاهدين)

এ কিতাবে কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতের উদ্ধৃতিতে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বিধর্মীদের উৎখাতে নেমে আসতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৩৫. মুনতাখাব যাওয়াবেতে সুলতানী (منتخب ضوابط سلطاني)

টিপু সুলতান সিপাহিদের উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচারজনিত যেসব নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা এ বইয়ে সংকলন করা হয়।

৩৬. রিসালায়ে কাচাড়ী (رساله كچهري)

প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা ও অধিদপ্তরে দায়িত্বরত আমলাদের জন্যে এ বইয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা ও নিয়ম-নীতি সংকলন করা হয়েছিলো।

৩৭. যাবেতায়ে আমসালে রাহ রফতানে সাওয়ারী (ظابطه امثال راه رفتن سواري)

অশ্বারোহী সিপাহিদের জন্যে এ বইয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা জানানো হয়েছে।

৩৮. নকশে মুরাদ (نقش مراد)

এটি একটি মসনভী। যার লেখক হলেন মুনশী মির্যা যাইনুল আবিদীন আবেদ। বইটিতে হযরত আলী রাদি. সহ অন্যদের কারামত সংকলন করা হয়েছে।

বইটির একটি অনুলিপি মহিসূরের ওরিয়েন্টাল রিসার্চ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

৩৯. চার কুরসি (چار كرسي)

নবাব হায়দার আলীর শাসনামলে বইটি মালবাগুলের জ্ঞানী লেখক আহমদ খান শেরওয়ানী সংকলন করেন। বইটিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ১২১ টি মাসআলা সন্নিবেশিত রয়েছে।

www.boimate.com

৪০. সারওয়ারুল মুমিনীন (سرور المؤمنين)

৪১. আকাঈদে হুসাইনী (عقائد حسيني)

এ দু'টি কিতাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের ওপর রচিত। সংকলন করেন মীর মুহাম্মদ আলী।

৪২. কাদের বারী (قادر باري)

এটি ফারসি ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম অভিধান। বইটিতে ৪০০ ফারসি শব্দের দখিনি ভাষায় অর্থ সংকলন করা হয়েছে। অভিধানগ্রন্থটির লেখক মীর আসকারী ফাইয়্যায ফিতনাত।

৪৩. ইনশায়ে আসকারী (إنشاء عسكري)

৪৪. ইনশায়ে জা'ফর (إنشاء جعفر)

মীর আসকারী ফাইয়্যায ফিতনাত এ দু'টি বইয়ে শি'আদের ফিকাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৪৫. কিসসায়ে লা'ল ও ঘর (قصه لعل وگهر)

পদ্যাকারে গল্পকাহিনী সমৃদ্ধ এ বইটি উরদু ভাষায় ১১০০ হিজরীতে দাকানের আরিফুদ্দীন খান নামের এক ব্যক্তি সংকলন করেন। সুলতানের নির্দেশে মীর হাসান ইয্যত ১১৯২ সালে তা ফারসিতে অনুবাদ করেন।

সালতানাতে খোদাদাদে উরদূ ভাষার ব্যবহার

যদিও উরদূ টিপু সুলতানের মাতৃভাষা নয়; কিন্তু তিনি অন্য যেকোনো ভাষার মতো অনায়াসে উরদূতে বলতে ও লেখতে পারতেন। টিপুর শাসনামল [১৭৮২ ঈ. থেকে ১৭৯৯ ঈ.] ছিলো উরদূ ভাষার সূচনাকাল। অন্যদিকে মহিসুর রাজ্য দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত হওয়ার কারণে তা উরদূ চর্চার আসল কেন্দ্র উত্তর ভারত থেকে অনেক দূরে ছিলো।

যখন বাহমানী শাসক ফিরোয শাহ বিজয়নগরের হিন্দু রাজার মেয়েকে বিয়ে করেন তখন প্রথমবারের মতো উত্তর ভারত থেকে প্রচুর উরদূভাষী নাগরিক দাক্ষিণাত্যের মহিসুরে চলে আসেন। এটি ১৪০০ ঈসাব্দের ঘটনা। ওই সময় মহিসুর ছিলো বিজয়নগরের হিন্দু রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন

www.boimate.com

একটি অঙ্গরাজ্য। এরপর থেকে নিয়মিত উত্তর ভারত থেকে প্রচুর উরদূভাষী দাক্ষিণাত্যে চলে আসতো। এক পর্যায়ে সালতানাতে খোদাদাদের প্রাথমিক যুগে উরদু ভাষাভাষীদের আধিক্যের কারণে উরদূ ভাষার গুরুত্ব ফারসি, কানড়ি ও মারাঠি ভাষার সমস্তরে চলে আসে। খোদ নবাব হায়দার আলীও উরদূ ভাষায় কথা বলতেন।

টিপু সুলতানের শাসনামলে উরদূ ভাষা দ্রুত উন্নতি করে। যদিও সালতানাতে খোদাদাদের সরকারি ভাষা ছিলো ফারসি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও গোটা রাজ্যে উরদূ ভাষার প্রচলন বেড়ে যায়। সাধারণত জনগণের মুখে এটি দখিনী ভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

খোদ সালতানাতে খোদাদাদে উরদু ভাষার প্রচুর উচ্চমার্গীয় কবি ও লেখক জন্মগ্রহণ করেন। তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। ওই সময় সরকারের আনুকূল্য পেয়ে অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রচুর উরদূ কবি ও সাহিত্যিক সালতানাতে খোদাদাদে এসে নিবাস পাতে। খোদ সুলতানের নির্দেশে উরদূ ভাষায় বেশক'টি গ্রন্থ লেখা হয়েছিলো। যেমন, খোলাসায়ে সুলতানী, আহকামুন নিসা, জলওয়াহনামা ইত্যাদি। ইতোপূর্বে আমরা বইগুলোর ওপর বিশদ আলোচনা করেছি।

সালতানাতে খোদাদাদের সামরিক বাহিনীর রণসঙ্গীত উরদূ ভাষায় ছিলো। জিহাদ প্রসঙ্গে টিপুর তত্ত্বাবধানে সংকলিত 'তুহফাতুল মুজাহিদীন' গ্রন্থে প্রচুর উরদূ কবিতা ছিলো। সেখান থেকে কয়েকটি চয়িত পংক্তি তুলে ধরছি—

برق جاں کوہ گراں پیک اجل دست قضا
تیغ و گرز و تیر و خنجر کے ترے ہیں چار نام

ہر ملک کو ورد ہوا نا فتحنا و مبدم
جب تو ہو پادر کاب از بہر قصہ کارزار

উরদূ ভাষার প্রথম সংবাদপত্র

শুনলে অবাক হবেন— টিপু সুলতানই উরদূ ভাষায় সর্বপ্রথম পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব দেখান। সাধারণত লোকমুখে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, 'দিল্লি উরদূ আখবার' নামে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ হুসাইন আযাদের পিতা মৌলভী

www.boimate.com

মুহাম্মদ বাকের ১৮৫৭ সালে উরদূ পত্রিকা বের করেন। অথচ এর থেকে ৬৩ বছর পূর্বে ১৭৯৪ সালে টিপু সুলতান কোনো ধরনের ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে নিভৃতে উরদূ পত্রিকা বের করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী আলীগড় থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'হামারী যুবান'-এর ১ লা জুলাই ১৯৫৭ এর উদ্ধৃতিতে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি দলীল-প্রমাণের আলোকে এ কথা প্রমাণিত করেছেন— টিপুই উরদূ ভাষার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৯৪ সালে শাহাদাতের ৫ বছর পূর্বে তিনি যখন অর্ধরাজত্ব ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার কারণে দেশের প্রশাসন নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছিলেন ওই সময় তিনি একদিন একটি রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা জারি করেন যে, এমন একটি প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে আরবি বর্ণমালায় মুদ্রিত হবে।

প্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওই বছরই সেখান থেকে উরদূতে 'ফৌজি আখবার' নামে সুলতানের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বড় সাইজে প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় সালতানাতের বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত সিপাহিদের নামে সুলতানের নির্দেশনা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি সাধারণত সিপাহিদের জন্যেই প্রকাশিত হতো। সেখানে জিহাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও দেশের প্রতিরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রকাশিত হতো। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি সুলতানের শাহাদাত পর্যন্ত একাধারে পাঁচ বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।[৯৪] শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর ইংরেজরা সেই পত্রিকার সমুদয় ফাইল খুঁজে খুঁজে বের করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ

হিন্দুস্তানের শাসকবর্গের দীর্ঘ ফিরিস্তিতে এমন কোনো শাসকের নযির নেই, যিনি সম্রাট হয়েও একদিকে আলিমে দ্বীন ছিলেন; আবার অন্যদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন। টিপু সুলতানই সেই একমাত্র শাসক– যিনি তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ময়দানে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর

---

[৯৪]. 'হামারী যুবান, আলীগড়। ১ জুলাই ১৯৫৬ ঈ.। করাচি থেকে মুদ্রিত বাসায়ের পত্রিকার উদ্ধৃতিতে।

www.boimate.com

অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতার নজির রেখে স্থাপত্য বিদ্যায় অনন্য নযির স্থাপন করেছিলেন। আবার চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিও তার মানসিক আকর্ষণ ছিলো। 'তুহফাতুল মুজাহিদীন' গ্রন্থে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য চিকিৎসার অনেক কৌশল সংকলন করেছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে 'তিব্বা দরাজুন' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখেছেন। এর বাইরে এ শাস্ত্রের ওপর তিনি দু'টি ইংরেজি বইয়ের ফারসি অনুবাদ করিয়েছিলেন। যার একটির নাম— مفردات در علم طب। আর অন্যটির নাম— برقي وطبي تجربات। মুহাম্মদ নাসরীর আফশার তুর্ক-কে দিয়ে تحفه محمدي নামে আরেকটি গ্রন্থ সংকলন করিয়েছিলেন। যেখানে আরবি বর্ণনামালা ধারাক্রম অনুসারে বিভিন্ন অষুধের বিবরণী দেওয়া ছিলো।

টিপু সুলতান যখন তাঁর কোনো অফিসার বা কর্মচারীর অসুস্থতার সংবাদ শুনতেন তখন নিজেই তার জন্যে অষুধ চয়ন করতেন। একবার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কৃষ্ণারাওয়ের পায়ে একটি পাগলা কুকুর কামড় দেয়। সংবাদ পেয়ে টিপু সুলতান নির্দেশ করেন যে, তার ক্ষতস্থানটি যেন পূর্ণ ছ' মাস খোলা রাখা হয়। তাহলে ভেতরের খারাপ পদার্থগুলো বাইরে বেরিয়ে আসবে। রাজপ্রাসাদে সুলতানের যেই ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিলো সেখান থেকে ইংরেজরা অন্যান্য মহামূল্যবান গ্রন্থের পাশাপাশি চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর ৬২ টি মূল্যবান গ্রন্থ খুঁজে পায়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে সুলতান কী পরিমাণ দক্ষ ছিলেন, সে সম্পর্কে ধারণা পেতে তাঁর লেখা দু'টি অষুধ নির্দেশিকা তুলে ধরছি।

ফারাসাত সমীপেষু ২১ ডিসেম্বর ১৭৮৫ ঈ.

তোমার পাঠানো চিঠিতে অষুধের তালিকায় এমন কয়েকটি সুগন্ধির নাম রয়েছে যেগুলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন হয়। কাজেই সে অষুধগুলোর স্থলে ইউনানি অষুধ চয়ন করো।

চিশতী ইয়ার খান সমীপেষু ২২ মে ১৭৮৬ ঈ.

১৪ মে তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি জানিয়েছো— দৌলত খান মূত্রথলির রোগে আক্রান্ত। তার জন্যে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু অষুধ পাঠাচ্ছি। অষুধগুলো আলাদাভাবে প্যাকিং করে মোহর লাগানো হলো—

www.boimate.com

১. বমির অষুধ চার তোলা গরম পানিতে মিশিয়ে সকাল বেলা পান করবে। পানির মতো বমি বমি ভাব এলে আট তোলা গরম পানি পান করবে। এতে সহজে বমি হয়ে যাবে। যখন সাত-আটবার বমি হবে তখন ছয় ঘণ্টা পর চাউল ও ঝোল খাবার হিসেবে পরিবেশন করবে। রাতে খাবারের পর অল্প পানিতে বাদাম তেল মেশাবে। এক-দু বমির পরপরই আল্লাহর ইচ্ছায় মূত্রথলিতে যেই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে তা কেটে যাবে।

২. পরদিন সকালের জন্যে পৃথক অষুধ হলো, সেখানে আট তোলা পরিমাণ অষুধ গাছের শাখা ও বার্গতুরাব ফলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করবে। এ অষুধ সাত দিন ব্যবহার করতে হবে।

এ সময় লাল-কালো মরিচ ও অন্যান্য গরম খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। চাউল ও মুলা খাবে। পানীয় জল হিসেবে তরমুজের দানা, কাকড়ির দানা, খারখুশকের দানা প্রতিটি থেকে নিংড়ানো রস আধা তোলা পরিমাণে পানির সঙ্গে মিশিয়ে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে পান করবে। বাস্তবেই যদি মূত্রথলিতে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধক থাকে তাহলে বেরিয়ে যাবে।[৯৫]

টিপু সুলতানের সময়কার উলামা ও কবিগণ

টিপু সুলতান নিজে যেমন বড় আলেম ছিলেন; অদ্রূপ তিনি সে সময়ের বড় বড় আলেম, সুফী ও জ্ঞানবিশারদদের মূল্যায়ন করতেন। তাঁর রাজদরবারে সবসময় একদল প্রাজ্ঞ আলেম অবস্থান করতেন। যা দ্বীনি বিষয়ে রাষ্ট্রকে পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন করতেন। এর বাইরে মহিসুরের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ বসবাস করতেন। যাদের অনেককে সুলতান নিজেই বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করে তাঁর রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তাই কয়েকজন সুচয়িত আলেম ও জ্ঞানবিশারদের বিবরণ আমরা নিম্নে উপস্থাপন করছি—

---

[৯৫]. সহীফায়ে টিপু সুলতান

www.boimate.com

১. শাহ আবুল লায়স রায়বেরেলী

যেই মহান আলেম ও আল্লাহঅন্তপ্রাণ বুযুর্গ টিপুর জীবনে সবচেয়ে গভীর ও প্রগাঢ় প্রভাব রেখেছেন, যাঁর প্রশিক্ষণ ও পরিশ্রমের ফলে সুলতানের মনে দ্বীনি স্পৃহা, ইসলামি চেতনার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে, যিনি সুলতানের মননে বিদআত ও কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মাঝে খাঁটি ইসলামি স্বকীয়তা ও আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তুলেছেন, তিনি হলেন শাহ আবুল লায়স রায়বেরেলী রহ. ।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, অদ্যাবধি সুলতানের ওপর যতোগুলো বই লেখা হয়েছে, সেগুলোতে তার আলোচনা যৎসামান্যই এসেছে। হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় জিহাদি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. তাঁর ভাগ্নে। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর শ্রদ্ধেয় জনক হলেন মাওলানা হাকীম আবদুল হাই হাসানী রহ. । তাঁরই শ্রদ্ধেয় দাদাজান হলেন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. ।

হাকীম আবদুল হাই হাসানী রহ. তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ نزهة الخواطر এর সপ্তম খণ্ডে শাহ আবুল লাইস সাহেবের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শাহ আবুল লাইস রহ. এর সঙ্গে টিপু সুলতানের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বিবরণ নদওয়াতুল উলামা লাখনৌর শিবলী নু'মানী লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি وقائع أحمدي [ওয়াকাইয়ে' আহমাদী] এর মাঝে সবিস্তারে বিবৃত রয়েছে।

১৮২২ সালে যখন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. তাঁর হজের সফরে কলকাতায় যাত্রাবিরতি করেন তখন সেখানে টিপু সুলতানের নজরবন্দি থাকা শাহযাদাগণ সুলতানের সঙ্গে এ পরিবারের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে সাইয়্যেদ সাহেবের হাতে বাইআত হন।

১১৮৮ হিজরীতে শাহ আবুল লাইস সাহেব তাঁর শ্রদ্ধেয় জনক শাহ আবু সাঈদের সঙ্গে পবিত্র হজ পালন শেষে যখন স্বদেশ ফিরে আসেন তখন মাতৃভূমি রায়বেরেলী ছেড়ে সালতানাতে খোদাদাদেই স্থায়ীভাবে থিতু হন। টিপুর শাহাদাতের কয়েক বছর পূর্বে ১২০৮ হিজরী, মুতাবেক ১৭৯৩ সালে পশ্চিম সমুদ্রোপকূলীয় নগরী মঙ্গলোর (Mangalore) ইনতিকাল করেন। ওই যুগে নগরীটির নাম ছিলো কোড়িয়াল বন্দর।

www.boimate.com

২. যাইনুল আবিদীন শাস্ত্রী

তিনি মূলত ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা ইরান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তানে চলে এসেছিলেন। প্রথমে কিছু দিন দিল্লিতে অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে বঙ্গদেশে চলে আসেন। কিছু দিন পর সেখান থেকে চলে আসেন হায়দারাবাদে। এই হায়দারাবাদেই ১৭৫৩ সালে শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করে। ইরানে 'শোস্তর' নামে একটি নগরী রয়েছে। সেদিকে সম্বন্ধিত করে তাকে 'শাস্ত্রী' বলা হয়।

শিয়াধর্মাবলম্বী ছিলেন। ওদিকে তার আপন ভাই 'মীর আলম' ছিলো নিযামের উযির। কিন্তু ভাইয়ের বিপরীতে যাইনুল আবিদীন শাস্ত্রী আমৃত্যু টিপু সুলতানের একনিষ্ট অনুসারী ও কৃতজ্ঞ সঙ্গী ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্যে জিহাদের মূলনীতি ও কায়দা-কানুন সম্বলিত একটি কিতাব লেখেন। ফারসি ভাষায় লেখা কিতাবটির নাম 'ফাতহুল মুজাহিদীন' [তুহফাতুল মুজাহিদীন]। সুলতান শহীদ হওয়ার পর তিনি হায়দারাবাদ চলে আসেন। এখানেই তার মৃত্যু হয়।

৩. হাসান আলী ইয্যত

তিনি সমকালের শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। পাশাপাশি প্রত্যুৎপন্নমতি কবিও ছিলেন। সুলতানের গৃহশিক্ষক ছিলেন। যদিও তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু সুলতানের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। 'ইয্যত' হচ্ছে তাঁর ছদ্মনাম। সুলতান তাকে ملك الشعراء [মালিকুশ শু'য়ারা] উপাধি দিয়েছিলেন। সুলতানের অনুরোধে তিনি ১১৯২ সালে قصه لعل وگهر [কিসসায়ে লা'ল ও ঘর] নামে উরদূ ভাষায় লেখা একটি বইয়ের ফারসি অনুবাদ করেন। এ ছাড়াও তিনি টিপুর অনুরোধে সঙ্গীত শাস্ত্রের ওপর مفرح القلوب [মাফরাহুল কুলুব] এবং মারাঠি ও নিযামের বিরুদ্ধে টিপুর যুদ্ধনৈপুণ্যের বিবরণী সম্বলিত فتح نامه ٹیپو سلطان [ফতেহনামায়ে টিপু সুলতান] ওরফে أضراب سلطاني [আযরাবে সুলতানী] সংকলন করেন। তার কবিতাসমগ্রের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

৪. সাঈদ মুহাম্মদ খান নায়েতী

তিনি ছিলেন 'নাওয়েত' বংশোদ্ভূত। শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। এর বাইরে রণাঙ্গনে তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার সুখ্যাতি ছিলো। টিপু

www.boimate.com

সুলতানের শাসনামলে তিনি মহিসুর সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। মহিসুর রাজ্যেই তাঁর ইনতিকাল হয়। [মাশাহীরে কওমে নাওয়ায়েত]

৫. হযরত সাইয়্যেদ পাঞ্জা ওরফে মীর বাহাদুর খান

তিনিও মহিসুরের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন ছিলেন। সুলতান তাকে ব্যাঙ্গালুরু কেল্লার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইংরেজ জেনারেল কর্নওয়ালসের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি কেল্লার হিফাযতের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন।

৬. গাযী খান

তিনি হায়দার আলীর শাসনামলে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। টিপু সুলতানের প্রশিক্ষকের দায়িত্বও পালন করেছেন। নবাবের নির্দেশে তিনিই টিপুর সামরিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। টিপু সুলতান তাকে সবসময় উসতায হিসেবে সম্মান করতেন। একজন সফল সেনাকর্মকর্তার পাশাপাশি তিনি প্রাজ্ঞ আলেমও ছিলেন।

৭. হযরত ইবরাহীম শাত্তারী কাদেরী

তিনি ছিলেন তরীকতের বিদগ্ধ শায়খ। সাধারণ মানুষ তাঁকে 'যিন্দা ওলী' বলতো। জন্মসূত্রে লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে দেশ ত্যাগ করে সালতানাতে খোদাদাদে চলে আসেন। টিপুর শাসনামলে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। ব্যাঙ্গালুরুর 'কুমারপেট' এলাকায় তাঁর মাযার অবস্থিত।

৮. হযরত হামীদ শাহ কাদেরী

এই বুযুর্গও টিপু সুলতানের নিমন্ত্রণে স্বদেশ ছেড়ে সালতানাতে খোদাদাদে বসতি স্থাপন করেন। সুলতান তাকে বিশাল এলাকার জমিদারি দান করেছিলেন। ব্যাঙ্গালুরুর 'কাবানপেট' এলাকায় তাঁর মাযার বিদ্যমান।

৯. মুহিব্বুল্লাহ শাহ কাদেরী

জনগণ তাকে بے سر اولیاء [বেসর আউলিয়া] নামে স্মরণ করতো। তিনিও

www.boimate.com

টিপুর শাসনামলে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসার ছিলেন। টিপু সুলতান তাঁর অনুরক্ত ছিলেন। ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১০. কাযী সাইয়্যেদ আলী

টিপু সুলতানের শাসনামলে তিনি রাজধানীর কাযীর পদে সমাসীন ছিলেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। টিপু সুলতান তাঁরই তত্ত্বাবধানে শায়খ আহমদ ও সাইয়্যেদ গোলাম মুসতফাকে সদস্য করে তিনজনের একটি লেখক প্যানেল তৈরি করে দেন। সুলতানের নির্দেশে এই লেখক প্যানেল হানাফী ফেকাহ্ অনুসরণে একটি ফিকাহকোষ তৈরি করেন। টিপুর শাহাদাতের পরও তিনি জীবিত ছিলেন এবং মহিসুরের প্রধান কাযীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১. মৌলভী হাবীবুল্লাহ

সুলতানের একান্ত আস্থাভাজনদের একজন মৌলভী হাবীবুল্লাহ বড় মাপের আলেম ছিলেন। সুলতানের সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন। এমনকি শাহাদাতের দিন যখন সুলতান মসজিদে আ'লায় ফজর নামায পড়েন সেখানেও তিনি সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। ১২২৩ হিজরীতে শ্রীরঙ্গাপত্তনামে ইনতিকাল করেন।

১২. হুসাইন আলী কিরমানী

তিনি ছিলেন টিপুর যুগের সবচেয়ে উজ্জ্বল লেখক। নবাব হায়দার আলী ও টিপু সুলতান— দু'জনের শাসনামল পেয়েছেন। ইরান থেকে আগত শি'য়া ছিলেন। কিছু কিছু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, তিনি সুন্নী ছিলেন।

হিন্দুস্তানে তার পরিবার বসতি স্থাপন করেছিলো বেলুর (Belur)-এ। মাতৃভাষা ফারসির পাশাপাশি আরবি ভাষাতেও তিনি অসামান্য দক্ষ ছিলেন। সালতানাতে খোদাদাদে প্রশাসনের উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭৯৯ সালে টিপু সুলতানের শাহাদাতের পর ইংরেজরা তাঁকে নজরবন্দি করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে অবস্থানকালেই ইংরেজরা ১৮০৬ সালে তাকে দিয়ে হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের জীবনবৃত্তান্তের ওপর 'নিশানে হায়দারী' নামে ফারসি ভাষায় একটি গ্রন্থ সংকলন করায়। যা এ বিষয়ের ওপর পৃথিবীর যেকোনো ভাষায় প্রথম বই।

www.boimate.com

যেহেতু কিরমানী সাহেব ওই সময় ইংরেজদের হাতে নজরবন্দি ছিলেন; এজন্যে স্বভাবতই তাদের নির্দেশ অনুসারে বইটির মাঝে টিপু সুলতান সম্পর্কে কিছু অসমর্থিত লোককথা যুক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি بديع المعاني নামে একটি বই লেখেছেন। সুলতানের নির্দেশে সালতানাতে খোদাদাদের বিভিন্ন করদ রাজা ও জমিদারদের জীবনী সম্পর্কে تذكرة البلاد والحكام [তাযকিরাতুল বিলাদ ওয়াল হুক্কাম] নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। বইটির একটি অনুলিপি এখনও মহিসুরের ডক্টর শফী' আহমদ শরীফ সাহেবের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি বইটির ইংরেজি ও উরদূ অনুবাদ করছেন।

১৩. আহমদ খান শেরানী

তিনি মূলত কোলার নগরীর অধিবাসী ছিলেন। অত্যন্ত যোগ্য আলেম ছিলেন। পরবর্তীকালে মহিসুর অন্তর্গত গরমকুণ্ডায় বসবাস শুরু করেন। খুব ভালো কবিতা রচনা করতেন। টিপু সুলতানের নির্দেশনায় তিনি ১২১ টি বিবিধ মাসআলা সমৃদ্ধ একটি কিতাব রচনা করেন। কিতাবটির নাম চার কুরসী।

১৪. খাইরুল্লাহ শাহ কাদেরী

তার অপর নাম মুহাম্মদ শরীফ। টিপু সুলতানের যুগে যখন বহির্দেশ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু নিদর্শন মহিসুরে নিয়ে আসা হয় তখন সুলতান সেগুলোর সংরক্ষণ ও দেখাশুনার দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেন। কবিতা বলতে-লেখতে ভালোবাসতেন। ছদ্মনাম ছিলো, 'খাদেম'। তার একটি কবিতাসমগ্র রয়েছে।

১৫. শাইখ মিয়া ফযলুল্লাহ

তরিকত শাস্ত্রের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ ছিলেন। সালতানাতে খোদাদাদে বসবাস করতেন। তাসাওউফের ওপর একটি কিতাব রচনা করেছেন। কবিতা লেখতেন। ছদ্মনাম ছিলো, 'ফকীর'।

১৬. কাযী সাইয়্যেদ হাজী মিসকিন

তিনি সালতানাতে খোদাদাদে বিয়ে-শাদী ইত্যকার অনুষ্ঠানে কাযীর দায়িত্ব পালন করতেন। টিপু সুলতান তার পরিবারের মহিলা সদস্যদেরকে মুসলিম নারীদের মাঝে বিচারকার্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব

www.boimate.com

প্রদান করতেন। ১২১২ হিজরীতে শাহাদাতের এক বছর পূর্বে একটি রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপন জারি করে রাজ্যের সকল মুসলমানকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়।

১৭. গোলাম হুসাইন মুনজিম আসী

আরবি ও ফারসি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। এ দু' ভাষায় অনায়াসে কবিতা লেখতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গেও তাঁর সখ্যতা ছিলো। ফারসি ভাষায় ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্যাবলি একত্র করে استيفاء [ইসতিফা] নামে একটি বই লিখেছিলেন।

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের দিন প্রত্যূষে তিনি সুলতানের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করেন যে, জাহাঁপনা! আজকের দিনটি ভালো মনে হচ্ছে না। কাজেই কিছু দান-খয়রাত করার অনুরোধ করছি। সুলতান তখন তার অনুরোধ বাস্তবায়ন করেন।

তিনি منشيات غلام حسين [মুনশিয়াতে গোলাম হুসাইন] নামে তাঁর লেখা চিঠিগুলোর একটি সংকলন বের করেছেন। এছাড়া ফারসি ভাষার নিয়ম-কানুনের ওপর تكميل الصرف [তাকমীলুস সরফ] ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রের ওপর গদ্যাকারে رسائل نجوم [রাসায়িলে নুজূম] লেখেছেন। মহিসুরে তার মাযার রয়েছে।

১৮. গোলাম মুহিউদ্দীন মাহকারী

তিনিও বড় মাপের আলেম ছিলেন। ফারসি ভাষায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিলো। তাঁকে সালতানাতে খোদাদাদের অন্যতম স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আলেম মনে করা হতো।

১৯. মুহাম্মদ বাকের আলী খান মাহকারী

তিনি ছিলেন আরব থেকে আগত 'নাওয়ায়েত' বংশোদ্ভূত। সালতানাতে খোদাদাদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলেম ও কবি হিসেবে তাকে গণ্য করা হতো। টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে তিনি রাজধানীর সকল প্রশাসনিক অধিদপ্তরগুলোর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতেন। টিপু সুলতান শহীদ হওয়ার পর ১৮০৮ সালে তিনি মহিসুরের প্রধান কাযী মনোনীত হন। তার কবিতাসমগ্রের একটি মুদ্রিত কপি এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

www.boimate.com

২০. আবদুল কাদের মাহকারী

তিনিও আরব থেকে আগত 'নাওয়ায়েত' বংশোদ্ভূত। টিপু সুলতানের যুগের স্বনামযোগ্য কবি ছিলেন। তার একটি কবিতাসমগ্র রয়েছে।

২১. হাফেয সাইয়্যেদ আবদুল কাদের যীনাত

২২. মৌলভী সাইয়্যেদ আবদুল কুদ্দুস

এ দু'জন বুযুর্গ মূলত শাহানূর -এর অধিবাসী ছিলেন। নবাব হায়দার আলী তাদেরকে সালতানাতে মহিসুরে বসতি স্থাপন করার আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণবশতঃ তখন আসতে পারেননি। পরবর্তীকালে টিপু সুলতানের অনুরোধের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তারা শ্রীরঙ্গাপত্তনামে নিবাস পাতেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেছেন।

২৩. গোলাম আলী খান ওরফে কুন্দাহচার বখশী

তিনিও আরব থেকে আগত 'নাওয়ায়েত' বংশোদ্ভূত। টিপু সুলতানের পদাতিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন। ইংরেজরা যখন শ্রীরঙ্গাপত্তনাম অবরোধ করে তখন তিনি সুলতানের রাজপ্রাসাদের প্রধান মুহাফিযের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। টিপু সুলতান তাকে একটি বিশাল এলাকার জমিদারি দিয়েছিলেন। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পরও তিনি জীবিত ছিলেন; কিন্তু শ্রীরঙ্গাপত্তনাম ছেড়ে তিনি বেলুর (Belur) নগরীতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

২৪. কাযী উমর শহীদ ইবনে হুসাইন আরব মককী

সালতানাতে খোদাদাদ অন্তর্ভুক্ত আদোনী (Adoni)-এর কাযী ছিলেন। অত্যন্ত সজ্জন মানুষ ছিলেন। সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। তিনিও আরবদেশ থেকে আগত 'নাওয়ায়েত' বংশোদ্ভূত ছিলেন।

২৫. মৌলভী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

অনেক বড় আলেম ছিলেন। মানযারাবাদ [হাসান (Hassan) জেলা অন্তর্গত সিকালাসপুর]-এ সুলতানি কেল্লার মুহাফিয [প্রধান নিরাপত্তারক্ষী] ছিলেন। তিনিও আরবদেশ থেকে আগত 'নাওয়ায়েত' বংশোদ্ভূত ছিলেন।

www.boimate.com

২৬. শামসুদ্দীন খান

তিনি সালতানাতে খোদাদাদের القضاة قاضي [কাযীর কুযাত] তথা প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এ ছাড়া মসজিদে আ'লা ও গুম্বাতে সুলতানীর ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শ্রীরঙ্গাপত্তনামের মসজিদে আ'লা চত্বরে এখনও তাঁর মাযার রয়েছে।

২৭. মীর আসকারী ফাইয়্যায ফিতনাত

তিনি মূলত ইরানের 'শিরাজ' শহরের অধিবাসী ছিলেন। নবাব হায়দার আলী যখন ইরানের দু' হাজার মোঘলকে তাঁর সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন, তখন তিনিও সে সূত্রে নিয়োগ পেয়েছিলেন। বড় আলেম ছিলেন। শিয়াধর্মাবলম্বী ছিলেন। টিপুর নির্দেশে তিনিই সর্বপ্রথম ফারসি-উরদূ অভিধান 'কাদের বারী' সংকলন করেন। যা পরবর্তীকালে মাদ্রাজ থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া শিয়া ফিকাহর ওপর দু'টি কিতাব إنشاء عسكري [ইনশায়ে আসকারী] ও إنشاء جعفرى [ইনশায়ে জা'ফরী] সংকলন করেছিলেন। শ্রীরঙ্গাপত্তনামের 'গুঞ্জে আম' মহল্লায় তার পারিবারিক মাদরাসা ছিলো।

২৮. মির্যা যাইনুল আবিদীন আবেদ

তিনি মূলত ইরানের অধিবাসী ছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় শাখার ওপর তার অসামান্য পাণ্ডিত্ব ছিলো। শিয়া ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ফারসি ছাড়াও আরবি ও উরদূ ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিলো। টিপুর নির্দেশনায় نقش مراد [নকশে মুরাদ] নামে একটি দীর্ঘ কবিতাগ্রন্থ সংকলন করেন। মহিসুরে তার তত্ত্বাবধানে একটি পারিবারিক মাদরাসা পরিচালিত হতো। এক বর্ণনানুসারে, টিপু সুলতানের পিতৃপুরুষের ওপর سلطان التاريخ [সুলতানুত তারীখ] নামের জীবনীগ্রন্থ সংকলনের কাজে তিনিও সম্পৃক্ত ছিলেন।

২৯. কাযী গোলাম আলী

অনেক বড় আলেম ও উঁচু দরের লেখক ছিলেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা ছিলো। রাজধানীর কাযীর পদও অলঙ্কৃত করেছেন। কবিতা লেখার শখ ছিলো। তাকে দিয়ে সুলতান خلاصه سلطاني [খুলাসায়ে সুলতানী] زاد المجاهدين [যাদুল মুজাহিদীন] ও جواهر القرآن [জাওয়াহিরুল কুরআন] নামে তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করিয়েছিলেন।

www.boimate.com

৩০. মৌলভী মুহাম্মদ ইসহাক

তিনিও টিপু সুলতানের শাসনামলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি কবি ছিলেন। আদব-শিষ্টাচার প্রতিপাদ্যের ওপর তিনি رياض العارفين। [রিয়াযুল আরিফীন] নামে একটি গদ্যাকারে লিখিত গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটিতে অনেক বুযর্গ ও শায়খের জীবনী ও ঘটনাবলি উপস্থাপিত হয়।

টিপু সুলতানের কয়েকটি অমীয় বাণী

সুলতানের জ্ঞান-গভীরতা, তাঁর লিখনী শক্তি ও বাকশক্তির ব্যাপকতা বোঝাতে তাঁর কয়েকটি অমীয় বাণী উপস্থাপন করছি। কথাগুলো যদিও তিনি পৃথক পৃথক প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন; কিন্তু অন্তর্গত ভাষ্যের গভীরতার কারণে সেগুলো ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে এখনও শোভা ছড়াচ্ছে। কথাগুলোর আবেদন এতোটাই হৃদয়ছোঁয়া যে, তা ঘরে ঘরে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা যেতে পারে। নিম্নে আমরা কয়েকটি বাণী তুলে ধরছি-

- 'শৃগালের মতো একশো বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা উত্তম'। [কথাটি বলেছিলেন শাহাদাতের কয়েক মুহূর্ত পূর্বে, যখন তাঁকে তাঁর এক গোলাম আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানিয়েছিলো]।
- 'মিথ্যে বয়ান দেওয়া নৈতিকতা ও ধর্ম- উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই অনেক বড় অপরাধ'।
- 'যেসব লোক ধর্মীয় পুণ্যস্থলগুলোর অবমাননা করে তারা দুনিয়াতেই তাদের অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবে। [শ্রীরঙ্গিরী মঠের শংকর আচার্য্যকে লেখা একটি জবাবি পত্রে তিনি এ কথাটি বলেছিলেন। এর ওপর আচার্য্য তার মঠের ওপর মারাঠি বর্বরদের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন]।
- 'পুরুষদের সর্বোত্তম ছবি তার বীরত্ব'। [যখন হায়দারাবাদ থেকে কিছু লোক সুলতানের ছবি তুলতে রাজধানীতে এসেছিলো]
- 'হিন্দুস্তান শুধুই হিন্দুস্তানিদের জন্যে। [দেশের সম্রাটদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন]।
- 'মানুষ মন্দকাজগুলো হাসিমুখে করে বেড়ায়; অথচ তার পরিণাম ভোগ করতে হয় অশ্রুভরা মুখে।'

www.boimate.com

- 'ইংরেজ হিন্দুস্তান ও মুসলমান– উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর। তাদের অস্তিত্ব থেকে প্রিয় স্বদেশকে মুক্ত করা হলে তারা ইসলাম ও জন্মভূমি– উভয়েরই সবচেয়ে বড় সেবা হবে'।
- 'প্রশাসনের অফিসারদের কর্তব্য হবে, তারা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে নির্দেশিত বিধান বাস্তবায়ন করবে। তারা কখনই নিজেদের প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের পথ ধরবে না।'
- 'ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে গাদ্দারি করার অর্থ হলো, নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে ধ্বংস ডেকে আনা'।
- 'ইসলামকে সমুন্নত করার জন্যে সমস্ত মুসলমানের ঐক্য আবশ্যক। ধর্মবিদ্বেষী আল্লাহর শত্রুদের ধ্বংস করাই জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য মনে করবেন।' [বিভিন্ন মুসলিম সম্রাটদের কাছে প্রেরীত চিঠিতে লেখেছেন]।
- 'আমি ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বসাতেই জন্মগ্রহণ করেছি। হত্যা, যুদ্ধ কখনই আমার কাছে ভালো লাগে না'।
- 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করবেন না যে, অমুক কী করেছে। সেদিন আমাকে শুধু আমার দায়িত্বের প্রতিপালন সম্পর্কে জবাব দিতে হবে'।
- 'জনগণ আল্লাহ তা'আলার সম্পদ। তারা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আল্লাহর আমানত'।
- 'আমার সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব; কিন্তু আমার বিশ্বস্ত বন্ধুদেরকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়'। [ইঙ্গ-মহিসুর সর্বশেষ যুদ্ধে তিনি ফরাসি মিত্রদের সম্বোধন করে কথাগুলো বলেছিলেন]।

www.boimate.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জন্মগত গুণাবলি ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলি

www.boimate.com

বীরত্ব ও সাহসিকতা

পুরো মানবেতিহাসে, বিশেষত শেষ শতাব্দীগুলোতে এমন উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যাবে যে, টিপু সুলতানের মতো অন্য কোনো সম্রাট নিজেই রণাঙ্গনে নেমে এসে শত্রুবাহিনীর মুকাবিলায় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। খোদ তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হায়দারাবাদের নিযামের অবস্থা হলো, সে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিজেও রাজধানীর বাইরে চলে আসতো। কিন্তু একটি নিরাপদ স্থান বাছাই করে সেখানে তাবু টানিয়ে বসে পড়তো আর নিজের সৈন্যদেরকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ করতো।

মারাঠা সর্দারদেরও একই অবস্থা ছিলো। নিজের সিপাহিদেরকে আগে বাড়িয়ে দিয়ে পথনির্দেশনার বাহানা দেখিয়ে পেছন দিকে অবস্থান করতো। ইংরেজ গভর্নর জেনারেলরা অবশ্যই এমন ছিলো না; তবে তারাও শুধু প্রয়োজনের সময় রণাঙ্গনে আসতো। অন্য সময় নিরাপদ স্থানেই অবস্থান করতো।

কিন্তু টিপু সুলতান ছিলেন এদের সবার থেকে আদ্যোন্ত ব্যতিক্রম। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, ছোট-বড় প্রতিটি যুদ্ধে সিপাহিদের সঙ্গে রণাঙ্গনে এসে কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। কৈশরে যখন তার বয়স মাত্র ১৩ বছর। তখন থেকেই আব্বাজান নবাব হায়দার আলী তাঁকে সঙ্গে করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতেন। ১৭৬৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের মতো ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহিসুরের প্রথম যুদ্ধে ৭ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন এবং মাঙ্গালোরে ইংরেজদের কেল্লা অবরোধ করে তাদেরকে সমুদ্রপথে মুম্বাই পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। ১৭৮০ সালে তাঁরই নেতৃত্বে মহিসুর ফৌজ কর্নেল বেলির নেতৃত্বাধীন সৈন্যদলকে পরাজিত করে। তিনি মারাঠি সর্দার তুরমুক রাওকেও পরাজিত করে পালাতে বাধ্য

www.boimate.com

করেছিলেন। জন্মগত সাহসিকতার কারণে তিনি সবসময় অশ্বারোহণ করতে পসন্দ করতেন। তার কাছে পালকিতে চড়ে ভ্রমণ করা অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিলো।

বাঘের সঙ্গে টিপুর সখ্যতা

মজ্জাগত বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে বাঘ তাঁর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিলো। অনুভূতি ও মানসিকতা– দু'ভাবেই জীবনভর বাঘের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের মাঝে বেশ সাদৃশ্য ছিলো। তিনি বাঘের মতো স্বাধীনচেতা ছিলেন। যে কারণে তার মুখ থেকে স্বর্ণাক্ষরে খচিত হওয়ার মতো এই ঐতিহাসিক মন্তব্য বেরিয়ে ছিলো— 'শৃগালের মতো একশো বছর বেঁচে থাকার চেয়ে বাঘের মতো একদিন বেঁচে থাকা উত্তম'। এখানে তিনি বাঘ বলে বাহাদুরি আর শৃগাল বলে কাপুরুষতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কাপুরুষদের মতো নিজেকে শত্রুপক্ষের হাতে অর্পণ করে জীবিত থাকাটা তার জাত্যাভিমানী অন্তর ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মন মেনে নেয়নি। টিপু সুলতান সেদিন চাইলে শত্রুবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের জীবন; এমনকি নিজের সিংহাসন কিছু দিনের জন্যে বাঁচিয়ে ভোগ-বিলাসিতার জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন।

টিপু সুলতান যখন নগরী বা কেল্লা বা প্রাসাদের প্রাচীর নির্মাণ করতেন তখন দেয়ালের ওপর বাঘের চামড়ার মতো ডোরাকাটা দাঁগ আঁকাতেন। তাঁর নির্দেশে মসজিদে আ'লার দেয়ালের ওপর বাবরি রঙ করা হয়।

মালাবারে যখন নায়ার গোষ্ঠীর প্রচুর সদস্য ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে সুলতান তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে তাদের জন্যে একটি পৃথক ব্যাটালিয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম ছিলো 'জামাতে আহমদী'। অন্যদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে তাদের জন্যে পৃথক ইউনিফর্ম নির্ধারণ করা হয়। তাদের ইউনিফর্ম হতো সিংহের চামড়া দিয়ে তৈরি।

টিপু সুলতান নিজেও যেই পোশাক পরতেন তার ওপরও বাঘের ডোরাকাটা দাঁগ থাকতো। তিনি তার সবগুলো অস্ত্রের ওপর أسد الله [আসাদুল্লাহ, যার অর্থ আল্লাহর বাঘ] শব্দ খোদাই করতেন।

www.boimate.com

টিপুর রাজপ্রাসাদে খাঁচার ভেতর অনেকগুলো বাঘ, চিতা বাঘ পোষা হতো। তিনি অবসর সময়ে সেগুলোর সঙ্গে খেলাধুলা করতেন।

প্রতি সপ্তাহে ১-২ বার সময়-সুযোগ বের করে জঙ্গলে চলে যেতেন। সেখানে তিনি চিতাবাঘের সাহায্যে বিভিন্ন জন্তু শিকার করতেন।

উসমানি খলীফার কাছ থেকে সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর তিনি একটি দৃষ্টিনন্দন রাজসিংহাসন তৈরি করেছিলেন। সেটাও ছিলো বাঘের আকৃতি বিশিষ্ট। এমনকি তিনি অনেকগুলো তোপ তৈরি করেছিলেন বাঘের আদলে। যৌবনের প্রারম্ভে একদিন তিনি জঙ্গলের ভেতর শিকার শিকার খেলছিলেন। অকস্মাৎ একটি হিংস্র বাঘ তার সামনে হাজির হয়। টিপু তখন অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করে বাঘটিকে সেখানেই হত্যা করতে সক্ষম হন। বাঘের সঙ্গে টিপুর এই সাদৃশ্যের কারণে ইংরেজরা তাকে TIGER OF MYSORE —'মহিসুরের বাঘ' উপাধি দিয়েছিলো। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

টিপু সুলতান যেহেতু একজন দক্ষ হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন, এজন্যে তিনি তাঁর মেধা ব্যয় করে 'খততে বাবরী' নামে একটি নতুন হস্তলিপি তৈরি করেন। এই হস্তলিপিতে বর্ণগুলো বাঘের মতো ডোরাকাটা হতো।

বাঘসদৃশ খেলনা

টিপু সুলতান একটি বাঘসদৃশ খেলনা বানিয়েছিলেন। খেলনার ভেতর থেকে চিতাবাঘের ঘরর.. ঘরর... হুঙ্কার ভেসে আসতো। খেলনার ভেতর ওই চিতাবাঘটি এক অসহায় ইংরেজকে কুপোকাৎ করে রেখেছিলো।

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর এ খেলনাটি টিপুর অন্যান্য জিনিসপত্র, যুদ্ধাস্ত্র, তৈজষপত্র ও চিঠিপত্রের সঙ্গে লন্ডন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামে এখনও সেই খেলনাটি সংরক্ষিত রয়েছে।

পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লন্ডনের লেকচারার প্রফেসর মাহমুদ খান শেরানী লন্ডনের মিউজিয়ামে সেই খেলনাটি দেখেছেন। তিনি তার چند لمحے وکٹوریہ البرٹ میوزیم میں [চান্দ লমহে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়াম মেঁ] প্রবন্ধে খেলনাটির বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। সেখান থেকে এম আবদুল্লাহ বাট সাহেব তাঁর 'টিপু সুলতান' গ্রন্থে নকল করেছেন। আসুন, প্রফেসর মাহমুদ খান শিরানীর কাছ থেকে আমরা সেই বিবরণী জেনে নিই। তিনি লেখেন—

www.boimate.com

'এ খেলনাটির আদল বিস্ময়কর। এমনটি আদল আমি কোথাও দেখিনি। তার আদল হলো, দেড় গজ লম্বা ও পৌনে গজ চওড়া এক টুকরো কাঠের ওপর এক ইংরেজ শুয়ে আছে। তার ওপর একটি বাঘ চেপে আছে। বাঘের দু' গাছি দাড়ি ইংরেজ লোকটির গলার ওপর পড়ে আছে। প্রথম থাবাটি ইংরেজের বুকের ওপর আর পরের থাবা রানের ওপর। বাঘের শরীর অন্তঃসারশূন্য। পেটের শূন্যস্থানে একটি যন্ত্র বসানো আছে। মেশিনের ভেতর হারমোনিয়ামের মতো লম্বা সারিতে ১৮ টি পর্দা রয়েছে। সেই পর্দাগুলোর ওপর তিন আঙ্গুল উঁচু ও মোটা ১৮ টি নল দু'টি সারিতে পাতা রয়েছে। যার ওপর তামার তৈরি দু' ইঞ্চি চওড়া তার বসানো আছে। যেগুলোর আকার পর্দার সমান। পর্দার শেষ প্রান্তে একটি দাঁতবিশিষ্ট চক্র রয়েছে। যার সম্পর্ক একটি লোহার তারের মাধ্যমে বাইরের হাতলের সঙ্গে। হাতলটি বাঘের বাহুর ওপর বাইরের দিকে পাতা। হাতল ঘোরালে ভেতর চক্র নড়তে শুরু করতো। যার প্রভাব পড়তো ভেতরের পর্দা ও নলের ওপর। বাঘের লেজের ওপর দু'টি চাবি রয়েছে। চাবি ঘুরিয়ে ভেতরের তারের পরিমাণ কমানো-বাড়ানো যায়। বাঘের শরীর অনেকগুলো তক্তার মাধ্যমে ঢাকা। তক্তাগুলো এমন যে, সেগুলো খোলা ও বন্ধ করা যায়।

খেলনাটি স্রেফ টিপু সুলতানের বিনোদনের জন্যে আবিষ্কার করা হয়েছিলো। কিন্তু চতূর নির্মাতা এ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তিনি তার আবিস্কারের মাঝে সুলতানের মনোভাব ও অভিলাষের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। [সুলতান টিপু। লেখক, আবদুল্লাহ ভাট। প্রফেসর আখতার শিরানীর প্রবন্ধের উদ্ধৃতিতে]

প্রভাব ও দাপট

টিপু সুলতানের ব্যক্তিত্বের মাঝে অসাধারণ প্রভাব ও সমীহ জাগানিয়া দাপট ছিলো। শত্রুরা পর্যন্ত টিপুর এই বৈশিষ্ট্য অকুণ্ঠে স্বীকার করেছে। যখন ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুস্তানে টিপু সুলতানের যুদ্ধ চলছিলো তখন

www.boimate.com

তার নাম শুনে ইংল্যান্ডে অবস্থানরত ইংরেজরাও ভয়ে কেঁপে ওঠতো। ইংরেজ মহিলারা শিশুদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে টিপুর নাম উচ্চারণ করতো। তারা টিপুর নাম শুনিয়ে ঘুম পাড়াতো।

মারাঠিরা যখন কোনো সৈন্যদল সম্পর্কে এ কথা শুনতো— খোদ টিপু সুলতান সেই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন তারা টিপু নাম শোনা মাত্রই বিনা যুদ্ধে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতো। কারণ, তারা জানতো, টিপু সুলতান শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়তে জানেন।

টিপু সুলতানের রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উযির এমনকি খোদ শাহযাদারাও টিপু সুলতানকে এ পরিমাণ সমীহ করতো যে, তারা তার সামনে কখনই অবান্তর কথা তোলার সাহস করতো না। টিপু সুলতান দায়িত্বপালনে অবহেলা বা নির্দেশ অমান্য করার অপরাধ প্রমাণিত হলে সরকারি অফিসারদেরকে পর্যন্ত বেত্রাঘাত করতেন। টিপুর শাসনামলে প্রশাসনের শৃঙ্খলাভঙ্গের ন্যূনতম সুযোগ ছিলো না। কোনো সিপাহি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলে তাকে তাৎক্ষণিক গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিতেন।

তিনি নেপোলিয়নের চেয়েও বড় বীর ছিলেন

কাকতালীয়ভাবে টিপু সুলতানের যুগে পৃথিবী আরেকজন বীরপুরুষের দেখা পেয়েছিলো। তিনি হলেন ফ্রান্সের নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। যিনি টিপু সুলতানের সমবয়সী ছিলেন। যদিও তাদের দু'জনকেই ভিন্ন ভিন্ন ময়দানে লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের দু'জনেরই প্রতিপক্ষ ছিলো ইংরেজ। সুলতান জোট বাঁধা শত্রুদেরকে মোকাবেলা করার জন্যে নেপোলিয়নের সঙ্গে ফ্রান্সে সম্পর্ক কায়েম করেছিলেন। যার বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে বিশদাকারে অবহিত হয়েছি।

বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই দু' ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মাঝে প্রচুর মিল ছিলো। কিন্তু এর বাইরে এমন কিছু পয়েন্ট রয়েছে, যেখানে টিপু সুলতান নেপোলিয়ন থেকে যোজন যোজন এগিয়ে ছিলেন।

সাধারণত অনেকেই টিপু সুলতানের বীরত্ব ও সাহসিকতা আলোচনা করার সময় তাকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের অভিমত হলো, তার সঙ্গে টিপুর তুলনা করা হলে এতে টিপুর

www.boimate.com

নয়: বরং খোদ নেপোলিয়নের সম্মান বৃদ্ধি হবে। কারণ হলো, তারা দু'জনই যদিও নিজ মন্ত্রীপরিষদ, আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন; কিন্তু নেপোলিয়ন আশাহত হয়ে শেষতক নিজেকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেন। যার ফলে অবশিষ্ট জীবন তাকে শত্রুদের হাতে বন্দি থেকে অতিবাহিত করতে হয়েছিলো। অথচ টিপু সুলতান আত্মসমর্পণকে নিজের ব্যক্তিত্বের পরাজয় মনে করেছিলেন। যার কারণে তিনি নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দেননি। বাঘের মতো মৃত্যুকে বরণ করেছেন।

টিপু সুলতানকে শাসনামলের প্রথম দিন থেকেই গাদ্দারদের গাদ্দারির মুখোমুখি করতে হয়েছে। অথচ নেপোলিয়ন শুধু সর্বশেষ যুদ্ধেই বিশ্বাসঘাতকদের কালো মুখ দেখতে পেয়েছিলেন।

নেপোলিয়ন ততো দিন পর্যন্ত জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় ছিলেন, যতোদিন নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দেননি। তার স্বাধীন জীবনটাই জনগণের চোখে ঈর্ষণীয় ছিলো। টিপু সুলতান তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। সম্মানজনক মৃত্যু তাকে জনতার চোখে আরও মহান, আরও শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিলো।

হৃদয়ের কোমলতা

সাধারণত শত্রুমহল থেকে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যেই অভিযোগগুলো ছোড়া হয়, তার একটি হলো— তিনি অত্যাচারী ও প্রতিশোধ পরায়ণ ছিলেন। ইংরেজ লেখক লিউন বী বূরঙ্গ তার বইয়ের মাঝে এ সম্পর্কে লেখেছেন যে, 'টিপুর নির্দেশে শুধু এক নগরীতেই ১৫ হাজার নাগরিককে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়।'

লেখক এতোটুকু বলেই থেমে গেছেন; অথচ নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ কথা লিখতে বাধ্য ছিলেন— টিপু সুলতান কী কারণে এক শহরের এতোগুলো লোককে হত্যা করেছেন?

যেখানে টিপু সুলতানের অভ্যাস ছিলো, কোনো শহর বা গ্রামে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি শুধু ষড়যন্ত্রের নাটের গুরুদের শাস্তি দিতেন। অধিকাংশ সময় তাদেরকে স্রেফ বন্দি করা হতো। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রয়োগ করতে তাকে খুব কমই দেখা গেছে।

www.boimate.com

যদি তর্কের খাতিরে আমরা ঘটনাটিকে সত্য ধরে নিই তাহলে প্রশ্ন ওঠে, নিঃসন্দেহে এটি মহিসুরের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সকল ঐতিহাসিকের কর্তব্য ছিলো, নিজ নিজ গ্রন্থে ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এক বুরঙ্গ ছাড়া অন্য কেউ এ ধরনের ঘটনা উল্লেখ করেননি।

টিপু সুলতান যে কোমল মনের শাসক ছিলেন, তা প্রমাণিত করতে শুধু এতোটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে, তিনি যখন তার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো বিদ্রোহ বা চক্রান্তের সংবাদ শুনতেন তখন অভিযোগ দলীল সহকারে প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতেন না। তার হৃদয়ের এই কোমলতার সুযোগ নিয়েই পুর্নিয়া, মীর সাদেক প্রমুখকে যেখানে নবাব হায়দার আলী হত্যা করার জোর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তারা শুধু প্রাণেই বাঁচেনি; বরং টিপুর একান্ত আস্থাভাজনদের সারিতে ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়েছিলো।

বাকহীন প্রাণীদের জন্যেও টিপু সুলতান ভালোবাসা অনুভব করতেন। একবার সুলতানের নির্দেশে নদীর তীরে অস্ত্র তৈরির একটি ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। যখন স্থানীয় লোকেরা এ অভিযোগ তুললো যে, কারখানার দূষিত বর্জ্যের কারণে নদীর মাছ মারা যাচ্ছে তখন তিনি তৎক্ষণাৎ ফ্যাক্টরি সেখান থেকে অন্য সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ করেন।

প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো দেশদ্রোহীর ওপর শাস্তি কার্যকর করতেন না। এরপর ওই অপরাধী ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি তাকে শুধু ক্ষমাই করতেন না; বরং পূর্বের পদে বহাল রাখতেন। মীর সাদিক, মীর কমরুদ্দীনের মতো জাতীয় গাদ্দাররা টিপু সুলতানের সেই দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্ষমা বাগিয়ে নিয়েছিলো।

শত্রুদলের কোনো নারী বা শিশু যুদ্ধবন্দি হলে তিনি কখনই তাদেরকে নিজের কাছে নজরবন্দি করে রাখতেন না। ১৭৮৭ সালে নবাব হায়দার আলীর শাসনামলে জেনারেল বেলির সঙ্গে মহিসুরের যুদ্ধের সময় যখন কয়েকজন ইংরেজ অফিসার বন্দি হয়ে টিপুর সামনে উত্থাপিত হয় তখন তিনি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত কোমল সদাচরণ করেন। এমনকি পকেট থেকে তাদেরকে জনপ্রতি ৫ প্যাগোডা [মহিসুরের স্থানীয় মুদ্রা] দান করেন। ১৭৮২ সালে জেনারেল বার্থভেট এর গ্রেফতারকৃত সেনাদের সঙ্গেও টিপু

www.boimate.com

সুলতান অনুরূপ আচরণ করেন। তাদেরকে তিনি পোশাক ও অর্থ দিয়েছিলেন।

কয়েদিদের সঙ্গে মহিসুর বাহিনীর কোনো অফিসারের কঠোর আচরণের কথা শুনলে তিনি অবশ্যই তার প্রতিবিধান করতেন।

১৭৮৬ সালে যখন মহিসুরের কাছে মারাঠি সিপাহিরা পরাজিত হয় তখন তাদের সর্দারদের অনেক স্ত্রী মহিসুর ফৌজের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলো। মারাঠি সর্দার হালকারের স্ত্রীকে টিপু নিজের কোমর থেকে সবুজ বর্ণের রেশমি কাপড়-বন্ধনী খুলে দেন। যেন এই টুকরো কাপড় দিয়ে সে তার মাথা আবৃত রাখে। সেই মহিলাদের জন্যে সম্মানজনক অবস্থান ও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। তাদের জন্যে পৃথক তাবু পাতা হয়। কয়েক দিন পর সুলতান তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীদের প্রহরায় তাদের সবাইকে পালকিতে চড়িয়ে পুনায় পালিয়ে যাওয়া তাদের স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। টিপুর এই মহৎ আচরণে মুগ্ধ হয়ে ওই মহিলারা তাদের স্বামীদেরকে টিপু সুলতানের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার চাপ প্রয়োগ করেছিলো।

একবার যুদ্ধের ময়দানে টিপু সুলতান একটি তাবুর ভেতর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পান। তিনি নিজেই তখন ওই তাবুর ভেতরে ঢুকে পড়েন। দেখতে পান— শত্রুপক্ষের এক কয়েদি তৃষ্ণায় ছটফট করছে। সুলতান তখন নিজ হাতে ওই যুদ্ধবন্দিকে পানি পান করান।

কোর্গের বিদ্রোহী কয়েদিদের ক্যাম্পে যখন কালবসন্তের মহামারি ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি বদরুজ্জামান খান নায়েতাকে পত্র মারফত নির্দেশ করেন যে, 'কয়েদিদেরকে এমন স্থানে রাখো যেখানকার আবহাওয়া ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষ যে ধর্মেরই হোক না কেন, তাকে অবশ্যই আল্লাহর আমানত মনে করবে'।

টিপু সুলতান বলতেন, 'আমি ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ রাখতেই জন্মগ্রহণ করেছি। হত্যা, যুদ্ধ আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয়'।

টিপু সুলতান সত্ত্বাগতভাবেই কোমলমনা ছিলেন। তিনি শান্তিবাদী ছিলেন। এ কারণেই দেখা যায়, তাঁর জীবনের সবগুলো যুদ্ধ ছিলো প্রতিরক্ষামূলক। তাঁর গোটা জীবনের একটি যুদ্ধও আক্রমণাত্মক ছিলো না। সব ধর্মের অনাথ শিশুদের প্রতিপালনের জন্যে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে গোটা রাজ্যে অসংখ্য অনাথ-আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন।

www.boimate.com

সুলতান নরম-কোমল মনের মানুষ ছিলেন, বিধায় অপরাধীদের জন্যে এমন দণ্ড নির্দেশ করতেন; যা একদিকে অপরাধীকে শুদ্ধ করবে, অন্যদিকে ওই দণ্ডের মাধ্যমে রাজ্যের উপকার হবে। যেমন, সাধারণ মাত্রার অপরাধ কারীকে সুলতান এ দণ্ড দিতেন যে, তাকে এমন গাছ বপন ও তার গোড়ায় পানি সিঞ্চনের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে হবে, যা দ্রুত ফল দেয়। আর মারাত্মক মাত্রার অপরাধীদের ক্ষেত্রে তার শাস্তি হতো, অপরাধীকে এমন গাছ বপন ও প্রতিপালন করতে হবে, যা অনেক দেরিতে ফল দেয়। যেমন, নারিকেল বা এ জাতীয় কাজ। তার শাস্তি ছিলো, গাছে ফল আসা পর্যন্ত তাকে গাছের পরিচর্যার কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্য

টিপু সুলতানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। এ গুণটিও তাঁকে তাঁর সমকালের অন্য শাসকদের থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিলো। তিনি সবসময় সতর্ক থাকতেন যে, কোনোভাবে যেন শত্রুদের সঙ্গে অবিচার না ঘটে। কোনো হিন্দু বা খ্রিস্টান তার ব্যাপারে এ অভিযোগ তুলতে পারেনি যে, স্রেফ ধর্মের কারণে সুলতান তাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছেন, বা তাদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত করেছেন।

হ্যাক্টর মনরো– যিনি টিপুর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মহিসুর শেষদু'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি তার আত্মজীবনীতে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, 'টিপু সুলতানের শাসনামলে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সঙ্গে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হতো। সেখানে বংশীয় কৌলিণ্য বা পারিবারিক আভিজাত্যের দোহাই তোলার সুযোগ ছিলো না।'

'ইমামি' নামে এক ধরনের মুদ্রা মহিসুরে প্রচলিত ছিলো। যার এক পিঠে লেখা ছিলো, هو السلطان العادل الوحيد—'তিনি একক ন্যায়বিচারক শাসক'।

টিপু সুলতান তাঁর এক শাহযাদাকে এ অপরাধে শাস্তি দিয়েছিলেন যে, সে জনৈক কৃষকের ক্ষেত থেকে অনুমতি না নিয়ে সব্জি তুলে এনেছিলো। সুলতানের শাসনামলে অপরাধ, দেশদ্রোহিতা ও আইন অবাধ্যতার শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কখনই ধর্ম ও বংশের বাছবিচার করা হতো না। সবার

www.boimate.com

ওপর সমান দণ্ড কার্যকর করা হতো। তাইতো দেখা যায়, ইংরেজদের সঙ্গে যৌনকর্ম করার অপরাধে তিনি কয়েকজন মুসলিম নারীকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। ১৭৮৫ সালে মারাঠিদের সঙ্গে যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন মহিসুর সেনাবাহিনীর কয়েকজন সিপাহি বিজয়-উৎসবের আতিশয্যে কয়েকজন হিন্দু মহিলার সঙ্গে অবৈধ কাজ করে তখন তিনি প্রমাণিত অপরাধের ভিত্তিতে সেই সিপাহিদের হত্যা করেন।

সুলতান কখনই কানকথার ভিত্তিতে কারও বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতেন না। অভিযোগকারী প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসার, তিনি এর পরোয়া করতেন না। সুলতান বলতেন— আমি যদি খোঁজ-খবর না নিয়ে স্রেফ শোনা কথার ভিত্তিতে শাস্তি দেওয়া শুরু করি তাহলে এর কারণে ব্যক্তিগত শত্রু জন্ম নেওয়ার পথ খুলে যাবে। এ কারণেই দেখা যায়— সুলতান উল্টো মিথ্যা অভিযোগকারীকে আইনের কাঠগড়ায় তুলতেন। ইতিহাস সাক্ষী— নীতিবান সুলতান তাঁর পিতা হায়দার আলীর অসিয়ত সত্ত্বেও শুধু এ কারণে মীর সাদিক, পুর্নিয়াকে কোনো ধরনের শাস্তি দেননি যে, তাদের দেশদ্রোহিতার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।

ইঙ্গ-মহিসুর সর্বশেষ যুদ্ধে ইংরেজরা সন্ধিচুক্তির জন্যে এ দাবী তুলেছিলো যে, তাকে ফরাসি সিপাহিদেরকে তাৎক্ষণিক চাকরিচ্যুত করে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু তিনি এ কথা বলে তাদের সেই দাবী নাকচ করে দেন যে, 'আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না।' এভাবে সুলতান নিজের জীবনের বিনিময়ে ফরাসিদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছিলেন। সুলতান তখন ইচ্ছে করলে গুটিকয়েক ফরাসিকে তাদের হাতে তুলে নিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে পারতেন।

সুলতানের প্রশাসন বা সেনাবাহিনীতে ধর্ম বা বংশের ভিত্তিতে কোটা ছিলো না। ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সক্ষমতাই চাকরিতে নিয়োগ ও উন্নতির একক মাপকাঠি বিবেচিত হতো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কখনই রাজপ্রাসাদে যেতো না। শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হাতে মাত্রই প্রথমে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বন্টন করতেন। বাকি অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে চলে যেতো।

জনগণের ন্যায়বিচার লাভের পথ সুগম করতে তিনি প্রতিটি গ্রাম ও শহরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পঞ্চায়েতের যিম্মাদারদের একজনকে 'প্যাটেল' আর অন্যজনকে 'ফৌজদার' বলা হতো। ধর্ম সংক্রান্ত মামলা

www.boimate.com

নিস্পত্তি করার জন্যে মুসলমানদের মাঝে 'কাযী' ও হিন্দুদের মাঝে 'পণ্ডিত' নিযুক্ত ছিলো। তাদের দেওয়া রায়ের ওপর বিচারপ্রার্থী সন্তুষ্ট না হলে তাদের জন্যে রাজধানীতে উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ওই আদালতে হিন্দু ও মুসলিম— উভয় ঘরানার বিচারক নিযুক্ত ছিলো। কোনো বিচারপ্রার্থী যদি এই উচ্চ আদালতের দেওয়া রায়ের ওপর সন্তুষ্ট না হতো তার জন্যে সুলতানের রাজদরবার খোলা ছিলো।

বিচার ও সাম্যের এমন সুশৃঙ্খল ব্যাবস্থাপনার কারণে দেখা যায়— সামষ্টিকভাবে কোনো হিন্দু কখনই তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় কারণে বিদ্রোহ করেনি।

ক্ষুরধার মেধা

সুলতান জন্মগতভাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি একাধিক ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। আরবি, উরদু, কানড়ি, ফারসি, তেলেগু, মারাঠি– সব ভাষায় সাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারতেন। ইংরেজি বলতে পারতেন। ফরাসি ভাষাও মোটামুটি জানতেন। তিনি তাঁর রাজদরবারে একসঙ্গে কয়েকজন 'মুনশি' থেকে চিঠি-পত্র শুনতেন। তাৎক্ষণিক তিনি সেগুলোর উত্তরও লিখিয়ে দিতেন।

সুলতান যদিও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক বা কবিরাজ ছিলেন না; কিন্তু নিজস্ব মেধা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বিভিন্ন রোগ-ব্যধির ওপর এমন কিছু অষুধ আবিষ্কার করেছিলেন যে, বহু দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পেশাজীবি চিকিৎসকরা পর্যন্ত তাঁর মেধার বিচ্ছুরণ দেখে অবাক হয়েছিলেন।

টিপু সুলতানের এক অনন্য আবিষ্কার হলো, ইতোপূর্বে জাহাজ নির্মাণের সময় কাঠের সঙ্গে কাঠ জোড়াতে লোহা ব্যবহৃত হতো। যার ফলে এ ধরনের নৌযানগুলো সমুদ্রের গোপন চুম্বক পাহাড়ের শিকারে পরিণত হতো। সুলতানই সর্বপ্রথম এক্ষেত্রে লোহার পরিবর্তে তামার ব্যবহার শুরু করেন।

উদ্ভাবনী ক্ষমতা

মহান আল্লাহ সুলতানকে অসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভা দিয়েছিলেন। তাঁর মাঝে সবসময় নতুন কিছু করার উদ্দীপনা কাজ করতো। ক্ষুরধার মেধা কাজে লাগিয়ে সবসময় অভিনব বস্তু আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেন।

www.boimate.com

হিন্দুস্তানের ইতিহাসে তিনি সর্বপ্রথম গোটা রাজ্যের আদমশুমারি করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রশাসন উপহার দেন। এমন শতভাগ সুরক্ষাপূর্ণ সাজোয়া যান আবিষ্কার করেন, বাইরে থেকে গুলি করে যা ক্ষতিগ্রস্থ করা যেতো না। তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে ফরাসি বিশেষজ্ঞদেরকে দিয়ে পানিতে ভাসমান এমন ইঞ্জিন তৈরি করেন, যা দিয়ে সহজেই প্রতিপক্ষের তোপের ভেতর ছিদ্র করা যেতো।

টিপু সুলতানই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মিসাইল আবিষ্কার করেন। এমনকি মার্কিনিরাও তাকে রকেট ক্ষেপণাস্ত্রের অন্যতম আবিষ্কারক স্বীকৃতি দিয়েছিলো।

সুলতান যখনই তার রাজ্যের কোনো যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানায় যেতেন তখন অবশ্যই নতুন প্রযুক্তির কোনো যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কৌশল জানিয়ে আসতেন।

তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী সনের পরিবর্তে মওলুদি সন প্রবর্তন করেন। নতুন এই সনটির সূচনা নবীজির হিজরতের দিন থেকে করেননি; বরং নবুওয়াত লাভের দিনটি থেকে এ সনের শুরু করেন।

তিনিই সর্বপ্রথম জ্যামিতিক সংখ্যা ডান দিক থেকে লেখা শুরু করেন। যেমন, ১৯৯৫ কে লেখা হতো ৫৯৯১।

সরকারি অধিদপ্তরগুলোর নাম লেখা হতো আল্লাহর নামের সঙ্গে মিলিয়ে। যেমন, গাফ্ফার কাচারি, রায্যাক কাচারি ইত্যাদি।

আরবি বর্ণমালার ভিত্তিতে একটি নতুন ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। যার নামগুলো এমন ছিলো,

أحمدي، بهاري، جعفري، دارائي، هاشمي، واسطي، زبرجدي،
حيدري، طلوعي، يوسفي، يازدي، بياضي.

টিপু সুলতান তার রাজ্যের নতুন নাম রেখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন, سلطنت خداداد [সালতানাতে খোদাদাদ]। তিনি এতোটাই অভিনবত্ব পটিয়সী ছিলেন যে, তিনি লেখার জন্যে লাল বা কালো রং ব্যবহার করতেন না। বরং লাল ও কালোর মধ্যবর্তী একটি নতুন ধরনের কালি তৈরি করেছিলেন। তিনি সাধারণত এই নতুন বর্ণের কালি ব্যবহার করতেন।

www.boimate.com

'খত্তে মুহাম্মদী' নামের একটি নতুন হস্তলিপি আবিষ্কার করেন। এর জন্যে তিনি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাও বের করেছিলেন। পরিমাপ-ওজনের জন্যে তিনি একটি নতুন মানদণ্ড আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি উপকূলীয় প্রদেশগুলোকে صوبجات يم [সূবাজাত ইয়াম] ও সমতলের প্রদেশগুলোকে صوبجات عنبرا [সূবাজাত আনবরা] নাম দেন।

সর্বোচ্চ ১২ পাউন্ড ভারি– এমন রকেটকে شهاب [শিহাব], তোপ-গোলাকে درخش [দারাখশ], বন্দুককে تفنگ [তাফাঙ্গ], তিন নলা বন্দুককে مقراض [মিকরায] নাম দিয়েছিলেন। সুলতান তার ব্যক্তিগত ঘোড়ার নাম দিয়েছিলেন 'তাউস'। অপরাধীদেরকে বৃক্ষরোপনের শাস্তি দিতেন। এগুলো প্রমাণিত করে— তিনি ছিলেন উদ্ভাবনী মেধার অধিকারী অনন্য শাসক।

নগরীর নাম পরিবর্তন

টিপু সুলতান তার সৃজনশীল মেধার স্বাক্ষর রেখে তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও কেল্লার নাম পরিবর্তন করেছিলেন। যার পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ–

পুরাতন নাম	নতুন নাম
১. ব্যাঙ্গালুরু	দারুস সুরুর
২. বিলারি	সামারপাটান
৩. কালিকাট	ইসলামাবাদ
৪. কোয়েম্বাটুর	সালামাবাদ
৫. কোলার	আজিমাবাদ
৬. সিরা	রুস্তমাবাদ
৭. মালোলি	গুলশানাবাদ
৮. মহিসুর	নযরাবাদ
৯. মঙ্গলোর	জামালাবাদ
১০. দিভানাহল্লি	ইউসুফাবাদ
১১. ধারওয়াড়	খুরশিদ সাওয়াদ
১২. হোস্কোটা	ইসলামপুর
১৩. শ্রীরঙ্গাপত্তনাম	যাফরাবাদ

www.boimate.com

১৪. ডান্ডিগাল	খালিকাবাদ
১৫. ফিরোক	ফারখি
১৬. ভাটকাল	রহমতাবাদ
১৭. পাওগড়	খাতমী
১৮. চিত্রাদুর্গা কেল্লা	ফারাহ-ইয়াব হিসার
১৯. নন্দীগড়	গুরদূঁ শিকওয়াহ
২০. কেল্লা	মানযারাবাদ
২১. কুশনগিরি	ফালাকুল আ'যম
২২. পানুকুন্ডা	ফাখরাবাদ
২৩. কেল্লাগুত্তি	ফায়য হিসার
২৪. বেদনুর	হায়দারনগর
২৫. মাকড়িদুর্গা	সাওভানগড় [ফালাক শিকওয়াহ]
২৬. কোর্গ (Coorg)	যাফরাবাদ
২৭. সাঙ্গলীদুর্গা	মুযাফফারাবাদ
২৮. পালিহল্লি	রহমত নগর
২৯. সুবা সিরা	রুস্তমাবাদ
৩০. নত্নাগিরি	মুসতফাবাদ
৩১. হাসান	কায়েমাবাদ
৩২. কাপালদুর্গা	জা'ফরাবাদ
৩৩. মুবারানী দুর্গা	আযবরাবাদ
৩৪. হলিয়ারাল্ল	উফুরাবাদ
৩৫. কর্মগিরি	মুহিউদ্দীনাবাদ
৩৬. দেবরায়দুর্গা	বালাশিকওয়াহ
৩৭. গুড়িবান্দা	আযমত শিকওয়াহ
৩৮. চমবারগড়	রিযাবাদ
৩৯. বাবরানদুর্গা	আযিমাবাদ
৪০. মারকালমাট্টো	মাহমুদাবাদ
৪১. কুন কুপা	মমতাযগড়
৪২. কান্দাপুর	নাসিরাবাদ

www.boimate.com

৪৩. কোবিদুর্গা	ইমতিয়াযগড়
৪৪. চন্দ্ররগুত্তি	শাকুরাবাদ
৪৫. সিবকোজি	ওয়াসিতাবাদ
৪৬. সদাশিবগড়	মাজিদাবাদ
৪৭. ধন্যিয়ান কোটা	হাসীনাবাদ
৪৮. আনন্তপুর	আহমদাবাদ
৪৯. চক্রগিরি	আযীযাবাদ
৫০. পাওগঢ়	হাফিযাবাদ
৫১. মারগুস	রহমানাবাদ
৫২. সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চল	সূবা য়াম
৫৩. প্রান্তর ও পার্বত্য অঞ্চল	সূবা ত্রন
৫৪. সমতলীয় এলাকা	সূবা আনবারা[৯৬]

মুদ্রার নাম

মহিসুর রাজ্যে সোনা, রুপা ও তামা— এই তিন ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত ছিলো। মুদ্রা তৈরির জন্যে দেশ জুড়ে মোট ১২ টি কারখানা স্থাপন করেছিলেন। রাজধানী শ্রীরঙ্গাপত্তনাম ছাড়াও মহিসুর (Mysore), ব্যাঙ্গালুরু , বেদনুর (Bednore) ও কালিকাট (Calicut) প্রভৃতি জেলায় সেই কারখানাগুলো স্থাপন করেন।

টিপুর শাসনামলের প্রথম চার বছর পর্যন্ত মুদ্রাগুলোর ওপর হিজরী সন লেখা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সেগুলোর ওপর নতুন প্রবর্তিত মওলুদি সন লেখা শুরু করেন। সোনা ও রূপার মুদ্রার ওপর সাধারণত একদিকে هو السلطان العادل الوحيد —'তিনি হচ্ছেন ন্যায়পরায়ণ একক সম্রাট' খোদাই করা হতো। মুদ্রার ওপর পিঠে লেখা হতো– دين احمد در جهاں روشن از فتح حيدر است—'হায়দারের বিজয় আহমদের ধর্ম [ইসলাম]-কে পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল করেছে।'

১৪ রুপি মূল্যমানের স্বর্ণমুদ্রাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধিত করে 'আহমদী' বলা হতো। ৭ রুপি

[৯৬]. নিশানে হায়দারি ও সহীফায়ে টিপু সুলতান

www.boimate.com

মূল্যমানের স্বর্ণমুদ্রাকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি.-এর দিকে সম্বন্ধিত করে 'সিদ্দীকি' বলা হতো। ৩.৫০ মূল্যমানের স্বর্ণমুদ্রাকে হযরত উমর রাদি.-এর দিকে সম্বন্ধিত করে 'ফারুকি' বলা হতো। আর সবচেয়ে ক্ষুদ্র মুদ্রাকে 'রাহাতি' বলা হতো। ২ রুপি মূল্যমানের রৌপ্যমুদ্রাকে হযরত আলী রাদি.-এর দিকে সম্বন্ধিত করে 'হায়দারি' বলা হতো। অবশিষ্ট মুদ্রাগুলোকে শিয়াদের ১২ ইমামের নামে 'বাকেরি, জাফরি' ইত্যাদি বলা হতো।

১ রুপি মূল্যমানের মুদ্রাকে 'ইমামি', আটানাকে 'আবেদি' আর চার আনাকে 'বাকেরি', দু' আনাকে 'জাফরি' আর এক আনা-কে 'কাযেমি' বলা হতো। ৩ পয়সা অর্থাৎ সবচেয়ে ক্ষুদ্র মুদ্রাকে 'খিযরি' বলা হতো।

তাম্রনির্মিত যে মুদ্রাটি ২ রুপি মূল্যমানের হতো সেটিকে হযরত উসমান রাদি.-এর দিকে সম্বন্ধিত করে 'উসমানি' বলা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটির নাম পরিবর্তন করে গ্রহ-নক্ষত্রের নামে مشتري [মুশতারি, অর্থাৎ বৃহস্পতি গ্রহ] নাম দেওয়া হয়। এরচেয়ে কম মূল্যমানের তাম্রনির্মিত মুদ্রাগুলোকে বিভিন্ন নক্ষত্রের দিকে সম্বন্ধিত করে নাম দেওয়া হয়। যেমন, এক পয়সাকে زهرة [যুহরা], অর্ধপয়সাকে مريخ [মিররিখ, অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহ], এক পয়সার চতুর্থাংশ মূল্যের মুদ্রাকে ستارة [সিতারা] ও এক পয়সার এক অষ্টমাংশ মূল্যমানের মুদ্রাকে قطب [কুতব, অর্থাৎ ধ্রুবতারা] বলা হতো।[৯৭]

পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রশাসন

যদিও প্রাচীন আমল সব এলাকাতেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্যে স্থানীয় কমিটি থাকে। এলাকার কোনো বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই কমিটির নেতা হয়ে থাকেন। কিন্তু টিপু সুলতান সর্বপ্রথম রীতিমতো রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রশাসনিক রূপ দান করেন। তিনি গ্রামের বিচার-সালিশ ও বিবাদমান বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্যে 'প্যাটেল' নামের একটি পদ নির্ধারণ করেন। তার একজন সহকারী হতো। সহকারীর পদটির নাম 'শানভাগ' [হিসাবরক্ষক]। স্থানীয় জনগণই সেই কমিটির সদস্য নির্বাচিত করতো। ওই কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে

[৯৭]. মুহিব্বুল হাসান বিরচিত 'তারীখে টিপু সুলতান'।

www.boimate.com

একজন এমন হতেন, যিনি জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কমিটিতে তার গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এই পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রশাসন এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিকে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার নতুন প্রথা– এটাও টিপু সুলতানের উদ্ভাবনী মেধার আবিষ্কার। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এতোটাই উপকারী প্রমাণিত হয়েছিলো যে, তা পরবর্তীকালে গোটা অঞ্চলে চিরদিনের জন্যে স্থায়িত্ব লাভ করে। অন্য শব্দে বললে, টিপু সুলতানই এই পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রশাসনের আবিষ্কারক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আদম শুমারি

বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বেও আলোচনা করেছি যে, সুলতানের সৃজনশীল মেধা সবসময় অভিনব বস্তু আবিস্কারের কথা ভাবতো। এই মানসিকতাই সুলতানকে আরেকটি বিষয় উদ্ভাবন করার প্রেরণা দিয়েছিলো। তাহলো, তিনি গোটা মহিসুর রাজ্যের আদম শুমারির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিষয়টি শুধু মহিসুর রাজ্যেই নয়; পুরো ভারতবর্ষের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন পদক্ষেপ। আদম শুমারির নির্দেশ জানিয়ে সুলতান তার প্রধান উযির মীর সাদিককে যেই পত্র দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি লেখেন,

> 'মীর সাদিকের নামে ফরমান ৯ জুলাই ১৭৮৬ ঈ.
>
> নির্দেশ করা হচ্ছে যে, পুরো রাজ্যের আদম শুমারি করা হোক। সেখানে অবশ্যই প্রত্যেকের লিঙ্গ ও সম্পত্তির বিবরণ থাকবে। শুমারি সম্পন্ন করার পর তার রিপোর্ট সুলতানের কাছে পৌঁছাতে হবে।
>
> স্বাক্ষর— *টিপু সুলতান*

ওই সময় মহিসুর রাজ্যের সকল কাযীকেও এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিলো যে, তারা আদমশুমারির কাজে সহায়তা করবে। সেখানে পুরুষ, মহিলা, শিশু, বাড়ি-ঘর, স্থাবর সম্পত্তি ও পেশা ইত্যাদিরও বিবরণ যুক্ত থাকবে। রিপোর্টের এক কপি সরকারের কাছে পৌঁছাতে হবে। আরেকটি কপি নিজের কাছে থাকবে।

স্বপ্নের সঙ্গে টিপুর মিতালী

টিপু সুলতান খুব বেশি স্বপ্ন দেখতেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে স্বপ্নগুলো ব্যাখ্যা সহকারে তাঁর রোযনামচায় লিখে রাখতেন। একবার তিনি স্বপ্নে

www.boimate.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ করেন। ওই স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে শাহাদাতের সুসংবাদ শোনান। প্রত্যূষে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি প্রথমে শোকরিয়ার নামায আদায় করেন। এরপর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ফকির-মিসকিনদের মাঝে দান-খয়রাত করেন।

টিপু সুলতানের ওই রোযনামচা তাঁর শাহাদাতের পর কর্নেল উইলিয়ামস যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাঝে দেখতে পেয়েছিলেন। টিপু সুলতানের ব্যক্তিগত লেখক হাবীবুল্লাহ খান রোযনামচাটি টিপু সুলতানের ব্যবহৃত বস্তু হিসেবে সত্যায়ন করেছিলেন। সুলতান তাঁর এই রোযনামচা সবার কাছ থেকে, এমনকি পরিবারের সদস্যবর্গ থেকেও লুকিয়ে রাখতেন। প্রফেসর মাহমুদুল হাসান ইংরেজিতে এবং মুসলিম যিয়াভি উরদূতে এ বিষয়ে অর্থাৎ সুলতানের স্বপ্ন সম্পর্কে স্বতন্ত্র বই লেখেছেন।

দেশপ্রেম

টিপু সুলতানের গোটা জীবন ছিলো দেশপ্রেমের অনন্য নিদর্শন। মাতৃভূমিকে তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। স্বদেশের প্রতি শতভাগ বিশ্বস্ত ছিলেন, এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা ও শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত রাখার জন্যে তিনি নিজের রাজসিংহাসন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

সুলতান ইচ্ছে করলে শত্রুদের কাছে স্বদেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর আত্মসম্মান এতে সায় দেয়নি। তিনি শত্রুদের প্রতিহত করার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনিই দেশের প্রথম শাসক– যিনি জনগণকে স্বাধীনতার একটি তুমুল জনপ্রিয় শ্লোগান **'হিন্দুস্তান হিন্দুস্তানিদের জন্যে'** উপহার দিয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র শাসক– যিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্যে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করেছিলেন। তিনি স্বদেশের শত্রুদেরকে প্রতিহত করার জন্যে নিযাম ও মারাঠি সর্দার, এমনকি ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। তাদেরকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

www.boimate.com

শেষতক তিনি যখন স্থানীয় শক্তিগুলোর ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন তখন বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সম্রাটদের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এখানেও তিনি ততোটা সাফল্যের দেখা পাননি। টিপু সুলতান যতোদিন জীবিত ছিলেন, ততোদিনে যদিও ইংরেজরা হিন্দুস্তানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করে নিয়েছিলো, তারপরও তাদের এ কথা বলার দুঃসাহস হয়নি— 'হিন্দুস্তান আমাদের'। কিন্তু তিনি ইহলোক ত্যাগ করতেই তার লাশের কাছে এসে জেনারেল হিয়ার্স স্বতস্ফূর্তভাবে উল্লাস করে বলেছিলো যে,

'আজ থেকে হিন্দুস্তান আমাদের'।

অন্যভাবে বললে, টিপু সুলতানের মৃত্যু ছিলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মৃত্যু। যার অন্যতম প্রমাণ হলো, তার শাহাদাতের ওপর কলকাতা, মাদ্রাজ ও মুম্বাই ছাড়াও খোদ লন্ডনেও উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছিলো।

টিপু সুলতানের মনে দেশপ্রেম এতোটাই প্রবল ছিলো যে, তিনি তাঁর জীবনে কখনই বিদেশি কাপড় ব্যবহার করেননি। যখন মাদ্রাজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে, তখনকার ঘটনা। একবার সেখান থেকে ব্যাঙ্গালুরুর ব্যবসায়ীরা লবণ আমদানি করেছিলো। টিপু সুলতান আমদানির সংবাদ শোনামাত্রই ওই ব্যবসায়ীদেরকে লবণ ফেরত পাঠাতে বাধ্য করেন। কাজেই অন্যভাবে বললে, টিপু সুলতান ছিলেন 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর উদ্ভাবক। তিনি মহিসুরের চতুর্সীমার ভেতর ইংরেজদেরকে কোনো ধরনের ব্যবসা করার অনুমতি দেননি। মালাবারের ফৌজদার আরশাদ বেগকে তিনি ১৭৮৭ সালে চিঠি লিখে নির্দেশ করেছিলেন— 'তিনি যেন রাজ্যের স্থানীয় বাসিন্দাদের জানিয়ে দেন, তারা যেন ইংরেজদের কাছ থেকে কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় না করে। তাহলে তারা নিরাশ হয়ে এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে।'

যদিও টিপু সুলতানের দখলে শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রচুর অত্যাধুনিক ইংলিশ ও ফরাসি যুদ্ধাস্ত্র ছিলো; কিন্তু তিনি সবসময় স্বদেশে নির্মিত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতেন। তাঁর শাহাদাতের পর শ্রীরঙ্গাপত্তনাম কেল্লা থেকে অসংখ্য অস্ত্র উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত যুদ্ধাস্ত্রের তালিকায় ৯২০ টি তোপ ছিলো। তন্মধ্য হতে শুধু ৫১ টি তোপ ছিলো ইউরোপিয়ান মডেলে তৈরি। টিপু সুলতানের দেশপ্রেমের প্রশংসা করে যুগে যুগে অনেক কবি প্রচুর কবিতা লেখেছেন। কবিতার ছন্দে ছন্দে তারা তাঁর দেশপ্রেমের প্রতি

www.boimate.com

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। এখানে আমি আখতার শিরানীর লেখা একটি কবিতা তুলে ধরছি—

عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے
عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے
عشق پہ کردوں فدا میں اپنی ساری زندگی
لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے

প্রেম ও স্বাধীনতা হলো জীবন-বসন্তের উপকরণ,
প্রেম হলো আমার জীবন। আর স্বাধীনতা আমার ঈমান।
প্রেমের জন্যে আমি আমার পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেছি,
কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে আমি আমার প্রেমকেও উৎসর্গ করেছি।

নির্মাণশিল্পের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ

সুলতান তার রক্তের ঐতিহ্যেই পেয়েছিলেন নির্মাণের প্রতি হৃদয়ের তুমুল আগ্রহ। নবাব হায়দার আলীও নির্মাণ করতে ভালোবাসতেন। পুরো মহিসুর রাজ্যে হাজার হাজার ভবন নির্মাণ করেছেন। অসংখ্য ফৌজি কেল্লা নির্মাণ করেছেন। ব্যাঙ্গালুরু, চিত্রাদুর্গা, হায়দারনগর [বেদনুর] ও ভাটকালে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। ভাটকালে তিনি যে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন, সেই মসজিদের নাম তার দিকেই সম্বন্ধিত করে 'সুলতানি মসজিদ' বলা হয়। কয়েক বছর পূর্বেও মসজিদ পুরাতন অবয়বে স্থির ছিলো। মসজিদের নির্মাণশৈলীতে সুলতানের উন্নত অভিরুচির প্রকাশ ঘটেছিলো। স্থানীয় বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে ওই মসজিদ নির্মাণ করার পর মসজিদের অভিভাকত্বের দলীল-দস্তাবেজ একটি পরিবারের নামে বরাদ্দ দিয়েছিলেন। সেই দলীল-দস্তাবেজ কয়েক বছর আগেও সেই পরিবারের হাতে সংরক্ষিত ছিলো।

সুলতান তাঁর আব্বাজান নবাব হায়দার আলীর কবরের ওপর একটি দৃষ্টিনন্দন চতুর্ভুজ ভবন তৈরি করেছিলেন। ওই ভবনের স্তম্ভগুলো ছিলো কালো রঙের মর্মর দিয়ে তৈরি। পাথরগুলো তৈলাক্ত বস্তুর মতো চকচক করতো। ভবনের ছাদে একটি সবুজ রঙের গম্বুজ তৈরি করেছিলেন। ওই ভবনে পরবর্তীকালে সুলতানকেও দাফন করা হয়।

www.boimate.com

নবাব হায়দার আলী রাজধানীতে কাভেরি নদীর দক্ষিণ তীরে একটি মনোরম মহল তৈরি করেছিলেন। যার নাম দিয়েছিলেন, দরিয়া দৌলত বাগ। টিপু সুলতান তাঁর শাসনামলে মহলটি আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়; তিনি স্থাপত্য শিল্পের সুষমা প্রয়োগ করে মহলটিকে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছিলেন। গ্রীষ্মকালে সুলতান অধিকাংশ সময় এখানেই অতিবাহিত করতেন। মহলটি এখনও শ্রীরঙ্গাপত্তনামের পুরাকীর্তি হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

১৭৮১ সালে হায়দার আলী ব্যাঙ্গালুরুতে নিজের জন্যে একটি প্রাসাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। টিপু সুলতান একের পর এক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ১৭৯১ সালে তার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।

ব্যাঙ্গালুরুতে মরক্কোর আরবদের নির্মাণশৈলীর অনুকরণ করে এক মিনারবিশিষ্ট একটি দৃষ্টিনন্দন, কারুকার্যখচিত মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতান নিজ তত্ত্বাবধানে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের মসজিদে আ'লার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

টিপু সুলতানের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে গোটা মহিসুরে আসা-যাওয়া ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিলো নৌকা। কিন্তু টিপু সুলতান তাঁর শাসনামলে সর্বপ্রথম মালাবারের এলাকাগুলোতে অনেকগুলো নতুন সড়ক নির্মাণ করেন। কাভেরি নদীর পূবপ্রান্ত থেকে ধর্মপূর ও হাসুরের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত, কৃষ্ণাগিরি থেকে বুদিকোটা পর্যন্ত দু'টি নতুন সড়ক নির্মাণ করেন। মালাবারে পথিকদের জন্যে তিনিই সর্বপ্রথম সরাইখানা নির্মাণ করেন। রাজধানী থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি বেরিবাধ তৈরি করেছিলেন। যার দৈর্ঘ্য ছিলো ৭০ ফিট। দারুজি এলাকায় আড়াই মাইল দৈর্ঘ্য ও ৪৫ ফিট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি উঁচু দীঘি তিনিই খনন করেছিলেন।

কাভেরি নদীর ওপর কৃষিকাজের সুবিধার্থে একটি বিশাল বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এমনকি ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর কর্নাটকের প্রাদেশিক সরকার কাকতালীয়ভাবে এই কাভেরি নদীর ওপর একটি বাধ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাধের জন্যে কোন জায়গাটি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, তা নির্বাচিত করতে

www.boimate.com

বিদেশি পানি-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা প্রচুর বাছ-বিচারের পর একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেন। যখন সেখানে খনন কাজ শুরু হয় তখন মাটির নিচ থেকে একটি শিলালিপি বেরিয়ে আসে। যার ওপর লেখা ছিলো, এখানে টিপু সুলতানের নির্দেশে একটি বিশাল বাধ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছে। ওই শিলালিপির লেখাগুলো শুরু হয়েছে بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاح দিয়ে।

শিলালিপিটি দেখে বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত অবাক হয়েছিলেন। তারা সুলতানের নির্মাণবিদ্যা ও বাধের জন্যে উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখে অবাক না হয়ে পারেননি। টিপু সুলতান سد محي [সাদ্দে মুহি] ও سد محمدي [সাদ্দে মুহাম্মাদি] নামে আরও দু'টি বিশাল বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় সলীম তামান্নায়ী সাহেবের কাছে রক্ষিত মহিসুরের দুটি প্রাচীন দস্তাবেজের মাঝে সেই বাধ তৈরির নির্দেশনা রয়েছে। ভাগ্যক্রমে সেই দস্তাবেজগুলো এখনও তার কাছে রয়েছে। আমি নিজেও সেই দস্তাবেজ দেখেছি।

www.boimate.com

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শাসক ও দেশপরিচালক হিসেবে টিপুর মূল্যায়ন

www.boimate.com

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা

সুলতান যেমন একজন সফল রাজনীতিবিদ ছিলেন, তেমনই ছিলেন দক্ষ পরিচালক। সুলতানের এই বৈশিষ্ট্যের কথা খোদ তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করতো। ইংরেজ ঐতিহাসিক ক্যাপ্টেন লিটল মন্তব্য করেন যে, যখন আমরা মহিসুর রাজ্যে প্রবেশ করি তখন অনুভব করি যে, সুলতান টিপুর সেনাবাহিনী ও প্রশাসন ইউরোপের কোনো উন্নত রাষ্ট্র থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নয়।'

টিপু সুলতান ওই যুগের প্রাচ্যের যেকোনো সম্রাটের তুলনায় শ্রেষ্ঠ দেশপরিচালক ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে মোঘলদের প্রাচীন অভিজ্ঞতা ও ইংরেজদের আধুনিক দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়ে এ দু'টোর সুফলগুলো সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সকল সরকারি কর্মকাণ্ড তিনি নিজেই দেখাশুনা করতেন। এ কাজে তার পুরো দিন অতিবাহিত হয়ে যেতো। কোনো এলাকায় চুরি, ডাকাতি বা অশান্তি সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার অফিসারদের কঠিন ভাষায় তিরস্কার করতেন। একবার তিনি এক তালুকদারকে এ ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন—

> নারসিপুরের তালুকদার মীর আহমদ আলীর নামে
>
> ২৫ জানুয়ারি ১৭৮৬ ঈ.
>
> তুমি জানিয়েছো যে, অপসারিত আমির প্রহরা থেকে পালিয়ে গেছে। তোমার কর্তব্য ছিলো তাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করার সুচারু পদক্ষেপ নেওয়া। এ ব্যক্তি রাষ্ট্রের ৩০ হাজার রুপি আত্মসাৎ করেছে।
>
> তাকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলে ওই অর্থ তোমার কাছ থেকে জরিমানা হিসেবে আদায় করা হবে।
>
> *-টিপু সুলতান*

এ কারণেই দেখা যায়, যদি দায়িত্বশীল অফিসারের কর্তব্যে অবহেলার কারণে জনগণের কোনো আর্থিক ক্ষতি ঘটতো তখন তিনি ওই ক্ষতির

www.boimate.com

সমপরিমাণ টাকা সেই অফিসারের বেতন থেকে কর্তন করতেন। যদিও সুলতান তার অধীনস্থদেরকে যথেষ্ট এক্তিয়ার দিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত তিনিই নিতেন। কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে পুরো সৈন্যদলের নেতৃত্বভার সবসময় নিজের হাতেই রাখতেন। কারো কাছ থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা পেলে তিনি শুধু সতর্কই করতেন না; বরং উপযুক্ত শাস্তি প্রয়োগ করতেন। এর বাইরে তিনি সবসময় সকল অফিসারকে ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার উপদেশ করতেন।

প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস

টিপু সুলতানের শাসনামলে মহিসুর ভূখণ্ডটি প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিলো। এই বিশাল রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার স্বার্থে তিনি অনেকগুলো শাখা গঠন করেছিলেন। যেহেতু নবাব হায়দার আলী তাঁর শাসনামলেই টিপু সুলতানকে কাননুর ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জমিদারি অর্পণ করেছিলেন; এজন্যে তখন থেকেই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও শুল্ক আদায় ইত্যকার বিষয়গুলো সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনেও কাজে এসেছে। হায়দার আলীর মৃত্যুর পর একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে প্রথম দিকে তিনি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ওপর মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাননি। কিন্তু মঙ্গালুরু চুক্তির পর তিনি এর ওপর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। প্রশাসন নতুন করে ঢেলে সাজান। তবে জনগণের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি প্রাচীন আইন-কানুনে কোনো আকস্মিক পরিবর্তন আনেননি।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

টিপু সুলতান একটি পার্লামেন্ট গঠন করেছিলেন। এই পার্লামেন্টই পুরো মহিসুর রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর নজর রাখতো। এটিই ছিলো কেন্দ্রীয় প্রশাসন। রাজ্যের সকল উযির ও অফিসার সেই পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। যার অধীনে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও বাণিজ্য তথা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৭টি বড় অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় ছিলো। প্রতিটি দপ্তর একজন উযিরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। সুলতান

www.boimate.com

নিজেই সেই উযিরদের জন্যে অফিসার নিয়োগ দিতেন। অধিদপ্তরগুলোর বিভিন্ন সময় বৈঠক হতো। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের আমলারা পারস্পরিক মতবিনিময় করে তাদের পরামর্শগুলো কার্যবিবরণীর রেজিস্টারে তুলে তার ওপর স্বাক্ষর করতেন এবং সেটির ওপর মহর যুক্ত করে বাক্সে রেখে দিতেন। পরবর্তীকালে তা খুলে অধিকাংশ আমলার পরামর্শের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সুলতানকে অবহিত করা হতো।

কোনো বিষয় খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে সে ব্যাপারে সুলতানের অভিমত প্রার্থনা করা হতো। অধিনস্থ অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতেন। অনেক সময় রাজ্যের সকল উযিরের উপস্থিতিতে সম্মিলিত বৈঠক হতো।

অধিদপ্তরগুলোর কার্যক্রম সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে গোয়েন্দা বিভাগ ছিলো। তারা সন্দেহভাজন আমলাদের গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। সকল কর্মকর্তাকে প্রতি তিন বছর পর একবার প্রমোশন দিয়ে অন্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হতো। রাষ্ট্রীয় ফরমানগুলো সাধারণত ফারসি ভাষায় জানানো হতো। মাঝে-মধ্যে কানড়ি, মারাঠি ও উরদূতেও সরকারি নির্দেশনা ঘোষিত হতো।

পার্লামেন্ট (কেন্দ্রীয় প্রশাসন)-এর অধীনস্থ মন্ত্রণালয়গুলোর কার্যক্রম নিম্নরূপ ছিলো—

১. অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কেন্দ্রীয় স্তরে প্রশাসনের এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়টিকে মহিসুরে 'মীর আসিফ' নাম দেওয়া হয়েছিলো। অন্যভাবে বললে, তা ছিলো 'অর্থনৈতিক বোর্ড'। এই মন্ত্রণালয়ের সর্বপ্রধান অর্থাৎ অর্থমন্ত্রীকে মহিসুরে 'দিওয়ান' বা 'মীর আসিফ' বলা হতো। সুলতান ও প্রধান উযিরের পর তিনিই হলেন প্রশাসনের তৃতীয় সর্বাধিক এক্তিয়ারধারী ব্যক্তি। এই পদে প্রথমে মীর সাদিক অধিষ্ঠিত ছিলো। ১৭৯২ সালে যখন পার্লামেন্ট গঠন করা হয় তখন মীর সাদিককে পার্লামেন্ট প্রধান বানিয়ে টিপু সুলতান এ পদে পুর্নিয়াকে অভিষিক্ত করেন।

এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলো মহিসুরের পুরো প্রশাসনের আয়-ব্যয়ের ওপর নজর রাখা। অর্থমন্ত্রীর অধীনে আরও ৬ জন সদস্য হতেন।

www.boimate.com

অর্থমন্ত্রীর বেতন ছিলো বার্ষিক ২১০০ প্যাগোডা। অন্য সদস্যদের বার্ষিক বেতন ছিলো ১০০০ প্যাগোডা। প্রশাসনের রাজকোষের হিসাব-নিকাশ সাধারণত ফারসি, কানড়ি ও মারাঠি ভাষায় লিখে রাখা হতো। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকটি শাখা ছিলো। প্রতিটি শাখার মেম্বারদের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব হতো।

২. স্থলবাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয়ের নাম ছিলো— كچهري ملك التجار [কাচারি মালিকুত তুজ্জার]। এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলো কারিগরি, প্রকৌশলবিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনা করা। প্রথমদিকে নৌবাণিজ্য মন্ত্রণালয়টি এর অধীনে ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে তার বিস্তৃতি ও গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে টিপু সুলতান তার জন্যে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেন।

এই অধিদপ্তরের মোট সদস্য ছিলো ৯ জন। প্রধানের নাম হতো 'আহমদ খান'। যার বার্ষিক বেতন ছিলো ৮৪০ প্যাগোডা। অন্য সদস্যদের বার্ষিক বেতন ছিলো ৫০০ প্যাগোডা। এই মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অধীনস্থ সকল কর্মকর্তাকে নিজ নিজ ধর্মানুসারে এ শপথ করতে হতো যে, তারা জনগণের কাছে হালাল রিযিক পৌঁছে দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং এ সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পূর্ণ ঈমানদারির সঙ্গে পালন করবে।

৩. নৌবাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয়কে كچهري مريم [কাচারি মারইয়াম] বলা হতো। যেহেতু টিপু সুলতানের শাসনামলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো; এজন্যে ১৭৯৬ সালে তিনি এর জন্যে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেন। এই মন্ত্রণালয়ের ৮ জন সদস্য হতো। মন্ত্রণালয়ের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা নির্বাচন করে নিতেন। যে উযির নৌবাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতেন, তাকে মহিসুর রাজ্যে 'হাফেয মুহাম্মদ মীর' বলা হতো। যার বার্ষিক বেতন হতো ৬৩০ প্যাগোডা। আর অন্য সদস্যদের বার্ষিক বেতন হতো ৫১০ প্যাগোডা।

www.boimate.com

৪. প্রতিরক্ষা বিভাগ

মহিসুর রাজ্যে এ মন্ত্রণালয়ের নাম ছিলো— كچهري مير ميران [কাচারি মীরে মীরাঁ]। এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলো সেনাবাহিনীর সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা। একজন উযিরের অধীনে ১৫ জন ফৌজি অফিসার এ মন্ত্রণালয়ের সদস্য হতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ পুর্নিয়া এই মন্ত্রণালয়ের উযির ছিলেন। প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব পালনের কারণে তার জন্যে আলাদাভাবে বার্ষিক ২৮৮০ প্যাগোডা বেতন নির্ধারিত ছিলো। অথচ অন্য সদস্যদের বেতন ছিলো মাত্র ৯০০ প্যাগোডা। মহিসুরের পুরো সেনাবাহিনীকে ১১ জন সিপাহসালারের অধীনে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিলো। টিপু সুলতান ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান সিপাহসালার।

৫. সমরাস্ত্র সংরক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

যুদ্ধের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা-বারুদের ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে টিপু সুলতান একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। তিনি এ মন্ত্রণালয়ের নাম রেখেছিলেন— كچهري مير صدور [কাচারি মীর সুদুর]। এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান তথা উযিরের নাম হতো, মীরুস সুদুর। গোলাম আলী খান এই মন্ত্রণালয়ের উযির ছিলেন। তার বার্ষিক বেতন ছিলো ৮৪০ প্যাগোডা। তার অধীনে ৮ জন অফিসার ছিলেন। তাদের বেতন ছিলো বার্ষিক ৬৫০ প্যাগোডা। এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলো মহিসুরের সকল সামরিক কেল্লা দেখাশুনা করা ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা। সেনাবাহিনীর আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব তাদের কাছে সংরক্ষিত হতো। এ-ছাড়া রাজ্যের কেল্লাগুলোতে যুদ্ধের উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র পৌঁছানোর দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয় পালন করতো।

৬. রাজকোষ সংরক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয়ের নাম ছিলো— كچهري مير كاظم [কাচারি মীর কাযিম]। যদিও এটি অর্থমন্ত্রণালয়েরই একটি শাখা ছিলো; কিন্তু কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে উঠে আসে। রাজকোষে নগদ মুদ্রা অর্থাৎ সোনা ও প্যাগোডা ছাড়াও মোহরযুক্ত সরকারি দস্তাবেজ সংরক্ষণ করার কাজ এ মন্ত্রণালয় আঞ্জাম দিতো। দেশজুড়ে যতোগুলো

www.boimate.com

টাকশাল ছিলো, সেগুলো এই মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো। যার সর্বোচ্চ কর্মকর্তার নাম হতো محمد أمين [মুহাম্মদ আমীন]। যার বার্ষিক বেতন ছিলো ৫৯৫ প্যাগোডা। তার অধীনে ৭ জন অফিসার কাজ করতো। তাদের বার্ষিক বেতন ছিলো ৪০০ প্যাগোডা।

৭. আইন, বিচার ও সালিশ মন্ত্রণালয়

নিজস্ব গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিচারে এ মন্ত্রণালয়টি দেশজুড়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বিবেচিত হতো। গ্রাম বা শহর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চায়েতের বিচারের বিরুদ্ধে কাউকে আপিল জানাতে হলে তারা এই আদালতের শরণাপন্ন হতো। কেমনযেনো এটি সেই যুগের সুপ্রিম কোর্ট ছিলো। এখানে হিন্দু ও মুসলিম— দু' ঘরানার বিচারপতি নিয়োগ পেতো। এই বিচারপতিদের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে কেউ আপিল করলে তা গ্রহণ করার একক অধিকার স্রেফ সুলতান ধারণ করতেন।

৮. সেনাবাহিনী বিষয়ক মন্ত্রণালয়

যদিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিসুরের সমস্ত সামরিক কর্মকাণ্ড চলে আসে; তারপরও টিপু সুলতান এ মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। তাহলো, সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও তাদের সার্বিক বিষয়-আশয় দেখাশুনা করা। ১৭৯৩ সালে তিনি এ মন্ত্রণালয় গঠন করেন। যার প্রধানের রাষ্ট্রীয় নাম ছিলো— محمد رضا [মুহাম্মদ রেযা]। যার বার্ষিক বেতন ছিলো ১০৫০ প্যাগোডা। তার অধীনে ১০ জন অফিসার হতো। যাদের বার্ষিক বেতন ছিলো ৭০০ প্যাগোডা। মহিসুর সেনাবাহিনীর মাঝে দেশি সিপাহি ছাড়াও কিছু বিদেশি সিপাহি চাকরি করতো। দেশি সিপাহিদেরকে زمرة [যুমরাহ] ও বিদেশি সিপাহিদেরকে غير زمرة [গায়রে যুমরাহ] বলা হতো। তাদের ইউনিফর্মের মাঝে হালকা পার্থক্য ছিলো। তাহলো দেশি সিপাহিদের সবুজ পাগড়িতে আলাদাভাবে একটি লালচে পট্টি হতো। যা বিদেশি সিপাহিদের পাগড়িতে হতো না।

৯. প্রচার ও প্রজ্ঞাপন বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এটি মূলত ডাক ও সংবাদ সরবরাহের বিভাগ। এর কেন্দ্রীয় দফতর ছিলো রাজধানীতে। তবে দেশের বিভিন্ন শহরের তার সদস্যবর্গ ও

www.boimate.com

কর্মচারীগণ ছড়িয়ে থাকতেন। যাদের মাধ্যমে সুলতান তার অধীনস্থদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হতেন। এটি অনেকটা গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব পালন করতো। এই শাখাটি সরকারি ও বেসরকারি চিঠিপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছানোর দায়িত্বও পালন করতো। এখানে দ্রুত চিঠি পৌঁছানো [Speed Post]-এর ব্যবস্থা ছিলো। যার জন্যে বিশেষ কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হতো। তাদেরকে 'বিজলী' বলা হতো।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীনে উপরিউক্তি মন্ত্রণালয়গুলো ছাড়াও আরও কিছু মন্ত্রণালয় ছিলো। যেমন, নির্মাণ অধিদপ্তর, দাস-দাসী তত্ত্বাবধান শাখা ও ধর্মীয় পুণ্যস্থান রক্ষণাবেক্ষণ শাখা।

প্রাদেশিক প্রশাসন

টিপু সুলতান তার শাসনামলের শুরুতে পুরো রাজ্যকে ৭টি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। মহিসুরের স্থানীয় পরিভাষায় প্রদেশকে বলা হতো اصفي [আসিফি]। পরবর্তীকালে প্রদেশের সংখ্যা ৯-এ উন্নীত হয়। ১৭৮৪ সালে মাঙ্গালুরু চুক্তির পর তিনি প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস করে প্রদেশসংখ্যা বাড়িয়ে ১৭-এ উন্নীত করেন। শেষদিকে প্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে একসময় ৩৭-এ উন্নীত হয়।

সুলতানের পক্ষ থেকে প্রতিটি প্রদেশের জন্যে দু'জন করে গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হতো। যেন কেউ অতিরিক্ত এক্তিয়ারের অধিকারী না হয়। একজন শুল্ক আদায়ের ব্যাপারটি দেখাশুনা করতেন। তাকে اصف [আসিফ] বা صوبيدار [সূবেদার] বলা হতো। অন্যজন বাকি দায়িত্বগুলো পালন করতো। তাকে امن عامة [আ-মিনে আ-ম্মাহ] বলা হতো। তার অপর নাম ছিলো فوجدار [ফৌজদার] বা فوجي گورنر [ফৌজি গভর্নর]। অপেক্ষাকৃত বড় প্রদেশের জন্যে চারজন গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হতো।

প্রতি বছর ঈদুল আযহার সময় সূবেদার ও ফৌজদার নিজ সহকারীদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে সুলতানের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ উপস্থাপন করতো। ঈদের নামাযের পর মুসলিম কর্মকর্তাগণ মসজিদের মিম্বারের সামনে কুরআন মাজিদ মাথায় রেখে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার নবায়ণ করতো। হিন্দু কর্মকর্তারা নিজস্ব শাস্ত্র অনুসারে অঙ্গীকার নবায়ণ করতো।

www.boimate.com

জেলা ও তালুক ব্যবস্থা

একটি প্রদেশের অধীনে অনেকগুলো জেলা হতো। জেলার প্রধান কর্মকর্তাকে 'আমলদার' বলা হতো। তার সহকারীকে বলা হতো 'তরফদার'। মহিসুর রাজ্যের মোট জেলার সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ১০২৪-এ উন্নীত হয়েছিলো। প্রতিজি জেলায় ত্রিশ থেকে চল্লিশটি গ্রাম হতো। আমলদার পুরো জেলায় কৃষকদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা, তাদের কল্যাণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গলো তত্ত্বাবধান করার যিম্মাদার হতো। তার দায়িত্ব হলো, ধনাঢ্যদের অতিরিক্ত মুনাফাখোরি থেকে কৃষকদের রক্ষা করা। তাকে সহায়তা করার জন্যে একজন তরফদার, দশজন মুহাররির ও ৪০ জন পিওন নিয়োগ দেওয়া হতো। তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করার জন্যে প্রতিটি জেলায় গোয়েন্দা বিভাগ সক্রিয় থাকতো। যার প্রধান সরাসরি সুলতানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

জেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে পঞ্চায়েত হতো। পঞ্চায়েতের প্রধানকে 'প্যাটেল' ও তার সহকারীকে 'শানভাগ' [হিসাবরক্ষক] বলা হতো। তারা পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধান করতেন। প্রতিটি প্রদেশ, জেলা ও গ্রামে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের তালিকা বিশদ বিবরণ সহকারে সুলতানের কাছে সংরক্ষিত থাকতো। সুলতান তাদেরকে কর্মনৈপুণ্যের ভিত্তিতে পদোন্নতি দিতেন। প্রতি তিন বছর পরপর তাদের অন্যত্র বদলি হতো।

বিচার ব্যবস্থাপনা

জনগণের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত, সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ সিভিল ও ফৌজদারি মামলাগুলোর জন্যে প্রতিটি গ্রামে প্যাটেল ও প্রতিটি শহরে 'আসিফ' নিযুক্ত ছিলো। ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদের নিরসনের জন্যে প্রতিটি শহরে মুসলিম নাগরিকদের জন্যে কাযী নিযুক্ত ছিলো। যিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত অবহিত করতেন। শ্রীরঙ্গাপত্তনাম, ব্যাঙ্গালুরু, বেদনুর ও চিত্রাদুর্গ– এই চারটি শহরে মহিসুরের চারজন বড় কাযী অবস্থান করতেন।

হিন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ নিরসন করার জন্যে পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলো। তিনি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতেন।

www.boimate.com

প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা আদালত অর্থাৎ ডিস্ট্রিক কোর্ট ছিলো। যেখানে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু– অর্থাৎ দু'জন বিচারপতি হতো। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্যাটেল বা জেলার 'আমলদার'-এর দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের আপিল করার সুযোগ ছিলো। রাজধানীতে উচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট ছিলো। যা কেন্দ্রীয় আইন, বিচার ও শালিস মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিলো। এখানে দেওয়া রায় যদি কারো মনোপূতঃ না হতো, তার জন্যে সরাসরি সুলতানের দরবারে মামলা উত্থাপন করার সুযোগ ছিলো। সুলতান তাঁর অফিসার ও উযিরদের সঙ্গে মত বিনিময় করে নিজ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন।

প্রতিটি আদালতে মামলার দু'পক্ষ উপস্থিত হতো। এরপর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারক ইসলামি সংবিধান অনুসারে তৎক্ষণাৎ ফয়সালা জানিয়ে দিতেন। সাধারণত শাস্তিগুলোও তাৎক্ষণিক কার্যকর হতো। হত্যা ও দেশদ্রোহের শাস্তি ছিলো ফাঁসি। চুরি-ডাকাতির অপরাধ প্রমাণিত হলে ধৃত অপরাধীর হাতে-পায়ে এক ধরনের তেল ব্যবহার করে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু করে ফেলা হতো। সাধারণত ধর্ষণের শাস্তি ছিলো লিঙ্গকর্তন। সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করা হতো। এই দণ্ডগুলো কার্যকর করার জন্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত ছিলো।

পররাষ্ট্র নীতি

টিপু সুলতান একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ ও দূরদর্শী শাসক হিসেবে পররাষ্ট্রনীতিমালা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। তিনি নিজেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এ সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠি-পত্র তিনি নিজ হাতে লেখতেন। হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজ্য যেমন, নেপাল, কাশ্মীর, জয়পুর, যোধপুর ইত্যকার রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে তিনি সবসময় সুসম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। দিল্লির মোঘল সম্রাটের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিলো। এমন মহিসুরের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মারাঠা ও নিযামের সঙ্গেও তিনি শেষ পর্যন্ত সন্ধি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তৈরির পূর্ণ প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। বহির্বিশ্ব তথা ইরান, আফগানিস্তান, ওমান, তুর্কিস্থান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সরকারের সঙ্গেও তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ওমানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতোটাই হৃদ্যতাপূর্ণ ছিলো যে, যেখানে মাস্কাটে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলোর

www.boimate.com

ব্যবসায়ীদের জন্য ৮% ও ইরানীদের জন্যে সাড়ে ৭% শুল্ক নির্ধারিত ছিলো, সেখানে মহিসুরের ব্যবসায়ীদের জন্যে শুল্কের পরিমাণ ছিলো মাত্র সাড়ে ৪%।

আফগানিস্তানের সম্রাট টিপু সুলতানকে সহায়তা করতে শুধু আগ্রহই দেখাননি; বরং একটি বিশাল সৈন্যদল নিয়ে হিন্দুস্তান সীমান্তে চলে এসেছিলেন। কিন্তু ইরানের আক্রমণের সংবাদ শুনে তিনি পুনরায় দেশে ফিরে যান। মোটকথা টিপু ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের বাইরের বিভিন্ন সম্রাটদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনকারী প্রথম সুলতান। এটা ভিন্ন কথা যে, তিনি তাঁর সেই সদিচ্ছায় সফল হতে পারেননি।

ফরাসিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

যদিও ফরাসি ও ইংরেজদের ধর্ম ছিলো এক। খ্রিস্টান হওয়ার কারণে দু' দেশই ইসলামের শত্রু। কিন্তু ওই যুগে আন্তর্জাতিক স্তরে ফরাসিরা ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলো। ওদিকে নবাব মুহাম্মদ আলী, হায়দারাবাদের নিযাম ও মারাঠি সর্দাররা কার্যত ইংরেজদের অনুগত পরিণত হয়েছিলো। অন্যভাবে বললে, তারা টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের রাজনৈতিক মিত্র হয়েছিলো। যার কারণে পুরো অঞ্চলে টিপু একাই ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে পড়েন। এজন্যে তিনিও পিতা হায়দার আলীর পথ অনুসরণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলেন। এই ফরাসিরা ওই যুগে ইংরেজদের মতো ব্যবসার অজুহাতে হিন্দুস্তানে পা রেখেছিলো।

ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে যদিও ফরাসিরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কারণে শেষ সময়ে মহিসুর সেনাবাহিনী থেকে সরে গিয়েছিলো; কিন্তু টিপু সুলতান ফরাসিদের বাধ্য-বাধকতার কথা জানতেন। যার কারণে তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, আগামীতে যেকোনো সময় তারা অবশ্যই তাকে সামরিক সহায়তা প্রদান করবে। এজন্যে তিনি কনস্ট্যানিপোলগামী কূটনৈতিক মিশনকে সেখান থেকে প্যারিসে গিয়ে ফ্রান্সের উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু অনিবার্য প্রতিবন্ধক সামনে চলে আসায় মিশনটি আর প্যারিস যেতে পারেনি। তারা হারামাইন শরীফাইন হয়ে মহিসুরে ফিরে আসে।

www.boimate.com

এর কিছু দিন পর সুলতান আরেকটি কূটনৈতিক মিশন একই উদ্দেশ্যে ১৭৮৭ সালে ফ্রান্স সম্রাট লুইশান্স দশমের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। যেই মিশনের সদস্য হিসেবে ছিলেন দরবেশ খান, আকবর খান ও উসমান খান প্রমুখ। টিপু সুলতান এই প্রতিনিধিদলটির মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের কাছে সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করেন এবং বিষয়টি নিয়ে একটি দশবছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা চুক্তির খসড়া প্রস্তাবনাও পেশ করেছিলেন।

সেই খসড়া প্রস্তাবনায় এ কথা ছিলো যে, ১০ হাজার ফরাসি সৈন্যের একটি দল মহিসুরে আসবে। তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার টিপু নিজেই বহন করবেন। এর বিনিময় হিসেবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে পান্ডেচেরি ও মাদ্রাজ সংলগ্ন এলাকা তাদের হাতে তুলে দেবেন।

ফ্রান্স সরকার এই কূটনৈতিক মিশনকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়ে বরণ করেছিলো। তাদের সম্মানে বিশেষ ভোজসভা আয়োজন করে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নানা বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ফরাসি সম্রাট কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেননি। যার ফলে প্রতিনিধি দলটি ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসে। অবশ্য মিশনের সদস্যরা কয়েকজন ফরাসি সামরিক বিশেষজ্ঞকে নিজেদের সঙ্গে মহিসুর নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এই বিশেষজ্ঞ দলটিতে কয়েকজন ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, নতুন ধরনের তোপ নির্মাতা, কার্তুজ ও বন্দুক তৈরির কারিগর ও উদ্যানবিদ ছিলো।

এরপর আরও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে টিপু সুলতান অনেকগুলো কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল ফ্রান্স পাঠিয়েছিলেন। ১৭৯৬ সালে মরিশাসে নিযুক্ত ফরাসি গভর্নর মিলারটিকের সঙ্গে এ বিষয়ে পত্রমারফত যোগাযোগ করেছিলেন। ১৯ জুলাই ১৭৯৮ সালে শাহাদাতের মাত্র এক বছর পূর্বেও তিনি আরেকটি প্রতিনিধিদল ফ্রান্স পাঠিয়েছিলেন। যার সদস্য ছিলেন শায়খ ইবরাহীম ও হুসাইন আলী প্রমুখ। কিন্তু মরিশাস থেকে ফ্রান্স যাওয়ার পথে ইংরেজরা ওই ফরাসি নৌযানের ওপর আক্রমণ করে।

এভাবে শেষ পর্যন্ত টিপু সুলতান একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক চুক্তি করতে পারেননি। ১৭৯৮ সালের আগস্ট মাসে ফ্রান্সের নেপোলিয়নের সঙ্গে টিপু সুলতানের পত্র

www.boimate.com

মারফত যেই কথাবার্তা হয়েছিলো, তার বিবরণ ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহিসুরের সেনাবাহিনী

মহিসুরের সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা স্থির ছিলো না। প্রয়োজন অনুপাতে কম-বেশ হতো। ১৭৬৭ সালে প্রথম ইঙ্গ-মহিসুর যুদ্ধে মহিসুর সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলো মাত্র ৩০ হাজার। ১৭৮২ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় সৈন্য সংখ্যা বেড়ে ৮৮ হাজারে উন্নীত হয়। ১৭৯২ সালে ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধের সময় টিপুর অধীনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ১৮ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিলো। এর বাইরে আরও অনিয়মিত ১ লক্ষ সিপাহি ছিলো। যারা রাজ্যের বিভিন্ন কেল্লা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রহরার দায়িত্ব পালন করছিলো। এছাড়াও তিনি টিপু সুলতান তার পিতা হায়দার আলীর রণকৌশলের মাঝে খানিকটা পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা কমিয়ে পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। যদিও তার এই ভুল রণকৌশলটি সালতানাতে খোদাদাদের পতনের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো।

১৭৯৯ সালে ইঙ্গ-মহিসুর সর্বশেষ যুদ্ধে খোদ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ভাষ্যানুসারে সুলতানের সঙ্গে কেল্লার ভেতর ও আশপাশে ৩৫০২ জন নিয়মিত অশ্বারোহী, ৯৩৯২ অনিয়মিত অশ্বারোহী, ২৩,৪৮৩ জন নিয়মিত পদাতিক সিপাহি, ৬৯০৯ জন অনিয়মিত স্বেচ্ছাসেবী সিপাহি এবং ৪৭৪৭ জন বন্দুকধারী সিপাহি ছিলো। এঁদের মধ্যে চারজন উচ্চপদস্থ ফরাসি অফিসার, ৪০ জন ইউরোপিয়ান সেনা ও ৩৫০ জন আফ্রিকান সৈন্য ছিলো। শুধু কেল্লার মধ্যেই সুলতানের সঙ্গে ১৪ হাজার নিয়মিত সৈন্য ছিলো। শাহাদাতের অল্প ক'মাস আগে ৫০ জন ইউরোপিয়ান সৈন্য ও ১০০ ফরাসি সৈন্য মহিসুর সেনাবাহিনীতে যোগদান করে।

এছাড়া রাজধানীর বাইরে বেদনুর, মঙ্গলোর, হোসকোটা, ব্যাঙ্গালুরু ও এ জাতীয় অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে প্রচুর নিয়মিত সৈন্য নিয়োজিত ছিলো। যাদের সামষ্টিক সংখ্যা ছিলো প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার। এর বাইরে আরও প্রচুর অনিয়মিত অর্ধসামরিক সিপাহি ছিলো। যারা যুদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতো।

www.boimate.com

যুদ্ধ না থাকলে অশ্বারোহী বাহিনী রাজধানীর আশপাশে অবস্থান করতো। পদাতিক বাহিনী অধিকাংশ সময় রাজধানীতে, বিশেষত কেল্লার ভেতর অবস্থান করতো। কয়েদিদের জন্যে পৃথক ব্যাটালিয়ান ছিলো। টিপু সুলতান এদের নাম রেখেছিলেন 'আহমদী' বা 'মুহাম্মদী'। শেষ দিকে তাদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছিলো।

নওমুসলিম ব্যাটালিয়ানকে 'আহমদী' মহিসুরের দেশী সৈন্যদেরকে 'যুমরাহ' ও বিদেশী সৈন্যদেরকে 'গায়রে যুমরাহ' বলা হতো। মহিসুরের স্থানীয় সৈন্যদের স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে তাদের সবুজ পাগড়ির মাঝে একটি লালচে রঙের টুকরো কাপড় হতো। নওমুসলিম ব্যাটালিয়ানের জন্যে বাঘের চামড়া থেকে প্রস্তুত ইউনিফর্ম রাখা হয়েছিলো।

হায়দার আলী পদাতিক বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন غارت گیر دسته [গারতগির দস্তা]। টিপু সুলতান তাদের নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন, اسد اللہی فوج [আসাদুল্লাহি ফৌজ]।

পদাতিক বাহিনীর ইউনিফর্ম ছিলো বেগুনি রঙের পোশাকের ওপর সাদা কোটি। সেনাবাহিনীতে সাধারণত হিন্দুধর্মালম্বীদের মধ্য থেকে রাজপুত ও মারাঠিদেরকে ভর্তি করা হতো। আর মুসলমানদের মধ্য থেকে পাঠান, মোঘল, শেখ ও সাইয়্যেদদেরকে ভর্তি করা হতো। হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ও মুসলমানদের উলামা-মাশায়েখকে ভর্তির উর্ধ্বে বিবেচনা করা হতো। যদিও হাজার হাজার আলেম ও বুযুর্গানে দ্বীন স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছেন, এমনকি তাদের কেউ কেউ সেনাবাহিনীর অনেকগুলো উচ্চ পদ অলংকৃত করেছেন। তাদের সেই অংশগ্রহণ ছিলো সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে।

সেনাসদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে একটি পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। যেখানে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে জিহাদের দাওয়াত প্রদান করা হতো। এই প্রয়োজন সামনে রেখেই 'তুহফাতুল মুজাহিদীন' বইটি সংকলিত হয়।

সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে টিপু সুলতান তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি সবসময় মারাঠি ও নিযামের সৈন্যদের তুলনায় নিজ সৈন্যদেরকে অধিক বেতন দিতেন। যেন সম্পদের লোভ দেখিয়ে শত্রুরা তাদেরকে ক্রয় করতে না পারে।

www.boimate.com

যুদ্ধের নানা প্রয়োজন, যুদ্ধাস্ত্র বহন ও রসদ ইত্যাদি আনা-নেওয়ার জন্যে তিনি বিদেশ থেকে উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া, গাভি, বলদ, খচ্চর ইত্যাদি আমদানি করেছিলেন। এগুলোতে তিনি মহিসুরেই প্রশিক্ষিত করে তোলেন। এজন্যে তিনি 'আমরাত মহল' নামে একটি পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'আমরাত মহল'-এর এই প্রশিক্ষিত ঘোড়ার সুখ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই ঘোড়াগুলো বিস্ময়কর দ্রুতিগতিসম্পন্ন হতো। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতর অনায়াসে মহিসুর থেকে মাদ্রাজ পৌঁছে যেতো।

সেনাসদস্যদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর ভেতর ১১ টি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। প্রতিটি বিভাগ একজন সিপাহসালারের অধীনে পরিচালিত হতো। কেল্লা নির্মাণ, যুদ্ধাস্ত্র তৈরি, ফৌজের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর বিচরণ, যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ ও বেতন-ভাতা বিতরণের জন্যে পৃথক পৃথক বিভাগ ছিলো। এই বিভাগগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে একটি পর্যবেক্ষক পরিষদ ছিলো। পুরো সালতানাতকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ২২ টি জেলায় বিভক্ত করে প্রতি দু' জেলার জন্যে একজন করে সিপাহসালার পর্যবেক্ষক নিযুক্ত ছিলেন।

সেনাবাহিনীর বিন্যাস

টিপু সুলতান যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে সেনাসদস্যদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন–

১. قشون [কাশূন]। এটি হলো সেনাবাহিনীর সবচেয়ে যোগ্য, রণকৌশল প্রয়োগে অভিজ্ঞ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটালিয়ন। বর্তমানের সামরিক পরিভাষায় যাকে 'রেজিমেন্ট' বলা হয়। এদের জন্যে একজন সিপাহসালার [কমান্ড্যান্ট] হতো। তাকে সহায়তা করার জন্যে একজন 'বখশী' [মাসোহারা বণ্টনকারী] ও কয়েকজন 'মুতাসদ্দী; [কেরাণী] হতো।

২. رسالة [রিসালা]। আধুনিক সামরিক পরিভাষায় যাকে 'স্কোয়াড্রন' বলা হয়। এ দলটির প্রধানকে 'রিসালাদার' বলা হতো। তার সহকারীকে 'সুরখেইল' ও অধীনস্থকে 'জমাদ্দার' বলা হতো।

৩. جوق [জওক]। আজকাল এ দলটিকে 'কোম্পানি' বলা হয়। এর প্রধানকে 'চৌকিদার', তার সহকারীকে 'দফাদার' ও অধীনস্থকে 'য়াযকুদার' বলা হতো।

www.boimate.com

কয়েকটি 'জওক' মিলে একটি 'রিসালা', কয়েকটি 'রিসালা' মিলে একটি 'কাশূন' গঠিত হতো। প্রত্যেকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ইউফির্ম ছিলো।

১৭৯৩ সালে মঙ্গলোর চুক্তির পর টিপু সুলতান তার সেনাবাহিনীকে নতুন করে ঢেলে সাজান। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে 'আসকার' নাম রাখেন। পদাতিক বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'জায়শ'।

সামরিক বাহিনীর বর্তমান পরিভাষা অনুসারে বললে এমন হবে যে, 'আসকার' অর্থাৎ অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে চারটি ব্রিগেডে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ব্রিগেডে থাকে পাঁচটি রেজিমেন্ট। টিপু সুলতানের শাসনামলে প্রতিটি ব্রিগেডের কমান্ডারকে 'বখশী' ও রেজিমেন্টের কমান্ডারকে 'মুকেমদার' বলা হতো। প্রতিটি রেজিমেন্টের অধীনে চারটি করে স্কোয়াড্রন হতো। প্রতিটি স্কোয়াড্রনের অনেকগুলো বাহু হতো। বাহুর প্রধানকে বর্তমানে ক্যাপ্টেন বলা হয়। টিপু সুলতানের যুগে বলা হতো 'য়াযিকদার'। তার অধীনস্থ অফিসারদেরকে বর্তমানে 'লেফট্যানেন্ট' বলা হয়। টিপুর আমলে বলা হতো 'সুরখেইল'। এই লেফট্যানেন্টের অধীনে হাবিলদার ও সাধারণ সিপাহিরা কাজ করতো।

'জায়শ' অর্থাৎ পদাতিক বাহিনীও চারটি ব্রিগেড [কাচারি]-তে বিভক্ত হতো। প্রতিটি ব্রিগেডে আবার চারটি করে قش [কশ] হতো। বর্তমানের পরিভাষায় যাকে রেজিম্যান্ট বলা হয়। প্রতিটি রেজিম্যান্টে চার جوق [যওক] হতো। বর্তমানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় কোম্পানি। কোম্পানির পরিচালককে 'বখশী' বলা হতো।

প্রতিটি قش [কশ] তথা রেজিম্যান্টে ১৩৯২ জন সিপাহি, ১০৫৬ জন বন্দুকধারী সৈন্য ও কয়েকজন তোপ পরিচালক হতো। প্রতিটি রেজিম্যান্টকে পৃথকাকারে চেনার জন্যে পৃথক পৃথক পতাকা দেওয়া হতো।[৯৮]

সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (محكمة مير ميران)-এর ওপর অর্পিত ছিলো। সিপাহিদের ছোট-বড় যাবতীয় কাজকর্ম এখানেই নিষ্পন্ন হতো। তবে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে টিপু সুলতান নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন।

---

[৯৮]. মুহিব্বুল হাসান বিরচিত 'তারীখে টিপু সুলতান'।

www.boimate.com

নৌশক্তি

নবাব হায়দার আলী ও টিপু সুলতান– অর্থাৎ সালতানাতে খোদাদাদের এই দু' শাসকই ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম শাসক, যারা সবার আগে নৌশক্তিরর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। এই প্রয়োজনীয়তা সামনে রেখেই তারা প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা সমুদ্রবন্দরগুলোকে আরও সম্প্রসারিত করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং সেগুলোর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন। নৌবাহিনী গঠনের কাজ নবাব হায়দার আলীর শাসনামলেই সূচিত হয়েছিলো; কিন্তু ১৭৮০ সালে যখন ইংরেজরা মঙ্গালোরের কাছাকছি আরব উপসাগরে জাহাজের ভাসমান নোঙ্গরখানা ডুবিয়ে দেয় তখন আর বিষয়টি সামনে অগ্রসর হয়নি।

টিপু সুলতান রাজ্যাভিষেকের পর নৌশক্তির ওপর পুনরায় মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। অল্প সময়ের ভেতর তিনি অনেকগুলো যুদ্ধতরী নির্মাণ করে ১৭৯৬ সালে এর জন্যে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেন। যার নাম দেন 'ওজারাতে মীর ইয়াম'। এই মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ২০ টি বৃহৎ ও ৩২ টি ছোট রণতরী সবসময় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতো। বড় জাহাজগুলোতে একসঙ্গে ৭২ টি তোপ রাখা যেতো। এই রণতরী গুলোর নিরাপত্তা ও প্রহরা নিশ্চিত করতে আরও ৭২ টি ছোট যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করেন।

আর ছোট রণতরীগুলোতে ৪৬ টি তোপ রাখা যেতো। এগুলোর নিরাপত্তার প্রয়োজনে আরও ৬৬টি যুদ্ধজাহাজ ছিলো।

রণতরী নির্মাণ করার জন্যে টিপু সুলতান মঙ্গলোর, মিরজান ও মওলুযাবাদে পৃথক পৃথক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মালাবারের গহীন জঙ্গল থেকে সাগওয়ান কাঠ আহরণ করে ওই কারখানাগুলো পাঠানো হতো। এক্ষেত্রে মজার বিষয় হলো, টিপু সুলতান নিজ হাতে এই জাহাজগুলোর নকশা তৈরি করে পাঠাতেন। ১৭৯৩ সালে সুলতান ২০ টি শক্তিহীন রণতরী ডুবিয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন।

নৌবাহিনীর সদস্যদেরকে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৭৯৩ সালে ভাটকালে জাহাজ পরিচালনা পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। জাহাজের নির্মাণকাজে লোহা ব্যবহারের কারণে সমুদ্রে চুম্বকীয় পাহাড়ের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা

www.boimate.com

সবসময় লেগেই থাকতো। এর থেকে রক্ষা পেতে পুরো পৃথিবীতে টিপু সুলতানই সর্বপ্রথম লোহার পরিবর্তে তামার ব্যবহার শুরু করেন। সুলতানই সর্বপ্রথম তার নৌজাহাজগুলোতে এর সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

মহিসুর রাজ্যের উপকূলীয় স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পশ্চিমা শক্তিগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের আক্রমণ থেকে মহিসুর রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে টিপু সুলতান মাসকাট, বসরা, আদনের নৌবন্দরগুলো ভাড়া দেওয়ার জন্যে তিনি দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

তার শাসনামলের প্রথম দিকে নৌবাহিনী সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় মহিসুরের প্রতিরক্ষা বিভাগের অধীনস্থ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে এ মন্ত্রণালয়ের ক্রমবিস্তৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৭৯৬ সালে তিনি এ মন্ত্রণালয়কে সাধারণ ফৌজ থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের রূপ দান করেন। নৌবাহিনীতে ৮ জন উচ্চপদস্থ অফিসার ছাড়াও ৩০ জন এডমিরাল সবসময় গভীর সমুদ্রে জাহাজে অবস্থান করতেন।

শাহাদাতের কয়েক বছর পূর্বে সুলতান আরও এক শ যুদ্ধজাহাজের একটি বিশাল নৌবহর তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিলো। দুঃখের বিষয় হলো, তা সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর মঙ্গলোর, কিন্দাপুর প্রভৃতি স্থান থেকে যেই জাহাজগুলো ইংরেজদের হস্তগত হয়েছিলো, তার তালিকা নিম্নে তুলে ধরছি—

জাহাজের দৈর্ঘ্য	সংখ্যা
১১০ ফিট	৩ টি
১০৪ ফিট	১ টি
১০৫ ফিট	২ টি
৯৫ ফিট	৩ টি
৬০ ফিট	১ টি
১১২ ফিট	১ টি
৭০ ফিট	৩ টি
৬৫ ফিট	১ টি

www.boimate.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

টিপু সুলতানের শাসনামলে মহিসুরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

www.boimate.com

মহিসুর রাজ্যের আর্থিক সচ্ছলতা

একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও টিপু সুলতান সবসময় জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা ও মহিসুরের প্রবৃদ্ধির কথা ভাবতেন। তাঁর শাসনামলে সালতানাতে খোদাদাদ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি খাত, কারিগরি ও হস্তশিল্পে যেই অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে, তা সুলতানের শত্রুরা পর্যন্ত অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন এবং এর ওপর সুলতানের ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যুর মহিসুরবাসীর আর্থিক সচ্ছলতার চিত্র এঁকে বলেন—

> 'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নতুন দেশে যায় আর দেখতে পায় যে, স্থানীয় বাসিন্দারা সচ্ছল। শহরে প্রচুর জনসমাগম রয়েছে। কৃষি খাত উন্নত। কারিগরি ও প্রকৌশল বিদ্যাও ক্রমোন্নতি লাভ করছে। বাণিজ্যের প্রচুর সম্প্রসারণ হচ্ছে। তাহলে বুঝে নেবে যে, সেখানকার প্রশাসন জনগণের আশার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। ঠিক এমনই ছিলো টিপু সুলতানের প্রশাসনের চিত্র। অন্ততঃ আমার চোখে এমনটাই ধরা পড়েছে।'

১৭৯৩ সালে মঙ্গলোর চুক্তি অনুসারে তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইংরেজদেরকে ৩ কোটি রুপি আদায় করার পর এটাই স্বাভাবিক ছিলো যে, এখন মহিসুরের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে। কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। বরং দক্ষ কর্মকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তিনি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।

সামষ্টিকভাবে পুরো ভারতবর্ষে মহিসুর রাজ্য ছিলো সবচেয়ে সচ্ছল। এ কারণেই ওই যুগের বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ডব্লিউ টরেন্স এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'পুরো ভারতবর্ষে টিপু সুলতানের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোই সবচেয়ে বেশি সবুজ-শ্যামল, ফুল-ফলে সুশোভিত। তাঁর জনগণই এতদাঞ্চলের সর্বাধিক সচ্ছল।'

www.boimate.com

বাণিজ্য সম্প্রসারণ

পুরো ভারতবর্ষে টিপু সুলতানই একমাত্র শাসক— যিনি নিজ রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করতে নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এজন্যে তিনি 'কাচারিয়ে মালিকুত তুজ্জার' নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। ফ্রান্স, তুরস্ক, ওমান ও আফ্রিকা থেকে বড় অংকের বেতন দিয়ে দক্ষ কারিগরদেরকে এনে মহিসুরে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ইংরেজ কয়েদীদের থেকে সেবা নিতেও কুণ্ঠিত হননি।

বহির্দেশ থেকে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে রেশমি পোকা এনে প্রতিপালন করে তার মাধ্যমে রেশম শিল্পকে নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। এর জন্যে তিনি রাজ্যজুড়ে ১২ টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গরিব প্রজাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তিনি একটি বিশাল বাণিজ্যিক কোম্পানি গঠন করেছিলেন। ওই কোম্পানিতে রাজ্যের যে কোনো নাগরিক কমপক্ষে ৫ রুপি, সর্বোচ্চ ৫০০ রুপি বিনিয়োগ করে বছরের শেষে ৫০% লাভ পেতো। আর ৫০০ থেকে ৫০০০ রুপি বিনিয়োগকারীকে ২৫% লাভ দেওয়া হতো। এটা ছিলো সুলতানের গরিববান্ধব বাণিজ্য নীতির বাস্তবাশ্রিত পদক্ষেপ।

টিপুর শাসনামলে শুধু মহিসুরেই ৩০টির অধিক বাণিজ্যিক কুঠি ছিলো। এর বাইরে তিনি বিদেশে জেদ্দা, বসরা, আদন প্রভৃতি অঞ্চলে আরও ১৭ টি কুঠি স্থাপন করেছিলেন। ১৭৮৫ সালে মহিসুর সরকারের পক্ষ থেকে মাসকাটে একটি বিশাল বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করা হয়। সেখানে মহিসুর সরকারের বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দেখাশুনা করার জন্যে সুলতানের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি সার্বক্ষণিক অবস্থান করতো। সেখান থেকে মহিসুরের বিভিন্ন পণ্য পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্য সাগর হয়ে ওপারের দেশগুলোতে রফতানি করা হতো। হিজাযের জিদ্দা নগরী ও ইরানের 'আরমুয' শহরে মণি-মুক্তা ক্রয় করার জন্যে দু'টি পৃথক বাণিজ্যিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকায় ছিলো ঘোড়া, রেশম পোকা, মুক্তা, তামা ও খেজুর ইত্যাদি। আর মহিসুর থেকে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকায় ছিলো চাউল, হাতির দাঁত, রেশমি কাপড়, গরম মশলা, চন্দন ও ফার্নিচারের কাঠ।

www.boimate.com

৫-৬ টি বিশাল বাণিজ্যিক জাহাজ শুধু মঙ্গলোর থেকে ওমান অভিমুখে সারা বছর নিয়মিত যাতায়াত করতো। এর বাইরে মাঝারি ও ছোট সাইজের অসংখ্য জাহাজ নিয়মিত আমদানি-রপ্তানির পণ্য নিয়ে আসা-যাওয়া করতো। মহিসুরের বিভিন্ন স্থান থেকে কেরালা অভিমুখে ব্যবসায়িক পণ্য আনা-নেওয়ার জন্যে দু' শ' গরুর গাড়ি সারা বছর ব্যস্ত থাকতো।

সুলতানের শাসনামলে মধ্য এশিয়ার দেশ আর্মেনিয়া থেকে প্রচুর বিদেশী বণিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে মহিসুরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুলতানের শিথীল বাণিজ্য নীতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তুর্কিস্তান, ইরান, হিজায় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দলে দলে বণিকেরা এসে মহিসুরে ব্যবসা শুরু করে দেয়।

মহিসুরে ব্যবসায়িক পণ্য আমদানি-রফতানিকারী চীনা বণিকদেরকে মালাবারের কিছু ডাকাত উত্তক্ত করতো। সুলতান তাদের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ নিয়োজিত করেছিলেন।

বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে মন্ত্রণালয় থেকে রীতিমতো অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) প্রদান করা হতো। ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক কোম্পানির জনে মহিসুরে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ ছিলো। মহিসুরের ব্যবসায়ীদের জন্যে তাদের কাছে পণ্য বিক্রির অনুমতি ছিলো না। যার কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তেলচেরি নগরীতে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম ধস বিরাজ করছিলো। তখন ইংরেজরা মাসকাটের ব্যবসায়ীদের ছদ্মবেশ ধারণ করে মঙ্গলোর থেকে চাউল ইত্যাদি কিনতে শুরু করে। সুলতান যখন তাদের এই অপতৎপরতার কথা শুনতে পান তখন তিনি এই ফরমান জারি করে দেন যে, বিদেশি বণিকদেরকে পণ্য কিনতে হলে অবশ্যই পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্র বা স্থানীয় দারোগা কর্তৃক স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র প্রদর্শন করতে হবে। নয়তো তাদেরকে কোনো পণ্য কিনতে দেওয়া হবে না।

সুলতান প্রথম দিকে পর্তুগিজদেরকেও মহিসুরের মাটিকে ব্যবসা করার অনুমতি দেননি। তখন তারা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুলতানের বৈরীতা শুরু করে দেয়। কিন্তু ১৭৯১ সালে যখন তারা কারওয়ার নগরীর কাছের শহর সদাশিবগড় খালি করে দেয় তখন সুলতান তাদের বিরুদ্ধে আরোপিত বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধ তুলে নেন।

www.boimate.com

অপরিশোধিত সোনা, হাতির দাঁত, চন্দনকাঠ ও গরম মশালার ব্যবসা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের ছিলো। এগুলো বিক্রি করার জন্যে রাজ্য জুড়ে অসংখ্য সরকারি বিপণী বিতান খোলা হয়েছিলো। জনগণের সুবিধার্থে ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতিমালা সম্পর্কে 'আহকাম' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছিলো।

প্রকৌশল ও কারিগরি বিদ্যার বিস্ময়কর উন্নতি

মহিসুর রাজ্য টিপু সুলতানের শাসনামলে কারিগরি শিল্পেও প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় যথেষ্ট উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিলো। স্থানীয় কারিগরদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে বিদেশী বিশেষজ্ঞদেরকে উচ্চ বেতনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো। উসমানি খলীফার খেদমতে টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে প্রেরীত কূটনৈতিক মিশন সুলতান সলীমের কাছে সোনা-রূপার খনি সম্পর্কে অভিজ্ঞ কারিগরদেরকে মহিসুর প্রেরণের আবেদন পেশ করেছিলো। ফরাসি কারিগরদের সাহায্যে সুলতান পৃথিবীর বুকে প্রথমবারের মতো পানিতে ভাসমান এমন একটি ইঞ্জিন আবিস্কার করেন, যার সাহায্যে প্রতিপক্ষের তোপে ছিদ্র করা যেতো।

সৈন্যদের সিংহভাগ যুদ্ধাস্ত্র মহিসুরেই তৈরি হতো। এজন্যে টিপু অনেকগুলো যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার এই উদ্যোগের কারণে একদিকে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হয়। অন্যদিকে মহিসুরের আমদানি পণ্যের তালিকা ছোট হয়ে আসে।

শ্রীরঙ্গাপত্তনামে লৌহজাত শিল্প ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানা ছাড়াও কাগজ তৈরির একটি বিশাল কারখানা ছিলো। এর বাইরে মহিসুরে বারুদ, শিশা ও সঙ্গীতের বিভিন্ন যন্ত্র তৈরি হতো। শহরের উপকণ্ঠে পাথর কাটার জন্যে বিশালাকারের মেশিন স্থাপন করা হয়েছিলো। চিনপটন নগরীতে চিনি ও শিশা তৈরির জন্যে পৃথক দু'টি কারখানা ছিলো। ব্যাঙ্গালুরুতে প্রচুর তাতী উন্নত মানের বিভিন্ন কাপড় তৈরির কাজে সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ত থাকতো। ধারওয়াড় (Dharwar), মহিসুর, ব্যাঙ্গালুরু, ফখরাবাদ, শ্রীরঙ্গাপত্তনাম, বেদনুর, কালিকাট (Calicut), গুট্টি (Gutti), চিত্রাদুর্গা (Chitaldroog), সীতামঙ্গল ও ডান্ডিগ্যালে সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা তৈরির টাকশাল ছিলো।

www.boimate.com

মাসকাট ও বঙ্গদেশ থেকে রেশম পোকা আমদানি করে সেগুলো প্রতিপালন করা হতো। রেশম পোকার খাদ্যা হিসেবে বিভিন্ন স্থানে শাহতুত গাছ রোপণ করা হয়েছিলো। গুণগত মানের কারণে কর্নাটকের রেশমি কাপড় আন্তর্জাতিক বাজারে যেই সুখ্যাতি অর্জন করেছিলো তার একক কৃতিত্ব অবশ্যই টিপু সুলতান পাবেন।

কোলার নগরীতে খনি থেকে অপরিশোধিত স্বর্ণ উত্তোলন করে তা পরিশোধনের আধুনিক ব্যবস্থাপনা ছিলো। গভীর সমুদ্র থেকে মুক্তা সংগ্রহের জন্যে কেরালার উপকূলে বাহরাইন ও মাসকাট থেকে বিশেষজ্ঞ এনে উচ্চ বেতনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো। শিমোগা (Shimoga) নগরীতে চন্দন কাঠ দিয়ে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য তৈরি করে উন্নত দেশগুলোতে রফতানি করা হতো। রাজ্য জুড়ে অসংখ্য অস্ত্র তৈরির কারখানা ছিলো। যার একটি ছিলো বেদনূরে। এখানকার একটি কারখানা থেকে প্রতি বছর ২০ হাজারেরও অধিক বন্দুক তৈরি হতো। মোটকথা, জীবন যাপনের এই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর সিংহভাগ মহিসুরেই তৈরি হতো। এর বাইরে আরও বিভিন্ন পণ্য তৈরির জন্যে ৩০ টির অধিক বিশালাকারের কারখানা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিলো।

যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ

মহিসুর সেনাবাহিনীতে যদিও দেশি-বিদেশি সব ধরনের যুদ্ধাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার ছিলো; কিন্তু সুলতান সাধারণত দেশে প্রস্তুত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতে পসন্দ করতেন। ব্যাঙ্গালুরু, শ্রীরঙ্গাপত্তনাম, চিত্রাদুর্গা ও বেদনুর (হায়দারনগর)-এ যুদ্ধাস্ত্র তৈরির চারটি বিশাল কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে ফরাসি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তরবারি, বন্দুক, তীর, খঞ্জর, গোলা বারুদ ও ছোট সাইজের তোপ তৈরি হতো। যেহেতু মহিসুরের তোপের মুখ সাধারণত ইংরেজদের তোপ থেকে বড় হতো, এজন্যে গোলা বর্ষণের ক্ষেত্রে মহিসুর বাহিনী সবসময় শত্রুপক্ষের চেয়ে এগিয়ে থাকতো। মহিসুরের তোপের সুখ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো। শুধু তোপখানার সরঞ্জাম বহন করার জন্যে ৪০ হাজার গরুর গাড়ি নিয়োজিত ছিলো। বেদনুরের অস্ত্র কারখানায় প্রতি বছর ২০ হাজার বন্দুক তৈরি হতো।

www.boimate.com

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম পতনের পর ইংরেজরা যেই যুদ্ধসম্পদ লাভ করে, সেখানে ৬০ হাজার বন্দুক, ১২ হাজার গোলা, ৫ লক্ষ গুলি, ৯২০ টি দোনলা বন্দুক ছাড়াও বারুদ ও অন্যান্য অস্ত্রের বিপুল পরিমাণ মজুত ছিলো। টিপু সুলতানই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম রকেট আবিষ্কার করেছিলেন। কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রেরীত সরকারি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ওই সময়কার উসমানি খলীফার খেদমতে মহিসুরে নির্মিত রকেটের একটি নমুনা পাঠিয়েছিলেন। খোদ আমেরিকার রকেট আবিস্কারের ইতিহাস সংকলনকারীগণ টিপু সুলতানকে অন্যতম রকেট আবিস্কারকের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

জার্মানির একজন গবেষক ইঞ্জিনিয়ার টিপু সুলতানের যুদ্ধাস্ত্রের ওপর গবেষণা করেছেন।

টিপু সুলতান তাঁর উর্বর মস্তিষ্কের স্বাক্ষর রেখে এমন ঢাল আবিস্কার করেছেন যার ওপর তীর বা গোলা কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে না। টিপু সুলতান এমন শতভাগ সুরক্ষিত সাজোয়া যান আবিষ্কার করেছিলেন, শত্রুপক্ষের বিধ্বংসী গোলাও যার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। টিপু সুলতান সবসময় নতুন নতুন আদলের বন্দুক আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন। টিপু সুলতানের কারখানায় যতো অস্ত্র তৈরি হতো সেগুলোর ওপর কারখানার ব্যবস্থাপক ও স্থান ইত্যাদির নাম খোদাই করা থাকতো। টিপু সুলতানের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে যেই বিশেষ অস্ত্র তৈরি হতো সেগুলোর ওপর أسد الله الغالب [আসাদুল্লাহিল গালিব] লেখা থাকতো। মোটকথা, কারিগরি ও প্রকৌশল বিদ্যার এই শাখা অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণশিল্পেও তিনি তাঁর শত্রুদের তুলনায় পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন।

কৃষি খাত

ব্যবসা ও কারিগরি শাস্ত্রের মতো কৃষি খাতেও মহিসুর রাজ্য টিপু সুলতানের শাসনামলে বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করেছিলো। ইংরেজ ঐতিহাসিক ক্যাপ্টেন লিটল তার ইতিহাসগ্রন্থে লেখেন যে, 'আমরা যখন সালতানাতে খোদাদাদে প্রবেশ করি তখন দিগন্তজুড়ে সবুজের বিস্তৃত সমারোহ, ক্ষেতভরা ফসল আর নাগরিকদের সচ্ছল জীবন দেখে আমরা

www.boimate.com

বুঝেছি যে, টিপুর সৈন্য ও তার প্রশাসন ইউরোপের কোনো উন্নত রাষ্ট্র থেকেও পিছিয়ে নয়।'

ভারতবর্ষের অন্যান্য ভূখণ্ডের মতো মহিসুর রাজ্যেও প্রচুর জমিদার ছিলো। তাদেরকে স্থানীয় পরিভাষায় 'পালিগার' বলা হতো। তারা নিজ নিজ অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ভোগ করতেন। এর বিনিময়ে সরকারকে একটি পূর্ব নির্ধারিত অংকের খাজনা পরিশোধ করতে হতো। আর ওই খাজনার চেয়ে পরিমাণে খানিকটা বেশি খাজনা কৃষকদের কাছ থেকে উত্তোলন করতো। যার অর্থ হলো, এই পালিগারদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে উত্তোলিত খাজনা সরকারের কাছে পৌঁছে যেতো।

জমিদারদের নিজস্ব সৈন্যদল হতো। কখনও কখনও তারা পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তো। ভারতবর্ষের বুকে এই জমিদারভিত্তিক রাজ্যব্যবস্থা আবহমান কাল থেকে চলে আসছিলো।

টিপু সুলতান তার শাসনামলে গরিবচোষা এই জমিদারি ব্যবস্থার মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। পালিগারদের একক কর্তৃত্ব তুলে দেন। কৃষকদের সুবিধার্থে তিনি সকল জমি সরকারের মালিকানা ঘোষণা দেন। কাজেই সুলতান এতদাঞ্চলের প্রথম শাসক– যিনি আবহমান কাল থেকে চলে আসা জমিদারি ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করেন। তিনি সরকারের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করেন। জায়গিরদারদের হাতে কুক্ষিগত অলস জমি গরিব কৃষকদের মাঝে বণ্টন করে দেন। যার ফলে কৃষি খাতে জমিদারদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটে। শষ্য উৎপাদন ও বাগান পরিচর্যার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলেন। অনাবাদ, পতিত, পাহাড়ি, পাথুরে জমিনের ওপর কেউ চাষাবাদ করলে তার জন্যে প্রথম বছরের খাজনা মওকুফ করতেন। দ্বিতীয় বছর তার থেকে খাজনা নেওয়া হতো; কিন্তু তা হতো সাধারণ কৃষক যেই খাজনা দেয়, তার চারভাগের মাত্র একভাগ। এভাবে প্রতি বছর তার উন্নতি ও সচ্ছলতার পরিমাণ অনুসারে অল্প অল্প করে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হতো।

সুপারি বাগানের ওপর উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রথম ৫ বছর খাজনা মওকুফ ছিলো। এরপরও ফল পাকা পর্যন্ত তাকে সাধারণ করের অর্ধেক পরিশোধ করতে হতো। পান উৎপাদনকারীদের জন্যেও প্রথম তিন বছর

www.boimate.com

কর মওকুফ রাখা হতো। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নারিকেল উৎপাদনকারীদের ক্ষেত্রেও প্রণোদনা ছাড় ছিলো। যেসব গাছে ১০ টির কম নারিকেল উৎপাদিত হতো সেগুলোকে করের আওতামুক্ত রাখা হতো।

কাজু বাদাম, এলাচি ও সব্জির ওপর কোনো ধরনের কর ছিলো না। গরিব কৃষকদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে বলদ, লাঙ্গল ও শষ্যবীজ সরবরাহ করা হতো। এর বাইরে শষ্যক্ষেতের ব্যয়ভার হিসেবে তাকে ২০ থেকে ৩০ রুপি পৃথকাকারে দেওয়া হতো।

সুলতান প্রতিটি এলাকার আমলদার (কমিশনার)-কে জমিদারদের মুনাফাখোরি থেকে গরিব কৃষকদেরকে নিরাপদ রাখার বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফসল পাকার মৌসুমে সে পুরো জেলা চষে একটি রিপোর্ট তৈরি করে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিতো। যদি কোনো জমিদারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রমাণিত হতো যে, সে কোনো শ্রমিককে তার ক্ষেতে পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে বেগার খাটিয়েছে, সুলতান তৎক্ষণাৎ ওই জমিদারের সকল শষ্য ক্রোক করতেন। কোনো কৃষক জমিনের মালিকের বিরুদ্ধে জুলুমের অভিযোগ দায়ের করলে সচ্ছল মালিকের ওপর ২০ প্যাগোডা ও মধ্যবিত্ত মালিকের ওপর ১০ প্যাগোডা অর্থদণ্ড করা হতো।

কর আদায়ের ক্ষেত্রে কৃষককে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো। তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের খাজনা বছরে পৃথক তিনটি কিস্তিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দানের সুযোগ পেতো। কোনো বছর উৎপাদনে বিপর্যয় দেখা দিলে তার ওই বছরের খাজনা মওকুফ করা হতো।

অকৃষি খাতে ব্যবহারের জন্যে অবৈধভাবে কোনো জমিন কেউ দখল করলে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রকৃত মালিকের কাছে ওই জমি ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হতো। যদি কোনো কৃষক জমিনে চাষাবাদ না করে, বা কর আদায়ে অকারণে টালবাহানা করে তাহলে সরকার তার কাছ থেকে জমি ফেরত নিতো।

প্রশাসনের অফিসারদেরক পুরস্কার হিসেবে জমিদারি দেওয়ার যেই ধারাবাহিকতা প্রাচীন আমল থেকে চলে আসছিলো সুলতান তা বন্ধ করে দেন। যেই কৃষককে শষ্য উৎপাদনের জন্যে খাল, নদী ইত্যাদি থেকে পানি সিঞ্চন করতে হতো তার ওপর তুলনামূলক অনেক কম খাজনা নির্ধারিত ছিলো। এর বিপরীতে যেসকল ক্ষেতে বৃষ্টির পর্যাপ্ত পানি দিয়ে

www.boimate.com

ফসল উৎপাদন করা যেতো সেগুলোর ওপর এক তৃতীয়াংশ কর আরোপিত ছিলো। এই কর নগদ প্রদান করতে হতো।

শাহতুতের গাছের ওপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্যে টিপু সুলতান কয়েকজন আমলাকে চীন পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখান থেকে কয়েকটি শাহতুত চারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো।

গরম মশলার একটি বিশেষ চারা মহিসুর রাজ্যে পাওয়া যেতো না। সুলতান ট্রাভাঙ্কুর থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় তার চারা সংগ্রহ করে মহিসুরে প্রথমবারের মতো উৎপাদন শুরু করেন।

সুলতান বাগান তৈরি করতে ভালোবাসতেন। ১৭৮৭ সালে তিনি ফ্রান্স থেকে কয়েকজন দক্ষ বাগান-পরিচর্যাকারীকে মহিসুরে আমন্ত্রণ জানান। তাদের সহায়তায় তিনি রাজধানী ও ব্যাঙ্গালুরুতে 'লালবাগ' বানিয়েছিলেন। ব্যাঙ্গালুরের সেই ঐতিহাসিক বাগানটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

কৃষকদের সুবিধার্থে টিপু সুলতান বিভিন্ন নদ-নদীর ওপর বড় আকারের বাধ তৈরি করেন। এগুলোর সাহায্যে শুষ্ক জমি আবাদযোগ্য করে তোলা যেতো।

কাভেরি নদীর পশ্চিমপ্রান্তে পনেরো কিলোমিটার দূরে তিনি একটি বিশাল বাধ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন; কিন্তু নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। তার বাছাইকৃত স্থানটিতেই বতর্মান কর্নাটক সরকার বিখ্যাত কৃষ্ণাসাগর ড্যাম নির্মাণ করে।

মোটকথা মহিসুর রাজ্য খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো। এখানে সকল শ্রেণির খাদ্য উৎপাদিত হতো। টিপু সুলতান স্বউদ্যোগী হয়ে কৃষিখাত পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করতেন। টিপু সুলতানের মহিসুরে যেকোনো তামাক জাতীয় শষ্যের উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিলো। এজন্যে মদ উৎপাদনে সহায়ক হয়, এমন সমস্ত ফল খেজুর ব্যতিরেকে– রোপন ও পালন নিষিদ্ধ করেন। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কারণে বার্ষিক আয় ওই যুগের হিসেবে ১ কোটি রুপি হ্রাস পেয়েছিলো; কিন্তু তারপরও জনগণকে অনিষ্টকর মদের কুফল থেকে রক্ষা করতে তিনি এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতি মেনে নিয়েছিলেন।

www.boimate.com

১৯৯২ সালে টিপু সুলতান একটি সরকারি ফরমানের মাধ্যমে অপরাধীদের জন্যে নতুন ধরনের শাস্তি ঘোষণা করেন। তাহলে প্রত্যেক অপরাধীকে তার অপরাধের মাত্রা অনুসারে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করে তাতে ফল আসা পর্যন্ত তাকে বন্দী জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

মোটকথা, টিপু সুলতানের শাসনামলে গোটা মহিসুর রাজ্যে সবুজের বিপ্লব ঘটেছিলো। তার কৃষকবান্ধব কৃষিনীতির কল্যাণে জমিদারদের মুনাফাখোর মনোবৃত্তি ও তাদের অমানবিক নিপীড়নের হাত থেকে গরিব কৃষক প্রথমবারের মতো রক্ষা পেয়েছিলো।

www.boimate.com

শত্রুদের মুখে সুলতানের ভূয়ষী প্রশংসা

টিপু সুলতান যদিও ১৭৯৯ সালে বেশ কিছু অনিবার্য কারণ ও প্রেক্ষাপটের শিকার হয়ে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং তার শাহাদাতের মাধ্যমে সালতানাতে খোদাদাদের পতন ঘটে; কিন্তু তাঁর শত্রুরা অকুণ্ঠে এ কথা স্বীকার করতো যে, টিপু সুলতান ব্যক্তিগতভাবে অসাধারণ মানুষ, যোগ্য শাসক, শ্রেষ্ঠ দেশচালক ও সফল সেনাপতি ছিলেন।

বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্যে আমরা সুলতানের ব্যক্তিত্ব ও দেশশাসন সম্পর্কে অমুসলিম মনীষা, বিশেষত ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কিছু অভিমত তুলে ধরছি। যা পড়লে সুলতানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা আরেকবার স্মরণ হবে।

১. ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যাকাঞ্জি

টিপু সুলতান তাঁর রাজ্যের অর্থনৈতিক উপকরণগুলোকে যেভাবে সুবিন্যস্ত করেছিলেন, তার আশপাশের কোনো রাজ্যে এর উপমা মেলে না।

২. স্যার জন এন্স থ্রড

টিপুর পতন নিঃসন্দেহে ইংরেজ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও বিশাল কীর্তি।

৩. মেজর বোস

তিনি আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর উপাসনাকারী ছিলেন। তিনি কখনই দু'মুখো পলিসি অবলম্বন করেননি। মিথ্যা ও লৌকিকতা থেকে সবসময় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন।

৪. ইংরেজ ঐতিহাসিক মিল

একজন প্রাচ্যদেশীয় শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানকোষ ছিলেন।

www.boimate.com

৫. ক্যাপ্টেন লিটল

[ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে কর্মরত সেনা অফিসার]

আমরা যখন সালতানাতে খোদাদাদে প্রবেশ করি তখন অনুভব করেছিলাম যে, টিপুর সৈন্য ও তার প্রশাসন ইউরোপের কোনো উন্নত রাষ্ট্র থেকেও পিছিয়ে নয়।

৬. লর্ড কর্নওয়ালস

[ভারতবর্ষে নিযুক্ত ইংরেজ গভর্নর জেনারেল]

যদি টিপু সুলতানকে আমরা তার নিজের মতো করে ছেড়ে দিতাম তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে হিন্দুস্তান ছাড়তে হতো।

৭. মেজর অলিন

[ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধে কর্মরত সেনা অফিসার]

টিপু শুধু একজন সম্রাটই ছিলেন না; তিনি বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা যখন দুর্ঘটনাস্থল দেখতে আসি তখনও তাঁর মুখ থেকে প্রচণ্ড প্রতাপ ও দাপট ঝরে পড়ছিলো। এটাই তাঁকে অন্য সাধারণ থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিলো।

৮. লর্ড ওয়েলেসলি

[ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল]

টিপুর মৃত্যুর পর এদেশের অন্য কোনো শাসক আমাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার দুঃসাহস দেখাবে না।

৯. পশ্চিমা বুদ্ধিজীবি ম্যুর

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নতুন দেশে যায় আর দেখতে পায় যে, স্থানীয় বাসিন্দারা সচ্ছল। শহরে প্রচুর জনসমাগম রয়েছে। কৃষি খাত উন্নত। কারিগরি ও প্রকৌশল বিদ্যাও ক্রমোন্নতি লাভ করছে। বাণিজ্যের প্রচুর সম্প্রসারণ হচ্ছে। তাহলে বুঝে নেবে যে, সেখানকার প্রশাসন জনগণের আশার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। ঠিক এমনই ছিলো টিপু সুলতানের প্রশাসনের চিত্র। অন্ততঃ আমার চোখে এমনটাই ধরা পড়েছে।

www.boimate.com

১০. স্কট

ইংরেজদের হিন্দুস্তানে আগমনের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো টিপুর পতন।

১১. মারাঠা সর্দার নানা ফার্নাবিজ

টিপুর নিঃশেষ হওয়ার অর্থ হলো, এখন বৃটিশদের শক্তি বেড়ে গেছে এবং হিন্দুস্তান কার্যত তাদের হয়ে গেছে। জাতির জীবনে দুর্যোগ নেমে এসেছে।

১২. জেনারেল মনরো

টিপুর প্রশাসনের সামরিক ও বেসামরিক— সব শাখাই অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। সেখানে সবকিছু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়।

১৩. ইংরেজ ঐতিহাসিক ডেভিল

টিপুই হলেন হিন্দুস্তানের প্রথম শাসক— যিনি তাঁর প্রশাসন ও দেশপরিচালনায় পশ্চিমা রীতি-নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন।

১৪. উইলিয়াম মেক্লোড

টিপু এমন একজন শাসক— যিনি নিজ সেনাবাহিনীকে একটি পরিকল্পনার অধীনে বিন্যস্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কারও অনুসরণ করেননি।

১৫. ম্যাকারটিনি

[১৭৮২ সালে মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্নর]

হায়দার আলীর তুলনায় টিপু সুলতান অধিক আল্লাহভীরু ও সভ্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

১৬. প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সিনিক্লিয়ার

['ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক]

টিপুর জন্যে তার হিন্দু-মুসলিম সব ধর্ম ও সব শ্রেণির জনগণ উৎসর্গপ্রাণ ছিলো। তিনি ছিলেন তাঁর জনগণের কাছে অসামান্য জনপ্রিয়।

www.boimate.com

১৭. ডব্লিউ টরেন্স

[বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য]

পুরো ভারতবর্ষে টিপু সুলতানের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোই সবচেয়ে বেশি সবুজ-শ্যামল, ফুল-ফলে সুশোভিত। তাঁর জনগণই এতদাঞ্চলের সর্বাধিক সচ্ছল।

১৮. প্রফেসর জয়েশ্র

টিপু সুলতান তাঁর যুগ থেকে অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১৯. ডক্টর জন আর এন্ডারসন

ভারতবর্ষের মাটিতে দ্বিতীয় টিপু দেখা যায়নি ও যাবে না।

২০. মার্কিন ঐতিহাসিক ব্রড

টিপু সেই লাঞ্ছিতদের মতো মৃত্যুবরণ করেননি, যারা নিজের জীবন বাঁচাতে শত্রুদের সামনে মাথা নত করে।

২১. ইংরেজ জেনারেল স্যার টমাস মনরো

[নিজ আত্মজীবনীতে]

টিপুর শাসনামলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে অভিন্ন আচরণ করা হতো। বিচারের ক্ষেত্রে দ্বৈত্য ছিলো না। তাঁর প্রশাসন এতোটাই শক্তিশালী ছিলো যে, এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে তার আরেকটি উদাহরণ দেখা যায়নি।

www.boimate.com

বইয়ে আলোচিত কিছু অপরিচিত স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বইটিতে শহীদ টিপু সুলতান রহ.-এর জীবনালেখ্য অধ্যয়নকালে পাঠকবর্গ কিছু এমন স্থানের উল্লেখ পাবেন, যা অচেনা মনে হতে পারে। সালতানাতে খোদাদাদের মানচিত্রে এগুলো সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে আমাদের পক্ষে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তন্মধ্য হতে কিছু গ্রাম ও শহরের নাম ইতোমধ্যে বদলে গেছে। কিন্তু আমরা বইয়ে সেই স্থানগুলোর ওই নামটাই উল্লেখ করেছি, টিপু সুলতানের শাসনামলে যে নামে সেগুলো পরিচিত ছিলো। তবে পাঠকবর্গের সুবিধার্থে বক্ষ্যমাণ শিরোনামের অধীনে আমরা সেই স্থানগুলোর বর্তমান অবস্থানস্থল জানিয়ে দিচ্ছি। আশা করি, এর মাধ্যমে বইটি পাঠকবর্গের কাছে আরও সুখপাঠ্য হয়ে ওঠবে।

শহর-নগরের ইনডেক্স তৈরির ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছি 'দৈনিক আফতাবে মহিসুর'-এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ডক্টর শফী' আহমদ শরীফ সাহেবের কাছে। তিনি তাঁর সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে আমাকে যে পরিমাণ সহায়তা করেছেন, তার জন্যে আমি তার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। *–ইলয়াস*

১	আরকাট	বর্তমান তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি জেলাশহর। টিপুর শাসনামলে এটি ছিলো প্রতিবেশী রাষ্ট্র।
২	উচঙ্গিদ্রগ [হোচাঙ্গিদ্রগ]	কর্নাটকের চিত্রাদুর্গ জেলার একটি গ্রাম।
৩	আদোনী [Adoni]	কর্নাটক প্রদেশের 'বিলারী' জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি শহর। টিপুর শাসনামলে এটি একটি ইসলামি হুকুমত ছিলো। এখানকার কেল্লার নিরাপত্তা-ক্ষমতা বেশ প্রসিদ্ধ ছিলো।

www.boimate.com

৪	আরমুজ	ইরানের একটি জেলা শহর। মুক্তা ক্রয়ের জন্যে টিপু সুলতান এখানে একটি বাণিজ্যিক কুঠি প্রতিস্থা করেছিলেন।
৫	আর্মেনিয়া	মধ্য-এশিয়ার একটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্র।
৬	আমবুর	তামিলনাড়ুর একটি বিখ্যাত শহর।
৭	অযোধ্যা	বর্তমানে লাখনৌ। (উত্তরপ্রদেশের রাজধানী)। পূর্বে এটি দাক্ষিণাত্যের একটি রাজ্য ছিলো।
৮	আহমদ নগর	মহারাষ্ট্র প্রদেশের ঐতিহাসিক নগরী।
৯	ইন্দোর	মধ্যপ্রদেশের একটি নগরী।
১০	আজমির	রাজস্থানের একটি ঐতিহাসিক নগরী। এখানে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.-এর মাযার অবস্থিত।
১১	ইসকান্দারিয়া	মিসরের একটি নগরী।
১২	আনীক্যাল	কর্নাটকের একটি নগরী।
১৩	আনকোলা	কর্নাটকের 'কারওয়ার' জেলার একটি নগরী।
১৪	আয়ারল্যান্ড	ইউরোপের একটি দেশ।
১৫	ইটালি	ইউরোপের একটি দেশ।
১৬	অনন্তপুর [Anantapur]	বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের একটি জেলা।
১৭	বোদিকোটা	কর্নাটক প্রদেশের 'কোলার' (Kolar) জেলার একটি গ্রাম।
১৮	ভিলোরি [Vellore]	কর্নাটকের একটি জেলা শহর।
১৯	বেদনুর [Bednore]	কর্নাটক প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত 'কারওয়ার' জেলা অন্তর্ভুক্ত একটি নগরী। হায়দার আলী এ জেলার নাম রেখেছিলেন 'হায়দারনগর'।
২০	বক্সার	উত্তরপ্রদেশে 'বানারস' শহরের পূবদিকে

www.boimate.com

		অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক জায়গা।
২১	বাদামি	কর্নাটক প্রদেশের 'বিজাপুর' জেলার একটি গ্রাম।
২২	ভাটকাল	কর্নাটকের 'কারওয়ার' জেলা অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম ও ঐতিহাসিক স্থান।
২৩	বাঙ্কাপুর	কর্নাটকের 'ধারওয়াড়' জেলার একটি থানা শহর।
২৪	বেদর	কর্নাটকের একটি জেলা শহর।
২৫	বিজাপুর [Bijapur]	কর্নাটক প্রদেশের একটি জেলা শহর।
২৬	বোদিকান্ডা	কর্নাটক প্রদেশের 'শিমুগা' জেলাস্থিত একটি থানাশহর।
২৭	বারো মহল	মোঘল আমলে তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের দক্ষিণাংশ সহ দাক্ষিণাত্যের এলাকাগুলোকে 'বারাহ মহল' নামে অভিহিত করা হতো।
২৮	বালাপুর [Ballapur]	কর্নাটক প্রদেশের দুটি থানাশহর। যা বর্তমানে চিক বালাপুর ও ডোডা বালাপুর নামে প্রসিদ্ধ।
২৯	বালা ঘাট	মাদ্রাজের একটি এলাকা।
৩০	বসরা	ইরাকের একটি ঐতিহাসিক নগরী।
৩১	ব্যাঙ্গালুরু [Bangalore]	কর্নাটকের রাজধানী।
৩২	বেলজিয়াম	ইউরোপের একটি দেশ।
৩৩	বুশহর	ইরানের একটি নগরী।
৩৪	মুম্বাই	মহারাষ্ট্রের রাজধানী।
৩৫	পিঙ্গানমুরি	মহিসুর জেলার একটি গ্রাম।
৩৬	পাংগাল	হায়দারাবাদের শহরতলীতে অবস্থিত একটি স্থান।
৩৭	পুনানি	কেরালার 'পালঘাট' জেলার একটি গ্রাম।
৩৮	পন্ডিচেরি [Pondicherry]	হিন্দুস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনস্থ

www.boimate.com

		দক্ষিণ-পূব সীমান্তে অবস্থিত একটি প্রাদেশিক নগরী।
৩৯	পলাশী	অবিভক্ত বাংলার একটি ঐতিহাসিক নগরী।
৪০	পানিপথ	হরিয়ানার একটি ঐতিহাসিক নগরী।
৪১	পুনা [Pune]	মহারাষ্ট্রের একটি ঐতিহাসিক নগরী। টিপু সুলতানের যুগে এটি ছিলো পার্শ্ববর্তী মারাঠিদের রাজধানী।
৪২	পাইনঘাট	রাজ্যের পশ্চিম ঘাটের একটি এলাকা।
৪৩	পানকুন্ডা	কর্নাটকে ভিলোরি [Vellore] জেলার ঐতিহাসিক থানা শহর।
৪৪	প্যারিস	ফ্রান্সের রাজধানী।
৪৫	তালিকোটা	দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদী (Krishna River) থেকে ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান।
৪৬	ত্রিচনাপলি [Tiruchchirappalli]	তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি গ্রাম।
৪৭	থানেশ্বর	দিল্লির কাছাকাছি একটি জায়গা।
৪৮	তেলচেরি	কেরালা প্রদেশের একটি নগরী।
৪৯	তানজোরি [Tanjore]	কর্নাটক প্রদেশের একটি বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র।
৫০	ত্রিপাতুর []	কর্নাটকের একটি বিখ্যাত নগরী।
৫১	ত্রুপতি [Trupati]	অন্ধ্র প্রদেশে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একটি পুণ্যভূমি।
৫২	ট্রাভাংকুর [Travancore]	কেরালা প্রদেশে 'কোচি (Cochin)' নগরী থেকে ৩০ মাইল দূরের একটি এলাকা।
৫৩	ত্রিনাভেলি	অন্ধ্র প্রদেশের একটি জেলা শহর।
৫৪	যোধপুর	রাজস্থানের একটি বিখ্যাত নগরী।
৫৫	জিদ্দা	সাউদি আরবের সবচেয়ে বৃহৎ

www.boimate.com

		বাণিজ্যিক ও উপকূলীয় এলাকা ।
৫৬	জয়পুর	রাজস্থানের রাজধানী ।
৫৭	চিতোর	অন্ধ্র প্রদেশে মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালুরুর মাঝখানে অবস্থিত একটি নগরী ।
৫৮	চিত্রাদুর্গ [Chitaldroog]	কর্নাটকের একটি নগরী ।
৫৯	চিনাপাটনাম	তামিলনাড়ুর রাজধানী মাদ্রাজের প্রাচীন নাম ।
৬০	চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক নগরী ।
৬১	চিক বালাপুর [Chikballapur]	কর্নাটক প্রদেশের 'কোলার' (Kolar) জেলার একটি একটি প্রাদেশিক শহর ।
৬২	চন্দ্রগিভাগ	কর্নাটক প্রদেশের চিত্রাদুর্গ [Chitaldroog]-এর একটি এলাকা ।
৬৩	চিংগিরি	কর্নাটক প্রদেশের শিমুগা জেলার একটি উপশহর ।
৬৪	চিনপাটান	কর্নাটক প্রদেশের ব্যাঙ্গালুরু জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ।
৬৫	হায়দারনগর	কর্নাটক প্রদেশের কারওয়ার জেলার একটি গ্রাম বেদনূরের প্রাচীন নাম ।
৬৬	হাযরামাউত	ইয়ামান দেশের একটি ঐতিহাসিক নগরী ।
৬৭	হায়দারাবাদ	অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী ।
৬৮	খোরাসান	ইরানের পূবদিকে আফগানিস্তানের পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি নগরী ।
৬৯	দাভারকার	গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত একটি স্থান । কথিত আছে যে, এখানে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য ছিলো ।
৭০	দিভানাহল্লি [Devanahalli]	ব্যাঙ্গালুরুর উত্তর-পূব প্রান্তে ২২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রাম । এখানেই

www.boimate.com

		টিপু সুলতান জন্মগ্রহণ করেন।
৭১	দেউগিরি	দাক্কানের একটি নগরী। পূর্বে এর নাম ছিলো দৌলতাবাদ।
৭২	ধারাপুর	তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি উপশহর।
৭৩	ধারওয়ার [Dharwar]	কর্নাটক প্রদেশের হুবলি জেলার একটি বিখ্যাত নগরী। প্রাচীন আমলে এটি ছিলো মারাঠিদের একটি মজবুত সামরিক ঘাটি।
৭৪	দুদা বালাপুর	ব্যাঙ্গালুরু থেকে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান।
৭৫	ডান্ডিগল	তামিলনাড়ুর একটি জেলা শহর।
৭৬	রাসকুমারি [কন্যাকুমারি]	কেরালা প্রদেশের ঐতিহাসিক উপকূলীয় এলাকা।
৭৭	রাইচপুর [Raichpur]	কর্নাটক প্রদেশের একটি জেলা শহর।
৭৮	রায়দ্রগ	অন্ধ্রপ্রদেশের একটি শহর।
৭৯	রতনাগিরি [Ratnagiri]	মহারাষ্ট্রের একটি নগরী।
৮০	সদা শিবগড়	কর্নাটক প্রদেশের একটি শহর।
৮১	সিরা [Sira]	ব্যাঙ্গালুরু থেকে ২৭ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত 'টমকুর' জেলার একটি উপশহর। মোঘল বাদশাহ আলমগীরের শাসনামলে এটি ছিলো দাক্ষিণাত্যের একটি ছোট শহর।
৮২	সোরাট	গুজরাট প্রদেশের একটি উপকূলীয়, বাণিজ্যিক ও ঐতিহাসিক নগরী।
৮৩	শ্রীরঙ্গাপত্তনাম	কর্নাটক প্রদেশে মহিসুরের নিকটবর্তী একটি ঐতিহাসিক নগরী। এটি সালতানাতে খোদাদাদের রাজধানী ছিলো।
৮৪	সতীমঙ্গল	কেরালা প্রদেশের একটি শহর।

www.boimate.com

৮৫	সুবন্দর	কর্নাটক প্রদেশের হুবলি জেলার একটি তালুক।
৮৬	সুরনগরি	কর্নাটকে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পুণ্যস্থান।
৮৭	সিদ্ধুট	কর্নাটক প্রদেশের একটি উপশহর।
৮৮	সায়লাম	তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী।
৮৯	শিমোগা [Shimoga]	কর্নাটক প্রদেশের একটি জেলাশহর।
৯০	শাভানুর [Savanur]	কর্নাটক প্রদেশের 'হুবলি' জেলার কাছাকাছি একটি ঐতিহাসিক স্থান।
৯১	কনস্ট্যান্টিনোপল	তুরস্কের বর্তমান রাজধানী। ইস্তাম্বুলের প্রাচীন নাম। [বর্তমানে ইস্তাম্বুল নামই প্রচলিত। –আ. আ. ফারুক]
৯২	কায়রো	মিসরের রাজধানী।
৯৩	কৃষ্ণারাজপুর	কর্নাটক প্রদেশের ব্যাঙ্গালুরুর কাছাকাছি একটি গ্রাম।
৯৪	কোলার [Kolar]	কর্নাটকের একটি নগরী।
৯৫	কংগিরি	ব্যাঙ্গালুরু থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপকূলীয় এলাকা।
৯৬	কান্দাপুর	কর্নাটক প্রদেশের সমুদ্র তীরবর্তী একটি এলাকা।
৯৭	কোটাপলি	ব্যাঙ্গালুরু থেকে উত্তরে ৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান।
৯৮	কোয়েম্বাটুর [Coimbatore]	তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি নগরী।
৯৯	কন্যানুর [Kannur]	কেরালা প্রদেশের একটি নগরী।
১০০	কারওয়ার [Karwar]	কর্নাটক প্রদেশের সমুদ্র তীরবর্তী একটি এলাকা।
১০১	কাডাপা [Kadapa]	অন্ধ্রপ্রদেশের একটি নগরী।

www.boimate.com

১০২	কোচি [Cochin]	কেরালা প্রদেশের একটি নগরী।
১০৩	কুঞ্জিবার্ম	তামিলনাড়ুর একটি বিখ্যাত শিল্পনগরী।
১০৪	কাজাগিস্তান	মধ্য-এশিয়ার একটি সদ্যস্বাধীন দেশ।
১০৫	কন্যাকুমারি [রাসকুমারি]	কেরালা প্রদেশের ঐতিহাসিক উপকূলীয় এলাকা।
১০৬	কারুমন্ডল	দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত পাহাড়ি এলাকা
১০৭	কালীকাট [Calicut]	কেরালা প্রদেশের বিখ্যাত উপকূলীয় এলাকা।
১০৮	কাভেরিপত্তনম	তামিলনাড়ুর একটি নগরী।
১০৯	কঙ্গানুর	কর্নাটক প্রদেশে শ্রীরঙ্গাপত্তনামের কাছাকাছি একটি গ্রাম।
১১০	কোর্গ [Coorg]	কর্নাটক প্রদেশে পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি নগরী।
১১১	কটক	উড়িষ্যার একটি বিখ্যাত নগরী।
১১২	কলকাতা	পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী
১১৩	কুঞ্চন গঢ় [কাঁচি]	তামিলনাড়ুর একটি নগরী।
১১৪	কিডলোর	অন্ধ্রপ্রদেশের একটি উপশহর।
১১৫	কোপাল	কনাটক প্রদেশের শিমুগা জেলার একটি উপশহর।
১১৬	কারকুল	দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নাটকের একটি গ্রাম।
১১৭	কারনোল [Kurnool]	অন্ধ্রপ্রদেশের একটি জেলাশহর।
১১৮	গোয়ালকান্ডা	অন্ধ্রপ্রদেশের একটি শহর।
১১৯	গানটোর	অন্ধ্রপ্রদেশের একটি শহর।
১২০	গুলবার্গা [Gulbarga]	কর্নাটক প্রদেশের একটি জেলাশহর।
১২১	গোয়লিয়র	মধ্যপ্রদেশের একটি ঐতিহাসিক নগরী। প্রাচীন আমলে এটি দাক্ষিণাত্যে মারাঠিদের ঘাটি ছিলো।
১২২	ঘানা	আফ্রিকার একটি দেশ।

www.boimate.com

১২৩	গোয়া	পশ্চিম ঘাটের একটি বিখ্যাত প্রাদেশিক শহর। স্বাধীনতার পূর্বে এটি পর্তুগিজদের আস্তানা ছিলো।
১২৪	গাদাগ	কর্নাটক প্রদেশের বিজাপুর জেলাস্থিত একটি নগরী।
১২৫	গুঞ্জিকোটা	কর্নাটক প্রদেশের হুবলি জেলাস্থিত একটি উপশহর।
১২৬	গুত্তি [গুট্টি] [Gutti]	কর্নাটক প্রদেশের বিলারি [Bellary] জেলার একটি কেল্লা।
১২৭	গরমকুন্ডা [গরমকাওয়াট্টা]	অন্ধ্রপ্রদেশের একটি উপশহর।
১২৮	লাক্ষ্মীবার	কর্নাটক প্রদেশের 'ধারওয়ার' জেলার একটি উপশহর।
১২৯	মুডগিরি	কর্নাটক প্রদেশের একটি নগরী।
১৩০	মিসরিকোটা	কর্নাটক প্রদেশের 'ধারওয়ার' জেলার একটি গ্রাম।
১৩১	মালবাগুল	কর্নাটক প্রদেশের 'কোলার' জেলার একটি গ্রাম।
১৩২	মাদোরা	তামিলনাড়ুর একটি নগরী।
১৩৩	মুন্ডিয়া	কর্নাটক প্রদেশের একটি জেলাশহর।
১৩৪	মালওয়াহ্	মধ্যপ্রদেশের একটি শহর।
১৩৫	মদনহাল্লি	অন্ধ্রপ্রদেশের একটি শহর।
১৩৬	মালদ্বীপ	দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের পশ্চিমে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত একটি মুসলিম রাষ্ট্র।
১৩৭	মাদুরায় [Madurai]	তামিলনাড়ুর 'মাদুরা' শহরের অন্য নাম।
১৩৮	মাহি বন্দর	পশ্চিম উপকূলে কালিকাট [Calicut]-এর নিকটবর্তী একটি নৌবন্দর।
১৩৯	মাসকাট	ওমানের রাজধানী।

www.boimate.com

১৪০	মাহি মন্ডল	দক্ষিণ আফ্রিকার কাছাকাছি একটি বদ্বীপ। যেখানে প্রচুর ভারতীয় বংশোদ্ভূত রয়েছে।
১৪১	মরিশাস	এশিয়ার একটি দেশ।
১৪২	মিরিচ	মহারাষ্ট্রের একটি নগরী।
১৪৩	মঙ্গলোর [Mangalore]	কর্নাটক প্রদেশের উপকূলীয় বাণিজ্যিক নগরী।
১৪৪	মাদ্রাজ	তামিলনাড়ুর রাজধানী
১৪৫	মারজান	কর্নাটক প্রদেশের কারওয়ার [Karwar] জেলার একটি নগরী।
১৪৬	মুরাদাবাদ	উত্তরপ্রদেশের একটি নগরী।
১৪৭	মালোলী	কর্নাটক প্রদেশের ব্যাঙ্গালুরু জেলার কাছাকাছি একটি উপশহর।
১৪৮	নরগুন্ডা	কর্নাটক প্রদেশের ধারওয়ার [Dharwar] জেলার একটি উপশহর।
১৪৯	নাগপুর	মহারাষ্ট্রের একটি নগরী।
১৫০	নন্দী	কর্নাটক প্রদেশে ব্যাঙ্গালুরু থেকে ১৮ মাইল দূরবর্তী একটি দৃষ্টিনন্দন পাহাড়ি এলাকা।
১৫১	নিলগিরি	তামিলনাড়ুর একটি বিখ্যাত নগরী।
১৫২	নিলোর	তামিলনাড়ুর একটি নগরী।
১৫৩	নরসিং নারায়ণ পেট	তামিলনাড়ুর একটি নগরী।
১৫৪	নেপাল	ভারতের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত একটি হিন্দুরাজ্য।
১৫৫	বিজয়নগর	দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক নগরী। প্রাচীন যুগে হিন্দুরাজ্যের কেন্দ্রীয় নগরী।
১৫৬	ওয়াম্বাড়ি	তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি গ্রাম।
১৫৭	ভিল্লোর [Vellore]	তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি নগরী।

www.boimate.com

১৫৮	হাওয়াস্কোট	ব্যাঙ্গালুরু থেকে ৩৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম ।
১৫৯	হোনাওয়ার [Honawar]	কর্নাটকের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকা ।
১৬০	হাঙ্গেরি	ইউরোপের একটি দেশ ।
১৬১	হুবলি [Hubli]	কর্নাটক প্রদেশের একটি শহর ।
১৬২	হাসান [Hassan]	কর্নাটক প্রদেশের একটি জেলাশহর ।
১৬৩	হাসুর	তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি উপশহর । একই নামে ব্যাঙ্গালুরুর কাছাকাছি একটি উপশহর রয়েছে ।
১৬৪	হারাপ্পনহাল্লি	কর্নাটক প্রদেশের বিলারি [Bellary] জেলার একটি উপশহর ।
১৬৫	হাবেরি	কর্নাটক প্রদেশের ধারওয়ার জেলার একটি নগরী ।
১৬৬	হেরাত	আফগানিস্তানের একটি নগরী ।
১৬৭	হল্যান্ড	ইউরোপের একটি দেশ ।
১৬৮	ইয়াদগির	কর্নাটক প্রদেশের গুলবার্গা [Gulbarga] জেলার একটি উপশহর ।
১৬৯	ইউসুফাবাদ [দিভানাহল্লি] Devanahalli	কর্নাটক প্রদেশে ব্যাঙ্গালুরু জেলার কাছাকাছি একটি নগরী । এটি টিপু সুলতানের জন্মস্থান ।

www.boimate.com

গ্রন্থপঞ্জি

১	البداية والنهاية	:	আল্লামা ইবনে কাসির
২	الكامل في التاريخ	:	আল্লাহ ইবনে আসির
৩	رحلة ابن بطوطة	:	ইবনে বতুতা
৪	نشان حيدري	:	মীর হুসাইন আলী কিরমানী
৫	حيدر علی	:	নরেন্দ্র কৃষাণ সিনহা
৬	صحيفة ٹيپو سلطان	:	মাহমুদ খান মাহমুদ
৭	تاريخ انگلينڈ	:	সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইযযুদ্দীন হুসাইন
৮	الهند في العهد الإسلامي	:	হাকীম আবদুল হাই হাসানী
৯	قسمات العالم الإسلامي	:	মুসতফা মুমিন
১০	تاريخ فرشتة	:	মুহাম্মদ কাসেম হিন্দু শাহ
১১	وقائع احمدی	:	সাইয়্যেদ হায়দার আলী টোংক
১২	التاريخ الإسلامي في الهند	:	আবদুল মুনঈম আন নামির
১৩	نزهة الخواطر	:	হাকীম আবদুল হাই হাসানী
১৪	تاريخ ٹيپو سلطان	:	মুহিব্বুল হাসান
১৫	تاريخ مرهته	:	মুহাম্মদ ইদরীস খান নজিবাবাদী
১৬	سوانح حيدر علی	:	সাইয়্যেদ আমজাদ আলী আশহারী
১৭	سلطان جمهور	:	মুসলিম ভিলোরি
১৮	سوانح ٹيپو سلطان	:	সাইয়্যেদ আমজাদ আলী আশহারী

www.boimate.com

১৯	انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ۲۲ جلدیں	:	পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর
২০	انسائیکلو پیڈیا آف تاریخ عالم	:	ইউলিয়াম এল
২১	اردو جامع انسائیکلو پیڈیا	:	জাস্টিস এস এ রহমান
২২	اسلامي انسائیکلو پیڈیا	:	সাইয়্যেদ কাসেম মাহমুদ
২৩	تاریخ سلطنت خداداد میسور	:	মাহমুদ খান ব্যাঙ্গলোরি
২৪	انقلاب کی خوني تاریخ	:	শওকত আলী ফাহমী
২৫	سلطان المجاهدین	:	সারওয়াত সাওলাত
২৬	ٹیپو سلطان	:	সাদেক হুসাইন সিদ্দীকি
২৭	غازی اعظم	:	শাহ আবুল হাসান আদীব
২৮	جنگ آزادی کے نامور مجاهدین	:	ইশরাত রহমানী
২৯	سیرت سید احمد شهید	:	মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
৩০	تاریخ مسلمانان پاك وهند	:	সাইয়্যেদ হাশেমী ফরিদাবাদী
৩১	مختصر تاریخ هند	:	মাওলানা আবু যাফর নদভী
৩২	مکمل تاریخ اسلام	:	শওকত আলী ফাহমী
৩৩	ٹیپو سلطان ایکسرٹ	:	এম মিথনা
৩৪	مسلم ان دکشن کنڑا	:	আবদুল ওয়াহহাব দোডামন
৩৫	دکن کے بهی سلاطین	:	হারুন খান শেরওয়ানি
৩৬	تاریخ کوکن	:	মুমিন মুহিউদ্দীন
৩৭	هند کے مایه ناز ہستیاں	:	প্রফেসর বি. উই. শেখ আলী
৩৮	ٹیپو کے تذکرے مختلف ادوار مس	:	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ব্যাঙ্গলোরি
৩৯	هاسن کے نوانط	:	আবদুল মজীদ নায়েতি
৪০	ٹیپو سلطان اور سرنگیری متھ	:	মুহাম্মদ গাউস মুজাবির
৪১	فیصله کن جنگیں	:	মাহমুদ ব্যাঙ্গলোরি
৪২	برٹش ریلیشن وتھ حیدر علی	:	প্রফেসর বি. শেখ আলী

www.boimate.com

	বৃটিশ রিলিশন ইউথ হায়দার আলী		
৪৩	ٹیپو سلطان	:	এম. আবদুল্লাহ ভাট
৪৪	عرب ودیار ھند	:	খাজা বাহাউদ্দীন আকরাম নদভী
৪৫	تاریخ دعوت وعزیمت	:	সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
৪৬	مغلوں کے زوال سے قیام پاکستان تك	:	সাইয়্যেদ হাশেমী ফরিদাবাদী
৪৭	جنگ آزادی اٹھارا سو ستاون	:	খুরশীদ মুসতফা রেজভী
৪৮	تاریخ النوائط	:	নবাব আযীয জঙ্গ বাহাদুর
৪৯	مقالات سلیمان	:	মাওলানা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি
৫০	أطلس تاریخ الإسلام	:	হুসাইন মুমিন
৫১	داستان میسور	:	ইকরাম কাভেশ
৫২	تاریخ جنوب ھند	:	মাহমুদ ব্যাঙ্গলোরি
৫৩	ریاست میسور میں اردو	:	মুহাম্মদ খান মহিসুরি
৫৪	منور ماائیریك ١٩٩٤	:	কেরালা প্রেস
৫৫	اذکار میسور	:	ইকরাম কাভেশ
৫৬	سہ ماہی بصائر، کراچی، ٹیپو سلطان نمبر ١٩٦٤	:	পাকিস্তান
৫৭	شہید آزادی	:	ড. শফী আহমদ শরীফ
৫৮	سونیر	:	পশ্চিমবঙ্গ মসজিদ কল্যাণ পরিষদ ১৯৯৪

www.boimate.com

کیا تم پاگل ہو گئے ہو! خاموش رہو! میرے لئے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے۔

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো। চুপ থাকো। আমার কাছে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা শিয়ালের মতো শত বছরের জীবন থেকে ঢের উত্তম'।

www.boimate.com

১৭০৪ সালে রাজা ওয়াদিয়ারের শাসনামলে মহিসুর রাজ্যের পরিধি। তখনও সালতানাতে খোদাদাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

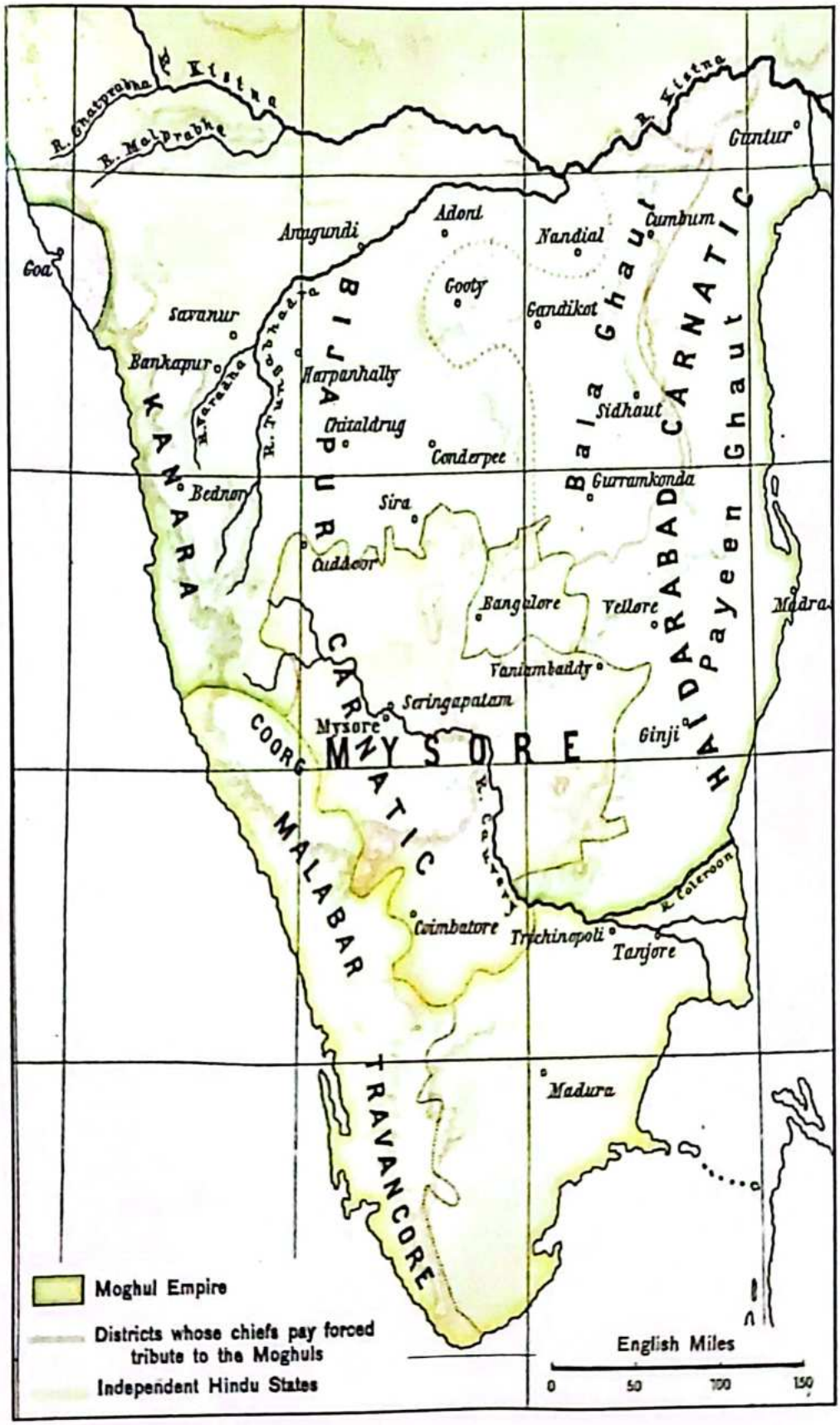

www.boimate.com

১৭৫১ সালে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যের মানচিত্র।

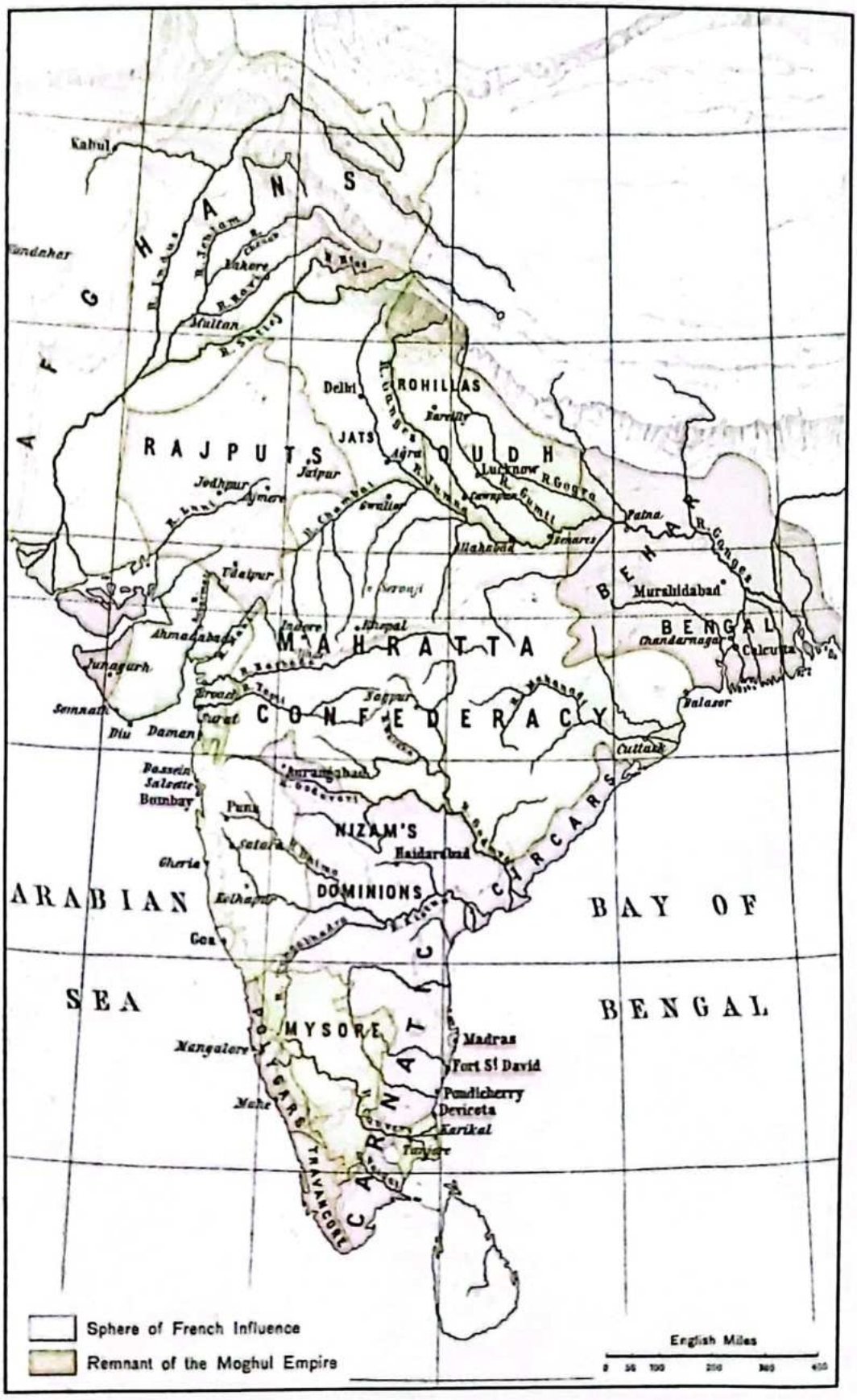

www.boimate.com

১৭৮০ সালে মহিসুরের মানচিত্র। তখন মহিসুরের সম্রাট ছিলেন নবাব হায়দার আলী।

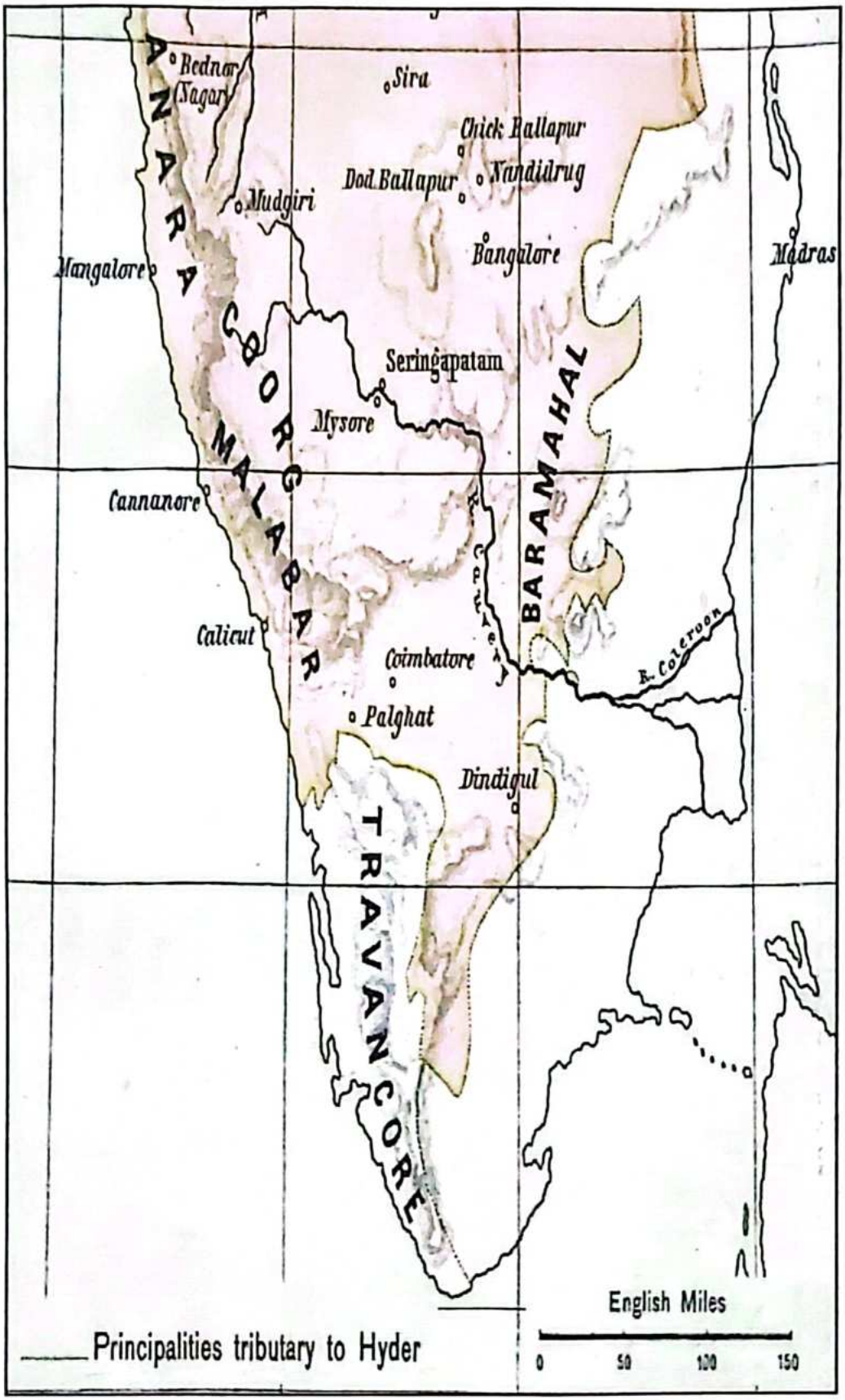

www.boimate.com

১৭৮৪ সালে মহিসুরের মানচিত্র। তখন মহিসুরের সম্রাট ছিলেন টিপু সুলতান রহ.।

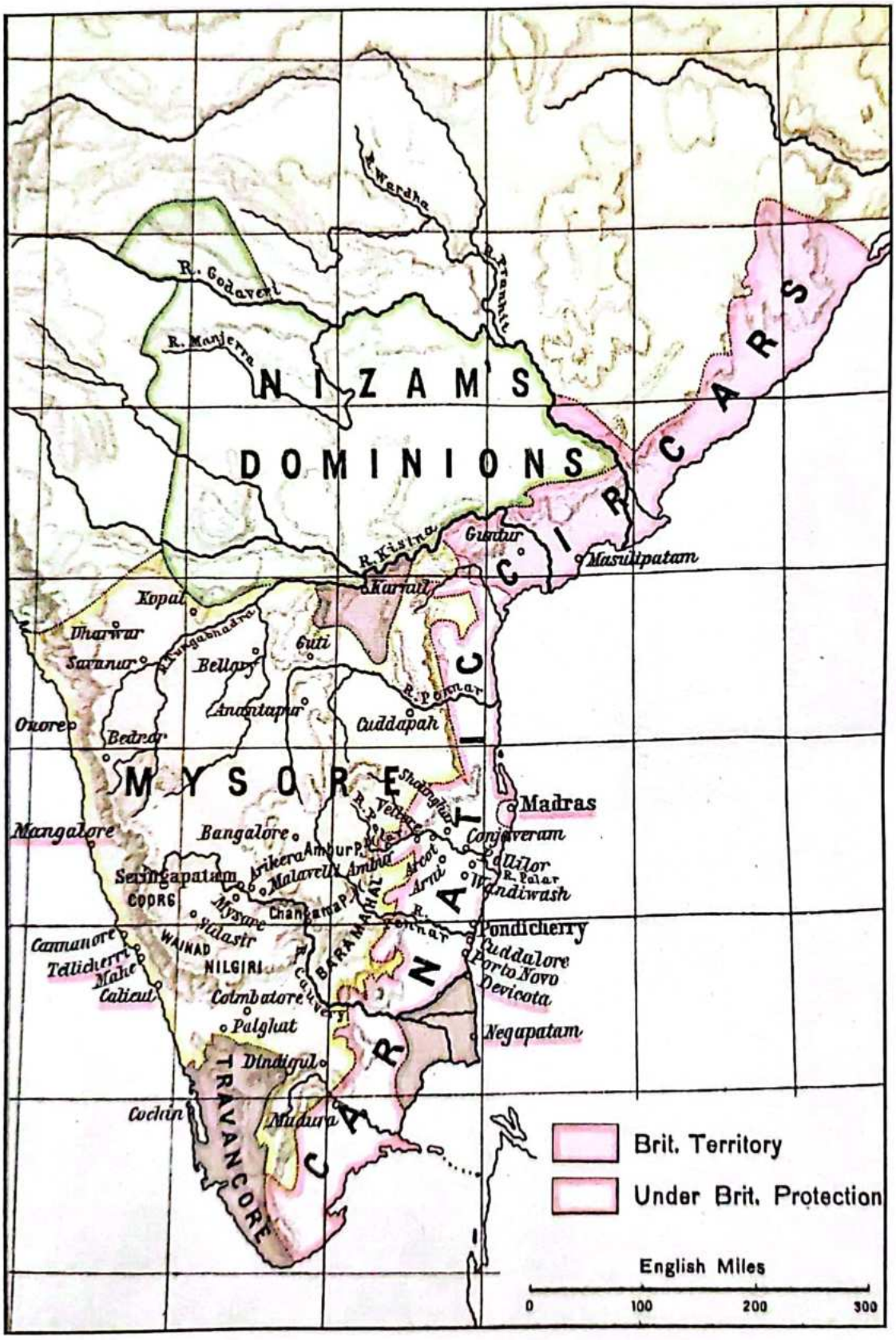

www.boimate.com

১৭০০ থেকে ১৭৯২ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যের মানচিত্র

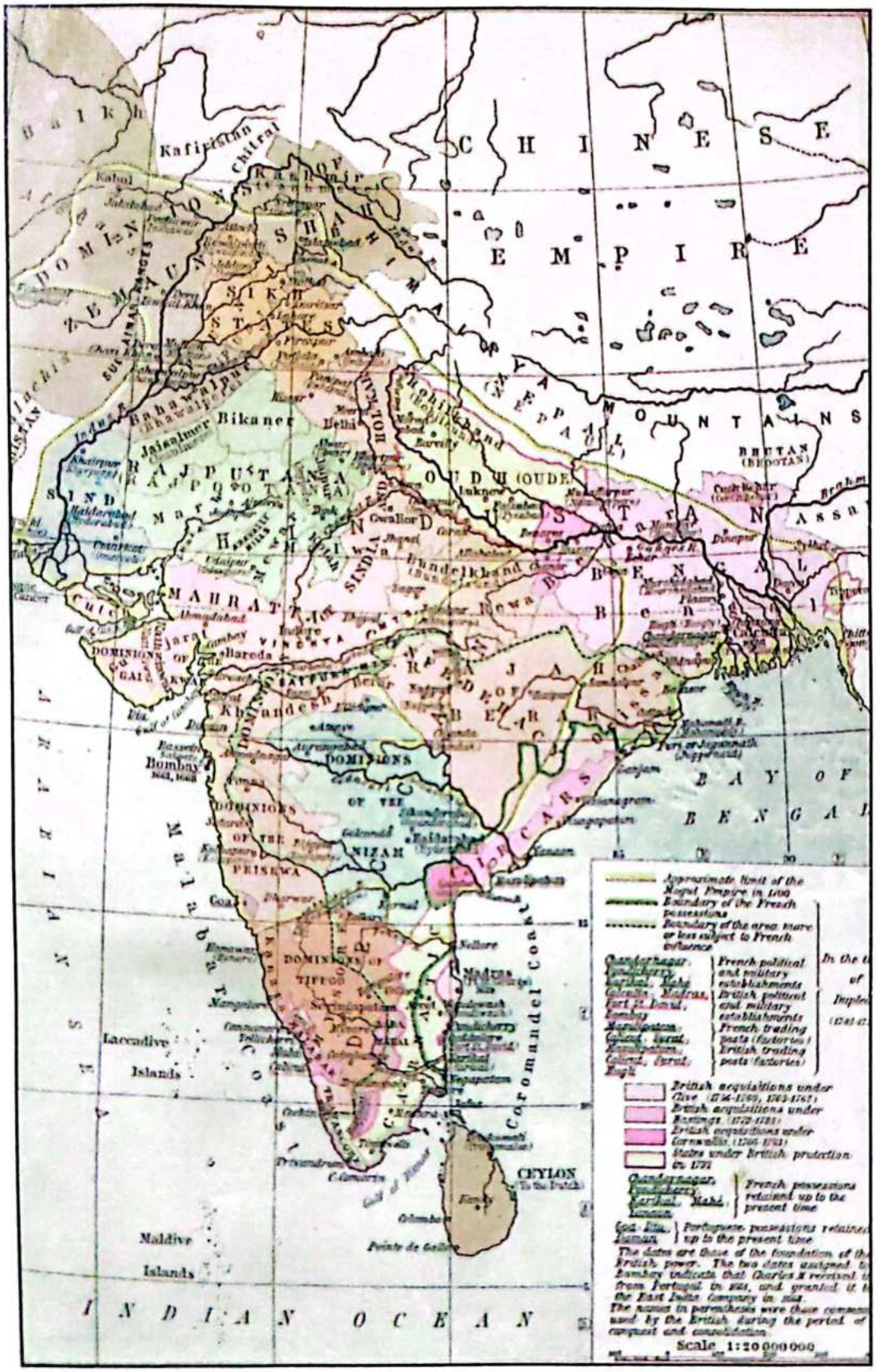

www.boimate.com

১৭৯৫ সালে দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র। ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত টিপু সুলতান ততোদিনে তার অর্ধেক রাজ্য হারিয়ে ফেলেছেন।

www.boimate.com

টিপুর শাহাদাতের কয়েক বছর পর ১৮০৫ সালে মহিসুরের মানচিত্র। তখন মহিসুরের ক্ষমতায় ইংরেজের পুতুল সরকার।

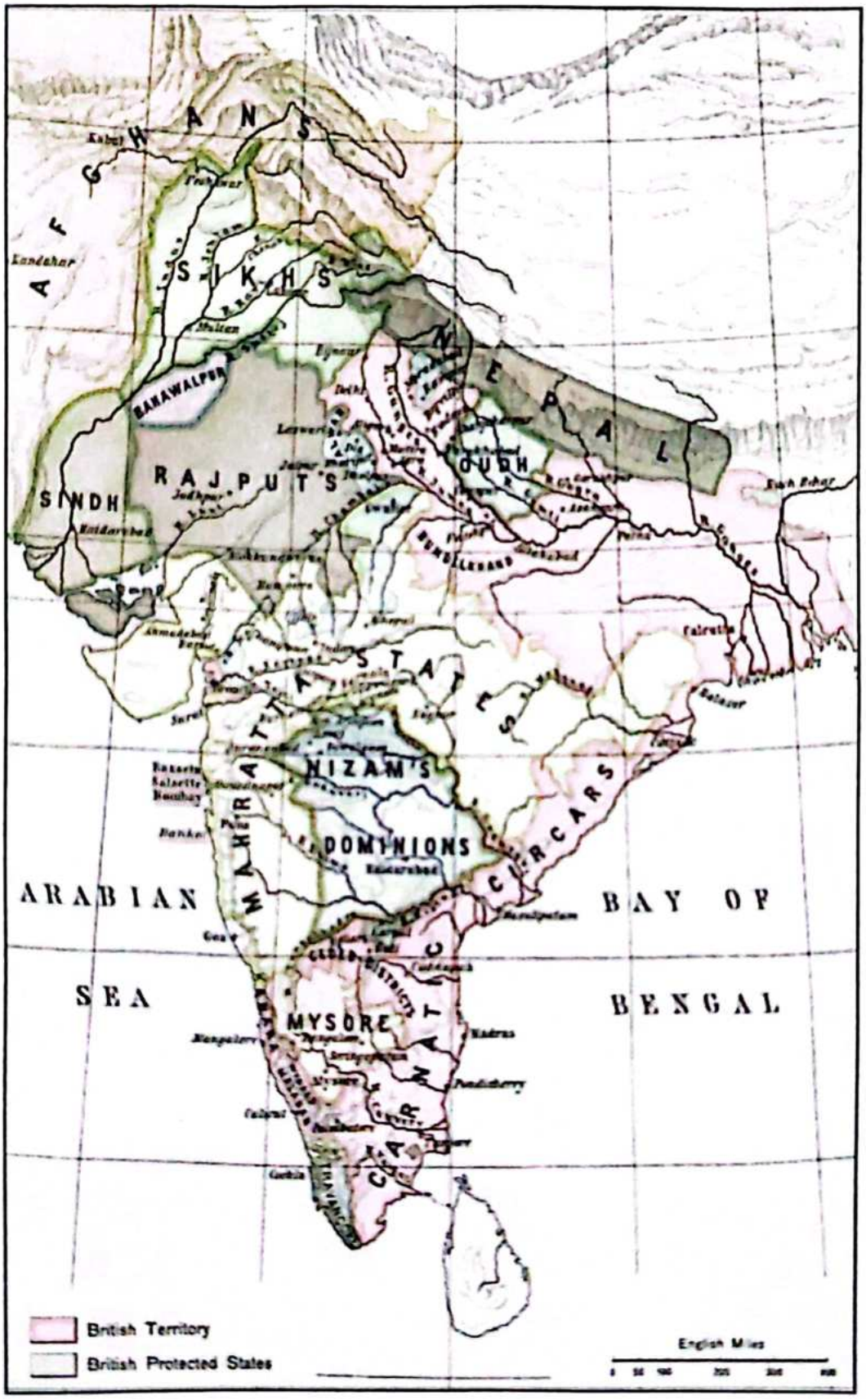

www.boimate.com

ঐতিহাসিক দরিয়া দৌলতবাগের বহির্দৃশ্য

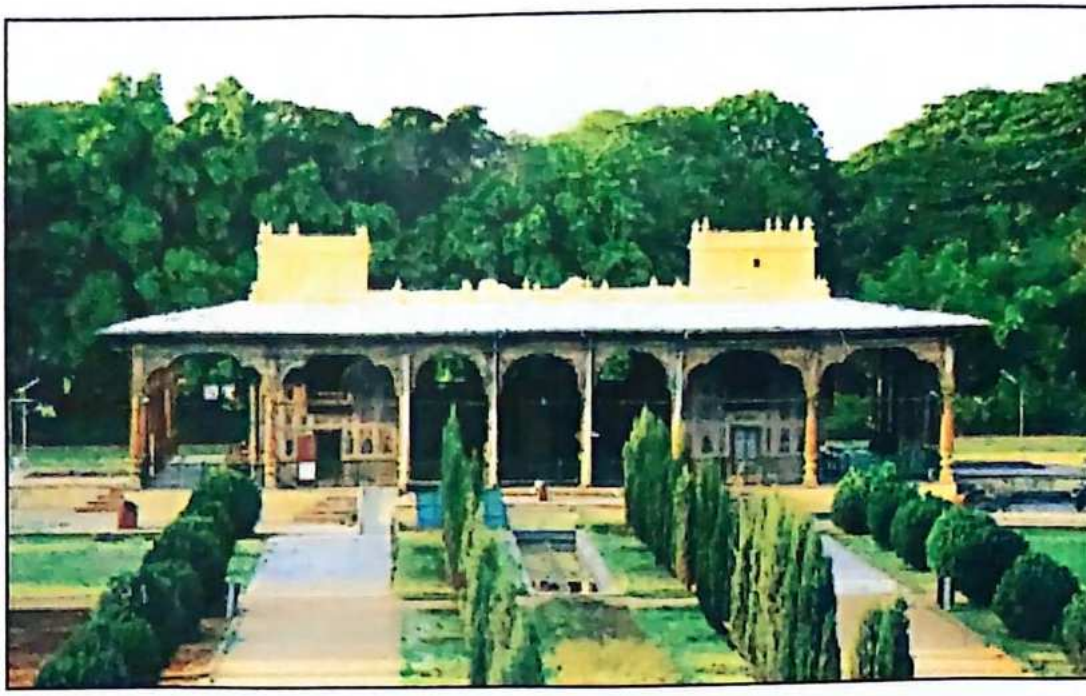

www.boimate.com

ঐতিহাসিক দরিয়া দৌলতবাগের ভেতরের কিছু দৃশ্য

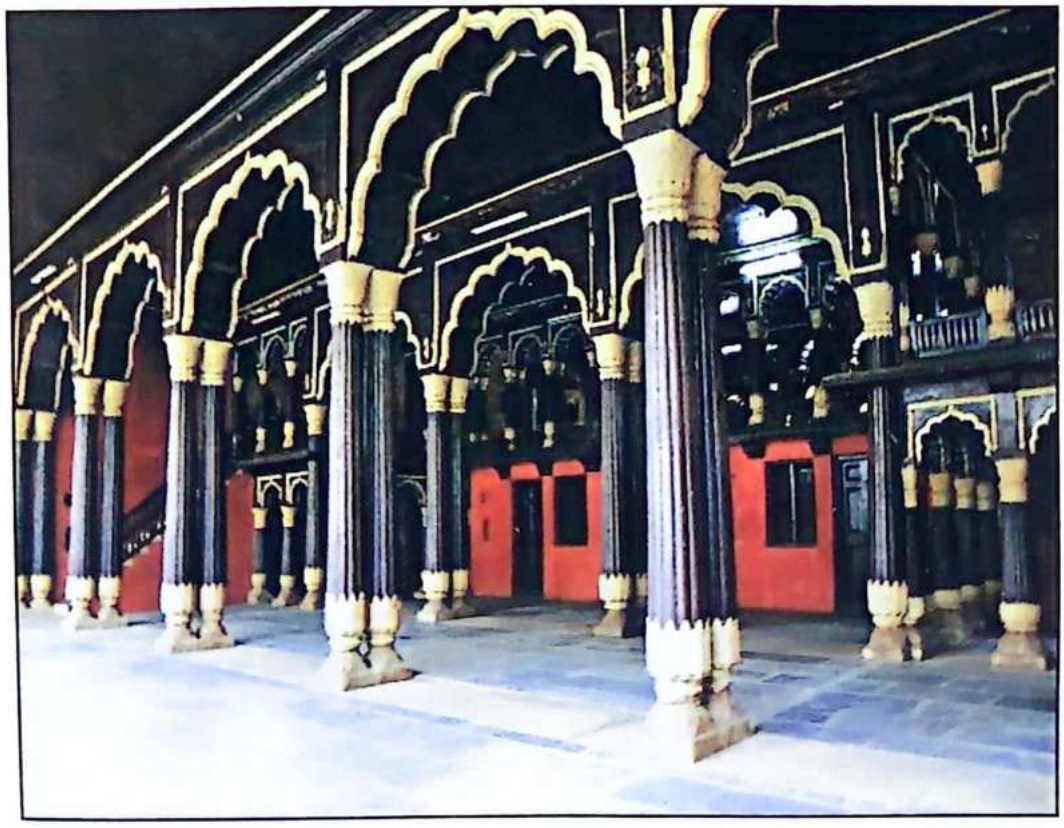

www.boimate.com

টিপু সুলতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে আ'লার কিছু দৃশ্য

www.boimate.com

মসজিদে আ'লার ভেতরের দৃশ্য

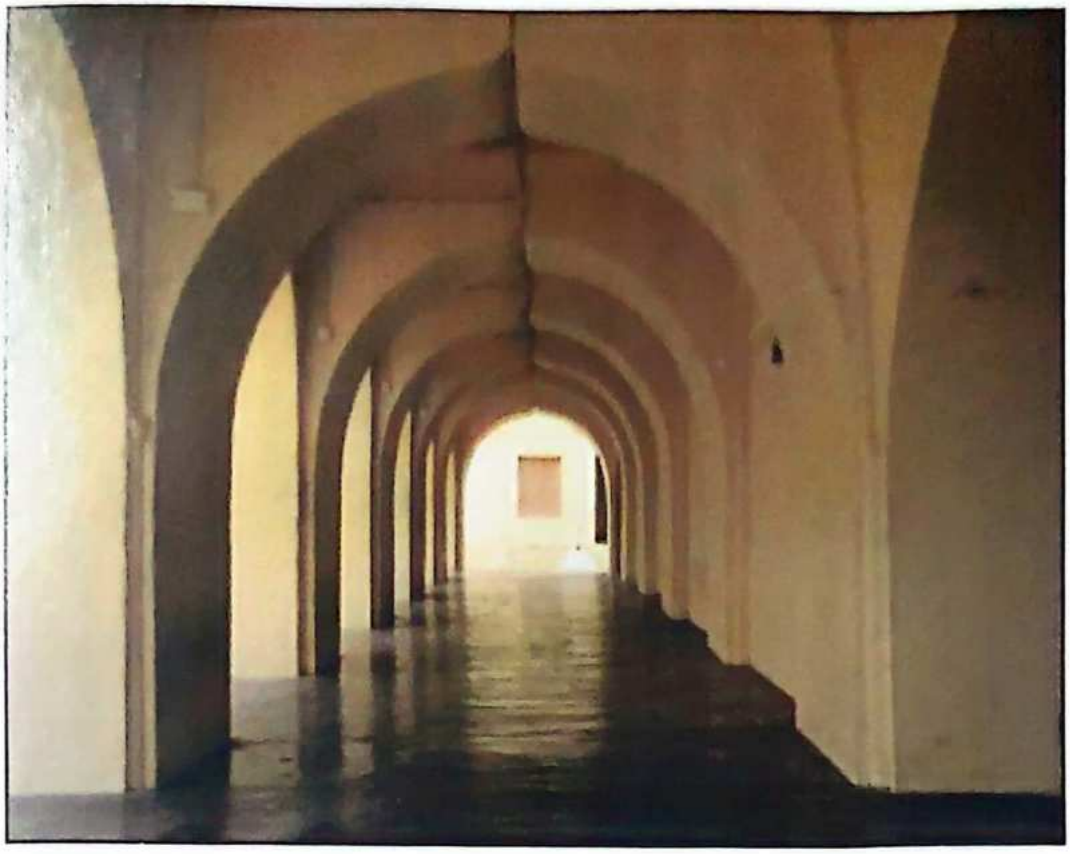

পূর্বপ্রান্ত থেকে মসজিদে আ'লার বহির্দৃশ্য

www.boimate.com

মহিসুর রাজপ্রসাদের চমৎকার দৃশ্য

মহিসুর রাজপ্রসাদের আরেকটি দৃশ্য

www.boimate.com

টিপু সুলতানের জন্মস্থান

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম কেল্লার ভগ্নাবশেষ

www.boimate.com

ইঙ্গ-মহিসুর চতুর্থ যুদ্ধের শেষ দিন ৪ মে ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতান এখানেই শাহাদাতবরণ করেন। এটি স্থানটির বর্তমান চিত্র।

টিপু সুলতানের শাহাদতস্থলের পুরনো দৃশ্য

www.boimate.com

টিপু সুলতানের শাহাদাতস্থলের প্রবেশমুখ

টিপু সুলতান যেখানে শাহাদাত বরণ করেন
শিল্পীর তুলিতে তার একটি স্থিরচিত্র

www.boimate.com

শ্রীরঙ্গাপত্তনাম কেল্লার কিছু দৃশ্য

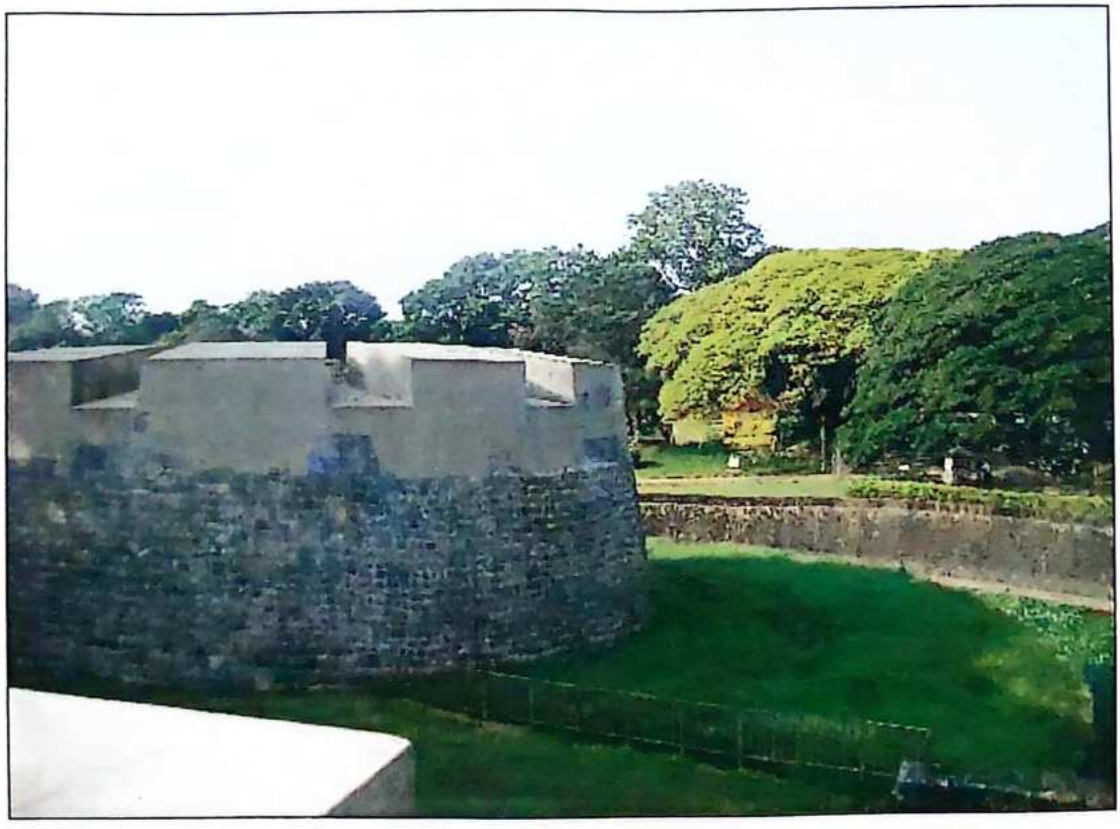

www.boimate.com

মহিসুরের কিছু স্থানীয় নদী

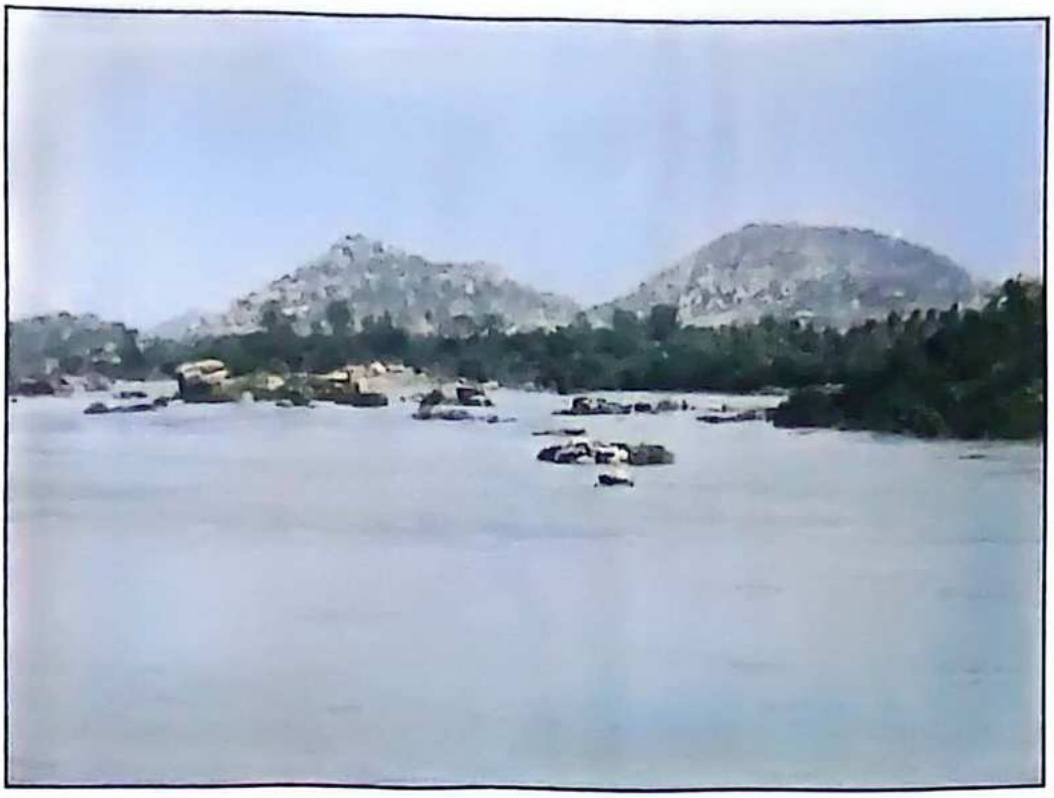

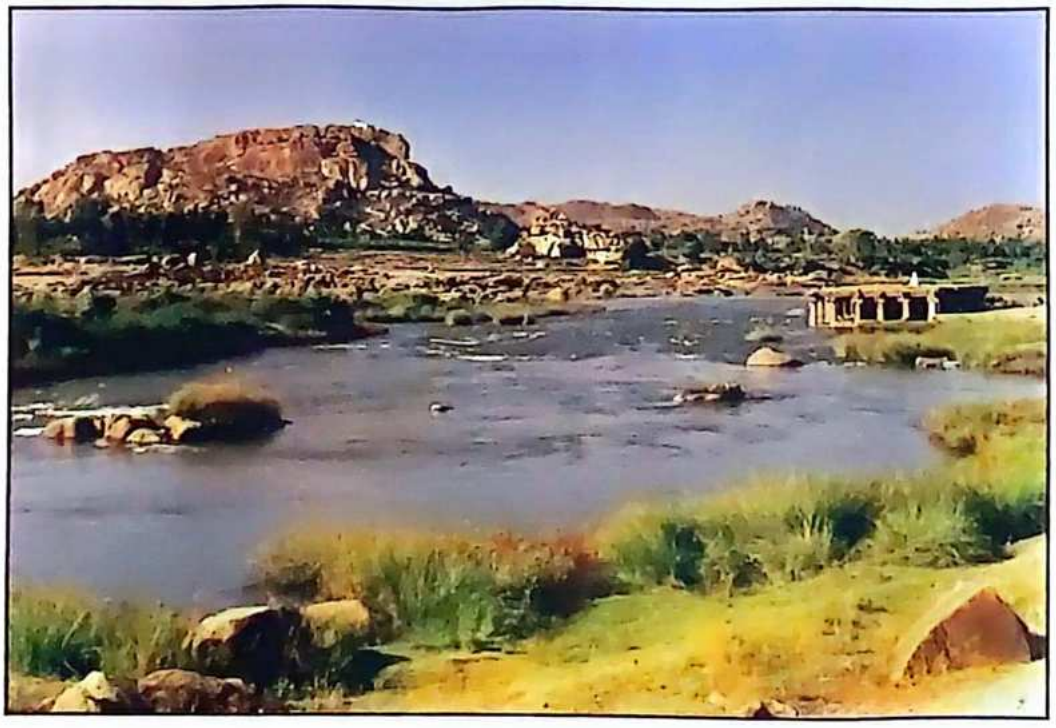

www.boimate.com

ঐতিহাসিক কাভেরি নদীর কিছু দৃশ্য । যার তীরে গড়ে উঠেছিলো মহিসুর রাজ্য

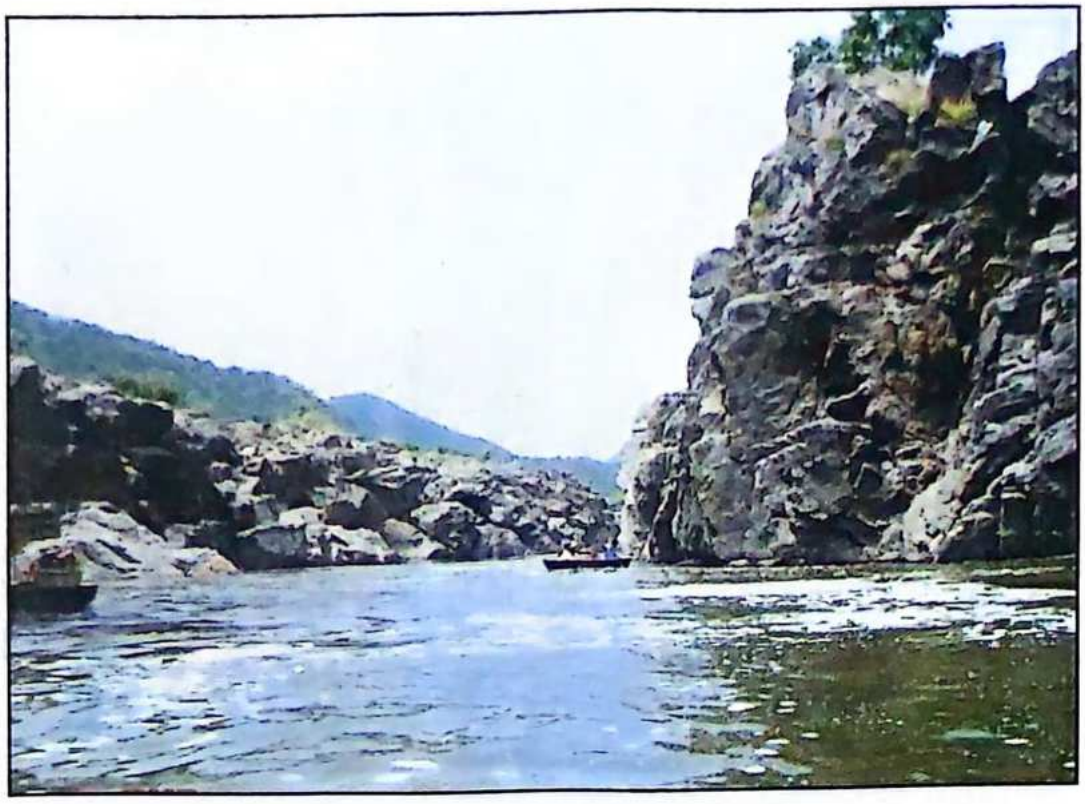

www.boimate.com

১৭৮০ সালে মহিসুরের মানচিত্র। তখন মহিসুরের সম্রাট ছিলেন নবাব হায়দার আলী।

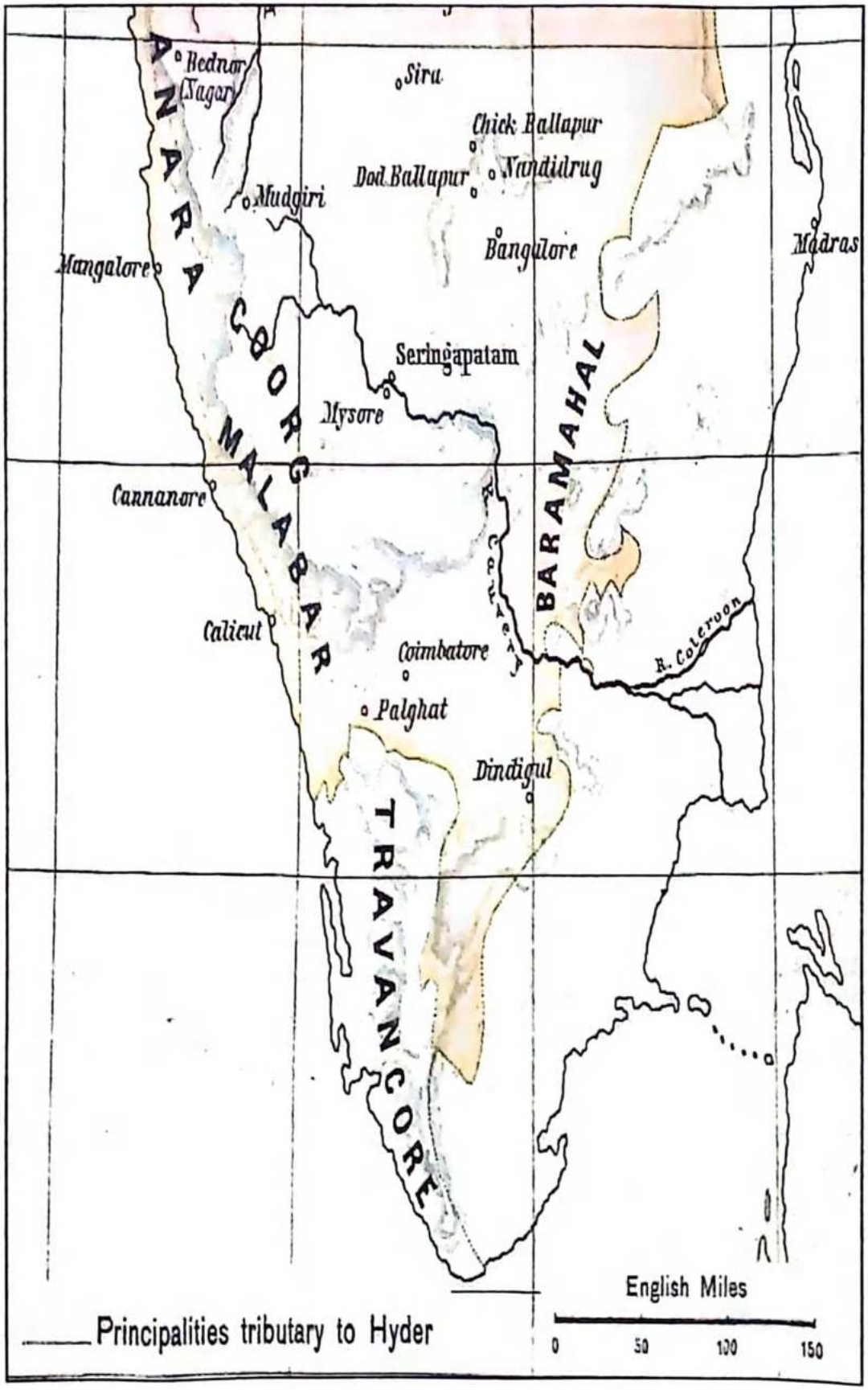

www.boimate.com

১৭৮৪ সালে মহিসুরের মানচিত্র। তখন মহিসুরের সম্রাট ছিলেন টিপু সুলতান রহ.।

www.boimate.com

মারাঠি রাজপ্রসাদের একটি দৃশ্য

মহিসুর রাজদরবারের একটি ঐতিহাসিক দৃশ্য

www.boimate.com

১৭৯৫ সালে দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র। ইঙ্গ-মহিসুর তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত টিপু সুলতান ততোদিনে তার অর্ধেক রাজ্য হারিয়ে ফেলেছেন।

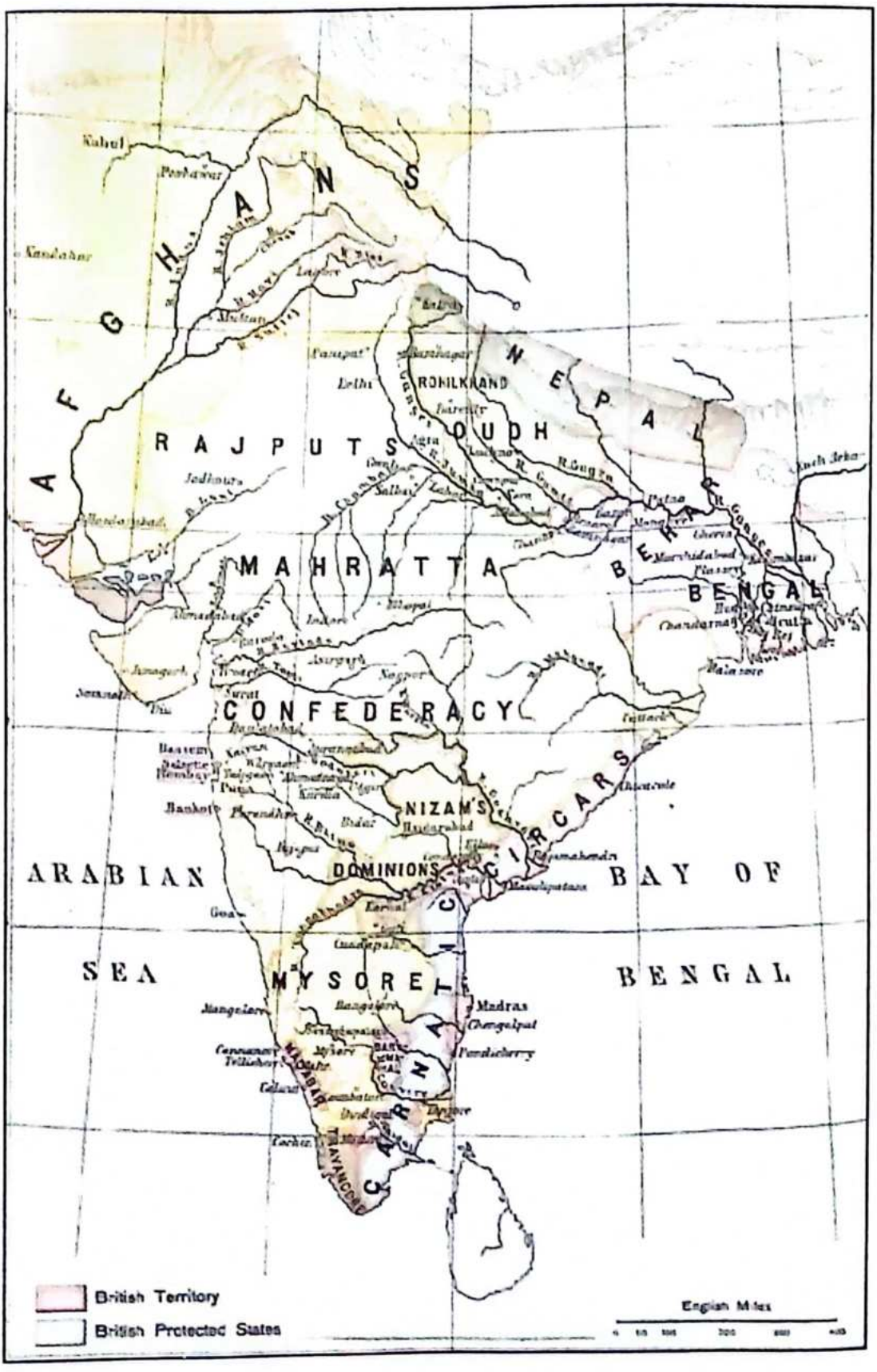

www.boimate.com

শিল্পীর চোখে টিপু সুলতান।

টিপু সুলতানের ঐতিহাসিক ব্যাঘ্রাকৃতির সিংহাসন।

www.boimate.com

যুবক নবাব হায়দার আলী

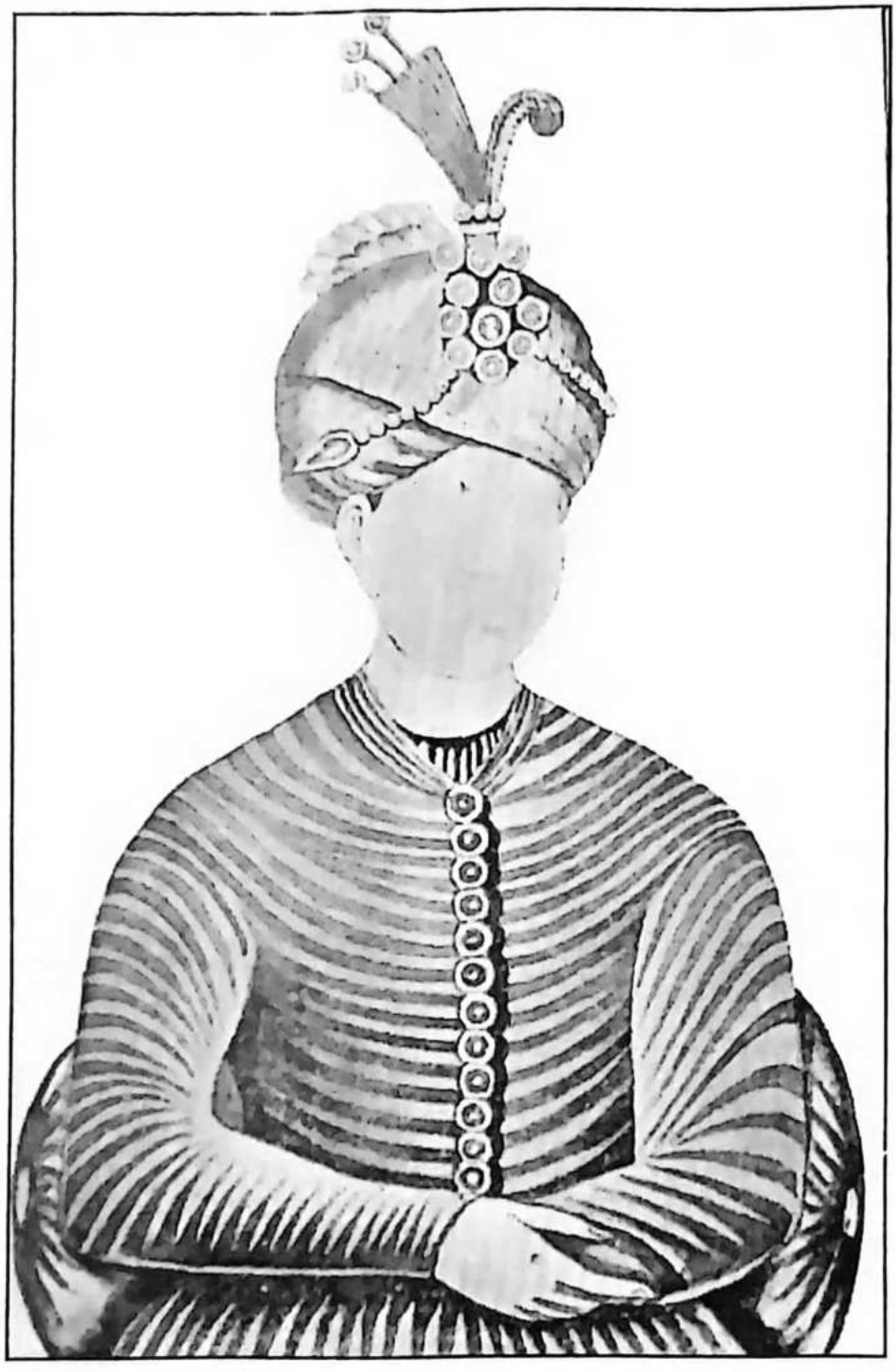

www.boimate.com

শিল্পীর চোখে নবাব হায়দার আলী

www.boimate.com

টিপু সুলতানের শাসনামলে সোনা, রুপা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিলো।
উদ্ধারকৃত কয়েকটি মহিসুরি মুদ্রা।

www.boimate.com

মহিসুর বাহিনীর ইউনিফর্ম

মহিসুর বাহিনীর ব্যবহৃত তোপ

www.boimate.com

টিপু সুলতানের ব্যবহৃত তরবারির কোষ

ধারণা করা হয়, এটি টিপুর ব্যবহৃত আংটি

www.boimate.com

কলকাতার নির্বাসিত জীবনে টিপুর সন্তানগণ ধর্মতলা ও টালিগঞ্জে দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেন। যা এখন সুলতান শাহী মসজিদ হিসেবে পরিচিত। প্রথম ছবিটি ধর্মতলা মসজিদ। আর দ্বিতীয় ছবিটি টালিগঞ্জ মসজিদ

www.boimate.com

টিপু সুলতানের আবিষ্কৃত রকেটের কিছু দৃশ্য। বিভিন্ন তত্ত্ব-উপাত্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, টিপু সুলতানই বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম রকেট আবিষ্কার করেন।

টিপুর আবিষ্কৃত খেলনা। যেখানে একটি ঔদ্ধত বাঘের নিচে অসহায় ইংরেজ ধরাশয়ী হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। খেলনাটি সুলতানের অত্যন্ত প্রিয় ছিলো।

www.boimate.com

শিল্পীর চোখে পরিণত বয়সের হায়দার আলী।

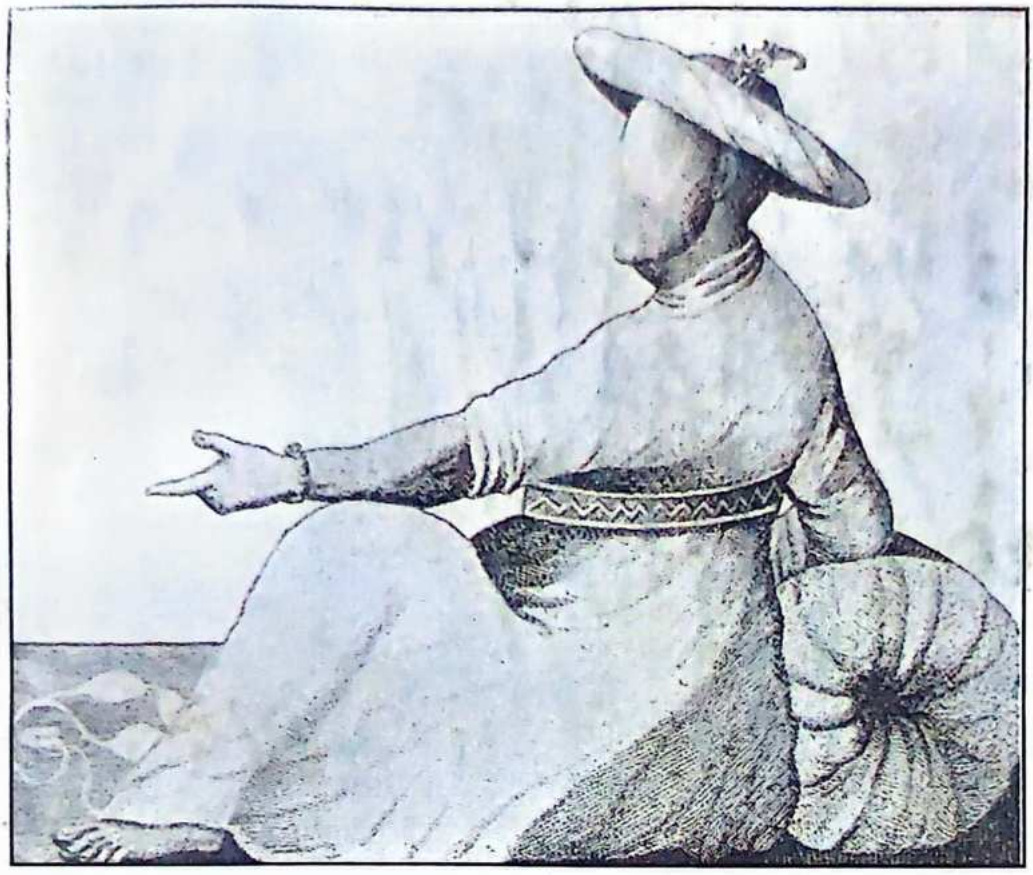

টিপু সুলতান মিউজিয়াম। সুলতানের ব্যবহৃত বিভিন্ন ঐতিহাসিক বস্তু এখানে প্রদর্শিত হয়।

www.boimate.com

মারাঠি সৈন্যদের ইউনিফর্ম

www.boimate.com

আবদুল্লাহ আল ফারুক

লেখক। অনুবাদক। মুহাদ্দিস। সম্পাদক

পিতা : মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাইফী

জন্ম : ২৩ নভেম্বর ১৯৮৩ ঈ. । খিলগাঁও, ঢাকা

দাওরায়ে হাদীস, আদব ও ইফতা

দারুল উলূম দেওবন্দ, উত্তরপ্রদেশ, ভারত [২০০৩-০৫]

পেশা : লেখালেখি ও শিক্ষকতা ।

লেখেন কবিতা, অনুবাদ ও কলাম। বই, স্মারক, দেয়ালিকা ও সাময়িকী সম্পাদনার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মুহাদ্দিস হিসেবে জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা ও দারুল উলূম রামপুরায় কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে বাসাবোস্থ আবু যর গিফারি কমপ্লেক্সে আরবি ভাষা ও ফিকাহ শাস্ত্রের শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করছেন।

ছাত্রজীবনেই লেখালেখির সূচনা। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার স্মারকে। আলোকিত বাংলাদেশ, প্রিয়.কম, কিশোরস্বপ ও রহমত-সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, মাসিক পত্রিকা ও স্মরণিকায় প্রবন্ধ, কবিতা ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও নিউজ পোর্টালে শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আরবি ও উরদু থেকে অনুবাদ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তার অনূদিত শিশুতোষ বইগুলোও বেশ জনপ্রিয়।

সাইয়্যেদ মানাযির আহসান গিলানী, শায়খ হিফযুর রহমান সিওহারভী, মাওলানা ইদরিস কান্ধলভী, মুহাদ্দিস আবদুর রশীদ নুমানী, শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুফতী তাকী উসমানী, শায়খ যুলফিকার নকশবন্দী-সহ বরেণ্যদের বেশ কিছু বইয়ের সার্থক অনুবাদ করেছেন। আরবি থেকে অনূদিত বইয়ের সম্ভারও বেশ ঋদ্ধ। ইমাম গাযালী, আয়েয আল কারনী, আবদুত তাওয়াব ইউসুফ, সামাহ কামেল, সামীর হালবী, আহমদ তাম্মাম, সালামাহ মুহাম্মদ-সহ আরববিশ্বের বেশ ক'জন খ্যাতিমান লেখকের বই অনুবাদ করেছেন।

প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অর্ধশতাধিক।

মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত বই

- ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
- স্মৃতির দর্পণে দারুল উলূম দেওবন্দ
- আকাবিরে দেওবন্দ : আদর্শ ও চেতনা
- আসল সালাফী ও আজকের সালাফী
- ডিজিটাল ছবি ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সম্পর্কে ইসলামের বিধান
- ছাত্রদের উদ্দেশে ইমাম গাযালী রহ.-এর খোলা চিঠি [হে বৎস]
- সোনালী যুগের মুহাদ্দিসীনে কেরাম
- খুতুবাতে যুলফিকার [৮, ৯, ১০, ২১, ২২, ২৩ ও ৩০]

মহান আল্লাহ তাঁর জীবন, জ্ঞান ও কর্মে বরকত দিন।

www.boimate.com

"One day of life as a Tiger is far better than thousand years of living as a Sheep"

-Tipu Sultan

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
9881532, 01924076365

বাংলাবাজার শাখা
১ আভারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01715023118

যাত্রাবাড়ি শাখা
৩৯, ৩৫, ৩৬ যাত্রাবাড়ি মাদরাসা মিডিয়া মার্কেট
কুতুবখালী, ঢাকা। 01975023118

maktabatulazhar@yahoo.com /Maktabatul-Azhar

www.boimate.com